ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ

কেশব চৌধুরী
রীডার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন রীডার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

BHARATIYA JATIYATABADER BHITTI O SWARUP
Keshab Choudhuri
[Basis and Nature of Indian Nationalism]

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
West Bengal State Book Board

প্রকাশকাল :
ডিসেম্বর, ১৯৭০

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন, (নবম তল)
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

মানচিত্রাদি : নির্মল কর্মকার
প্রচ্ছদ : দুর্গা রায়

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in Regional Languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী···'

মায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক আমলের নূতন আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়াস ও তার গুরুত্ব আজও কমেনি। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে আগ্রহী দেশী-বিদেশী গবেষকদের বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিতে ঐরূপ প্রয়াসের পরিধি উত্তরোত্তর বিস্তৃততর হয়েছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিসংগ্রাম প্রায় অবশ্যপাঠ্যের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের নেতৃত্বে পরিচালিত 'বিশ্ববিদ্যালয় নেতৃত্ব প্রকল্পের' অন্যতম কর্মী হিসাবে বিগত বছর দু'টিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদানরত সহকর্মী বন্ধুদের সাথে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটেছিল। আগরতলা, কোলকাতা, বহরমপুর, বিরাটি, বেলুড়, মেদিনীপুর প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকদের সাথে আলোচনাচক্রে মিলিত হতে পেরেছিলাম। তাঁদের কেউ কেউ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনাচক্রে উপস্থাপিত আমার বক্তব্য ও অভিমতের ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় একখানি বই লেখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন থেকে বইটি লেখার কাজে হাত দিই ; আবার আলোচনাসভায় বলার কাজও চলতে থাকে। বলা যায়, বলতে বলতে লিখেছি, লিখতে লিখতে বলেছি। বইটিতে তাই পাণ্ডিত্যের ভার নেই, দাবি তো নেই-ই।

বইটি লেখার ব্যাপারে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য উৎসাহ যুগিয়েছেন। নানা বিষয়ে তাঁর পরামর্শ আমার মূল্যবান মনে হয়েছে। বিভাগীয় অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতার মনোভাব আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বলা বাহুল্য, বইটির যে-কোন ভুলত্রুটির দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে আমার, অন্য কারোর নয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ও জ্ঞানোদয় প্রেসের পরিচালক ও কর্মীদের উদার ও নিপুণ সহায়তা ছাড়া বইটি প্রকাশ করা অসম্ভব হত। শ্রীমান অরূপ চৌধুরী নির্দেশিকা রচনায় সাহায্য করেছে। তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

মে দিবস, ১৯৭০ — কেশব চৌধুরী

আশুতোষ বিল্ডিংস

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরিভাষা

alternative model বিকল্প ছক্ বা নক্শা
antithesis পূর্বপক্ষ বিরোধী
appendix উপাঙ্গ বা অনুবন্ধ

by-produrt উপজাত

caste scale বর্ণমানক
caste system বর্ণপ্রথা বা ব্যবস্থা
centralized কেন্দ্রীভূত
centrifugal কেন্দ্রাতিগ
certificate অভিজ্ঞানপত্র
concentration ঘনীভবন
conceptual ধারণাগত
configuration বহিরাকৃতি

depreciation fund অবচয় তহবিল
despatch প্রতিবেদন
drain theory নিষ্কাশন তত্ত্ব

economic depressor মন্দীভূত আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের পীঠস্থান
elite অভিজাত গোষ্ঠী
empirical evidence চাক্ষুষ সাক্ষ্য-প্রমাণ
enlightenment জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকউদ্ভাস
ethnocentric স্বজাতিকেন্দ্রিক
extremist চরমপন্থী

filtration process পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া

great religious tradition মহান ধর্মীয় ঐতিহ্য

hindu ethic হিন্দু নৈতিকতা
historiography ইতিহাস লিখন
homogeneous সমরূপ
horizontal mobilization অনু-ভূমিক জমায়েত

ideal-type construct আদর্শ প্রতিরূপ
industrialization শিল্পায়ন
infrastructure অন্তর্গঠন
imperial preference রাজকীয় অগ্রাধিকার
instinctive alliance স্বতঃপ্রবৃত্ত মৈত্রী
interest group স্বার্থগোষ্ঠী
involution কুণ্ডলীকরণ

labour-intensive শ্রমনিবিড়

legal code আইনসংহিতা
legitimacy বৈধতা
liberal উদারপন্থী বা উদারনৈতিক
little religious tradition ক্ষুদ্র ধর্মীয় ঐতিহ্য

mass communication গণজ্ঞাপন
mass phase জনসাধারণী পর্যায়
mechanization যন্ত্রিকরণ
metropolis মহানগর
militant জঙ্গী
model ছক্, ধাঁচ বা নমুনা
moderate নরমপন্থী
modernization আধুনিকীকরণ
multisectoral বহু স্তরভিত্তিক

nation-building জাতিগঠন

occult অধিবিদ্যক
organized politics সংগঠিত রাজনীতি

polarization মেরুকরণ
political economy রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি
pressure group চাপগোষ্ঠী
protectionist policy সংরক্ষণবাদী নীতি
psycho-aesthetic মনস্তাত্ত্বিক-নান্দনিক
premier মন্ত্রীপ্রধান

regnerative পুনরুজ্জীবনমূলক
rural idiom গ্রামীণ বাগ্‌ধারা

sanskritization সংস্কৃতায়ন
social mobility সামাজিক সচলতা
socialization সামাজিকীকরণ
socioeconomic আর্থ-সামাজিক
speciatization বিশেষিকরণ
spectrum বর্ণালী
status scale মর্যাদা-মানক
stratification স্তরবিন্যাস
subaltern নিম্নবর্গ
surplus valuc উদ্বৃত্ত মূল্য

take off প্রথম উৎক্ষেপ
theosophic movement দিব্যজ্ঞান আন্দোলন
thesis পূর্বপক্ষ
traditional modernity পরম্পরা-গত বা সনাতনী আধুনিকতা
trusteeship theory অছিতত্ত্ব

urbanization নগরীকরণ বা নগরায়ন
utilitarianism হিতবাদ

vertical mobilization উল্লম্ব জমায়েত
village community গ্রামীণ সম্প্রদায়
volunteer agent স্বেচ্ছাসম্মত দালাল

westernization পশ্চিমীকরণ

সূচীপত্র

মানচিত্রসূচী

চিত্রসূচী

মুখবন্ধ

ব্রিটিশ ভারতে জাতিগঠনের প্রয়াস এবং জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের আলোচনায় বিভিন্ন মতাদর্শের আলোকসম্পাত ঘটেছে।

গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস লিখনে ভারতীয় জাতির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিস্তার ও প্রাবল্য অচিরেই এরূপ অস্বীকৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছিল। ঐরূপ ইতিহাস লিখন তখন এরূপ তত্ত্ব প্রচারে নিয়োজিত হয়েছিল যে, ভারতীয় জাতিগঠনের সম্পূর্ণ কৃতিত্বই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রাপ্য। কেননা, হেস্টিংস থেকে ড্যালহৌসি পর্যন্ত 'কোম্পানি রাজের' আমলে ভৌগোলিক দিক থেকে সংবদ্ধ, রাজনৈতিক ভারত সৃষ্টি করেছিল ঐ শাসন। একের পর এক সামরিক অভিযান পরিচালনার মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ব্রিটিশ ভারতভুক্তি এবং সবত্র সমরূপ শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যের বনিয়াদ রচনা করাও ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের ফলশ্রুতি বলে প্রচারিত হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল যে, স্থবির ভারতীয় অর্থনীতির ধ্বংস ঘটিয়ে এবং নূতন অর্থনীতি গড়ে তুলে আর্থনীতিক প্রগতির রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া ঐ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ব্রিটিশ তথা ভারতীয় উদারনৈতিক দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে ভগবানের আশীর্বাদরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা মনে করেছিলেন যে, পশ্চিমী শিক্ষা ও মানবতাবাদী কার্যক্রমের মাধ্যমে সভ্যতা-সংস্কৃতির 'অচলায়তন' ভারতে ঐ শাসন নূতন চেতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভগীরথের ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিমী আধুনিকীকরণের প্রবক্তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অনুধাবন ও রূপায়ণে সক্ষম ভারতীয় একটি 'শ্রেণীর' উদ্ভব উদারনৈতিক দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান কীর্তি হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। দাবি করা হয়ে থাকে, এই শ্রেণীর ভারতীয়রাই জাতিগঠনের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন এবং তাঁরাই জাতীয়তাবাদী চিন্তার জনক হিসাবে কর্তব্য পালন করেছিলেন।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী চিন্তা ভাববাদের প্রেরণায় ঔপনিবেশিক শাসনকে ভারতীয় জনজীবনের উপর সর্বব্যাপী একটি অভিশাপ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। এরূপ চিন্তায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদ স্বদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মমূল থেকে উৎসারিত বলে প্রতিভাত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখনে এরূপ একটি বিশ্বাস লক্ষণীয় যে, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রভৃত আত্মত্যাগ, জনসাধারণের দাবিদাওয়া উত্থাপন ও 'সংগঠিত রাজনীতির' চাপ সৃষ্টি করার মাধ্যমে জাতিকে মুক্তিসংগ্রামের পথে সামিল করেছিলেন।

ইতিহাস লিখনের উপরোক্ত তিনটি প্রয়াসের ক্ষেত্রেই সাধারণ একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ বা ভারতীয় "অভিজাত' গোষ্ঠীর সৃষ্টি, অভিজাত বলতে ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী, যা-ই বোঝান হোক না কেন। সংগঠিত রাজনীতি শুরুর আগে বা পরে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয় নিম্নবর্গের জনতার ভূমিকা নির্ণয়ের তাগিদ উপরোক্ত প্রয়াসগুলিতে অনুপস্থিত।

মার্কসীয় তাত্ত্বিক রজনীপাম দত্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, মুক্ত বাণিজ্যের ধ্বজাধারী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতে বস্তুগত দিক থেকে প্রগতিশীল ভূমিকা পালনে রত ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে, ঐ ভূমিকা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের আর্থনীতিক পূর্বশর্ত রচনা করেছিল।

১৯২০-২১ সালে এম. এন. রায় রাশিয়া থেকে লিখেছিলেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে উদ্ভূত বস্তুগত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সহযোগী ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এবং ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক শক্তির পুরোধা হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

মতাদর্শের তারতম্য সত্ত্বেও ঐতিহাসিকদের রচনায় ভারতীয় জাতীয়তা-ভিত্তি ও স্বরূপ নির্ণয়ে ব্রিটিশ শাসনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা কমবীকৃত হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক তথা নয়া ঔপনিবেশিক,

জাতীয়তাবাদী ও নয়া জাতীয়তাবাদী সব রকম রচনাতেই এরূপ স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা রচনাগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ ভারতের নবজাগরণের সীমাবদ্ধতা এবং কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামগুলির চরিত্র সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা যায়। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশে ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা নির্ণয়ে ঐ রচনাগুলি নিশ্চিত ও সার্থক পথনির্দেশ দেওয়ার কাজটি সম্পূর্ণ করে ফেলেছে বলা যায় না।

ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ নির্ণয়ের কাজটি আজও সমাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রয়োজন আছে আরও গবেষণার। তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিচার-বিশ্লেষণের।

জাতীয়তাবাদ একটি সমষ্টিগত চেতনা। শুধুমাত্র আর্থনীতিক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে এরূপ চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। বস্তুগত ও ধারণাগত বহু রকম শক্তি এই চেতনার প্রকৃতি নির্ধারণ করে থাকে। 'মানুষ নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই রচনা করে, কিন্তু তাদের যেমন খুশী তেমন ভাবে নয়…।' নিজেদের পছন্দমাফিক পরিস্থিতির আওতায় তারা ইতিহাস রচনা করে না, করে সরাসরি প্রত্যক্ষগোচর পরিস্থিতি ও অতীত থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। অতীত ঐতিহ্য বংশপরম্পরায় সমকালীন মানুষের মস্তিষ্কে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত ভারী চাপ সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষেত্রে মার্কসের এই বক্তব্যের যথার্থতা ধরা পড়ে।

বর্তমান পুস্তকটি রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ নির্ণয়ে প্রয়াসী। ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় অর্থনীতির মৌল সাংগঠনিক পরিবর্তন ও সামাজিক জীবনের নয়া বিন্যাসের ফলে জাতীয় চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের প্রক্রিয়াটি এখানে বর্ণনার চেষ্টা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া ভারতের অতীত সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপনায় রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত কোন ব্যক্তির ধ্যানধারণা বা বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অপরিহার্য নয়। গাছগুলিকে বাদ দিয়ে বনের অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু গাছগুলিকে আলাদা ভাবে দেখতে যাওয়ার অসুবিধা এই, তা'তে

বন যায় হারিয়ে। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, একের পর এক ব্যক্তিবিশেষের আদর্শ, মতামত ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়াসের আড়ালে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপের সামগ্রিক চিত্রটি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই কারণে জাতীয়তাবাদের দীক্ষাগুরুদের বক্তব্য এই বইতে ততটুকু স্থান পেয়েছে যতটুকু ঐ চিত্রটির সাদা-কালো রঙের ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করতে সহায়তা করে।

এই বইতে মোট এগারটি অধ্যায়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপের আলেখ্যটি উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। ভিত্তিগত সাদৃশ্য সত্ত্বেও এশীয় জাতীয়তাবাদ আর্থ-সামাজিক পরিবেশগত প্রভাবে ইউরোপীয় জাতীয়তা-বাদের স্বরূপের বিশ্বস্ত প্রতিকৃতি না হয়ে কিভাবে নিজেকে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণে বিশিষ্ট করেছে, তা-ও বলা হয়েছে। সবশেষে, ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটের প্রাথমিক পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ ও আর্থ-সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপীয় মানসে ঐ স্বরূপ ও প্রকৃতির পরিবর্তনশীল উপলব্ধির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতের কৃষি ও শিল্পে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের **'ধ্বংসাত্মক'** ও **'পুনরুজ্জীবনমূলক'** ক্রিয়াকলাপের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করা হয়েছে।

গণজ্ঞাপন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি এবং সর্বভারতীয় রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তা-ভাবনার বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ইতিবৃত্ত ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে শুধুমাত্র শাসন-শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতবাসীর চিন্তা ও মননের উপরও আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট ছিল। এরূপ আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ

নানা কারণে অনুভব করেছিল। কারণগুলি অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীদের একাংশ পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বিমুগ্ধ বা বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় কিভাবে স্বদেশী সমাজের পুনরুজ্জীবনে বিভিন্ন পথের অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন তারও একটি পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতির পটভূমিতে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের যুগোপযোগী সংস্কার আশু প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিলে ভারতীয় সংস্কারকেরা কিভাবে ঐ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়েছিলেন তা' নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমের ধর্ম, দর্শন ও ধ্যানধারণা তাঁদের চিন্তাভাবনা ও কর্মের জগতে নিঃসন্দেহে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের দশকগুলিতে ভারতীয় ধর্মগুলি নূতন ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত হয়ে আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে ওঠে। ঐ সময় ভারতের ধর্মসংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের একাংশের মধ্যে 'স্বতঃপ্রবৃত্ত মৈত্রী-বন্ধন' গড়ে ওঠে। নবলব্ধ এই মৈত্রী ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে কালক্রমে যুগপৎ শুভ-অশুভ ফলাফলের কারণ হিসাবে দেখা দেয়। নবম অধ্যায় এরূপ কারণ অন্বেষণে রত।

জাতীয় জনসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার স্বাক্ষর বহন করেছিল, আবার কখনো কখনো প্রতিক্রিয়াশীলতার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছিল। জাতীয় জনসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির দ্বৈত ভূমিকায় বিধৃত আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি দশম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে ভারতে কতগুলি নূতন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। বস্তুগত পূর্বশর্তের অভাবে পুরাতন কিছু কিছু শ্রেণীর বিলোপ ঘটে, আবার কিছু কিছু শ্রেণী নূতন আর্থনীতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের ভূমিকা নূতন ভাবে নির্ধারণ করে নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করার তাগিদ সত্ত্বেও সামাজিক শ্রেণীগুলি কখন, কেন এবং কিভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে

অংশগ্রহণ করে নিজেদের ভূমিকা নির্ধারণ করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় একাদশ অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

আর, সবশেষে একটি কথা। ভারতের জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সমকালীন ভারতের জাতীয় জীবনের নানা সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পক্ষে প্রয়োজনীয় রসদ কিছুটা মিললেও মিলতে পারে। অবশ্য বর্তমান পুস্তকের অধ্যায়গুলিতে ঐরূপ রসদ সরবরাহের প্রত্যক্ষ প্রয়াস লক্ষণীয় এমন নয়।

১ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট

জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে লেখা বইয়ের সংখ্যা কম তো নয়ই, বরং প্রচুর। শুধুমাত্র ঐসব বই নিয়ে ছোটখাট একটি পাঠাগার তৈরি করা অসম্ভব নয়। জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব ও স্বরূপ নির্ণয়ের উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ইলি কেডৌরি, অ্যালফ্রেড ক্যোবান, এফ. ও. ইর্টজ ও ই. এইচ. কার্-এর রচনায় লক্ষ্য করা যায়; আর, জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক পর্যালোচনার নিদর্শন হিসাবে হ্যান্‌স কন্‌, এইচ. এম. চ্যাডউইক ও এল. স্নাইডারের রচনার সপ্রশংস উল্লেখ করা যায়।[1]

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি নির্ণয় ও সর্বহারাশ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে তার স্বরূপ উপলব্ধি সম্পর্কে স্বয়ং লেনিন ও স্ট্যালিনের রচনাবলী মৌল পথ-নির্দেশের দিশারী।

তা সত্ত্বেও সামাজিক আন্দোলনের গবেষণায় রত অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি-মাত্রেই অবগত আছেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিশ্লেষণমূলক ও তুলনামূলক পর্যালোচনার অভাব আছে। তাই, যে-কোন দেশের জাতীয়তা-বাদ ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ নির্ণয়ের আগে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিভিন্ন প্রকার জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক নির্ধারণ জরুরী হয়ে পড়ে।

জাতীয়তাবাদের ইউরোপীয় ধারা

মধ্যযুগের ইউরোপ জাতীয়তাবাদের সাম্প্রতিক ধ্যানধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি রাজবংশের উত্তরাধিকার নীতির অনুগত কতগুলি ভূখণ্ড ছিল মাত্র। ঐ রাষ্ট্রগুলি ঐক্যবদ্ধ খ্রীস্টান জগতের ধারণা ও ক্যাথলিক ধর্মীয় সংগঠনের সার্বজনীন ভাষার প্রভাবে কিছুটা সংবদ্ধ ছিল বলা যায়। কিন্তু ঐ রাষ্ট্রগুলির সীমানা স্পষ্টরূপে নির্ধারিত ছিল না; ভাষাগত, ধর্মীয় বা জাতিগত ঐক্যের নিরিখে সীমানা ধার্য হয়েছিল বলা যায় না। প্রতিযোগী রাজা বা সম্রাটের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ ভূখণ্ডের অধীশ্বর

নিজস্ব রাজ্য বা সাম্রাজ্যের পরিধি নির্ণয়ের সুযোগ ভোগ করতেন। তাঁর প্রজারা ত্রিবিধ আনুগত্যের অনুগত ছিল। রাজার প্রতি কর্তব্য পালন, আঞ্চলিক সামন্তপ্রভুর প্রতি দায়দায়িত্ব পালন এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা-নিরপেক্ষ ভাবে ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি কর্তব্য পালনে তারা অভ্যস্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত জাতি সংক্রান্ত সাম্প্রতিক ধারণার রাজনৈতিক কোন তাৎপর্য ছিল না।

রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধারণাটি ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিতে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক আন্দোলন বা প্রবণতার মধ্যে জন্মলাভ করে। নবজাতক ধারণাটি বিবর্তনের ধারাপথে শক্তি সঞ্চয় করে। ক্রমে ক্রমে রাজার প্রতি আনুগত্য ও রাজকীয় সরকারের প্রতি দায়িত্ব পালন শাসক, প্রশাসক ও সমগ্র জনতার স্বার্থের দ্যোতক হয়ে উঠতে থাকে। এরূপ ঐতিহাসিক প্রবণতার পশ্চাতে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ক্রিয়াশীল থাকলেও সর্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল উৎপাদনব্যবস্থার মৌল পরিবর্তন, অন্তর্দেশীয় ও বহির্বাণিজ্যের বিকাশ এবং সামাজিক শ্রেণী-ব্যবস্থার নয়া বিন্যাস। ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে মূলধনের অধিকারী ধনিক-শ্রেণী ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রশক্তিকে কুক্ষিগত করে ব্যবসাবাণিজ্য সূত্রে সম্পদ আহরণ সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করতে আগ্রহী কেন্দ্রিভূত রাষ্ট্রের পত্তন ঘটায়। বৃহৎ শিল্পের আবির্ভাব ঘটলে বণিক ধনতন্ত্রের শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে। ঐতিহাসিক দিক থেকে নূতন এই ধনিকশ্রেণী ইউরোপে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড সমাধা করে। এই শ্রেণীর নেতৃত্বে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার সমগ্র জনসাধারণ এক জাতি, এক রাষ্ট্র ও এক পতাকাতলে সমবেত হতে শুরু করে। আর্থনীতিক বাজার-প্রাঙ্গণে আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়তা-বাদের আগমনবার্তা শ্রুত হয়েছিল।

ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে অবশ্য জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপীয় রাজনৈতিক তত্ত্বগুলি এবং আন্দোলনগুলি সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি।[2] প্রধানত রুশোর রচনাবলী থেকে জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক নীতি বা তত্ত্বের আদর্শ নূতন শক্তি সঞ্চয় করে। রুশো এবং জ্যাকোবিন্-রা সমগ্র জনগণকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকারী হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে, আদর্শ রাষ্ট্র নির্দিষ্ট একটি জাতির বসবাসের অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্রের' ধারণার সাথে

কালক্রমে জাতীয় সংহতি, সার্বজনীন নাগরিকত্ব, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদানের সমান অধিকার, আইনের চোখে সাম্য ইত্যাদি ধ্যানধারণাগুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণ বা ভাষাগত কিংবা কুলগত ঐক্যের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা নির্ণীত হলে জাতি-ই রাজনৈতিক সংগঠনের মৌল ও সার্বজনীন একক হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। মানব-সমাজ জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির সমষ্টি হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়। অত্যাচারিত জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উত্থাপনের সুযোগ লাভ করে। জাতির পূর্ণ মর্যাদা লাভের সোপান হিসাবে নিজস্ব রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ইউরোপীয় রাজনৈতিক মানসে অনিবার্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের তত্ত্বটি আজকাল অত্যন্ত শক্তিশালী ত্রিবিধ আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে :

১. ই. এইচ. কার্ তাঁর বিশ্লেষণী নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জাতীয়তাবাদের ধারণা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার বিশ্বের জাতিগুলির সমবায়ে সুখী একটি পরিবার গঠনে শুধুমাত্র ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়, আন্তর্জাতিক বিরোধেরও বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। যুদ্ধ ও বিপ্লবের পক্ষে জাতীয়তাবাদ অনেক সময় যৌক্তিকতা সরবরাহ করে। গণফৌজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচার ও রাজনৈতিক যৌক্তিকতা সৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ ক্রিয়াশীল হতে পারে।

২. কেডৌরি মন্তব্য করেছেন যে, অ্যাংলো-আমেরিকান উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বয়ংশাসিত জাতীয় সরকারের সাংবিধানিক গণতন্ত্রের আকর্ষণসঞ্জাত ভেবে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েছেন। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতি-ভিত্তিক বহু রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সাংবিধানিক গণতন্ত্র, মুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা, পার্লিয়ামেণ্ট-শাসিত সরকার এবং স্বাধীন বিচারালয়ের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত না-ও করতে পারে।

৩. জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রধান একটি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাটি জাতির সংজ্ঞা নির্ণয় সংক্রান্ত।

ভাষাগত, কুলগত বা সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি ভৌগোলিক সীমাবন্ধন অনেক ক্ষেত্রেই মান্য করে না। এই কারণে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবক্তারা ভার্সাই চুক্তি কার্যকর করতে গিয়ে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। 'নির্ভেজাল' জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র নিয়ে নূতন ইউরোপীয় মানচিত্র অঙ্কণ করতে গিয়ে তাঁরা নূতন সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন। অনেকগুলি জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নবসৃষ্ট রাষ্ট্রগুলির সীমানার ভিতরে বা বাইরে অসুবিধাজনক আবাসভূমি গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদের নীতি নানা দিক থেকে সমালোচিত হলেও একথা সত্য যে, দ্বন্দ্বসংঘাত-জর্জর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য জাতীয়তাবাদকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। ফিকৃটে, রেনান এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বপ্নবিলাসী জাতীয়তাবাদী প্রচারকদের বক্তব্য স্মরণে রেখেও একথা বলা যায়, জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই উপলব্ধি করে থাকেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কায়েম হলেই রাষ্ট্রিক সার্বভৌম স্বয়ংসম্পূর্ণতা কায়েম হয়ে যায় না বা বিশ্বশান্তির অমৃতসুধা সর্বজনভোগ্য হয়ে ওঠে না।

তত্ত্বের দিক থেকে জাতীয়তাবাদের বিশুদ্ধ একটি নীতি নির্ণয় করা অসম্ভব নয়।[3] কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করা যায় যে, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের তথাকথিত দাবি ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন জাতীয়তাবাদের রূপ ও স্বরূপকে বিকৃত করে তোলে। লেনিনের মতে ধনতান্ত্রিক দেশে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে পথপরিক্রমা করে; —নির্দিষ্ট কোন সময়ে জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ঐ দেশে প্রাধান্যের অধিকারী শ্রেণীগুলির উপর নির্ভর করে। ধনিকশ্রেণী মুনাফা স্ফীতকায় করার তাগিদে পররাজ্য দখলের পথে নামে, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার পদদলিত করে। সর্বহারাশ্রেণীর পক্ষে তাই নির্দিষ্ট কোন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কায়েম করাই যথেষ্ট নয়; সকল জাতির জন্য সমানাধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং সকল জাতির শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য রক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করাকে লেনিন মার্কসীয় জাতীয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করেছিলেন।[4]

পশ্চিমী দুনিয়ার জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ হান্স কন্ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় আন্দোলনের সাধারণ একটি ধারা থেকে জাতীয়তাবাদের সূত্রপাত। তিনি মনে করেছেন, 'জাতীয়তাবাদ মনুষ্যসমাজের বিভেদগুলিকে আরও বেশী প্রকট করেছে এবং

পরস্পর বিরোধী আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূর্বের তুলনায় আরও ব্যাপকতর জনতার মধ্যে বিস্তৃত করে দিয়েছে।' এরূপ জাতীয়তাবাদ 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে এবং জাতীয় সংগ্রামগুলিকে আধা-ধর্মযুদ্ধের জ্যোতির্বলয়ে বিশিষ্ট করেছে।'[5]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' নিবন্ধে স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির তীব্র নিন্দা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের জাতীয় লোলুপতার যূপকাষ্ঠে বিজিত জাতিগুলির মঙ্গল বিনাশের আয়োজনে তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন।

আবার, বলশেভিক বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার 'পরজাতির উপর প্রভাব' সম্পর্কে তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন: 'সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্পর্ক আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির—আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়।' অথচ, গ্রেট ব্রিটেনের শাসন 'পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের জন্য নির্জীব করে রেখেছে।'[6]

সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ গুণগত দিক থেকে পৃথক হয়ে থাকে। আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় শ্রেণীশোষণের অস্তিত্ব বা অবলোপ এরূপ পার্থক্যের নির্ণায়ক। তা সত্ত্বেও একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কতগুলি আর্থনীতিক শর্তের উপর নির্ভর করে না। বস্তুগত ভিত্তি ছাড়াও ধারণাগত নানা বিষয়, ধর্ম, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতিনীতি, প্রতীক ইত্যাদি জাতীয়তাবাদের স্বরূপে বিশিষ্টতা এনে দেয়। সর্বহারাশ্রেণীর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তির দৃষ্টিতেও নির্দিষ্ট দেশের জাতীয়তাবাদের স্বকীয় সৌন্দর্য ধরা পড়ে।

'তৃতীয় বিশ্বের' ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের আধুনিক ধারণাটি ইউরোপীয় রাজনৈতিক ধারণা হিসাবেই প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক বিস্তারের সাথে সাথে বা তার ফলশ্রুতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়।

এরূপ জাতীয়তাবাদকে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার উপজাত ফসল হিসাবে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন।

শাসন-শোষণের প্রয়োজনে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশগুলিতে 'আধুনিক রাষ্ট্রের' পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যন্ত্র সৃষ্টি করেছিল। কোন কোন উপনিবেশে একই কারণে আধুনিক সংযোগব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। সামরিক-বাহিনীর আধুনিকীকরণ ঘটেছিল এবং উপনিবেশগুলির ভৌগোলিক সীমানা নিশ্চিত রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, স্বদেশী সমাজ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, বিদেশী শাসনাধীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশী শাসন প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা তাঁরা জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিনিয়ে নেবার তাগিদে সর্বাগ্রে তাঁদের আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল জাতিগঠনের কাজে। বলা বাহুল্য, কাজটির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল বিপুল প্রয়াসের। জাতীয় সত্তার একটি রূপকল্প রচনা করা, জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা ও সংহতিবোধ সৃষ্টি করা এবং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের দাবিতে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলা তাঁদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ এরূপ আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে তৎপর ছিল। অবশ্য দমন-পীড়নের মাত্রা ও কৌশল ঔপনিবেশিক শাসকশক্তির চরিত্র এবং রাজনৈতিক-সামরিক পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল ছিল।

সাইপ্রাস, আলজিরিয়া, এডেন প্রভৃতি স্থানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। সামরিক বলে আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। জাতীয় মুক্তির আন্দোলন আইন-বহির্ভূত পন্থায়, গুপ্ত পথে 'গেরিলা' প্রতিরোধ পদ্ধতি অনুসরণে লিপ্ত হয়েছিল।

ভারত প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষার স্বার্থে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিয়েছিল। রাজনৈতিক অসন্তোষের অকস্মাৎ বহ্নুৎপাত ঠেকাতে সংসদীয় রীতিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে রক্ষাকবচ হিসাবে ব্যবহার করতে

ঐ কর্তৃপক্ষ অভিলাষী ছিল। রাজনৈতিক দল গঠনের সম্মতি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের 'গণতান্ত্রিক অধীনতাবন্ধন' সৃষ্টির কৌশলের নামান্তর ছিল মাত্র।

সশস্ত্র বা অহিংস উভয় শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাফল্যই শক্তিশালী গণসমর্থনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা এবং জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। প্রথম শ্রেণীর আন্দোলনকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নিরঙ্কুশ সাফল্যের মধ্য দিয়ে, বিপুল জনসমর্থনে নিজস্ব রাজনৈতিক বৈধতা সপ্রমাণ করতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর আন্দোলনকে স্বদেশী জনগণের কাছে যেমন, বিদায়ী ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছেও তেমন, জাতীয়তাবাদী শক্তিমত্তার বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞানপত্র প্রদর্শন করতে হয়।[7]

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যুগে বহু শ্রেণী বা মুক্তিকামী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্মিলিত ঐক্যের বনিয়াদে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তা জাতীয় ঐক্যের দীর্ঘস্থায়ী নিশ্চিতি বা 'গ্যারান্টি' না-ও দিতে পারে। স্বাধীনতালাভের পর বহু আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রে বহুশ্রেণী-ভিত্তিক ঐক্য শিথিল থেকে শিথিলতর হয়েছে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঐক্যমতে ভাঙন ধরেছে। কোন কোন রাষ্ট্রে মুক্তিসংগ্রামের যুগে অর্জিত জাতীয় সত্তার ভাবমূর্তিটি অচিরেই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হয়েছে। এরূপ পরিস্থিতিতে দৃঢ়সঙ্কল্প সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (বিশেষ করে সামরিকবাহিনী) 'আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষক', 'জাতীয় ঐক্যের ধারক ও বাহক' ইত্যাদি নানা ধরনের আওয়াজ তুলে শাসনক্ষমতা দখলে প্রয়াসী হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের রূপবৈচিত্র্য

জাতীয়তাবাদ কখনো কখনো প্রকাশ্য তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করে, আবার কখনো কখনো অস্পষ্ট বা লুক্কায়িত থেকে ক্রিয়াশীল থাকে। জাতীয়তাবাদ সাংস্কৃতিক সংহতি আনবার কাজে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, চরিত্রের দিক থেকে গণতান্ত্রিক রূপে বিশিষ্ট হতে পারে, আবার ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশ-কাল অনুযায়ী সামগ্রিকতাবাদী ভাবধারা ও কর্মকাণ্ডে জঙ্গী হয়ে উঠতে পারে। মোট কথা, জাতীয়তাবাদ নানা রূপ ধারন করে নানা উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। সাধারণত, নিম্নে বর্ণিত রূপবৈচিত্র্যের কিছু কিছু লক্ষণে বিধৃত হয়ে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে[৪]:

১. **ঐক্যসাধনের শক্তি হিসাবে ঃ** রাজনৈতিক দিক থেকে বিভক্ত জাতীয় জনসমাজগুলিকে একই রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় আশ্রয় দেবার উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদের মূল শক্তি নিয়োজিত হতে পারে। ভূমিগত দিক থেকেও জাতীয়তাবাদ সংহতি ও সংবদ্ধতা এনে দিতে পারে, যেমন দিয়েছিল ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

২. **ভ্রাতৃত্ববোধ সম্প্রসারণের শক্তি হিসাবে ঃ** নির্দিষ্ট কোন একটি জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশগুলি ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ত্বরান্বিত করে ঐক্যবদ্ধ হবার মানসিকতায় জাতীয়তাবাদের শক্তি ব্যবহারে প্রয়াসী হতে পারে। ইতালীয় জাতিগোষ্ঠী থেকে বিযুক্ত জাতিগুলির মধ্যে এরূপ একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

৩. **ঔপনিবেশিকতার বিরোধী শক্তি হিসাবে ঃ** এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদ প্রধানত ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। অভীষ্ট সাধনের পর ঐরূপ জাতীয়তাবাদ জাতিগঠনের কাজে রূপান্তরিত হয়েছে বলা যায়। ভারত, সিরিয়া, জর্ডন, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, জিম্বাওয়ে, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ এরূপ রূপান্তরে বিশিষ্ট হয়েছে।

৪. **স্বাধীনতা অর্জনের শক্তি হিসাবে ঃ** জাতীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বৃহত্তর কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের জন্য জাতীয়তাবাদের শক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হতে পারে। যেমন হয়েছিল চেক্, পোল্, শ্লোভাক্, ক্রোয়াট্, বল্‌ট, ফিন্ প্রভৃতিদের ক্ষেত্রে।

৫. **স্থিতাবস্থা বজায় রাখার শক্তি হিসাবে ঃ** বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদ একজাতি-ভিত্তিক একাধিক রাষ্ট্রের আবির্ভাবকে প্রতিহত করতে পারে। রাশিয়া, জার্মানী, অস্ট্রো-হাঙ্গারী প্রভৃতি সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদ এরূপ শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

৬. **উপনিবেশ বিস্তারের শক্তি হিসাবে ঃ** উপনিবেশগুলির বাজার থেকে সুলভে কাঁচামাল কিনে ও উচ্চমূল্যে ঐ বাজারে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রি করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলার দুরন্ত তাড়নায় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ধনিকশ্রেণী জাতীয়তাবাদের শক্তিকে ব্যবহার করে। উদাহরণ হিসাবে, সমগ্র উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল,

স্পেন, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭. **পররাজ্য আক্রমণের শক্তি হিসাবে:** কোন দেশের শাসকশ্রেণী স্বদেশকে আপেক্ষিকতার বিচারে অন্যান্য দেশের তুলনায় দরিদ্র বা বঞ্চিত ভেবে ধনসম্পদ, ভূমি ও ক্ষমতালাভের জন্য পররাজ্য আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদের শক্তি ব্যবহার করতে পারে। উইলহেল্মের জার্মানী, নাৎসী জার্মানী, ফ্যাসিস্ত ইতালী ও সামরিক উন্মাদনায় মত্ত জাপান বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরূপ শক্তি ব্যবহারে প্রমত্ত হয়েছিল।

৮. **আন্তর্জাতিক বাজারে আর্থনীতিক আধিপত্য বিস্তারের শক্তি হিসাবে:** অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির কাছ থেকে সুযোগসুবিধা লাভের জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলি জাতীয়তাবাদের শক্তিকে মহানুভবতার শোভনসুন্দর পোশাক পরিয়ে চটকদার করে তুলে নয়ন ভোলায়। মানবতার গালভরা বুলি আওড়ে, সাহায্যের নামে শর্ত-কণ্টকিত ঋণ দিয়ে, শিল্পজাত দ্রব্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্রয় করতে বাধ্য করে শিল্পোন্নত দেশগুলি অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অধস্তন আর্থনীতিক সহযোগিতায় আবদ্ধ করে নিতে চায়। সাহায্য, অনুদান, ঋণ ইত্যাদি মহানুভব জাতীয় আদর্শের নামাবলী ধারন করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থনীতিক প্রগতির কণ্ঠরোধ করতে নিয়োজিত হতে পারে।

জাতীয়তাবাদ: এশীয় ধারাপথ

সংজ্ঞার বিচারে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা বা এশিয়ার জাতীয়তাবাদের কোনরূপ বিশেষ পার্থক্য করা চলে না। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে এশীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বুঝতে হলে কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে অনুসন্ধানের দৃষ্টিকোণ নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়। জাতীয়তাবাদের বিশ্বজোড়া চিত্রটি থেকে এশীয় অংশটিকে বিশেষ কতকগুলি চিহ্ন বা সঙ্কেতের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়:

১. এশীয় জাতীয়তাবাদ ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় দীর্ঘকাল উচ্চকণ্ঠ থেকে সংগ্রামী আবেগপ্রবণতায় মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের হাতিয়ার বিদেশী ঔপনিবেশিক সরকারগুলির অবসানের পরেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বদেশী নেতৃবৃন্দের বক্তব্যে

আবেগপ্রবণতার বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। তীব্র আবেগপ্রবণতায় হঠাৎ উচ্চগ্রামে উত্তরণ ও চকিতে নিম্নগ্রামে অবতরণ এশীয় জাতীয়তাবাদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এই আবেগপ্রবণতা কখনো জ্বলন্ত, সর্বগ্রাসী বহ্নিশিখা, আবার কখনো কম্পমান, শীর্ণকায়া দীপশিখা। কখনো আদর্শগত কারণে ভাস্বর, আবার কখনো অযৌক্তিক রূপের প্রকাশে ছন্নছাড়া। আজও এশীয় জাতীয়তাবাদ 'আবেগপ্রবণতার বিপুল আধার হিসাবে বিরাজিত ; এই আধারের দখলদার নেতৃত্বের চরিত্র নির্ধারণ করে ঐ আবেগ-প্রবণতা ভাল, বা, মন্দ কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে।'"

২. এশিয়ার জাতীয়তাবাদ প্রধানত নেতিবাচক শক্তি হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয়তাবাদ মুক্তিসংগ্রামের বৎসরগুলিতে প্রগতিশীল, মুক্তিকামী, ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যে বিধৃত হয়নি এমন নয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক বিদেশী শাসন অবসানের পর জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ আর্থনীতিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক যোগ্যতা, সামাজিক ঐক্য, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু সম্প্রীতি, শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতি ইত্যাদি কার্যক্রম রূপায়ণে অনেকাংশে ব্যর্থ হন। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানে ব্যর্থ হয়ে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের ফাঁকা বুলিতে জনমতকে ভিন্নমুখী করে নিজেদের নেতৃত্ব ও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় তৎপর হন।

৩. এশীয় জাতীয়তাবাদ মুক্তিসংগ্রামের যুগে এবং পরেও সম্প্রদায়গত বিরোধ ও সংঘর্ষে ক্লান্ত থেকেছে। এই বিরোধ ও সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উস্কানি লাভ করেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদী অপ-কৌশল সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির মূলে কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল এমন নয়। এশীয় দেশগুলির আর্থ-সামাজিক বহু ধরনের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতার মূলে জলসিঞ্চন করেছিল। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ বা দাঙ্গাহাঙ্গামা আজও ঘটে না এমন নয়। এশিয়ার বহু দেশে এরূপ বাধাবিঘ্নের বিন্ধ্যাচলে জাতিগঠনের কাজ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গের মত ভগ্নমনোরথ হয়ে গতিহীন।

৪. ভাষা-কেন্দ্রিক কলহ-দ্বন্দ্বের আবর্তে পড়ে এশীয় জাতীয়তাবাদের ঐক্যের বনিয়াদ দুর্বল হয়েছে। ভারতে হিন্দী, ইংরাজী ও আঞ্চলিক ভাষা-গুলির পারস্পরিক সম্পর্ক আজও মধুর হয়ে ওঠেনি। ইংরাজী বা হিন্দী 'ভাষায় সাম্রাজ্যবাদ' প্রতিহত করার উন্মাদনা যেমন চরমে ওঠে, ঐ দুই

ভাষার সমর্থনেও আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। পূর্বতন পূর্ব পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে **ভাষা-কেন্দ্রিক বিরোধ** জাতীয়তাবাদের ঐক্যচেতনাকে বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত করেছে বারে বারে।

৫. **ধর্মীয় বিরোধ** এশীয় জাতীয়তাবাদকে কলুষিত করেছে অনেক সময়। কোন বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সমকালীন জীবনের প্রয়োজন সাধনে সক্ষম, নূতন ব্যাখ্যায় সঞ্জীবিত প্রাণোদ্দীপ্ত ধর্ম জীবদেহে হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চারের মত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শাখাপ্রশাখায় সর্বত্র নূতন অনুপ্রেরণা সঞ্চারে সাফল্য অর্জন করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন-চার দশক ধরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'দক্ষিণেশ্বর বিপ্লব', আর্যসমাজ এবং দিব্যজ্ঞান আন্দোলন ভারতে এই মহান দায়িত্ব পালন করেছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দুধর্ম বা ইসলামের প্রগতিশীল সংস্কারের মাধ্যমে পরিশীলিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ রূপের শুদ্ধতা অর্জন করতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্মের মহান ঐতিহ্যের সঙ্কীর্ণ, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যাখ্যা আর্থনীতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য ও বিভেদের সুযোগ গ্রহণ করে ধর্মীয় দ্বন্দ্বকলহে ইন্ধন যুগিয়ে জাতীয়তাবাদের ঐক্যশক্তিকে দগ্ধ করতে সচেষ্ট ছিল। আজও ঐরূপ ব্যাখ্যার সামাজিক বনিয়াদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে এমন নয়।

৬. সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও এশীয় জাতীয়তাবাদ **গণতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ** সদাজাগ্রত রাজনৈতিক তৎপরতা ও স্থায়ী বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় **অচঞ্চল রাখতে পারেনি**। এম. এন. রায় 'এশিয়ায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে গণতন্ত্রের প্রতিকূল পটভূমি সৃষ্টির কারণ এরূপভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :

'সমগ্র এশিয়া জুড়ে বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে। মধ্যযুগীয় কুসংস্কারে তাঁরা আবদ্ধ। মধ্যযুগের ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচিত উদ্দেশ্যবাদী জীবনদৃষ্টি কর্তৃত্বপূজারী একটি মানসিকতার সৃষ্টি করে—কর্তৃত্বের আধারকে ঈশ্বরদত্ত ভেবে গ্রহণ করে তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে একটি গুণ হিসাবে অনুশীলনে উৎসাহিত করে। অজ্ঞ জনতার কাছে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অদৃষ্টবাদের রূপ ধারন

করে। রাজনীতি-সচেতন সংখ্যালঘুরা গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র বা পুরুষানুক্রমিক ব্যবস্থাকে বেশী কাম্য মনে করে।'[10]

দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইনস, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্রে সামরিক একনায়কতন্ত্র বর্তমানে সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আসীন। গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাংবিধানিকতা ও সংসদীয় রীতিপদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকেও বেশীর ভাগ এশীয় রাষ্ট্রে সম্ভব নয়।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ রেনেসাঁ, ধর্মসংস্কার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক-উদ্ভাসের যুক্তিবাদী, মতাদর্শ আশ্রয়ী ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুসারী প্রেক্ষাপটে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। এশীয় জাতীয়তাবাদ অনুরূপ প্রেক্ষাপটের আনুকূল্য খুব একটা লাভ করেনি। প্রায় শৈশবকাল থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়তে বাধ্য হয়ে ঐ জাতীয়তাবাদ 'বৈরী মনোভাব' বা 'বিরোধী অনুভূতির' প্রাবল্যে যতটা প্রভাবিত হয় তার চেয়ে জাতিগঠনের পক্ষে অপরিহার্য ইতিবাচক উপাদানগুলিতে অনেক কম সংবদ্ধ হয়। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা ও ক্রটির অভাব নেই। কিন্তু এশীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা ও ক্রটির সাথে সেগুলির মৌল পার্থক্য বর্তমান। ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ইতিহাস, ভূগোল—অনেক দিক থেকে এশীয় দেশগুলির জনগণ বহুবিধ তুচ্ছ, জটিল বিভেদের সীমাবন্ধনে বিভক্ত। আশ্চর্যের কিছু নেই, এশীয় রাষ্ট্রগুলির উপস্থিতি ও উদ্যোগে বিভিন্ন সম্মেলনে (এশীয় সম্পর্ক সম্মেলন, বান্দুং সম্মেলন, শক্তিজোট-নিরপেক্ষ বিশ্বসম্মেলনসমূহ) ঔনিবেশিকতার বিরোধিতা, আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতার প্রসার, ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণ, রাষ্ট্রীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি এবং বিশ্ব-শান্তির অনুকূলে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে নানা প্রস্তাব গৃহীত হলেও এশীয় জাতীয়তাবাদ আজও সর্বএশীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেনি।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ : সামাজিক প্রেক্ষাপটের নিরিখে

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জাতীয়তা-বাদী ও ঔপনিবেশিক উভয় প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে অদ্ভুত একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদের প্রবক্তা পশ্চিমী ঐতিহাসিকদের রচনায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ব্রিটিশ শাসনের মতাদর্শগত

একটি ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী ও নয়া জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের রচনাতেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী উভয় প্রকার বিশ্লেষণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সম্পর্ক হিসাবে অনুধাবন করার প্রয়াস স্পষ্ট: অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসন ভারতে বিপুল কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিল, ঐ কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ আবির্ভূত হয়েছিল এবং বিকাশলাভ করেছিল। ব্রিটিশ শাসন নাকি ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিন ধ্বনি, আর ভারতীয়রা যুগিয়েছিল প্রতিধ্বনি!

ঔপনিবেশিক বা জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী বা উদারনৈতিক ঐতিহাসিকদের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁরা একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভব হয়েছিল বলে বিশ্বাস করেন। এই প্রক্রিয়াটির জনক ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন; প্রক্রিয়াটির ইতিবাচক ভূমিকা নিম্নোক্তরূপে বিশ্লেষিত হয়ে থাকে[11]:

১. লর্ড ওয়েলেস্‌লী থেকে শুরু করে লর্ড এলেনবরো পর্যন্ত বিটিশ গভর্নর জেনারেলদের অনুসৃত 'লৌহ ও রক্ত নীতির' দৃঢ়তায় রচিত, ভৌগোলিক দিক থেকে সংবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিক মানচিত্রটি আসমুদ্রহিমাচল রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের বনিয়াদ রচনা করে।

২. ব্রিটিশ শাসনের মানবতাবাদী একটি কার্যক্রম (ডাকাত, ঠগী, পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুদলগুলি দমন, সতীদাহ প্রথার বিলোপ, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন রদ, বিধবা বিবাহের আইনানুগ পরিস্থিতি সৃষ্টি, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবাক্ষ উন্মোচন, ইত্যাদি) স্থবির ভারতীয় সমাজে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ চাঞ্চল্য ভারতীয় চেতনাতে হিন্দোল সৃষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শীর্ণ ধারাটিকে গতিবেগসম্পন্ন করে তোলে।

৩. ঔপনিবেশিক শাসনকে ভারতীয় জনমতের অনুসারী করে তোলার বাসনায় ব্রিটিশ ভারতের আমলাতন্ত্র দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ায় ঈপ্সিত ফললাভের জন্য সানন্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের স্মারক অভিজ্ঞানপত্র দেয়। আমলাতন্ত্র নাকি ঔপনিবেশিক শাসনকে 'থিসিস্' বা পূর্বপক্ষ ধরে নিয়ে ভারতীয়

জাতীয় কংগ্রেসকে 'অ্যান্টিথিসিস্' বা পূর্বপক্ষের বিরোধী শক্তি বলে মনে করেছিল। আশা করেছিল, পূর্বপক্ষীয় বা পূর্বপক্ষবিরোধী শক্তিগুলি জনমতের অনুসারী 'সিন্থেসিস্' বা সমন্বয়মূলক শুভ শাসনের সূচনা করবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ার তত্ত্বটি উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের অভিজাত বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীঘেঁষা বিশ্লেষণরীতির ফলশ্রুতি এবং সাম্রাজ্যবাদপূজারী ঐতিহাসিকদের অভিসন্ধিমূলক গবেষণার অপকীর্তি।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, অসচেতন বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ভাবে হলেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতে এমন কতকগুলি কার্যক্রম রূপায়ণে লিপ্ত হয় যেগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দৃঢ় করতে সহায়ক হয়। ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিস্তার, ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা প্রবর্তন, কৃষিপণ্যের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের সংযোগ সাধন, গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, যানবাহন ও সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন এবং আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের রাজনৈতিক রীতিপদ্ধতিতে উৎসাহদান, ইত্যাদি, বহু রকম কার্যক্রম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্রুত বিকাশ ও বিস্তারে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে উদ্ভূত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুকূল পরিবেশের কারণে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা অসমীচীন যে, ঐ জাতীয়তাবাদ ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মানসপুত্র।[12] ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জনগণের রক্তের, ঘর্মের, কর্মের ও চিন্তার সোনার ফসল। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক ধাঁচে সর্বভারতীয় আর্থনীতিক বনিয়াদ গড়ে ওঠার আগেও বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দরিদ্র, নিরন্ন, কর্মচ্যুত ভারতবাসীদের একাংশ বিদেশী অপশাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। ডাকাত, ঠগী, পিণ্ডারী প্রভৃতি দলগুলির ক্রিয়াকলাপ নিষ্ঠুরতায় কলঙ্কিত ছিল; কিন্তু ক্ষুধার অন্ন যোগাতে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করা ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। ওয়াহ্‌বী বিদ্রোহ ধর্মীয় কারণে উদ্ভূত হয়েও পরবর্তী সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান নির্বিশেষে শোষকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত আন্দোলনের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এ সকল ক্রিয়াকলাপ ও বিদ্রোহ দমন করতে বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল। শুধুমাত্র পিণ্ডারীদের দমন করতে শ্রীরঙ্গপত্তনম অবরোধ ও দখলের সময় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর চেয়ে বিশালতর সেনাবাহিনীর প্রয়োজন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে

পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়দের নেতৃত্বে পরিচালিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আদর্শে সংগঠিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বরূপটি বিকাশলাভ করার পূর্বেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহ এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রাবল্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ধূমায়িত এরূপ অসন্তোষ রাজনৈতিক মতাদর্শে ও সবভারতীয় চেতনায় বিধৃত হবার সুযোগ লাভ করেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ভারতীয়দের সমষ্টিগত চৈতন্যে ঐ সকল বিদ্রোহ, বিক্ষোভ ইত্যাদির স্মৃতি ক্রিয়াশীল ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ বা প্রসারের কোন পর্যায়েই সচেতন, ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে ইচ্ছুক ছিল না। যতদিন সম্ভব জাতীয়তাবাদী চিন্তা ও কর্মপ্রয়াসকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে সাম্রাজ্যবাদ সক্রিয় থেকেছিল। যখন জাতীয়তাবাদের জলতরঙ্গ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তখনই কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ঐ শক্তি স্বীকার করে নিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রিত গতিপথে চালিত করতে চতুর কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ডাফ্‌রিন বা রাজকর্মচারী অ্যালান অক্টেভিয়াস হিউমের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অবদান এরূপ প্রয়াসের নিদর্শন।

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে উদ্ভূত আধুনিক জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব স্বদেশী ধনিকশ্রেণী দীর্ঘকাল করায়ত্ত করতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে গড়ে তুললেও, ব্রিটিশ ধনিকেরা ভারতে শিল্পায়নের বিকাশ যতদূর সম্ভব সীমিত রেখেছিল। সম্ভাব্য ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্ভবে সকল প্রকার বাধা সৃষ্টি করেছিল। প্রয়োজন বুঝে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির সাথে মিতালি সৃষ্টি করে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে স্বাধীন অর্থনীতির বিকাশে বাধা দিয়েছিল। কাঁচামালের দেশ হিসাবে ভারতকে অনুন্নত রেখে স্বদেশের শিল্পগুলির জন্য উৎপাদনের উপাদান সংগ্রহ করা ও শিল্পজাত দ্রব্যগুলি ভারতের বিশাল বাজারে বিক্রি করার তাগিদে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতকে বরাবর কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা 'মন্দীভূত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পীঠস্থান' হিসাবে সংরক্ষিত রাখতে প্রয়াসী ছিল।[13] এই কারণে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্ন বিলম্বিত হয়েছিল। জন্মের পরেও

দীর্ঘকাল ঐ শ্রেণী পঙ্গু থাকতে বাধ্য হয়েছিল। শৈশব অবস্থা অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়ত হয়েছিল।

অথচ ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী স্বদেশে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির নায়ক হয়ে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড সম্পাদনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক মালিকানা ও সম্পর্ক কায়েম করে, নূতন ধরনের শ্রেণী-সম্পর্ক গড়ে তুলে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্র তৈরী করে, শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সব কিছুকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থবহ হিসাবে সংগঠিত করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে নূতন, উন্নততর এক সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ রচনা করেছিল। শিল্পায়ন, 'বুর্জোয়া' রাষ্ট্রযন্ত্রের উদ্ভব, জাতীয়তাবাদের বিকাশ—ক্রমবিবর্তন ও পারস্পরিক সংযোগের মধ্য দিয়ে গ্রেট ব্রিটেনকে আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিল। এই ছকটি, কিছু কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও, পশ্চিমী দেশগুলিতে অনুসৃত হয়েছিল বলা যায়।

কিন্তু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে বিদেশী ধনিকশ্রেণী উপনিবেশগুলিতে অনুরূপ প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেনি, ভারতেও করেনি। মার্কস ও এঙ্গেল্‌স সাম্যবাদী ইস্‌তেহারে ধনিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক ভূমিকার যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সাথে উপনিবেশগুলির বিদেশী ধনিকশ্রেণীর ভূমিকার বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। প্রধানত ইউরোপ-কেন্দ্রিক তথ্য ও ধ্যানধারণার ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন করেছিলেন। ১৮৫৩ সালে নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন পত্রিকায় 'দি ফিউচার রেজাল্টস্‌ অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' নিবন্ধে অবশ্য মার্কস ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ভারতীয় ভূমিকার এরূপ মূল্যায়ন করেছিলেন: 'আধুনিক সংযোগব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তুলে, দেশীয় সামরিক-বহিনীকে আধুনিক উপায়ে সংগঠিত করে, স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে দেশীয় একটি শাসকশ্রেণীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ঘটিয়ে……এবং ভারতীয় জীবনের কেন্দ্রমণি হিসাবে বিরাজিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে গ্রেট ব্রিটেন ভারতে দ্বৈত উদ্দেশ্য সফল করেছিল: একদিকে প্রাচীন এশীয় সমাজকে বিনষ্ট করছিল, অন্যদিকে এশিয়াতে পশ্চিমী সমাজের জাতীয় ভিত্তি রচনা করছিল।'[14] ধ্বংসাত্মক ভূমিকার সাথে পুনরুজ্জীবনমূলক কাজকর্মের ধারাটিকে অব্যাহত

রাখা ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা-পুষ্ট ঐ শ্রেণী সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে ক্রমশ ভারতীয় সামন্ত শক্তিগুলির সাথে মিতালি রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে; সামন্ত রাজা, শাসক ও ভূস্বামীদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করার অপকৌশল গ্রহণ করতে থাকে। ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর পুনরুজ্জীবনমূলক ভূমিকা সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী দশকগুলিতে নিঃশেষ হয়ে যায়। 'ধ্বংসাত্মক' ও 'পুনরুজ্জীবনমূলক' শব্দ দু'টিকে মার্কস হয়ত দ্বান্দ্বিক সম্ভাবনা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছিলেন। পুনরুজ্জীবনমূলক কাজকর্মের রূপরেখাটি যে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়ে শেষে বিলীন হয়ে যায় সে-সম্পর্কে পরিণত বয়সী মার্কসের প্রতীতি জন্মেছিল। 'ক্যাপিটাল' বা 'গ্রুনড্রিসে'-তে তিনি ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি।

মূলধন ও সরকারী আনুকূল্যে বলীয়ান ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সক্ষম ভারতীয় কোন সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব না ঘটায় জাতিগঠনের কাজটি ভিন্নতর একটি 'শ্রেণীর' স্কন্ধে ন্যস্ত হয়; শ্রেণীটির সঠিক চরিত্র বিশ্লেষণের কাজ আজও সমাপ্ত হয়েছে মনে হয় না। মার্কসীয়-অমার্কসীয় পণ্ডিতেরা বিভিন্ন নামে এই শ্রেণীকে চিহ্নিত করেছেন: কেউ কেউ বলেছেন অধস্তন 'বুর্জোয়া', কেউ কেউ বলেছেন 'পেটি-বুর্জোয়া', আবার, অনেকে বলেছেন 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী', কেউ-বা 'ভদ্রলোক শ্রেণী'। 'বুদ্ধিজীবী শ্রেণী' বলেও কেউ কেউ নামকরণ করেছেন।

প্রাথমিক অনীহা সত্ত্বেও, ঘটনা, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের তাগিদে ব্রিটিশ ধনিকেরা ভারতে সুসংহত বিচারব্যবস্থা, পশ্চিমী শিক্ষা প্রবর্তন ও সমাজসংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করলে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বন্দরনগর-গুলিতে ধীরে ধীরে পশ্চিমী ধ্যানধারণায় প্রভাবিত একটি সামাজিক 'শ্রেণী' গড়ে উঠতে থাকে। ভারতে তখন স্বদেশী শিল্পায়নের কোনরূপ সুযোগ না থাকায় এই শ্রেণীর কোন অংশের পক্ষেই বুর্জোয়া শ্রেণীতে উত্তরণের উপায় ছিল না। শ্রমিকশ্রেণীর জন্মলগ্ন যন্ত্রনিনাদে ঘোষিত হতে তখনো বাকী ছিল। দরিদ্র, নিরন্ন, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত কৃষকসমাজের পক্ষে জাতিগঠনের দায়িত্ব গ্রহণের কোন প্রশ্ন ছিল না। কাজেই উৎপাদনব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, সচেতন কোন শ্রেণীর অবর্তমানে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতি-

গঠনের মহান দায়িত্ব ইংরাজী-শিক্ষিত, পশ্চিমীকরণের কম-বেশী পক্ষপাতী বা ঘোরতর বিরোধী, বন্দরনগরগুলির বাসিন্দা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, মধ্যবিত্তের অধিকারী স্বল্প সংখ্যক ভারতীয়দের বহন করতে হয়েছিল।

শিল্পায়ন তথা আর্থনীতিক বাজার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লব্ধ পশ্চিমী দুনিয়ার জাতীয়তাবাদের ধাঁচ বা নমুনাটির যান্ত্রিক প্রয়োগ ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের চরিত্র উপলব্ধিতে বিশেষ সহায়তা করে না। এডওয়ার্ড শীল্স বলেছেন, পশ্চিমী দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের জনকেরা শিল্পসমৃদ্ধ সমাজের অন্যতম সৃষ্টি; ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্রষ্টাদের অনুরূপ সৃষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। যুগোপযোগী আধুনিকতার ভারতীয় রূপের বিকাশে তন্ময় রামমোহন থেকে শুরু করে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হেন্‌রী ভিভিয়ান ডিরোজিও হয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত সবাই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকের প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুক্ত বাণিজ্যের নীতি প্রবর্তন, খনিজ সম্পদ আহরণ, শিল্পায়ন, কৃষিজ উৎপাদনের সাথে মুনাফা অর্জনের সংযোগ সাধন, উদারনৈতিক গণতন্ত্রের রীতিপদ্ধতি প্রবর্তন, সংযোগব্যবস্থার উন্নতি বিধান, শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার, সামাজিক ব্যাধিগুলি অপসারণে তৎপরতা ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুসৃত ঔপনিবেশিক আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি তাঁদের চোখে স্বপ্নমদির নীলাঞ্জনরেখা অঙ্কন করে দিয়েছিল। নিরবধিকালের জন্য না হলেও খণ্ডকালের জন্য ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আধুনিকীকরণের প্রবাহ অব্যাহত রাখতে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতে ঐ শাসনকে বৈধতার অভিজ্ঞানপত্র দিয়েছিলেন।

সারা ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে, এমন কি ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী প্রায় দুই দশক পর্যন্ত, রামমোহন থেকে শুরু করে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণের প্রসারে সচেতন কর্মোদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বেন্থাম, মিল, স্পেন্সার, পেইন, বার্ক, ডারউইন, গ্ল্যাডস্টোন, মর্লে প্রভৃতির ভাবধারা তাঁরা আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন। ব্রিটিশ উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন তাঁদের চিন্তাজগতকে উদ্ভাসিত করেছিল।[15] ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত 'শ্রেণীর' স্বাধীন,

স্বচ্ছল জীবন তাঁদের জীবনাদর্শ হয়ে উঠেছিল। 'গ্রেট ব্রিটেনের নামে তাঁরা ভারতকে ভালবাসতেন।' ব্রিটিশ সংসদীয় রীতিতে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষের দরবারে আর্জি পেশ করতেন, প্রার্থনা জানাতেন এবং প্রয়োজনমত প্রতিবাদ জানাতেন।

উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা যুক্তিবাদী, আপোষপন্থী সংসদীয় পদ্ধতিতে জাতীয়তাবাদকে পরিচালনা করে উষাকালে মধ্যদিনের সূর্যের আলোকদীপ্তি এনে দেবার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির হাত থেকে জাতিকে বাঁচিয়েছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা, উদারনৈতিক গণতন্ত্র, ভারী শিল্পের ভিত্তিতে শিল্পায়নের কার্যক্রম, বিকেন্দ্রীকরণ, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচী রূপায়ণ এবং সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন দাবি করে তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ করেন। বি. আর. নন্দা মনে করেন যে, তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাতিকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।[16] সারা দেশব্যাপী শাসনকর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে বৈধ বলে স্বীকার করে এবং ভারতীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে নাগরিকতার ধারণা গড়ে তুলে তাঁরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম দিকের প্রবক্তাদের অবশ্য কোনক্রমেই বিপ্লবী কোন শ্রেণীর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করা যায় না। তাঁদের প্রায় সবাই ভারতীয় বর্ণাশ্রিত সমাজব্যবস্থার ঊর্ধ্বতন বর্ণগুলিতে বিরাজ করতেন। বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ কখনো উচ্চগ্রামে পৌঁছয়নি। 'বজ্রসূচী' অনুবাদ করা ছাড়া রামমোহন বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য উপস্থাপিত করেননি বা আন্দোলন গড়ে তোলেননি। কৌশলগত কারণেই হোক, আর বিশ্বাসগত কারণেই হোক, রামমোহন বিলাতে ব্রাহ্মণ পাচক নিয়ে গিয়েছিলেন। অন্তিম শয়নে রামমোহনের গাত্রে উপবীত প্রলম্বিত ছিল; 'ওম্' মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয়। মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী নেতাদের অনেকেই চিৎপাবন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিগণ হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণগুলি থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গান্ধীপূর্ব ভারতের উচ্চবর্ণ-সঞ্জাত জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বর্ণপ্রথাকে বৈধতার স্বীকৃতিতে গ্রহণ করেছিলেন এবং স্বভাবতই ঐ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনে তাঁদের

অনীহা ছিল। যুগোপযোগী ধর্মীয় সংস্কারে আগ্রহী গোষ্ঠীগুলি কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরাঞ্চলে বর্ণপ্রথাবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করে হিন্দুসমাজের ব্যাপক স্বীকৃতিতে তৈরী বৈধতার দেওয়ালে আঁচড় কাটা ছাড়া বিশেষ কিছু করতে পারেনি।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদি প্রবক্তাগণ সামাজিকীকরণের দীক্ষা পেয়েছিলেন একদিকে ভারতীয় সনাতনী সমাজব্যবস্থার ধর্মসংস্কৃতির ধ্যান-ধারণায় গড়া সংঘ, প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদির মাধ্যমে, আবার অন্যদিকে অ-ভারতীয় ভাষায় শিক্ষার মধ্য দিয়ে লব্ধ পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠানগত ও ধারণাগত জগতের মাধ্যমে। সনাতনী ও পশ্চিমী উভয় জগতকে বৈধ বলে স্বীকার করে বাস্তববাদী কার্যক্রম গ্রহণে বাধ্য হয়ে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে তুলেছিলেন। তাঁরা দুই জগতের বাসিন্দা হয়ে কোন জগতের সাথেই সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পারেননি ; উভয় জগৎ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। নিজেদের সত্তা নির্ণয়ে তাঁরা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ নিবিড় বন্ধনে ধন্য হয়নি। অজ্ঞ, নিরক্ষর, দরিদ্র, তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনসাধারণের সাথে তাঁদের স্বচ্ছন্দ ভাববিনিময় সম্ভব ছিল না। ঐ জনসাধারণ 'চিরন্তন শূদ্র' হিসাবে ধিকৃত, সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত অবস্থায় থেকে যায়।[17] উচ্চবর্ণভুক্ত, অবস্থাপন্ন জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতের সার্বিক উন্নতির জন্য জনসাধারণের মাথার উপর দিয়ে ইংরাজী ভাষায় কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে নিজেদের মধ্যে ভাববিনিময় এবং আলাপ-আলোচনা করতে বাধ্য হতেন ; জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলতে পারতেন না। মহানগরগুলির শহুরে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্কীর্ণ পরিমণ্ডলে আবদ্ধ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ গণচেতনার দুয়ারে পৌঁছুতে পারেনি।

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে গ্রেট ব্রিটেনের ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের জন্মলগ্ন প্রত্যক্ষ করতে শুরু করে। শিল্প ও ব্যাঙ্কব্যবস্থার সাথে মূলধন হাতে হাত মিলিয়ে ভারতীয় শ্রমিকদের উপর শোষণ তীব্রতর করে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টিতে উঠে-পড়ে লেগে যায়। ব্রিটিশ ধনিকেরা নিজেদের মধ্যে বাজার ভাগাভাগি, একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠা, 'কার্টেল' গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে উদীয়মান ধনতান্ত্রিক, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির সম্ভাব্য প্রতিযোগিতাকে রুখে দিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার পাহাড় গড়তে লেগে যায়।

ব্যয়সঙ্কোচের প্রয়োজনে সরকারী, সওদাগরী, বেসরকারী অফিস ও কলকারখানাসমূহে শিক্ষিত ভারতীয়গণের নিয়োগ সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষিত বেকার সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। ভারতীয়গণের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর আঘাত হানা শুরু হয়ে যায়। দেশীয় ভাষার পত্রপত্রিকার সংবাদ পরিবেশনের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। ১৮৭৬ সালে গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড লিটনের আমলে অস্ত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে ভারতবাসীকে নিরস্ত্র করা হয়।

রাজনৈতিক-আর্থনীতিক অবিচার-অত্যাচারে পর্যুদস্ত ভারতবাসী ব্রিটিশ জনগণের কাছে কৃপার পাত্র হয়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুটি দশকে রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং তাঁর উপন্যাসগুলিতে ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয় ভদ্রলোকদের অসার, কর্মবিমুখ জীবনকে উপহাসের বস্তু করে তোলেন। প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে, পাশ্চাত্য পাশ্চাত্যই থাকবে, দুয়ের মিলন হবে না কোনদিন—জাতিবৈরিতার এরূপ একটি তত্ত্ব তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে ইংরাজ গৃহকোণে, ট্রেনে, বাসে, রেস্তোরাঁয় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মধ্যবিত্ত ইংরাজদের চক্ষে ভারতবাসী সাদা মানুষের কাঁধে বাদামী মানুষের বোঝা হিসাবে প্রতীয়মান হতে থাকে। বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের জাতি-বৈরিতার খ্রীস্টীয়-আমলাতান্ত্রিক মেকলে-ভাষ্য ঐ শতাব্দীর শেষাশেষি কিপ্‌লিং-এর রচনায় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবে রঞ্জিত হয়ে জনপ্রিয় সাহিত্যিক রূপ পায়।[18]

বিগত শতাব্দীর শেষ চারটি দশকে খ্রীস্টধর্মীয় প্রচার, ইংরাজ হিতবাদী দর্শন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ভারতীয় রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জনজীবনে অশুভ ফলশ্রুতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের উদ্ধত, আক্রমণাত্মক মনোভাব চরমে ওঠে। প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দুধর্ম নিজেকে বৃহৎ সনাতনী ঐতিহ্যে সজ্জিত করে ভারতীয় হিন্দু সংহতির রূপকার হয়ে উঠতে থাকে। বঙ্গভূমি, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, সংযুক্ত প্রদেশ ও মাদ্রাজে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই ব্রিটিশ শাসন প্রয়োজন—এরূপ তত্ত্ব প্রচার করে হিতবাদী দর্শন ভারতে ঔপনিবেশিকতার দার্শনিক সমর্থন যোগাতে তৎপর থাকে। আর, ইংরাজী শিক্ষা বিজাতীয়তার জনক হিসাবে প্রতিভাত হতে থাকে।

সাম্রাজ্যবাদী অপশাসন ও শোষণের দিনগুলিতে উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদের রাজনৈতিক 'ভিক্ষার ঝুলি' ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছুক, কৃপণ হাতের ছিটেফোঁটা দানে প্রায় শূন্যগর্ভ হয়ে উঠলে তাঁরাই ঔপনিবেশিক শোষণের আর্থনীতিক দিকটির স্বরূপ নির্ণয়ের তাগিদ অনুভব করেন। দাদাভাই নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁদের নিষ্কাশন তত্ত্বের ('ড্রেন থিওরী') মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হন কিভাবে ভারতীয় অর্থ ও সম্পদ নিষ্কাশিত হয়ে গ্রেট ব্রিটেনকে সম্পদশালী করে ভারতকে গরীবিয়ানার নিম্নস্তরে ঠেলে দিচ্ছে।

কিন্তু ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন জঙ্গী বা চরমপন্থী (অরবিন্দ ঘোষের ভাষায় জাতীয়তাবাদী) নেতৃবৃন্দ। এঁদের বংশানুক্রম বিচার করলে লক্ষ্য করা যায়, ব্রিটিশ-সৃষ্ট বাজারে অংশগ্রহণ বা জমির মালিকানা সূত্রে উদারপন্থী নেতাদের মত এঁদের পারিবারিক আয়ও গড়ে উঠেছিল। শ্রেণীচরিত্রের বিচারে উদারনৈতিক ও চরমপন্থী নেতাদের পার্থক্য করা চলে না। বিতর্কের সম্ভাবনা এড়িয়ে বলা যায় যে, উৎপাদনব্যবস্থার সাথে এঁদের কেউই সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। আবার কেউই শুধুমাত্র সনাতনী ঐতিহ্য অনুশীলনে রত বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবের পূর্বে তাঁরাই মেহনতী মানুষের বিকল্প হিসেবে দাবিদাওয়া ঔপনিবেশিক শক্তির দরবারে তাঁদের সীমিত সামর্থে উপস্থাপিত করেছিলেন। বুদ্ধিজীবী হিসাবে তাঁদের সনাতনী বা উৎপাদনব্যবস্থার সাথে জৈবিক নির্ভরশীলতায় আবদ্ধ কোন গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।[19]

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ত্রিস্তর-মাত্রিক প্রতিবাদ আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা চলে। রাজনৈতিক-আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে এই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল।[20] রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান লক্ষ্য করে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, সাদা মানুষের কাঁধে বাদামী মানুষের তথাকথিত বোঝার তত্ত্বটি আসলে সত্যের অপলাপ মাত্র; বাদামী রঙবিশিষ্ট ভারতীয়দের কাঁধে সাদা রঙবিশিষ্ট ব্রিটিশেরাই আসলে ছিলেন বোঝা। তাই তাঁদের দৃষ্টিতে পূর্ণ স্বরাজ ভারতীয়দের জন্মগত অধিকার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। গ্রেট

ব্রিটেনের নাগরিকগণ জাতীয় স্বাধীনতার যে পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করেন তার চেয়ে এক ইঞ্চি কম পূর্ণতায় বিধৃত স্বাধীনতাও ভারতীয়দের জন্য কাম্য বলে তাঁরা মনে করতেন না।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির যন্ত্রবাদী, বস্তুবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমালোচনার তীব্র আঘাতে জর্জরিত করেছিলেন। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে নূতনতর বিকাশে সঞ্জীবিত করে তাঁরা বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির বহিষ্কার দাবি করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে চরমপন্থীরা খ্রীস্টধর্ম, হিতবাদী দর্শন ও ব্রাহ্মধর্মকে সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী শক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। হিন্দুধর্মের নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ ঐ তিন বিরোধী শক্তির আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে তাঁরা মনে করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চারটি দশক জুড়ে হিন্দুধর্মীয় নেতাদের বক্তব্যের সাথে চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যের 'স্বতঃপ্রবৃত্ত মৈত্রী' গড়ে উঠতে থাকে।

হিন্দু ধর্মসংস্কৃতি, জাতীয় ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের সংযোগ ও সাযুজ্য রচনা করার প্রয়াসের সাথে রাশিয়ার 'স্ল্যাভোফিল' বা 'স্ল্যাভ' ঐতিহ্য অনুসারী আন্দোলন, জার্মান রোমান্টিক আন্দোলন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের কেল্টীয় পুনরভ্যুত্থানের সংগ্রাম তুলনীয় বোধ হয়।[21]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রায় সবাই পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিলক্ষণ অবহিত ছিলেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁর নমুনাটিকে মনে রেখে তাঁরা ভারতের গৌরবময় সৃজনশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার মহান ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে রেনেসাঁর শুদ্ধ ভারতীয় প্রতিরূপ রচনায় উৎসাহী ছিলেন।[22] সমকালীন হিন্দুধর্মীয় নেতাদের অনেকের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান সৃষ্টির অভিযোগ তোলা সম্ভবপর হলেও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ তোলা অযৌক্তিক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর নেতারা হিন্দুধর্মের রীতিনীতি, সংগঠন ইত্যাদির পুনরাবির্ভাব কামনা করেছিলেন, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতারা হিন্দুসভ্যতার গভীরে প্রবেশ করে তার আধ্যাত্মিকতার সোনার কাঠির স্পর্শে ভারতীয় জনজীবনকে সঞ্জীবিত করতে প্রয়াসী ছিলেন।

তাছাড়া, ভারতীয় জনগণমন অধিনায়ক হিসাবে ভারতীয় হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের যুগপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করবার একটি প্রয়াস সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র

থেকে শুরু করে তিলক, লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকের রচনা ও বক্তব্যের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি একটি রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি একটি বৈরী মনোভাব এবং ইংরাজ প্রণীত আইন ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও হিতবাদের প্রতি বিরূপতার সাধারণ ঐক্যমতের বন্ধনে চরমপন্থী নেতারা আবদ্ধ ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশকের মধ্যে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি কিছুটা দৃঢ় ও ব্যাপ্তি খানিকটা সম্প্রসারণে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের ধর্মাশ্রিত চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস বিদেশী শাসন-শোষণের হৃদয়হীন অবস্থায় হৃদয়ের দৃপ্ত অনুভূতিগুলিকে চন্দন ও ধূপের পবিত্র পরিমণ্ডলের আবরণে রক্ষা করেছিল। তাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা মহানগরগুলির সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য ছোটখাট শহরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মাতৃভাষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা নিম্নমধ্যবিত্ত ভারতবাসীর দুয়ারে পৌঁছে দিতে সমর্থ হন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ দিকে উদারনৈতিক ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ উভয়েই যখন জাতীয় মুক্তির মহাযজ্ঞে শ্রেণীবর্ণ নির্বিশেষে সার্বিক অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করতে ব্যর্থ হয়ে দিশাহারা, তখন ভারতের কতিপয় অঞ্চল জুড়ে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতার সূত্রপাত ঘটতে থাকে। ভারতের জনচিত্তে প্রোথিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বৈধ স্বরূপের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার সামর্থ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ছিল না। আপামর জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বিস্তারে বিশেষভাবে প্রয়াসী না হয়ে এই আন্দোলন গণভিত্তি লাভে বঞ্চিত থেকেছিল। আশ্চর্যের কিছু নেই, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণ পরিবারগুলির অল্পসংখ্যক যুবক-যুবতীর ঐকান্তিক প্রয়াসে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন 'বাবু সম্প্রদায়ের এক ধরনের খেলা' বা 'বোমার রাজনীতি' নামে অবমাননাকর পরিচিতির শিকার হয়ে পড়ে।

কৃষকসমাজের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থতা, সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের কর্মদক্ষতা, পুলিশী দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক মতাদর্শের দুর্বলতা, পর্যাপ্ত সংখ্যক বিপ্লবী বা আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব এবং সর্বোপরি জনমানসে ব্রিটিশ শাসন

সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ আসক্তি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। কিন্তু বাসুদেও বলবন্ত ফাড়কে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বাঘা যতীন এবং বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের গুপ্ত সমিতিগুলির অমর বিপ্লবীদের মৃত্যুঞ্জয়ী দর্শন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে গান্ধীর আবির্ভাব পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক জনগণকে উদ্দীপ্ত রাখতে সমর্থ হয়।

প্রথম দিকে সন্ত্রাসবাদ রাজকর্মচারী, শোষক, দালাল প্রভৃতি হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত থাকলেও, ক্রমে ক্রমে তা বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে সঞ্জীবিত হতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে জাতীয় স্তরে ক্ষমতা দখলের জন্য আদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে।

উদারপন্থী, চরমপন্থী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য ছিল। ভারতীয় অর্থনীতির অসম বিকাশ, ইংরাজী শিক্ষার প্রতি মুসলমানগণের দীর্ঘকাল অনীহা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলমানগণের সংখ্যাল্পতা ইত্যাদি নানা কারণে এরূপ অংশগ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছিল। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও একথা সত্য যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে হিন্দুয়ানির ছায়াপাত ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উচ্চবিত্ত মুসলমানগণের মধ্যে ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক-আর্থনীতিক স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। এরূপ তাগিদ অনুভব করে তাঁদের একাংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখা কাম্য মনে করেছিলেন।[23]

রামমোহনের যুগ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিপর্ব পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ব্যাপ্তি ও মেজাজ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে ক্রমশ বিস্তৃততর ও উচ্চকণ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমের নেতৃত্ব শহরবাসী, শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক শ্রেণীর' করায়ত্ত থাকে। এরূপ নেতৃত্বাধীন সময়কালকে ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের 'অভিজাত' গোষ্ঠীর পর্যায় বা 'এলিট ফেজ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তথাকথিত অভিজাত গোষ্ঠীকে ক্ষমতাবান গোষ্ঠী বা 'পাওয়ার এলিট্' হিসাবে বিবেচনা করা ভুল। ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী ভারতীয় কোন গোষ্ঠীকেই ক্ষমতাবানের

মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকতে দেয়নি। যাই হোক না কেন, সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠী বা শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের কবলমুক্ত হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বহু শ্রেণীর মানুষের সংগ্রামের মুক্তাঙ্গনে বিস্তৃতি লাভ করে। বহুবিধ কারণের যোগসাজসে এরূপ বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বিশ্বজোড়া সঙ্কটের চাপে ভারতীয় আর্থনীতিক জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী দারিদ্র ও বেকারীর নিষ্পেষণে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সমগ্র দেশ উত্তাল হয়ে উঠলে পুলিশী দমন-পীড়ন তুঙ্গে ওঠে। সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যে কার্যকরী করা হয় না। ভারতীয় জনসাধারণের অসন্তোষ অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি রচনা করে।

অসন্তোষের পাশাপাশি, ভারতীয় জনসাধারণের হৃদয়মনে আশার সঞ্চার করে কতকগুলি আন্তর্জাতিক ঘটনার উদ্ভব ঘটে ঠিক এই সময়ে। ইউরোপের কয়েকটি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়। তুরস্কের খলিফার পতন ঘটান হলে বিক্ষুব্ধ ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সম্মিলিত আন্দোলন সংগঠিত করার বাস্তব পরিস্থিতি রচিত হয়।

জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি ও চরিত্রের দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সমকালীন ভারতে ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা বৃদ্ধি। বিশ্বযুদ্ধকালীন সমরোদ্যোগের সহযোগী শিল্পায়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে এই শ্রেণী শৈশব অবস্থা থেকে কৈশোরে পদার্পণ করে। স্বল্পকালীন নীতি হিসাবে এই শ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অধস্তন হিসাবে তাঁবেদারি করে লাইসেন্স, বাণিজ্য শুল্ক, সরকারী অনুদান, বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সুযোগসুবিধা আদায়ে ব্যস্ত থেকেছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নীতি নির্ণয়ে এই শ্রেণী সঠিকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে নিজস্ব স্বার্থের সংঘাত উপলব্ধি করেছিল। ভারতীয় বাজারের উপর সার্বভৌম দখলদারির জন্য স্বাধীন ভারতীয় সরকার কায়েম করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে অনুভব করেছিল। গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনগুলির ব্যাপ্তি, গভীরতা ও সম্ভাবনায় আশান্বিত হয়ে এই শ্রেণীর এক শক্তিশালী অংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য যোগাতে মনস্থির করে। স্বল্পকালীন নীতি হিসাবে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে সহযোগিতা ও দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে জাতীয় আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য

ও নৈতিক সমর্থন দান করা ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর শক্তিশালী একাংশের রাজনৈতিক-ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতার অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।[24]

বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের জাতীয়তাবাদী আওয়াজ প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে কার্যকরী হতে শুরু করলে ভারতীয় বস্ত্রকল মালিকদের মুনাফা লাভের অতিরিক্ত সুযোগ উপস্থিত হয়। ১৯১৯ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বদেশী প্রস্তাব গৃহীত হলে ঐ ধনিকশ্রেণী গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনগুলিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। বলাই বাহুল্য, এই সময় থেকে গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনের কর্মসূচী, নীতি, কৌশল, সংগ্রামের ধরন ও মাত্রা এরূপভাবে নির্ধারিত হতে থাকে যাতে ঐ শ্রেণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়।

রাজনৈতিক দিক থেকে সুশৃঙ্খল, সংহত ও বিজ্ঞানধর্মী মতাদর্শের অধিকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে সামাজিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা নির্ণয়ে যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত, গান্ধী তখন শ্রেণীগুলির কাছে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত না করে, করেছিলেন জনগণের দরবারে। ঐতিহাসিক যে যুগসন্ধিক্ষণে গান্ধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার রাজনৈতিক আদর্শ ছিল জাতীয়তাবাদ। প্রয়োজনের তাগিদে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহুশ্রেণী-ভিত্তিক হতে বাধ্য। গান্ধী তাই সর্বশ্রেণীর মানুষের সাথে সংযোগ স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, সফলও হয়েছিলেন। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, মিল ও ফ্যাক্টরির মালিক, হস্ত-শিল্পে নিযুক্ত কারিগর, কৃষিতে নিযুক্ত দাস-শ্রমিক, জমিদারদের শোষণে জর্জরিত কৃষক, চা-বাগানে নিযুক্ত শ্রমিক, লাঞ্ছিতা দেবদাসী, কেরানী, ছাত্র, বণিক সবাই গান্ধীর শক্তি ও প্রেরণার আধার হিসাবে কাজ করেছিল।[25] কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ লড়াই বা শাসনকর্তৃপক্ষের সাথে দর কষাকষি সর্বত্রই জনতার সাথে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

জনমানসে ব্রিটিশ শাসনের বৈধতার ভাবমূর্তির ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে তাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে গান্ধী নূতন এক নৈতিক, আর্থ-সামাজিক বৈধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি 'প্রত্যেক ভারতবাসীকে উঠে দাঁড়াতে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করতে' পরামর্শ দেওয়া পবিত্র কর্তব্য মনে করে-ছিলেন। সামরিক-আমলাতান্ত্রিক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে 'শয়তানের শাসন' বলে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন। ন্যূনতম ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের

ভিত্তিতে সংগঠিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা রামরাজ্যের দ্যোতনা নিয়ে তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। ধনিক ও সর্বহারার শ্রেণীসংগ্রাম পরিহার করে উভয়ের স্বার্থ সমন্বয়ের নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি 'সম্পত্তির অছি তত্ত্ব' প্রতিষ্ঠা করে ধনিকের অর্থসম্পদ জনস্বার্থে প্রয়োগের একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন।

তিলকের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে গান্ধী রাজনীতি ও নৈতিকতাকে একই জগতের বিষয়বস্তু বলে ভাবতেন। উভয়কে তিনি দুই অংশযুক্ত একই ধারণার বিভক্ত রূপ বলে গণ্য করতেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক কোন আদর্শ বা কার্যক্রম, গান্ধীর মতে, উদ্দেশ্যের দিক থেকে নৈতিকতায় ধন্য হওয়াই যথেষ্ট নয়, উদ্দেশ্য চরিতার্থতার মাধ্যম নৈতিক হওয়াও একান্ত জরুরী। গান্ধী রাজনীতিকে নৈতিকতার বিষয়বস্তুর সাথে একাত্ম করে দিতে প্রয়াসী ছিলেন। অহিংস সত্যাগ্রহকে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[26]

জাতিগঠনের কাজে গান্ধী সনাতন ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতীকগুলিকে নূতন ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে আধুনিকীকরণের কাজে প্রয়োগ করেছিলেন।[27] তিনি তাঁর 'রামধুন' ভক্তিসঙ্গীতে ঈশ্বর ও আল্লাকে একযোগে স্মরণ করতে পারতেন; উপবীত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন। অস্পৃশ্যদের হরিজন হিসাবে বিবেচনা করে তাঁদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে পারতেন। গীতা, উপনিষদ, কোরাণ, বাইবেল তাঁর মতামতের উপর প্রভাব ফেলেছিল। তিনি জানতেন দরিদ্রের কাছে ভগবান রুটি, মাখনের রূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে বহু আধুনিক 'অস্ত্র' গান্ধীর অহিংস নীতির দুর্গপ্রাকার থেকে সংগৃহীত হয়। ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যের অহিংস নীতিকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের কার্যক্ষমতায় সজ্জিত করে তিনি নিরস্ত্র ভারতীয় জনতার হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার গাণ্ডীব হিসাবে তুলে দিতে পেরেছিলেন। বিপরীত অর্থের বাহক 'মহাত্মা' ও 'মহারাজ' উভয় অভিধায় গান্ধী স্বভাবতই অভিহিত হয়েছিলেন।

গান্ধীর মত নেতা বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের ভারতে ধনিকশ্রেণীর কাছে অগ্রহণযোগ্য হবার কোন কারণ ছিল না।[28] অহিংসা নীতি বা 'সম্পত্তির অছি তত্ত্ব' সমকালীন ভারতে এই শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থের প্রতিবন্ধক হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সমাজের কাছেও গান্ধীর

বক্তব্য ও কর্মপ্রয়াস স্বার্থের প্রতিকূল হয়নি। দুর্বল বুর্জোয়া শ্রেণী, সীমিত পরিধিতে আবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণী ও রক্ষণশীল কৃষকসমাজের কাছে গান্ধী অনায়াসে তাত্ত্বিক, কর্মযোগী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে পেরেছিলেন। বহুশ্রেণী-ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনা করে তিনি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ব্যাপ্তি ও শক্তি বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের যুগ থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনসাধারণী পর্যায় বা 'মাস্ ফেজ' শুরু হয়েছিল বলা হয়।

শ্রেণীগুলিকে যূথবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয় ঐক্য রচনার রূপকার গান্ধী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারতের অভ্যন্তরে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে পুণায় অন্তরীণ থাকার সময় তিনি মার্কসের 'ডাস্ ক্যাপিটাল' পড়তে শুরু করেছিলেন; কিন্তু মার্কসের শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব ও রচনাশৈলী তাঁর পছন্দ হয়নি।[29] তিনি শ্রেণীসমন্বয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শ্রমিকের উপর ধনিকের শোষণ অস্বীকার করেননি। কিন্তু আত্মিক বলে বলীয়ান শ্রমিককে শোষণ করা ধনিকের অসাধ্য কাজ বলে তিনি ভেবেছিলেন।[30] আবার ধনিককে তিনি জনকল্যাণেব আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-অপশাসন এবং ভারতীয় ধনিক ও জমিদারশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপে নিপীড়িত কৃষক-শ্রমিক সমাজ গান্ধীর জীবদ্দশাতেই ক্রমশ শ্রেণী-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছিল। জাতির অগ্রগণ্য নেতা হিসাবে তাঁর বক্তব্যের সুরও প্রয়োজন মত চড়া হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডে ত্রিশের দশকে তিনি ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে এমন সব চোখা চোখা কথা বলেছিলেন যাতে স্থানীয় ধনিকেরা অখুশী হয়েছিলেন।[31] চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারকে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে, ভারতীয় জমিদারশ্রেণী যদি কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করতে থাকে তবে কৃষকেরা জমিদারদের সম্পত্তি প্রয়োজনবোধে বেদখল করে নেবে; এর ফলে যদি ভারতবর্ষ দিন পনেরোর জন্য নৈরাজ্যের সম্মুখীন হয়,—হোক তাহলে।[32] অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও শত্রুকে মিত্রে পরিণত করার জীবনদর্শনে গান্ধী তাঁর বিশ্বাস হারাননি কখনো; লুই ফিশারকে তিনি সম্ভাব্য পরিস্থিতির সাংকেতিক চিত্র যুগিয়েছিলেন মাত্র। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই সত্য,

শোষিত শ্রেণীগুলির দারিদ্র্য ও আর্তনাদ গান্ধীকে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে কঠোর হতে প্রেরণা দিয়েছিল। শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীর দৃঢ় প্রতিবাদ ও শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাসী গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকাণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে শ্রেণীসংগ্রামের একটি ধারা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। শোষক শ্রেণীগুলিও জাতীয়তাবাদের পিঠে চেপে, তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নিজেদের স্বার্থরক্ষায় প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার ঠিক পরে ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দৌর্বল্য এবং ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের জঙ্গী মনোভাবের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী অন্তর্দ্বন্দ্ব লাঘব করার রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে ওঠে। আদমজী, ইস্পাহানি, বিড়লা, ডালমিয়া পরিচালিত ধনিকশ্রেণীর চাপ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উপর বিশেষ ভাবে অনুভূত হতে থাকে। বিদেশী ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রায় দু'শ বছর ধরে সুসংগঠিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে অঞ্চলগত বা সম্প্রদায়গত অসম সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের অশুভ প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার চারাগাছটিকে এ সময় মহীরুহে পরিণত করে। মহীরুহের মূল ভারতবর্ষের ভূখণ্ডের গভীরে প্রোথিত হয়ে দুটি রাষ্ট্রীয় সত্তায় ভূখণ্টিকে দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়। প্রথম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে বেদনাহত গান্ধী দিল্লীতে না থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গে অহিংসা ও প্রেমের বাণী বহন করে শান্তিরক্ষীর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।[33]

গান্ধীর মহাপ্রয়াণের পরবর্তী ভারতে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যান্য শ্রেণীগুলি আর্থ-সামাজিক অধিকার রক্ষার লড়াইতে নূতন চেতনায় সংবদ্ধ হচ্ছে। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ছত্রছায়ায় সামাজিক শ্রেণীগুলি নিজেদের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে তৎপর হচ্ছে। ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যডোরে বাঁধা গোষ্ঠীগুলি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার, কখনো-বা বিচ্ছিন্নতার দাবিতে মুখর হচ্ছে। স্বভাবতই ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরিত্রটি স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উদ্ভূত রাষ্ট্রনীতিক-আর্থনীতিক পরিবেশে শ্রেণীসংগ্রাম এবং ভাষা ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলির আন্দোলনে বিধৃত হচ্ছে। আর্থনীতিক, সামাজিক বহুতর বৈষম্য কায়েমী স্বার্থ প্রণোদিত নানা ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে উস্কানি দিচ্ছে। সর্বোপরি, ক্ষমতাবান শ্রেণী উৎপাদন, গণজ্ঞাপন,

সংযোগ ইত্যাদি ব্যবস্থার উপর মালিকানা ও কর্তৃত্ব কায়েম করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে সমাসীন থাকতে বদ্ধপরিকর। সর্বহারাশ্রেণীর সচেতনতা ও সংগঠনশক্তি ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠছে।

রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শিক্ষিত, বিত্তবান, প্রভাবশালী ভারতীয়দের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দু'একটি দশকের মধ্যেই ঐ নেতৃত্বে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। কিন্তু ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ঔপনিবেশিক আমলে দীর্ঘকাল যথেষ্ট শক্তিধর ছিল না বলে সমগ্র ভারতীয় জনসাধারণকে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করা বা জাতিগঠনের কাজে প্রণোদিত করার দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিল। বিদেশী বণিক ও ধনিকের শাসনে শোষিত, হৃতসর্বস্ব, সাধারণ মানুষ নিজেদের জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে শিক্ষিত, বিত্তবান, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ বা ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বের জন্য তৃষ্ণার্ত থেকে কালক্ষেপ করেনি। তারা নেমে পড়েছিল সংগ্রামে। ঔপনিবেশিক আমলের ঊষাকালে নিঃসঙ্গ, একাকী। মুক্তিসংগ্রাম বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠলে ঐ সাধারণ মানুষের দল (গ্রামসি-র ভাষায় 'সাবঅলটার্ন' জনতা বা নিম্নবর্গের মানুষ) ভারতীয় 'অভিজাত' বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির অংশগ্রহণ বা আশাতিরিক্ত জঙ্গীপনা সম্ভব করেছিল। তারা নেতৃবৃন্দের নির্দেশিত গণ্ডী পেরিয়ে লাগামের বাঁধন ছিঁড়ে সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রভাবশালী দেশীয় গোষ্ঠী বা দল-উপদলগুলির উল্লম্ব জমায়েতের তথাকথিত প্রক্রিয়ায় তারা আবদ্ধ থাকেনি।[34] সংগ্রামী নিম্নবর্গের মানুষের দলগুলি দারিদ্র্য ও সীমাহীন শোষণের আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

কাব্যে উপেক্ষিতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। নিম্নবর্গের মানুষেরা মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার অনুরূপ উপেক্ষার গ্লানি দূর করার জন্য সংবেদনশীল ঐতিহাসিকের জন্য অপেক্ষারত।

২ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতি

ভারত সম্পর্কে বিমূর্ত রূপের কল্পনা পশ্চিমী জনমানসে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। প্রধানত **তিনটি রূপসত্তাকে কেন্দ্র করে** এই কল্পনা নিয়োজিত থেকেছে: অতুলনীয় ধনসম্পদ ও জাঁকজমক এবং আড়ম্বরের দেশ হিসাবে, শ্বেতবর্ণের মানুষের কাঁধে বোঝা হিসাবে এবং আধ্যাত্মিক রূপমাধুর্যে অনন্যা হিসাবে ভারতের বিমূর্ত রূপ পশ্চিমী জণমানসে বিস্ময়, দায়িত্ব ও শ্রদ্ধার মনোভাব গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিল।[1]

কল্পনারঙীন ঐশ্বর্যবান ভারত

ভারতের সাথে প্রথম পরিচয়ে ইউরোপীয় বণিক, যোদ্ধা, ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও রাজদূতেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন। স্ট্র্যাবো ভারতকে 'অন্য যে-কোন দেশের তুলনায় সমৃদ্ধিতে অগ্রসর' এবং ডায়োনিসাস বিত্ত-সম্পদ ও অতুল ঐশ্বর্যের পীঠস্থান হিসাবে অভিহিত করেছিলেন। হেরো-ডোটাস ও মেগাস্থিনিসের রচনাতে অনুরূপ বক্তব্যের সমর্থনে বহু তথ্যের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যপ্রাচ্য বরাবর ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যপথে আগত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, মুক্তা, মণি, মাণিক্য, হাতীর দাঁত, তুলা, লঙ্কা, এলাচ, দারুচিনি, লবঙ্গ ইত্যাদি মূল্যবান ভারতীয় জিনিসপত্র ইউরোপীয় ভোগ্যপণ্যক্রেতাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল। কল্পনারঙীন, ঐশ্বর্যবান ভারতের একটি চিত্র বিদেশী-দের মনে মুদ্রিত হয়েছিল। এমন কি 'ভারত' নামটি ল্যাটিন 'ইণ্ডিয়া' থেকে প্রাপ্ত, আবার 'ইণ্ডিয়া' গ্রীক 'ইণ্ডিকা' থেকে আগত; 'ইণ্ডিকা' পারসিক 'হিন্দু' থেকে উদ্ভূত। সংস্কৃত 'সিন্ধু' থেকে 'হিন্দু'র উৎপত্তি।

পার্থিব ঐশ্বর্যে শুধু নয়, দর্শনচিন্তায় ভারত বিদেশীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ওসেনিক্রিটসের বিবরণ থেকে কালানোস ও মান্দনীস নামে দু'জন ভারতীয় দার্শনিক সাধুর কথা জানা যায় যাঁরা সমকালীন গ্রীক দেশের দার্শনিকদের তুলনায় ন্যূন ছিলেন না। সোফিস্ট্‌স বা সোক্রেটিস অনুরাগী

দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনার উৎকর্ষ তাঁদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে আলেকজাণ্ডার মন্তব্য করেছিলেন।

শ্বেতবর্ণ মানুষের কাঁধে বোঝা হিসাবে ভারত

মধ্যযুগের বিশ্বভূগোলের সংক্ষিপ্ত বয়ানের 'ইমাগো মুণ্ডি' শীর্ষক যে বইখানি কলম্বাস ব্যবহার করেছিলেন তাতে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'ভারতের অত্যাশ্চর্য বিষয়সমূহ'। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান দার্শনিক হেগেল ভারতকে 'বাসনার দেশ' আখ্যা দিয়ে লিখেছিলেন: সকল জাতি-ই বাসনার দেশে তাদের 'ইচ্ছা আর কামনাকে' প্রাকৃতিক সম্পদ আর 'জ্ঞানের ঐশ্বর্য' লাভের আশায় পরিচালিত করেছিল। মুক্তা, হীরা, সুগন্ধ দ্রব্য, গোলাপ নির্যাস, সিংহ, হাতী তাদের প্রলুব্ধ করেছিল, আবার ভারতীয় জ্ঞানের সম্পদ তাদের মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছিল।[2]

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাশেষি থেকে শুরু করে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগীজ, দিনেমার, ইংরাজ, ফরাসী প্রমুখ জাতিগুলির নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কার অভিযানের ফলশ্রুতিতে 'বাসনার দেশ' ভারতের কল্পনারঙীন চিত্রটি বিবর্ণ হতে শুরু করে। প্রত্যক্ষ পরিচয় ভারত সম্পর্কে অশ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করতে থাকে। ভাস্কো ডা গামা ভারতীয় হিন্দুদের 'বর্বর', 'দৈত্যদানব উপাসনাকারী' ও 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' বলে অভিহিত করেছিলেন।[3] পর্তুগীজ খ্রীস্টানদের কাছে ভারত একটি বোঝা হিসাবে বিবেচিত হতে শুরু করে; ভারতবাসীকে সভ্য ও খ্রীস্টান করার দায়িত্ব ঈশ্বর-নির্দেশিত বোঝা হিসাবে নাকি তাঁদের স্কন্ধে বিরাজিত ছিল! ১৯৫৪ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্তুগালের ডঃ সালাজার বলেছিলেন, 'খ্রীস্টধর্মের সংরক্ষণ ও প্রসারের ভিত্তি হিসাবে পর্তুগীজ গোয়ার স্থায়িত্ব রক্ষা করা অপরিহার্য।' স্যর রিচার্ড ফ্যানশ অনূদিত এশিয়ায় পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের মহাকাব্য 'দি লুসিয়াড্স' থেকে শুরু করে বিশপ হেবারের 'দি হীদেন মাদার' কবিতা[4] পর্যন্ত ভারত ইউরোপীয় স্কন্ধে প্রধানত ভারবস্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেকলে প্রমুখ ভিক্টোরীয় উদারনীতির প্রবক্তাগণ খ্রীস্টধর্ম, হিতবাদী দর্শন ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের গরিমায় গর্বোদ্ধত হয়ে ভারতবাসীকে 'সভ্য' করে তোলার প্রয়াসে তাদের গিনিপিগের অযাচিত অমর্যাদায় লাঞ্ছিত করেন। শ্বেতবর্ণ মানুষের কাঁধে বোঝা হিসাবে

ভারতবাসী সম্পর্কিত ধারণাটির সাথে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং অন্য একটি সহোদর ধারণা জুড়ে দেন : 'আইনকানুনের স্পর্শবিহীন আংশিক মানুষের গুণসম্পন্ন ভারতবাসী'। তাঁর মতে ভারতীয়দের জীবনের ভিত্তি ছিল 'বিকৃত, একেবারে বিকৃত।'[5]

১৯২৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত ক্যাথারিন মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' বইতে ভারতকে 'নগ্ন দারিদ্র্যের দেশ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর মতে, ভারতীয়দের কুঅভ্যাসের ফলেই ভারত দরিদ্র, অধঃপতিত ও বর্বর। ঐ ভারত ব্রিটিশ শাসন-শোষণের সৃষ্টি ছিল না, ভারতীয়দের নৈতিকতার অভাব নাকি ঐ ভারতের অবির্ভাব অনিবার্য করে তুলেছিল। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে নোংরা, বিকৃত তথ্যের সমাবেশে মেয়োর বই এমন অনন্য ছিল যে, গান্ধী ঐ রচনাকে 'স্যানিটারি ইনস্‌পেকট্রেস্' বা স্বাস্থ্যব্যবস্থার পরিদর্শিকার রিপোর্টের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। নিজের ধর্ম ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে মেয়ো ভারতবাসীর ধর্ম, নৈতিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছিলেন সেগুলি জাতিগত পক্ষপাতিত্ব ও দম্ভে বিকৃত ছিল।

জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় দীপ্তিমান ভারত

রেনেসাঁ ও জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকউদ্ভাসের পরবর্তী ইউরোপ পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে উদগ্রীব হয়ে প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপে উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়। চীন, ভারত, মিশর প্রভৃতি দেশগুলির দিকে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। জোনস, হলহেড, কোলব্রুক, উইলকিন্‌স, উইলসন প্রমুখ ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ভাগবৎ পুরাণ ইত্যাদি এবং পালি থেকে ধম্মপদ, বৌদ্ধ অনুশাসন, জাতকের গল্প প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থরাজি অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র, দ্যূতক্রীড়া সম্পর্কিত রচনাবলী ইউরোপীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হতে থাকে। চীন ও মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে এই ধরনের প্রয়াসের ফলে নূতন এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রেমণ্ড শ্বোয়াব এই আলোড়নের প্রতিশ্রুতির নামকরণ করেছিলেন দ্বিতীয় রেনেসাঁ বা প্রাচ্যদেশীয় রেনেসাঁ।[6] ইংল্যাণ্ডের কাব্যজগতে

রোমান্টিক আন্দোলনের পুরোধা ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন, কীট্‌স, শেলী প্রভৃতি কবিরা ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মবাণীর প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন।[7]

ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্স ও জার্মানীতেও এই রেনেসাঁ সংঘটিত হয়েছিল। চেজী, ভলটেয়ার, শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়, শীলার, সপেনহাওয়ার, ফিক্‌টে, নীৎসে প্রভৃতি ফরাসী ও জার্মান পণ্ডিতেরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সংস্কৃত ভাষার অমূল্য সম্পদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। মহাকবি গ্যেটে শকুন্তলা কাব্যে স্বর্গমর্ত্যের যুগল মিলন ঘটেছে বলে মনে করেছিলেন। ভারতীয় ধর্মদর্শন কয়েকজন দিকপাল ইউরোপীয় মনীষীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। জার্মান দার্শনিক সপেনহাওয়ার মন্তব্য করেছিলেন যে, 'সারা বিশ্বে আদি রচনাগুলি ছাড়া পাঠের এমন কোন বিষয় নেই যা উপনিষদের মত এত উপকারী ও উদার মাহাত্ম্যে ভরপুর। আমার জীবনের সান্ত্বনা এই বই, মৃত্যুর সান্ত্বনাও হবে এই বই।'[৮] ভারতের ধর্মদর্শন সম্পর্কে এরূপ সশ্রদ্ধ মনোভাব ক্রমে ক্রমে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌতূহলী শিক্ষার্থীদলকে ভারত, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমের দুয়ারে হাজির হতে প্রেরণা দেয়। বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অস্ট্রিয়ান লিওপোল্ড ফিশার হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে যান। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ও তাঁর স্বামী কর্নেল ওল্‌কট প্রতিষ্ঠিত দিব্যজ্ঞান সমাজ বা থিওসফিক্যাল সোসাইটি বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ভারত ও পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্মদর্শন ও আধ্যাত্মিকতা প্রচারের বহুল পরিচিত কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ব্রিটিশ মহিলা সমাজসংস্কারক অ্যানি বেসান্ত ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ঐ দিব্যজ্ঞানের প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করেন।

'বাসনার দেশ' হিসাবে ও শ্বেতবর্ণ মানুষের কাঁধে বোঝা হিসাবে ভারতের রূপকল্প দু'টির মত জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি হিসাবে ভারতের কল্পনাও বাস্তবতার স্পর্শে সত্যনিষ্ঠ হয়নি। বেদ, বেদান্ত ও উপনিষদের 'সুবর্ণময় যুগে' ভারত শুধু আধ্যাত্মচিন্তায় কালাতিপাত করেনি। শোষণ, বৈষম্য, অবিচার-অনাচারে ভারতীয় জনজীবন ঐ যুগেও পীড়িত হয়েছিল। আধ্যাত্ম চিন্তায় যেমন ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রভাবিত হয়েছিল, বস্তুবাদী-যুক্তিবাদী ভাবনাতেও তা সঞ্জীবিত হয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলিতেও অনুরূপ-

ভাবে যুক্তিবাদী, বস্তুবাদী, ইহমুখীন দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি অতীন্দ্রিয় চিন্তা-ভাবনার মনোভাব বিরাজ করেছিল।

প্রতীচ্যের মানুষেরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে আংশিক পরিচয়ের জন্য ভারত ও ভারতবাসীর সম্পূর্ণ পরিচয় লাভে বঞ্চিত হয়েছে। আধ্যাত্ম চিন্তায় রত ভারতবাসীকে তাঁরা একমাত্র সত্য জেনেছে, জীবনসংগ্রামের যোদ্ধা ভারতবাসী তাঁদের দৃষ্টির বাইরে থেকেছে। আবার, ভারতীয় জনগণ স্বদেশীয় প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির আধ্যাত্মিকতার গরিমায় পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতের সংস্কৃতির 'মহান ও ক্ষুদ্র ঐতিহ্য'

সামন্তবাদী কৃষির উপর প্রধানত দণ্ডায়মান ব্রিটিশপূর্ব ভারতীয় সংস্কৃতির দার্শনিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক ও শিল্পকলাগত ধারাপ্রবাহগুলি অতীন্দ্রিয়তার মহাসঙ্গমে বিলীন হয়েছে। আর্থনীতিক দিক থেকে ভারতীয় সমাজ নিম্নমানে অবরুদ্ধ ছিল দীর্ঘকাল; সামাজিক জীবন হয়ে উঠেছিল গতিহীন, প্রায় অপরিবর্তনশীল। শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে ভারতীয় জনজীবনে পরিমাণগত নানা পরিবর্তন ঘটলেও গুণগত পরিবর্তন বিশেষ ঘটেনি। অনড় আর্থ-সামাজিক জীবন ভারতীয় চিন্তা ও মননকে অস্থায়ী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎসংসার তথা বস্তুজগতকে হেলায় তুচ্ছ করতে শিক্ষা দিয়ে চরমতম, পরমতম বাস্তবতা-জ্ঞানে ঈশ্বরমুখীন করে তুলেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম ব্যক্তিকে পরমেশ্বরের খণ্ডপ্রকাশ বলে চিহ্নিত করে ব্যক্তির অন্তর্জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়াসী হয়েছিল। ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনকে ভারতীয় ধর্মগুলি প্রধানতম মূল্যবোধ হিসাবে সংস্থাপিত করতে প্রয়াসী হয়েছিল, ইহজীবনকে মায়াময়, অলীক বলে ভাবতে শিক্ষা দিয়েছিল।[৭]

ধর্মমতের সংস্কার, উত্থান-পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায়-ভিত্তিক ভারতীয় আর্থনীতিক সংগঠন স্বয়ং-সম্পূর্ণতার স্থানীয় কূপমণ্ডুকতায় বদ্ধ থেকে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী উন্মেষের পথে বাধার বিন্ধ্যাচল রচনা করেছে। শঙ্করাচার্য, বল্লভাচার্য, বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, রামানুজ, নানক, কবীর, দাদু নূতন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা বা পুরোন ধর্মমতের নূতন ব্যাখ্যায় ভারতবর্ষের গ্রামে ও নগরে বিপ্লব সাধন করেছেন; শহরের পর শহর, গ্রামের পর গ্রাম হিন্দু থেকে বৌদ্ধ বা জৈন হয়েছে, বৈষ্ণব থেকে শৈব

হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি অনড় হয়ে বিরাজ করে ভারতীয় চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদার প্রান্তরে নিয়ে যেতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেনি।

ইসলাম উন্মুক্ত অসি হাতে ভারতে আবির্ভূত হয়েছিল, কিন্তু কালক্রমে অসি কোষবদ্ধ করে হিন্দু জগৎদৃষ্টি ও একেশ্বরবাদের সাথে সাযুজ্য রচনা করে সমন্বয়মূলক ধর্মসংস্কৃতি গড়ে তোলে।[10]

'ভারতের হিন্দু সংস্কৃতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ধর্মীয় উপাদানে আপ্লুত ছিল। হিন্দু আইনব্যবস্থার সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল।...ধর্ম ও সাহিত্য এত নিবিড়ভাবে আত্মীয়তা রচনা করেছিল যে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যকীর্তি চরিত্রগত দিক থেকে ভক্তিমূলক। এমন কি, জাতির সৌন্দর্যানুভূতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দর্পণ বিবেচিত শিল্পকলাও ধর্মের সাথে গভীর ভাবে যুক্ত ছিল। স্থাপত্য মন্দিরে আত্মপ্রকাশ করত, ভাস্কর্য খোদাই কার্যে মূর্ত হয়ে উঠত, প্রবৃত্তি ধর্মীয় প্রতীকে সজ্জিত হয়ে সব কিছুকে অলঙ্কৃত করত।'[11] ও'ম্যালীর এই বক্তব্যের সাথে সংযোজন হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ভারতের ইসলামী সংস্কৃতির প্রকৃতি ও স্বরূপও ধর্মীয় চিন্তাভাবনায় বিশেষ ভাবে সঞ্জীবিত হয়ে ঐহিক জীবনের দাবিকে প্রাধান্য না দিয়ে পরলোকের চিন্তায় নিয়োজিত ছিল। হিন্দু ধর্মসংস্কৃতির সাথে সেতুবন্ধন রচনা করে ভারতীয় ইসলাম ইহজগৎবিমুখ, পরলোক চিন্তায় ভাবিত একটি জীবনদর্শনের রূপকার হয়ে উঠেছিল।

ধর্মসংস্কৃতির একটি 'মহান সর্বভারতীয় ঐতিহ্য' যেমন যুগ-যুগান্তর ধরে সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় ঐক্যবন্ধনে ভারতবাসীকে সংবদ্ধ রেখেছে, অপর দিকে 'ক্ষুদ্র একটি ঐতিহ্য' গোষ্ঠীগত বা অঞ্চলগত দিক থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে লৌকিক নানা আচার-অনাচারে বিযুক্ত রেখেছে। মহান ঐতিহ্যটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থরাজিতে, ধর্মীয় অনুশাসনে, ক্ষমতাবান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যায়, জননেতাদের পরিবেশনে, পবিত্র ধর্মকেন্দ্রগুলির মন্দির, সাধু-সন্ন্যাসী, নদী প্রভৃতির সংস্পর্শের মাধ্যমে, ব্যক্তিজীবন ও ঋতুচক্রের আচরণ ও রীতিপ্রকরণ নির্ণায়ক পবিত্র পঞ্জিকার নির্দেশে ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে।[12] আর, ক্ষুদ্র ঐতিহ্যটি পরিবেশ ও জনজীবনের প্রাত্যহিকতার সাথে একাত্ম হয়ে বিভিন্ন ধারা-উপধারায় প্রবাহিত হয়ে নিম্নগামী হয়ে নিম্নমান অর্জন করেছে। প্রস্তর, বৃক্ষ, জীবজন্তু ও অসংখ্য দেবদেবীর পূজা এই ঐতিহ্যের অনুসারী।

ভারতের নগরসংস্কৃতি

ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতের প্রধান শহরগুলি প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্র, রাজা, বাদশাহ্, নবাব, সুলতানদের আবাসভূমি, সর্বোচ্চ বিচারালয়ের কেন্দ্রস্থল, প্রধান সামরিক ঘাঁটি, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র বা তীর্থস্থান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ভূমিরাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত অর্থ গ্রাম থেকে শহরের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে স্তূপীকৃত হত। রাজস্বের সিংহভাগ শাসক, অভিজাত সম্প্রদায়, সামরিক ও প্রশাসনিক রাজকর্মচারীদের ভোগবিলাসের মাধ্যমে শহরাঞ্চলে ব্যয়িত হত। বণিক সম্প্রদায় মুনাফার অধিকাংশই নগরজীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ব্যয় করতেন। স্বভাবতই উচ্চমান সুতীবস্ত্র, রেশম বস্ত্র, ধাতু ও মার্বেল পাথর নির্মিত দ্রব্যসামগ্রী, নানাবিধ বিলাসদ্রব্য এবং সমরাস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র হিসাবে শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নাব্য নদী ও সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত শহরগুলি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। প্রধানত গ্রামীণ এলাকার উপর ভূমিরাজস্বের মাধ্যমে শোষণ কায়েম করে শহরগুলি বিকশিত হলেও, ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের সূত্রেও ভারতীয় শহরগুলি গ্রামাঞ্চলের তুলনায় ধনী হয়ে উঠেছিল।

শ্রেণীবিন্যাসের বিচারে ভারতীয় শহরজীবন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। শহরে রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক ও সামরিক রাজকর্মচারী ও তাঁদের পরিবারবর্গ, সম্ভ্রান্ত বংশের লোকজন, বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি যেমন বসবাস করতেন, তেমনই আশ্রয়স্থল গড়ে তুলত কারিগর, শ্রমিক, ভৃত্য ও অন্যান্য মেহনতী মানুষ। তাছাড়া, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রভাবিত 'বৃহত্তর ভারতের' রাষ্ট্রগুলি থেকে রাজদূত, পর্যটক, বণিক, দার্শনিক, শিল্পী, ধর্মার্থীরা এসে ভারতীয় শহরগুলিতে গমনাগমন করতেন। সামাজিক সচলতায় ভারতীয় শহরগুলি বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক কারণে বিত্তবান লোকেরা এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াত করতেন।

বিত্তবান শ্রেণীগুলি শহরগুলিতে কেন্দ্রীভূত হত। জাতীয় সম্পদের বিপুল অংশ শহরগুলিতে ব্যয়িত হত। রাজা, অভিজাত ব্যক্তি ও বণিকেরা তাঁদের উদ্বৃত্ত সম্পদ যথেচ্ছ ব্যয় করে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, স্থপতি, গায়ক, নর্তক-নর্তকী, চিত্রশিল্পী প্রভৃতিদের নিয়োগ করে নিজেদের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা

মেটাতেন। অশোক, বিক্রমাদিত্য, ভোজ, হর্ষবর্ধন প্রভৃতি হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজাদের সভায় এবং পরবর্তীকালে বাদশাহ্-নবাবদের দরবারে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা অলঙ্কারের মণিমাণিক্যের মত সৌন্দর্য বিচ্ছুরণ করতেন। কালিদাস, বাণ, ধন্বন্তরী, হরিষেণ, বরাহমিহির, তানসেন, আবুল ফজল, ফৈজী ভারতীয় ইতিহাসের বিগত শতাব্দীগুলিতে রাজদরবারের সাংস্কৃতিক গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের শহরগুলিতে স্থপতি ও বাস্তুকারেরা গড়ে তুলতেন অনুপম স্মারক বা স্মৃতিস্তম্ভ, সুরম্য অট্টালিকা; জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিরীক্ষণ আগার সৃষ্টি করে মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণায় লিপ্ত থাকতেন। রাজদরবারে ঐতিহাসিকেরা সমকালীন যুগের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করতেন। কবি-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি সমকালীন যুগের বেড়া ডিঙিয়ে সার্বজনীন সম্পদ সৃজনে ব্যস্ত থাকত। বিজ্ঞানী ও বৈদ্যরা নূতন নূতন তত্ত্ব বা পদ্ধতি আবিষ্কার করে জ্ঞানের জগতকে সমৃদ্ধ করতেন। গায়কদের সুরের মূর্চ্ছনায়, নর্তকীর নূপুরনিক্বণে অমরাবতীর আবেশ রচিত হত। এক কথায়, রাজদরবারে অনুগ্রহপুষ্ট, শহরবাসী শিল্পী-বিজ্ঞানী-সাহিত্যিকেরা এবং শহর-সভ্যতার পিলসুজ মেহনতী মানুষেরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের রূপকার হয়ে উঠতেন। কেবলমাত্র, বিক্রমাদিত্য বা আকবরের মত বরেণ্য সম্রাটেরাই জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে রাজদরবারের কেন্দ্রভূমিতে 'রত্নসভা' গড়ে তুলতেন এমন নয়, উদ্বৃত্ত সম্পদের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজবংশের প্রতিনিধিরা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করতেন।

স্বাভাবিক কারণে দর্শন, শিল্পকলা, ধর্মসম্পর্কিত বহুমুখী চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের সূত্রপাত শহরগুলি থেকেই হত। বৈজ্ঞানিক প্রগতির শীর্ণ ধারাটি শহরগুলিতে বহমান হয়ে শহর-গ্রামের প্রান্তসীমায় বিলীন হত। শিল্পকলা ও ধর্মসংক্রান্ত নূতন চিন্তাভাবনার সূতিকাগৃহ হিসাবে শহরগুলি আত্মপ্রকাশ করত। আস্তিক, নাস্তিক ধর্মমতের দ্বন্দ্ব শহরগুলিতে লক্ষ্য করা যেত। ভাববাদী এবং আধ্যাত্মিক দর্শনের বিচিত্র প্রবাহ জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত শহরে মানুষের চিন্তার দিগন্তকে উদ্ভাসিত করত।

প্রধানত সামন্তবাদী স্থবিরতায় জর্জর স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির ভূমিরাজস্বের উপর নির্ভরশীল ব্রিটিশপূর্ব ভারতের শহরগুলির নিজস্ব সম্পদ সৃজনের ক্ষমতা ছিল পঙ্গু। কারিগরেরা বিত্তবান ব্যক্তি, বণিক, রাজা, বা বাদশাহ্দের নিযুক্ত অধস্তন কর্মী হিসাবে শিল্পদ্রব্য তৈরী করত। বিখ্যাত

চান্দেরী শাড়ীর শিল্পীরা সূক্ষ্ম রেশমতন্তুতে ধূলিকণার সংস্পর্শ এড়াতে মাটির তলায় স্বল্পালোকিত ঘরে কাজ করতে বাধ্য হত। শাসক বা বণিকের মূলধনে শাড়ী বুনে নির্দিষ্ট মূল্যে তাঁদের কাছেই কারিগরেরা উচ্চমান শাড়ী বিক্রয় করত।[13] নিম্নমান কিছু শাড়ী সাধারণ ক্রেতার দুয়ারে হাজির হত। রপ্তানির লভ্যাংশ কারিগর নিয়োগকারী সামন্তপ্রভু বা বণিকের থলিতে স্থান পেত। চান্দেরী শাড়ীর মত বহু বিচিত্র শিল্পসম্ভার একই রকম মূলধন এবং একই রকম ব্যবস্থাপনায় তৈরী হত। শহরের শিল্পদ্রব্যের পক্ষে ক্রয়ক্ষমতা-বিহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বাজার দখল করা অসম্ভব ছিল। কাজেই শহুরে সংস্কৃতির গ্রামীণ বিস্তারের আর্থনীতিক পটভূমি ব্রিটিশপূর্ব ভারতে রচিত হয়নি। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামীণ পরিবেশের আবেষ্টনীতে শহরগুলি মরুদ্যানের মত বিরাজ করায় ঊষর মরুভূমিসদৃশ গ্রামগুলি শহুরে সংস্কৃতিতে ধন্য হয়নি। আবার পশ্চাৎপদ গ্রামীণ সংস্কৃতির (বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কৃতির) ছোঁয়াচে শহুরে সংস্কৃতি আবিল হয়েছে। বর্ণপ্রথা, দাসসুলভ শ্রমের ব্যবহার গ্রামের মত শহরেও বর্তমান ছিল।

ভারতের ধর্মীয় ও প্রশাসনিক শহরগুলি তীর্থযাত্রী এবং সরকারী দপ্তর ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের প্রয়োজন ও ব্যয়ে গতিবেগ লাভ করত। আর, শিল্পসমৃদ্ধ বা বৈদেশিক আমদানি-রপ্তানিতে ধনী শহরগুলির উৎপাদনব্যবস্থায় ব্যক্তিগত আর্থনীতিক কর্মোদ্যোগের নীতি প্রয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি না হওয়ায় ব্রিটিশপূর্ব ভারতে শিল্পনগরীর উদ্ভব ঘটেনি। সীমিত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করলেও উৎপাদনব্যবস্থার সামন্তবাদী প্রভাবে, আর্থনীতিক বাজারের অভাবে, সড়ক ও যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় সংশ্লিষ্ট ভারতীয় শহরগুলি ধনতান্ত্রিক চরিত্র অর্জনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও ভারতের গ্রামগুলি উৎপাদন-ব্যবস্থা ও বণ্টনের উপর সম্প্রদায়গত নিয়ন্ত্রণ রেখে, শহর ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগবিহীন হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। শহর-গ্রাম ও আন্তর্গ্রাম আর্থনীতিক সম্পর্ক অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমিত ছিল। বহির্বিশ্বের সাথে গ্রামগুলির আর্থনীতিক সংযোগ ছিল না। স্বভাবতই

সংযোগব্যবস্থা শতাব্দীর পর শতাব্দী অনুন্নত থেকেছে। আর্থনীতিক সংযোগ ও যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে ভারতীয় শহরে সংস্কৃতি বা বিশ্বসংস্কৃতির আলোকরশ্মি ভারতীয় গ্রামগুলির দুর্ভেদ্য কূপমণ্ডুকতার আস্তরণ ভেদ করতে পারেনি। সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ঘটেছে: মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, কুষাণ, দাস, খিলজী, তুঘলক, পাঠান, মোগল, চোল, পাণ্ড্য, চালুক্য, সাতবাহন কত-না রাজবংশ একের পর এক উত্তর, দক্ষিণ ভারতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকেছে, আবার কালক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ বা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ব্রিটিশ যুগের সূত্রপাত পর্যন্তও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে শতাব্দীর পর শতাব্দী সংহত অস্তিত্ব কায়েম রেখেছে। শুধুমাত্র ভূমিরাজস্ব পূর্বতন সম্রাট বা নবাবকে না দিয়ে নূতন সম্রাট বা নবাবকে দিতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুযুগ থেকে শুরু করে মোগল যুগের শেষ পর্যন্ত গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থনীতিক সংগঠনের চেহারা বজায় রেখেছে। নিম্নমান আর্থ-সামাজিক অস্তিত্বে স্থবির গ্রামগুলির চিন্তা ও মননের জগৎ দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট হয়েছে।

আদিম কৃষি ও অনুন্নত শিল্প, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যাগত সহায়তায় ধন্য হয়নি। গ্রামীণ জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বলদ-চালিত লাঙল বা অপটু, সাদাসিধা যন্ত্রপাতির বেড়াজালে বদ্ধ হয়ে নিম্নমান সৃজনশীলতায় বন্দী হয়েছে। ভূমিরাজস্ব দিয়ে, আগামী বৎসরের কৃষি উৎপাদনের বীজ মজুত রেখে, উৎপাদিত ফসলে কোনক্রমে খেয়েপরে গ্রামীণ জনসাধারণ বেঁচে থাকত। খরা, অজন্মা, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্বিপাক দেখা দিলে কীটপতঙ্গের মত মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। বহির্বিশ্বের সঙ্গে সংযোগবিহীন গ্রামগুলিতে সাহায্য প্রেরণের কোনরূপ ব্যবস্থা করার সুযোগ ছিল না।

এরূপ নিম্নমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং অনিশ্চয়তায় ক্লিষ্ট জীবন গ্রামবাসীদের চিন্তাভাবনাকে কুসংস্কার, হতাশা, পলায়ন মনোবৃত্তি, ধর্মীয় দুর্জ্ঞেয়তা এবং প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রতি স্থূল ভক্তি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

বর্ণব্যবস্থা জীবনের সর্বক্ষেত্রে রীতিনীতি, বাধানিষেধ ও উর্ধ্বতন-অধস্তন সম্পর্ক কায়েম করে ব্যক্তিজীবন থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কর্মোদ্যোগ কেড়ে নিয়েছিল। যৌথ পরিবারব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশে অনুরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। এরূপ পরিবেশে গ্রামীণ জনসাধারণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য

বিকাশে তৎপর না হয়ে সব কিছুকে বিধিনির্দিষ্ট মনে করে উদ্যমহীন, স্থবির জনজীবন গড়ে তুলেছিল। সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা নূতন পথের সন্ধানের দিশারী হয়নি। সামাজিক অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে ওঠার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। আশ্চর্যের কিছু নেই, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার, একঘেঁয়েমি ও চিন্তাবিকাশের বন্ধ্যাদশায় গ্রামীণ জনজীবন গতিহীন হয়ে পড়েছিল। গ্রামগুলি 'আর্থনীতিক স্থবিরতা, সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং সাংস্কৃতিক অন্ধত্বের' দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

বহির্জগতের চিন্তাভাবনার দমকা বাতাস দুর্গগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশাধিকার পায়নি। সামাজিক সচলতায় গ্রামীণ জীবন চঞ্চল ছিল না। তীর্থযাত্রা, বিবাহ বা গ্রামীণ মেলায় অংশগ্রহণ ছাড়া গ্রামবাসীদের স্বল্পকালের জন্যও গ্রামত্যাগের অন্য কোন উপলক্ষ ছিল না। যোগাযোগ ও যানবাহনব্যবস্থার আদিম অবস্থাও বহির্জগতের সকল প্রভাব থেকে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিকে মুক্ত রাখার বন্দোবস্ত স্থায়ী করে তুলেছিল। স্বভাবতই এরূপ পরিবেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব সামাজিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক ঐক্যবন্ধনের ক্ষেত্রে মৌল প্রভাব বিস্তারে অক্ষম ছিল।

ভারতের ইতিহাসে নগরগুলিকে কেন্দ্র করে সামরিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বহু বিদ্রোহ, বিক্ষোভ, আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে; কিন্তু, রক্ষণশীল, স্থবির, দরিদ্র গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন পূর্বের মতই একই পঞ্চায়েত সমিতি, সামাজিক রীতিনীতি, আইনকানুন, বর্ণপ্রথা, একান্নবর্তী পরিবার, ইহবিমুখ হেঁয়ালিপনায় আবিল ধর্মমত ও নিম্নমান কৃষি এবং শিল্পোৎপাদনের চৌহদ্দিতে আবর্তিত হয়েছে।

ভারতের ধর্মবিপ্লবগুলি সর্বভারতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের সমষ্টিবদ্ধ রূপের অভাবে জাতীয় চেতনা সঞ্চারে সফল হয়নি। ধর্মমতের আদর্শগত ঐক্য স্থাপনে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম যুগল প্রয়াসে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু এই ঐক্য জাতীয়তাবাদের জনক হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। একটি জাতীয় অর্থনীতির অভাব, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার অনগ্রসরতা এবং সর্বভারতীয় রাজশক্তির অধীনে সংঘবদ্ধ ভৌগোলিক সর্বভারতীয় সত্তার অভাব জাতীয়তাবাদের চেতনা সৃষ্টিতে প্রতিকূল শক্তি যুগিয়েছে। ধর্মমতের আদর্শগত ঐক্যের বৈপ্লবিক ভূমিকা ভারতীয় গণমনের দর্পণে প্রতিবিম্ব ফেলে

অচিরেই অন্তর্হিত হয়েছে। সর্বভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির অভাবে ঐ ভূমিকা আশ্রয়স্থল খুঁজে না পেয়ে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত বৃথাই পক্ষসঞ্চালনে ক্লান্ত হয়েছে। অনগ্রসর সামাজিক অর্থনীতিতে বিড়ম্বিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি কূপমণ্ডুক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের জন্য সর্বভারতীয় চেতনার লালনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি। লৌকিক ধর্মমতের কুসংস্কার, রক্ষণশীলতা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখার প্রবণতা সামাজিক অর্থনীতিকে ধর্মীয় বৈধতার প্রলেপ দিয়েছে, আবার সামাজিক অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা ধর্মীয় রূপের অনগ্রসরতা, রক্ষণশীলতা ও আবিলতার আধার তৈরী করেছে।

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ইসলামী অবদান

ব্রিটিশপূর্ব ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের যৌথ প্রয়াসে সার্বজনীন রূপরেখা রচনায় নিয়োজিত ছিল। রেখা কখনো ভগ্ন হয়েছিল, কখনো রক্তলিখনে বিড়ম্বিত হয়েছিল, আবার অনেক সময় মূর্তি-ভাঙ্গা হাতুড়ীর প্রচণ্ড আঘাতে সাময়িকভাবে বিলুপ্ত হয়েছিল, অথবা সঙ্কীর্ণতা-কূপমণ্ডুকতার শীতল স্পর্শে প্রাণহীন হয়েছিল।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ আর্থনীতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পার্থক্য ও বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক মনোভাবের গোড়ায় জলসিঞ্চন করে বিষবৃক্ষ সৃষ্টি করেছিল।

ইসলাম অনুগামীরা ভারতে আক্রমণকারী হিসাবে পদার্পণ করেছিলেন। কাফের দমন, মন্দির ধ্বংস এবং বলপূর্বক ধর্মান্তর সাধন দীর্ঘকাল বজায় থাকলেও শাসনের প্রয়োজনে তাঁরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহযোগিতা অর্জনের কৌশল রচনায় সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে, ধীরে ধীরে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে ইসলাম রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক নয়া বিন্যাসের রূপকার হয়ে উঠতে থাকে। সমন্বয়ী ভাবধারা ভারতীয় চিন্তা ও মননকে প্রভাবিত করতে থাকে। আবার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে রাজশক্তির দাপট মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক নয়া বিন্যাসের পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষে এরূপ দ্বৈত কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল।

বাবর, শের শাহ্, হুমায়ুন বহু ধর্মাবলম্বী প্রজাদের সমদৃষ্টিতে দেখতে

পেয়েছিলেন। আকবরের 'দীন ইলাহী'-কে সর্ব ধর্মের মর্মবাণীকে উদাত্ত সার্বজনীন ধর্মে রূপান্তরিত করার-প্রয়াস বলে বিবেচনা করা যায়।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালের শেষ দিকে উদারনৈতিক ধর্মনীতির সম্প্রসারণ ঘটেছিল। দারা শিকোহ্‌ ও জাহানারার প্রভাবে এই প্রক্রিয়া শক্তি অর্জন করেছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে হিন্দুদের পুনর্জাগরণে শাহ্‌জাহান শেষ জীবনে শক্তি যুগিয়েছিলেন হিন্দু কবি, জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সহায়তা দিয়ে। হিন্দী কবি চিন্তামণি ও সুন্দর দাস এবং সংস্কৃত পণ্ডিত কবীন্দ্রাচার্য, জগন্নাথ ও বেদাঙ্গরাজ তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।[15]

শাহ্‌জাহানের আমলে মুসলমান চিন্তানায়কদের একাংশ ইসলামের নূতন ব্যাখ্যাদানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে জোরজবরদস্তির নিন্দা করে তাঁরা সার্বজনীন সহনশীলতা ('সুল-হি-কুল্‌') অনুসরণের নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা মুসলমান শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও দর্শন শিক্ষা দেবার অধিকার ভোগ করতেন। প্রায় সমগ্র ভারত থেকে বারাণসীতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের সমাগম হত।

আকবরের প্রিয়পাত্র আবুল ফজল, ফৈজী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ দারা শিকোহ্‌র কাছেও অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নুরুদ্দিন সিরাজির 'মুলাহ্‌জাত-ই-দারা শিকোহি' মহম্মদের কার্যাবলীর যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল। দারা আকবরের মত নূতন ধর্মের পত্তন চাননি, সমন্বয়ী ধর্মবিশ্বাসের প্রসার চেয়েছিলেন। 'সির্‌-হি-আকবর'-এর ভূমিকায় দারা মন্তব্য করেছিলেন যে, সত্য কেবলমাত্র কোরাণের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়।

ধর্মীয় সহনশীলতার বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ভারতে ধর্মান্ধতার শক্তি বরাবরই ক্রিয়াশীল ছিল। সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্‌জেবের জয়লাভে ঐ শক্তি সাফল্যের শিরোপা মস্তকে ধারন করে ভারত জয় করে নেয়।

ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, শাহ্‌জাহানের রাজত্বকাল থেকে আওরঙ্‌জেবের আমল পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, হিন্দু কর্মচারীদের শতকরা হার মোগল প্রশাসনে ক্রমশ বেড়েছিল। ছয় হাজার ঘোড়ার মালিক হিন্দু রাজা যশোবন্ত সিং মোগল আমলের সবচেয়ে বড় অভিজাত মনসবদার ছিলেন। মোগল ও মোগল পূর্ববর্তী মুসলমান-শাসিত ভারতে হিন্দুধর্মের

আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করার স্বাধীনতা দাদু, কবীর, নানক ভোগ করেছিলেন।

ভারতে দর্শন, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলা, চিত্রকলা, স্থাপত্য, বেশভূষা, খানাপিনা সর্বত্র ইসলামী প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে ঐ প্রভাব ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ আর শুধুমাত্র হিন্দুর নয় বা কেবলমাত্র মুসলমানের নয়, —উভয়ের।

প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবন

মধ্যযুগের ভারত সার্বিক চরিত্রের বিচারে প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক ছিল বলা যায়। কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য তখনও দাসযুগীয় সম্পর্কের উপস্থিতির কিছু কিছু লক্ষণ বর্তমান ছিল।[16] ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রগতির বস্তুগত শর্তগুলি অবর্তমান ছিল। মোগল আমলের শেষ দিকে বহু ধনবান ব্যক্তির অর্থসম্পদ বিপুল আকার ধারন করেছিল। কিন্তু আর্থনীতিক বাজারের অভাবে এ অর্থসম্পদ শিল্পে মূলধন হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারেনি।

প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির মত মধ্যযুগের ভারতের অর্থনীতিও গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির ক্রিয়াকর্মের উপর প্রধানত সংস্থাপিত ছিল। মোগলেরা শহুরে মানুষ ছিলেন, নগরপ্রশাসনে তাঁদের বিশিষ্ট অবদান অনুভূত হয়েছিল।[17] কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থ-সামাজিক বিশিষ্টতার পরিবর্তে নূতন কোন বিশিষ্টতায় গ্রামভারতের সমাজজীবন এবং আর্থনীতিক জীবনকে তাঁরা উজ্জীবিত করতে পারেননি।

খাজনা, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদির বোঝা বহন করে ভারতীয় কৃষির পক্ষে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করা সম্ভব হত না। ক্ষুন্নিবৃত্তি ও বীজধানের প্রয়োজন মেটাতে ঐ কৃষি নিযুক্ত ছিল বলা যায়। ইরফান হাবিব হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, মোগল আমলে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আমলা, সৈনিক ও খাজনা প্রাপকদের নানা শ্রেণীর লোকজন কৃষিউৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত আত্মসাৎ করে নিতেন।

বেঞ্জামিন হাইনের হিসাব থেকে জানা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ভূমিকর ফসলের ৩৫ শতাংশ ছিল; প্রশাসক ও সৈনিকদের প্রাপ্য ছিল ১২·৫ শতাংশ, ধর্মীয় প্রচারে লিপ্ত লোকজনদের ২·৫ শতাংশের কিছু বেশী, আর কারিগর এবং চাষবাসের সাথে সম্পর্কহীন ভৃত্যদের

২·৫ শতাংশ। কাজেই সাধারণ একটি বৎসরে মোট উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক মাত্র রায়ত, দিনমজুর, কুটিরশিল্পের শ্রমিক, ভৃত্য প্রভৃতিদের জন্য পড়ে থাকত।[14]

উদ্বৃত্ত ফসলের অভাবে কৃষির উন্নতি ভারতে সুদূরপরাহত হয়ে উঠেছিল। কৃষকেরা শিল্পদ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি, শিল্পদ্রব্যের গ্রামীণ বাজার রচিত হয়নি। তাদের জীবনযাত্রার মান জীবন-মরণের মধ্যবর্তী সীমারেখায় চঞ্চল থেকেছিল বরাবর। খরা, বন্যা বা দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যের অভাবে কৃষকেরা মশামাছির মত মরত, অথচ তাদের উৎপাদিত ফসলের কৃপায় শাসকশ্রেণী ও সেনাবাহিনীর লোকজন বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। উদ্বৃত্ত ফসলের বিপুল অংশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবন মন্দগতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় কৃষকেরা রাজস্ব, কর, খাজনা ইত্যাদির দায় মিটিয়ে এবং নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে বাজারে সরাসরি ফসল বিক্রির কোন সুযোগ পেত না। অথচ, সমগ্র ফসলের ক্রেতা, মহাজন, খাজনাদার, রাজস্ব সংগ্রাহকেরা কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফসল নিজেরাই পণ্যে রূপান্তরিত করতেন। কৃষকদের অনুরূপ সুযোগ না থাকায় কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিত্ত সঞ্চিত হতে পারেনি। উদ্বৃত্ত সৃষ্টির বিরুদ্ধে সুদ, ভূমিকর ইত্যাদি স্থায়ী প্রতিবন্ধক হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সুদ, কর ইত্যাদির দায় মিটিয়ে যে সামান্য পরিমাণ শস্য অবশিষ্ট থাকত তা-ই স্থানীয়ভাবে ভোগ্যপণ্য হিসাবে ব্যয়িত হত।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি শুধুমাত্র চাষী পরিবার নিয়ে গড়ে উঠত এমন নয়, কুটির ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের ঝাড়ুদার, জমাদার ইত্যাদি লোকজনও ঐগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামে চাষী ছাড়াও কুমোর, কামার, ছুতোর, তাঁতী, মুচি, কলু, নাপিত থাকত। তারা সবাই প্রায় সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে নিযুক্ত থাকত। তথাকথিত নিম্নবর্ণ থেকে উদ্ভূত ঝাড়ুদার, জমাদার প্রভৃতিরা ভারতীয় আদিম জাতিগুলির অধস্তন পুরুষ; প্রাচীন হিন্দুসমাজ এদের নিম্ন পর্যায়ের কাজকর্মে নিযুক্ত করেছিল।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির জনজীবনে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাজন নীতির সার্থক প্রয়োগ অনুপস্থিত ছিল। চাষী পরিবারগুলি প্রধানত কৃষিকর্মে নিযুক্ত

থাকলেও, বৎসরের নির্দিষ্ট সময় সুতো কাটায় ব্যাপৃত থাকত। আবার, অনুরূপভাবে গ্রামীণ কারিগরেরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভূমিখণ্ড লাভ করে বৎসরের কিছু সময় চাষবাসে নিযুক্ত থাকত।

শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকেরা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয় এলাকা থেকেই সংগ্রহ করে নিতে পারত। মাটি, কাঠ, চামড়া, ব্যবহার্য পাত্র, বাসনপত্র ইত্যাদি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যেত। তুলা অনায়াসেই সংগ্রহ করা যেত। লোহা কোন কোন ক্ষেত্রে বহিরাঞ্চল থেকে আনতে হত। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, কারিগরেরা গ্রামীণ শিল্পোৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তর থেকেই সংগ্রহ করবার সুযোগ লাভ করত। অর্থাৎ, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জনজীবন প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল।

গ্রামীণ কৃষি ও শিল্প নিম্নমান প্রযুক্তিবিদ্যার অধীনে সংস্থাপিত ছিল। সাদাসিধা ধরনের যন্ত্রপাতি (কাস্তে, লাঙল ইত্যাদি) কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হত। শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও অনুরূপ ছিল। করাত, কাটারি, হাতুড়ি, গাঁইতি এবং চরকা সামান্য মালমশলায় স্বল্প সময়ে নির্মিত হয়ে বংশপরম্পরায় ব্যবহৃত হত। বায়ুচালিত বা জলশক্তি-চালিত চাকার ব্যবহার প্রায় ছিল না বলা চলে।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে বর্ণপ্রথা প্রাকৃতিক নিয়মের অলঙ্ঘ্যতা নিয়ে সদস্যদের জীবিকা বা পেশা নির্ধারণ করে দিত। কর্মক্ষেত্রে নৈপুণ্য বা কৃতিত্ব প্রদর্শন করে এক বর্ণ থেকে অপর বর্ণে উন্নীত হবার বিরল সম্ভাবনা থাকলেও বর্ণপ্রথা জন্ম-নির্ধারিত বা বংশানুক্রমিক ছিল বলা যায়। কাজেই ভারতে পেশা বা জীবিকা নির্বাচনও বংশানুক্রমিক ছিল বলা যায়।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি বহির্বিশ্বের সাথে আর্থনীতিক সংযোগবিহীন হয়ে নিম্নমান, বৈচিত্র্যবিহীন, কূপমণ্ডুক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কৃষক ও কারিগরের উৎপাদিত প্রায় সকল দ্রব্যসামগ্রী গ্রামের অভ্যন্তরে বিনিময় প্রথায় বণ্টিত হয়ে যেত। গ্রামে উৎপাদিত প্রায় সব কিছু গ্রামীণ জনসাধারণের ভোগ বা সেবায় লেগে যেত। সামান্য যা কিছু উদ্বৃত্ত রাখা হত তা পুনরুৎপাদনের কাজে ব্যয়িত হত। স্থানীয়ভাবে গড়ে-ওঠা, বিনিময়-ভিত্তিক সঙ্কীর্ণ, সীমিত আর্থনীতিক লেনদেন যুগ-যুগান্তর ধরে ভারতীয় জনজীবনকে স্থবির, একঘেঁয়ে জীবনের নাগপাশে বদ্ধ করে রেখেছিল। দুর্বিপাক, দুর্ধর্ষ

জাতি-উপজাতির বহিরাক্রমণ বা খরার ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ বৈচিত্র্যবিহীন জনজীবনে কেবলমাত্র সাময়িক চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে সক্ষম হত।

গ্রামের অভ্যন্তরে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম বিনিময়ের জন্য যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা কেবলমাত্র ব্যক্তি-সম্পর্কের উপর সংস্থাপিত ছিল এমন নয়। চাষীরা শিল্পকর্মে নিযুক্ত কারিগরদের উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্ম প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করত, কিন্তু প্রতিটি দ্রব্য বা সেবাকর্মের জন্য পৃথকভাবে মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামীণ সম্প্রদায় চাষীদের তরফ থেকে ফসল তোলার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য সরবরাহ করে বা ভূমিখণ্ড প্রদান করে মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করত। কারিগর তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ব্যক্তি-মালিক হিসাবে বিবেচিত হত না; শেলভাঙ্করের মতে, সে গ্রামীণ সম্প্রদায় কর্তৃক নিয়োজিত জনসেবক হিসাবে গণ্য হত। দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময়ক্ষেত্রে একদিকে থাকত চাষীরা ও গ্রামীণ সম্প্রদায়, এবং অন্যদিকে গ্রামীণ জনসেবক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কারিগরেরা।

দ্রব্য ও সেবাকর্মের বিনিময় গ্রাম-ভিত্তিক হওয়ায় সড়কপথ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি প্রায় শুদ্ধগতিতে স্থবির হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে গরুর গাড়ি যানবাহনের প্রধানতম মাধ্যম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিবাহ, তীর্থযাত্রা, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি উপলক্ষ ছাড়া স্থানান্তরে যাতায়াতে জনসাধারণ অভ্যস্ত ছিল না। সচলতাবিহীন জনজীবন সড়কপথ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির প্রতিকূল শক্তি হিসাবে ক্রিয়ারত ছিল।

'রাজনৈতিক আকাশের ঝটিকামেঘের' প্রাবল্যকে উপেক্ষা করে ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি কেমন করে যুগের পর যুগ অপরিবর্তিত থেকেছিল কার্ল মার্কস তা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আদিম, সহজ, সরল উৎপাদন পদ্ধতি এবং যুগযুগান্তরব্যাপী একই রকম পুনরুৎপাদন ব্যবস্থা রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা ও রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয়ের সম্ভাব্য আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রধানতম হাতিয়ার হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। যদি প্রতিকূল শক্তির আঘাতে কোন গ্রামীণ সাম্প্রদায়িক সংগঠন ভেঙেও পড়ত, প্রায় সাথে সাথেই একই স্থানে একই রকম পূর্বতন সহজ, সরল, আদিম উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ব্যবস্থা গজিয়ে উঠত। শাসক বংশগুলির ক্রমাগত পরিবর্তন ও রাষ্ট্রশক্তির বারংবার

পতন-উত্থান সত্ত্বেও ভারতীয় তথা এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি তার নিজস্ব স্থবির, বৈচিত্রবিহীন স্বকীয়তা বজায় রেখেছিল।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির সামাজিক জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল না। ব্যক্তি-সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবার নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিরাজ করত। পরিবারগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও বর্ণ প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত। স্বায়ত্তশাসনের জন্য স্থানীয়ভাবে একত্রিত পরিবারগুলি গ্রামীণ সম্প্রদায় গঠন করত। খাদ্যগ্রহণ রীতি, বিবাহ পদ্ধতি, পেশা গ্রহণ ইত্যাদির ভিত্তিতে সংগঠিত পরিবারগুলির সম্মেলন অপরাপর পরিবারগুলির সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের নিয়মকানুন রচনা করে সংশ্লিষ্ট বর্ণ গঠন করত। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি এলাকাভিত্তিক ছিল, বর্ণ শুধুমাত্র গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ত। ব্যক্তিজীবনের উপর পরিবার, বর্ণ ও গ্রামীণ সম্প্রদায় আদর্শগত নিয়ন্ত্রণ কায়েম করত। ব্যষ্টিজীবন সমষ্টিগত জীবনের অধীন ছিল। ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমষ্টিগত জীবন-নির্ধারিত সীমানার মধ্যে সীমিত হয়ে পড়েছিল। ও'ম্যালী ঠিকই বলেছেন যে, গ্রামীণ সম্প্রদায় শুধুমাত্র আংশিকভাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরাজ করত। প্রধানত আর্থনীতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি ক্রিয়াশীল ছিল; কদাচিৎ প্রযুক্ত হলেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানটির উপর আইনানুগভাবে প্রয়োগ করার বিধান ছিল। বর্ণ ও পরিবারের উপর প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ ছিল না। ধর্মীয় ও প্রথাগত বিধিনিষেধের নিগড়ে বর্ণভুক্ত, পরিবারের অন্তর্গত সদস্যবৃন্দের জীবন সংবদ্ধ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্তও ভারতীয় ব্যক্তিজীবন গ্রামেও যেমন, শহরেও তেমন—শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবার, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শহরাঞ্চলের ব্যবসাবাণিজ্য সংঘ ও সমিতির প্রতি আনুগত্যের সাথে যূথবদ্ধ অনুরূপ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পরিচালিত হত। এক কথায় বলা চলে যে, ভারতীয় সমাজ ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত সমষ্টির নির্দেশ ও বর্ণের বিধানে প্রভাবিত থেকে ব্যক্তির উৎকর্ষকে জাগতিক উন্নতির নির্ণায়ক করে তুলতে বাধা দিয়েছিল।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও শহুরে অর্থনীতি

কেউ কেউ এরূপ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতবর্ষে পরিণত সামন্ততন্ত্র সীমিত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের সূচনার আভাস দিচ্ছিল। জওহরলাল নেহ্‌রু 'দি ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'-তে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি তখন অগ্রগতির ধারাপথ বেয়ে শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল।[১৬] মন্তব্যটি স্বদেশপ্রেমে রঞ্জিত হলেও তথ্যনির্ভরতার অভাবে অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। অথবা, এমন হতে পারে নেহ্‌রু শিল্পবিপ্লবের দোরগোড়া বলতে ফ্যাক্টরিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সম্ভাবনার পরিবর্তে শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে পরিচালিত ধনতান্ত্রিক কর্মশালার সূচনা বুঝেছিলেন। ব্রিটিশ আগমনের পূর্বেই বহু রকমের ভারতীয় শিল্পদ্রব্য শহরাঞ্চলের কর্মশালায় তৈরী হয়ে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব লগ্নের সূচনা করছিল। বয়নশিল্পে নিযুক্ত তাঁতীরা বস্ত্র বয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনা ও বস্ত্র তৈরী করার দিনগুলিতে সাংসারিক খরচ চালানর তাগিদে বণিকদের কাছ থেকে মূলধন ঋণ হিসাবে গ্রহণ করত। বণিকেরা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিশ্রুত বস্ত্র বা কাপড়ের সরবরাহ পেতেন, বয়নশিল্পীরাও ঋণকে প্রদেয় সম্পূর্ণ মূল্যের অগ্রিম হিসাবে বিবেচনা করতেন। ব্যবসায় লিপ্ত বা অর্থলগ্নীতে যুক্ত ব্যক্তিদের হাতে মূলধন জমা হচ্ছিল, কিন্তু দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কারিগরদের পক্ষে সঞ্চয়ের কোন পথই খোলা ছিল না। ভারতীয় হস্তশিল্পে বণিক মূলধন স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ; ফলশ্রুতিতে ব্যাপকভাবে পুনরুৎপাদন শ্লথগতি হয়ে পড়েছিল এবং প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। মহীশূরে ধনতান্ত্রিক সহযোগিতার প্রাথমিক শর্তগুলির ভিত্তিতে বয়নশিল্পের কর্মশালা গড়ে উঠেছিল। মজুরির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কর্মশালার শ্রমিক নিয়োগকারী মালিক-কারিগর মাসিক শতকরা দুই টাকা হারে বণিক ও মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারতেন। সরকারী শুল্কনীতিও বয়ন কর্মশালার প্রসারে সহায়ক ছিল। বঙ্গভূমিতেও বয়নশিল্পে অনুরূপ লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল। যে সকল সম্পন্ন তাঁতীরা শ্রমিক নিয়োগ করত তারা প্রায়ই বণিক ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে মুনাফা লুটত। ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের উন্নততর স্বরূপ এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে আত্মপ্রকাশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

হীরক, লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশপূর্ব ভারতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সূচনা ঘটেছিল।[20] লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন অবশ্য সমকালীন অনুরূপ ব্রিটিশ উৎপাদনের তুলনায় পরিমাণগত, গুণগত ও ব্যয়-সংক্ষেপের নীতিগত কারণে অনগ্রসর ছিল। তাছাড়া, ধনতান্ত্রিক কর্মশালার রীতিপদ্ধতি উৎপাদনের উচ্চতন পর্যায়েই সীমাবদ্ধ ছিল; আস্তকর্মশালা বা কৃষি এবং কর্মশালাগুলির কেনাবেচার সম্পর্ক ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির সাথে সাযুজ্য রচনা করে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প নির্দিষ্ট ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্র রচনা করতে পারেনি।

গুজরাটের বিখ্যাত জাহাজ তৈরীর আঙিনায় শ্রমবিভাজন নীতির উন্নত প্রয়োগ ঘটেছিল। একজন অভিজ্ঞ ব্রিটিশ মন্তব্য করেছিলেন যে, ঐ আঙিনায় ভারতীয়রা 'জাহাজ তৈরীতে যে কাঠ ব্যবহার করে তা ইউরোপে আমাদের জাহাজগুলির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হবে, কেননা ঐ কাঠের গুণে গুলীর আঘাত ফাটল সৃষ্টি করতে পারে না।'[21] কাগজ তৈরীর ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতির প্রাথমিক উদ্বোধন বেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে ও শেষভাগে কাশ্মীরে রেশম সূতো তৈরী ও বস্ত্র বয়নে অনুরূপ রীতিপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে উৎপাদনব্যবস্থার সীমিত ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাথমিক লক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশ লাভ করলেও সর্বভারতীয় কৃষি ও শিল্পোৎ-পাদনের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেগুলি বিকাশ লাভ করতে পারেনি। শহরের বণিক মূলধন বা শিল্পোৎপাদনের মুনাফাসঞ্জাত পুঁজির পক্ষে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভারসাম্য ভেঙে সর্বভারতীয় বাজার তৈরী করা সম্ভব ছিল না।

শহরের শিল্পগুলি মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল বলা যায়: ১. বিলাস-দ্রব্যসামগ্রী তৈরীর শিল্পগুলি রাজা বা নবাব পরিবারগুলি, অভিজাত শ্রেণী ও উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের চাহিদা মেটাতে ব্যাপৃত থাকত। বিদেশী চাহিদা মেটাতে এ ধরনের শিল্পগুলির অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ২. দ্বিতীয় বিভাগের শিল্পগুলি প্রধানত রাষ্ট্রীয় ও জনপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজন মেটাত। ৩. গলিত লৌহ, শোরা, ধাতু প্রভৃতি থেকে নানা ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরীর শিল্পগুলি স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজ করত।

শিল্পে নিযুক্ত শহুরে শ্রমিকেরা প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন: ক. স্বাধীনভাবে যারা শিল্পদ্রব্য তৈরীতে নিযুক্ত ছিলেন। খ. রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান বা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে যারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যাপৃত থাকতেন।

শিল্পবাণিজ্যের সাথে যুক্ত শহুরে শ্রেণীগুলির পক্ষে গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙ্গে ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটান সম্ভব হয়নি নানা কারণে। শেলভাঙ্কর তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন:

১. গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থ-সামাজিক জনজীবনের অভ্যন্তরীণ সংগঠনটি এমন সংহত, অনড ও শক্তিশালী ছিল যে, শহরাগত শিল্পদ্রব্যাদির পক্ষে ঐ দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ অতিক্রম করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

২. ভারতীয় কৃষির পক্ষে জলসেচ ও হরেক রকম সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এগুলি পরিচালনার জন্য ভূমি থেকে প্রাপ্ত কর আদায়ের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী প্রতিনিধি মোতায়েন করতে হত। কেন্দ্রগুলি প্রশাসনিক শহর হিসাবে গডে উঠতে থাকে। গ্রাম গ্রামই থেকে যায়।

৩. গ্রামের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত শোষণের উপর ভিত্তি করে রাজা-রাজডা, নবাব-বাদশাহ্ ও শহুরে অভিজাত ব্যক্তিদের বিলাস, আড়ম্বর, জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। গ্রামীণ এলাকার উপর কর আরোপের অধিকার তাঁরা কখনো হারাতে সম্মত ছিলেন না। শহরকেন্দ্র থেকে এই অধিকার প্রযুক্ত হয়ে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অর্থনীতির সম্ভাব্য প্রগতির কণ্ঠরোধ করত।

বার্ণিয়ার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয় শহরগুলি সামরিক কর্মকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কালক্রমে আর্থনীতিক বাজার ও শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে।

সতীশচন্দ্র মনে করেন, ভারতের মত একটি উপমহাদেশে শিল্পোৎপাদন বিকাশের একই রকম একটি প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল বলে ভাবা সত্যের অনুসারী নয়।[৪২] ইউরোপের মত ভারতেও শিল্পোৎপাদনের নির্দিষ্ট কতকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল: গুজরাট, মালাবার, করমণ্ডল এবং কিছু পরিমাণে বঙ্গদেশ। তাঁর মতে শহরাঞ্চলের শিল্পজ দ্রব্যসামগ্রীর গ্রামাঞ্চলে বিপণনের প্রতিবন্ধক হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উপস্থিতির তত্ত্বটি সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। বহুবিধ কারণের যোগসাজসে এই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

হয়েছিল : সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের শহর ও গ্রামের পাস্পরিক সম্পর্ক, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ, শিল্পোৎপাদনের সাংগঠনিক কাঠামো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অনগ্রসরতা, ভারতীয় বর্ণপ্রথা, বিদেশী ধ্যানধারণার প্রতি বিরূপতা এবং যুক্তিবাদের প্রতি হেঁয়ালিপূর্ণ নিস্পৃহতা ভারতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের সম্ভাবনাকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

কে. এন. চৌধুরী মনে করেন ব্রিটিশপূর্ব ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার যে বিশেষ অগ্রগতি ঘটেনি তার কারণ বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণরত ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় বস্ত্রসম্ভারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মান, উৎকর্ষ ও সুলভ মূল্যের কথা বলা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক বিবেচনা না করায় শিল্পজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতীয় সম্পত্তিবান ব্যক্তিরা এবং বিশেষ করে বণিকেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণে উৎসাহ বোধ করেননি। যখনই প্রতিযোগিতার আঘাতে স্বার্থহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখনই সংশ্লিষ্ট ভারতীয়রা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে আগ্রহী হয়েছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরী উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ বস্ত্রকলগুলির প্রতিযোগিতায় জর্জরিত ভারতীয় শিল্পপতিদের বিদেশী প্রযুক্তিবিদ্যার সাগ্রহ আমদানির কথা উল্লেখ করেছেন।[23]

সোভিয়েত সমাজবিজ্ঞানী ভি. আই. পাভলভ্ ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ধনতান্ত্রিক অগ্রগমনের অনতিক্রম্য বাধা হিসাবে একদিকে ভারতীয় শহরগুলির জনসমষ্টির বিশেষ বিভাগগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অপরদিকে ঐ বিভাগগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জমির উপর ধার্য খাজনা সংগ্রাহকদের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

সমকালীন ভারতীয় শহরগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেত : ১. প্রশাসনিক শহর—যেখানে, রাজা, বাদশাহ্, নবাব, রাজকুমার, অভিজাত সম্প্রদায়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সামরিক কর্তাব্যক্তিরা থাকতেন। শহরটি রাজধানী হলে সেখানে প্রধান সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠত। গায়ক, স্থপতি, চিত্রকর, কবি, সাহিত্যিক, নর্তক-নর্তকী প্রভৃতি সহায়ক সামাজিক গোষ্ঠীভুক্ত লোকজনেরা বিত্তবান শহরবাসীর আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক চাহিদা চরিতার্থ করতে নিযুক্ত থাকতেন। ২. ধর্মীয়

শহর—বেনারস, মথুরা, বৃন্দাবন, পুরী, নাসিক, তিরুমালাই, কালীঘাট প্রভৃতি কেন্দ্রগুলি ধর্মপ্রাণ তীর্থযাত্রীদের নিত্য আনাগোনায় মুখর হয়ে উঠত। তীর্থযাত্রীদের সেবাকর্মে নিযুক্ত একটি জনসমষ্টি এ সকল শহরে পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করতেন। ৩. বাণিজ্যিক শহর—সমুদ্রোপকূলে, নাব্য নদীর তীরে বা বাণিজ্যপথের ধারে গড়ে উঠত। একমাত্র বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী বন্দরনগরগুলি ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের শহরগুলির অস্তিত্ব জমির উপর ধার্য করের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। এই শহরগুলি প্রকৃতির দিক থেকে পরগাছাসুলভ ছিল বলা যায়। বিদেশী ভোগ্যপণ্যক্রেতা বা জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল স্বদেশী বিত্তবান গোষ্ঠীর চাহিদা মেটাত ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের প্রাথমিক সূচনায় যেসব পণ্যসামগ্রী চিহ্নিত ছিল সেগুলিই সর্বপ্রথমে ব্রিটিশ ফ্যাক্টরিতে প্রস্তুত সুলভ পণ্যসম্ভারের প্রতিযোগিতায় পিছু হঠে কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এন. কে. সিন্‌হা দাবি করেছেন যে, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশের শহরগুলিতে সাধারণ পৌরজীবনের উদ্ভব সম্ভব হয়নি।[24] এমন কি বিশাল শহরগুলিও বর্দ্ধিত কলেবর গ্রাম ছাড়া আর কিছু ছিল না। যাঁরা ঐ শহরগুলিতে বসবাস করতেন তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের কথা ভাবতেন। শহরে অভিজাত কোন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল না। শহরে স্থায়ী বসবাসকারী বিত্তবান বণিকদের কোন গোষ্ঠী দেখা যেত না। সংঘবদ্ধ নগর বা শিল্পের জননী শহরের অস্তিত্ব ছিল না। নগর-গুলিতে মধ্যবিত্ত কোন শ্রেণী বিরাজ করত না।

সাধারণভাবে শ্রীযুক্ত সিন্‌হার বক্তব্য সঠিক বলে প্রতিভাত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি অত্যন্ত স্থূলাকৃতি তুলির টানে বক্তব্য সাজিয়েছেন। বঙ্গদেশের শহরগুলির স্থায়ী, নির্দিষ্ট কোন জনসংখ্যা ছিল না এমন নয়; শ্রমিক, কারিগর, বণিক, মহাজন পরিবারগুলি স্থায়িভাবে শহরগুলিতে বসবাস করতেন। অভিজাত পরিবারগুলি, বিশেষ করে সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা, তাঁদের অধীনস্থ লোকজন ও ভৃত্যদের সঙ্গে নিয়ে সামরিক উত্থান-পতন ও স্থানীয় শাসকের বিত্তবৈভব বা সম্পদহানির নিরিখে নিজেদের স্বার্থ বিচার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করতেন। শহরগুলির 'ভাগ্য-লক্ষ্মী' সামরিক জয়-পরাজয় ও শাসকের বিত্ত-সম্পদের হদিশ রেখে অধিষ্ঠান করতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অগ্রসর অঞ্চলের শহুরে অর্থনীতিতে ও সমাজজীবনে পুরোন সম্পর্কের পাশাপাশি পরিণত সামন্তবাদী সমাজের ভূসম্পত্তি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য এবং হস্তশিল্পে সামাজিক শ্রমবিভাগ বিকাশ লাভ করেছিল। ভারতীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনের নির্দিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা দিলেও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির আবির্ভাব সুদূরপরাহত ছিল।

প্রাচীন ভারতের আর্থনীতিক-রাষ্ট্রনীতিক জনজীবন সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব

১. প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে ভারতের সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থার অনগ্রসরতা ও স্থবিরতার একটি তত্ত্ব ক্রমশ স্বীকৃতি পেতে শুরু করে। তত্ত্বটির মূল বক্তব্য ছিল এই: রাষ্ট্রশক্তি ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির উদ্বৃত্ত ফসল খাজনা হিসেবে আত্মসাৎ করে কৃষি অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। অন্যদিকে, উদ্বৃত্ত ফসলের মূল্য রাষ্ট্রের শাসকশক্তির জাঁকজমক, আড়ম্বর ও বিলাসব্যসনের ব্যয়ভার মিটিয়ে আর্থনীতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। সাথে সাথে ধর্মের অনুশাসন শাসকশক্তিকে ঐশ্বরিক ঘোষণা করে জনসাধারণকে অবিমিশ্র আনুগত্য শিখিয়ে স্বৈরতন্ত্রের দীর্ঘস্থায়ী বনিয়াদ রচনা করেছিল।

প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্বটি অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মন্টেস্কুর লেখায় স্বীকৃতি লাভ করে। ভলটেয়ার অবশ্য তত্ত্বটির সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। জেম্‌স মিলের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের নেপথ্যে তত্ত্বটির যথার্থতা সম্পর্কে বিশ্বাস আগাগোড়া লক্ষ্য করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রনীতিক অর্থনীতি সম্পর্কে রিচার্ড জেমসের যে বইটি হাইলেব্যারি কলেজে পড়ান হত তাতে তত্ত্বটি নির্ভুলতার 'সার্টিফিকেট' লাভ করেছিল। প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্তও তত্ত্বটিকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিলেন। আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রয়োগে বিশ্বাসী কার্ল মার্কস স্থবির পরিবর্তনবিহীন এশীয় সমাজ ও প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের রূপকল্পটির প্রভাবমুক্ত

ছিলেন না।[25] তাঁর 'এশীয় উৎপাদন পদ্ধতি' সংক্রান্ত 'মডেল' বা নমুনাটি এশীয় সমাজের অনড় অবস্থার চিত্রটিকে মূর্ত করে তোলে।

প্রাচীন ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কে মার্কসের চিন্তাভাবনা অনুসরণ করে একটি দ্বৈত সাংগঠনিক রূপের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হওয়া যায়। মার্কসের চিন্তাকে সমকালীন সমাজবিজ্ঞানের কেতাবী ভাষায় প্রকাশ করলে এরূপ বলতে হয় যে, ব্যষ্টিগত সমধর্মী সংগঠনগুলির (গ্রামীণ সম্প্রদায়) ঐক্যের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত হয়েছিল সমষ্টিগত সংগঠনটি (প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র)। এরূপ দ্বৈত আর্থ-সামাজিক সংগঠনটি পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ সামাজিক শ্রমবিভাগের একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রতিটি ব্যষ্টিগত সংগঠনে এই শ্রমবিভাগ ক্রিয়াশীল ছিল (কৃষি—হস্তশিল্প), আবার সামগ্রিকভাবে সমষ্টিগত সংগঠনটিতেও তা বর্তমান ছিল (জমির উপর ধার্য ভূমিকর ও তা পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে)।[26] সামাজিক ও আর্থনীতিক স্থিতাবস্থা জনজীবনে স্থবিরতা সৃষ্টি করেছিল। জরাগ্রস্ত চিন্তাভাবনা ও কুসংস্কার ব্যক্তিমানুষের উদ্যমকে অবরুদ্ধ করেছিল। ভারতীয় ধর্ম নিষ্ক্রিয়তা শিখিয়ে ও নগরজীবনের অভাব স্থবিরতার প্রশ্রয় দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের দার্শনিক এবং আর্থনীতিক ভিত্তি রচনা করেছিল।

মার্কস মনে করেছিলেন যে, প্রাচীন গ্রামীণ সম্প্রদায়ের উৎস থেকে 'ঊর্ধ্ব ও নিম্নগামী বহুতর বিচিত্রগামী আবেগমথিত প্রেরণা' আর্থ-সামাজিক জনজীবনকে সংবদ্ধ করে স্থবিরত্বে ধিকৃত করেছিল। নিম্নগামী প্রেরণায় ব্যক্তিমানুষ ব্যষ্টি সংগঠনে সৃজনশীলতা সৃষ্টিতে অক্ষম হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থবিরতায় লাঞ্ছিত হয়েছিল। আর সমষ্টিগত সংগঠন ঊর্ধ্বগামী প্রেরণায় স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। ১৮৫৩ সালের একটি নিবন্ধে মার্কস লিখেছিলেন যে, 'আপাতদৃষ্টিতে অমঙ্গলকর হিসাবে প্রতিভাত না হলেও তথাকথিত গ্রামীণ ব্যবস্থা প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে সর্বদা কাজ করেছিল,... ক্ষুদ্রতম পরিমণ্ডলে মানুষের মনকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল।'[27] এঙ্গেল্‌স অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের পরিবেশে সামন্তযুগীয় অবস্থা থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব ছিল না। সঞ্চয় গড়ে ওঠার পথরোধ করে ঐ স্বৈরতন্ত্র আর্থনীতিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছিল।

২. আর্যশ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দশকগুলিতে ভারতীয় জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ 'কালোত্তীর্ণ' ভারতীয় গ্রামীণ ব্যবস্থাকে আদর্শ সমাজ-সংগঠন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তীব্র স্বদেশপ্রেমের মোহাবেশ ভারতীয় সবকিছুকে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—বরনীয় করে তোলে। আর্যসমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় সংগঠন, অর্থনীতি, বর্ণাশ্রম কোন কিছুই প্রগতিবিরোধী বলে তাঁদের মনে হয়নি। তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায় আর্য সমাজের সব কিছু নিষ্কলুষ, প্রগতিশীল ও মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

এমন কি উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের অনেকে এবং পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বহু বুদ্ধিজীবী ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থনে আর্যশ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বকে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল এই : ইন্দো-ইউরোপীয় আর্যসভ্যতার জন্মদাতা দুই ভ্রাতা সহস্র সহস্র বৎসর বিচ্ছিন্ন থেকে ব্রিটিশ শাসনে পুনর্বার মিলিত হয়েছে। ভারতবাসী ও ব্রিটিশ ঐ দুই ভাই ![২৪]

ব্রিটিশপূর্ব ভারতের আর্থ-সামাজিক জনজীবনের মূল্যায়নে নিয়োজিত দুটি তত্ত্বই—প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র ও আর্যশ্রেষ্ঠত্ব—যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ, তথ্য এবং সমীক্ষালব্ধ ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রথম তত্ত্বের উদ্ভাবকেরা প্রাচ্য দেশগুলিতে ভূসম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি ঘোষণা করে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতি সুবিচার করেননি। ভারতের ক্ষেত্রে গুপ্তযুগে বা পরবর্তীকালে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করা যায়। প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তাত্ত্বিকেরা রাজতন্ত্রের স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তর ব্যাখ্যায় ধর্মের গুরুত্বকে তথ্যনির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ভারতীয় ধর্ম রাষ্ট্রনীতিক কর্তৃত্বকে স্বৈর ক্ষমতায় নিরঙ্কুশ করে তুলেছিল বলাই যথেষ্ট নয়; উভয়ের গভীর, নিবিড়, জটিল সম্পর্কটি অনুধাবন করা একান্ত জরুরী। 'ইহবিমুখ, মায়াবাদী, ভোগবিলাসী এবং জীবজন্তু পূজামত্ত' ভারতীয় ধর্ম ভারতীয় জীবনকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল ও স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির সমর্থনে ক্রিয়াশীল ছিল—এরূপ বক্তব্য আংশিক সত্যে বিধৃত হলেও সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশে ব্যর্থ। ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ভারতে বহুবার রাষ্ট্র-

শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছিল। ভারতীয় সমাজে সর্বত্যাগী সাধক, সাধু, মহাপুরুষদের ভূমিকা স্বৈরতন্ত্রের সহায়ক হিসাবে প্রতিভাত হয়নি।

নগরীকরণের অভাব ও গ্রামীণ জীবনের সর্বব্যাপী অস্তিত্ব ভারতীয় আর্থনীতিক জীবনকে স্থবির রেখে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রশক্তির সেবাদাসে পরিণত করেছিল বলে যে মত প্রচলিত আছে তা-ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের বিরোধী। মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, খ্রীস্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব থেকে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে-ওঠা দ্বিতীয় পর্যায়ের লৌহভিত্তিক সভ্যতার নগরগুলি এবং দক্ষিণ ভারতের বন্দরনগরগুলি প্রাচীন ভারতের নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার সাক্ষ্য দেয়, গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার নয়।

প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্র ও আর্যশ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব উভয়ই মতাদর্শগত বক্তব্য উপস্থাপনে যতটা আগ্রহী তার চেয়ে ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহে অনেক কম যত্নবান। আর্যশ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্বটি প্রাচীন ভারতের জনজীবনের সামগ্রিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণের চাবিকাঠির হদিশ না পেয়ে দিকভ্রান্ত; প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্বটি পর্যাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্যের সমর্থন না খুঁজে অসম্পূর্ণতা-দোষে দুষ্ট।

'হিন্দু নৈতিকতা' ও আর্থনীতিক উদ্যোগ: ওয়েবারের বিশ্লেষণ

প্রোটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পিউরিটান ক্যালভিন-অনুসারী শাখার অভিজ্ঞতা থেকে ম্যাক্স ওয়েবার সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, বিশেষ কোন ধর্মবিশ্বাসের রূপের সাথে আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল বিশেষ ধরনের প্রত্যয় ও উদ্যমের নিবিড় সংযোগ আছে। ক্যালভিনের মানবমুক্তির উপায় নির্ণয়ের প্রয়াস কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্রের মাধ্যমে ব্যবসাবাণিজ্য এবং ধনতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদনের চেতনার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় ওয়েবার তাঁর 'প্রোটেস্টান্ট এথিক্ অ্যাণ্ড দি স্পিরিট অফ ক্যাপিটালিজম' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করে চীন ও ভারত সংক্রান্ত গবেষণায়, ওয়েবার ইউরোপীয় শিল্পোদ্ভূত ধনতন্ত্রের অনুরূপ কোন বিকাশধারা অনুপস্থিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। ধনতান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের অনুকূল প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার অনুরূপ কোন ধর্মীয় নৈতিকতার অনুমোদন তিনি হিন্দু বা বৌদ্ধধর্মের মধ্যে খুঁজে পাননি। এরূপ নৈতিকতার অভাব তিনি হিন্দুধর্মের অযৌক্তিকতার ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন। হিন্দুধর্মের

অযৌক্তিকতার লক্ষণ হিসাবে তিনি বর্ণব্যবস্থা, কর্মফল সংক্রান্ত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা, পুনর্জন্মবাদ, অতিরিক্ত বিধিনিষেধ, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস ও ইহলোক-বিমুখ মানসিকতার উল্লেখ করেছেন।[২৭]

ইউরোপীয় ও ভারতীয় অবস্থার তারতম্য নির্ণয়ে ওয়েবারের যুক্তির ধারাটিকে নিম্নলিখিতভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:

১. আর্থনীতিক কর্মকাণ্ডে উদ্যোগ গ্রহণ বা অনীহা উভয় ক্ষেত্রেই সমাজ-ব্যবস্থার ফলশ্রুতি। তাঁর মতে প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ আত্মা বা চেতনা বর্তমান থাকে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এই আত্মা বা চেতনাকে তিনি প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতা এবং ধনতন্ত্রের অন্তরাত্মার বেদীতে সংস্থাপিত করেছেন, আর ভারতের ক্ষেত্রে হিন্দু নৈতিকতা ও হিন্দু চরিত্রের ভিত্তিভূমিতে।

২. ইউরোপীয় ক্ষেত্রে ক্যালভিনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা বা সমর্থনের কাজে নিয়োজিত না হয়ে ভাবী পুনর্গঠিত সমাজব্যবস্থার আবাহনে নিয়োজিত ছিল। অপর দিকে, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমকালীন বর্ণভিত্তিক, ঐতিহ্য অনুসারী সমাজব্যবস্থার সমর্থনে নিয়োজিত ছিল।

৩. ব্যক্তির আচরণ, উদ্যোগ ও অভীপ্সার উপর ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব নিরূপণের জন্য ওয়েবার উভয় ক্ষেত্রে আদর্শ প্রতিরূপ নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ইউরোপের ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক যে আদর্শ প্রতিরূপটি তিনি গড়ে তুলেছিলেন তা ক্যালভিনীয় ব্যক্তিত্বের অনুসারী। আর, ভারতের হিন্দু ব্যক্তিত্বের আদর্শ প্রতিরূপ গড়ার সময় তিনি ধর্মশাস্ত্রীয় পুঁথিপত্র ও ইউরোপীয় ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

৪. ধর্মীয় আদর্শ ও সমাজব্যবস্থার সম্পর্কের পারস্পরিক কার্য-কারণ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বৈত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হলেও ওয়েবার অর্থনীতির উপর ধর্মীয় আদর্শের স্বাধীন প্রভাব প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন। বিশ্বাসীদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটিয়ে গতিশীল ধর্মীয় আদর্শ সমাজব্যবস্থার কিরূপ রূপান্তর ঘটায় ওয়েবার ইউরোপীয় ক্ষেত্রে তা সপ্রমাণ করেছেন। অন্যদিকে, ধর্মীয় আদর্শের রক্ষণশীল প্রভাব ঐতিহ্যবাদী ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে তিনি নিরূপণ করেছেন।

ওয়েবারের বিশ্লেষণ অনুসরণ করলে এরকম একটি ধারণার দুয়ারে উপনীত হতে হয় যে, ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক বিকাশ, যুগোপযোগী সমাজ সংস্কার ও

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তনের জন্য ভারতের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাস, পুনর্জন্মের তত্ত্ব, মায়াবাদ, চক্রাকার যুগপরিবর্তনের ধর্মীয় তত্ত্ব এবং অসংখ্য আচার-আচরণবিধির অনুশাসন পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। কর্মফলের তত্ত্ব ও বর্ণপ্রথাকে ওয়েবার আর্থনীতিক উন্নতির প্রধানতম অন্তরায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মার্কসকে প্রতিধ্বনিত করে, কিন্তু সাম্যবাদী ইসৃতেহারের সাথে অনৈক্য ঘোষণা করে, ওয়েবার লিখেছিলেন, 'কর্মের তত্ত্ব বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে যুক্তিগ্রাহ্য নৈতিকতা-নিরূপিত সুশৃঙ্খল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রূপান্তরিত করেছিল। এই তত্ত্ব ইতিহাসে অদ্যাবধি রচিত সর্বাপেক্ষা সুসমঞ্জস ধর্মশাস্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। জ্ঞানালোকের এরূপ পটভূমিতে, সাংগঠনিক এরূপ ব্যবস্থাতেই একমাত্র ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর অভিশপ্ত অবস্থান অর্থবহ হয়ে ওঠে। এরই ফলশ্রুতিতে তাঁর আচরণ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সাম্যবাদী ইসৃতেহার এরূপ শব্দগুচ্ছের ব্যবহারে সমাপ্ত হয়েছে যে, তাদের (সর্বহারাদের) শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই, জয় করার জন্য তাদের রয়েছে একটি পৃথিবী। নিম্নবর্ণের ধার্মিক হিন্দুর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। সে-ও জয় করে নিতে পারে পৃথিবীকে, এমন কি স্বর্গীয় জগতকে ; সে ক্ষত্রিয় হতে পারে, ব্রাহ্মণ হতে পারে, স্বর্গলাভ করতে পারে এবং ভগবান হয়ে উঠতে পারে—তবে বর্তমান জীবনে নয় কিছুতেই, একই ছাঁচের জগতে পুনর্জন্মের পর ভাবী জন্মে।'[১০] ওয়েবার এরূপ বিশ্লেষণ থেকে দ্বিবিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন : কর্মফলের তত্ত্বে নোঙর-করা বর্ণপ্রথার রীতিপ্রকরণের উপর নির্ভরশীল ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থাকে অর্থনীতির যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কারের মাধ্যমে ধ্বংস করা অসম্ভব ; আবার উল্টো দিকে, অর্থনীতিকে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে সংস্কৃত করাও ঐতিহ্যবাহী, আচার-অনুষ্ঠাননির্ভর সমাজব্যবস্থায় অসম্ভব।

হিন্দু নৈতিকতার মনস্তাত্ত্বিক ফলাফলকে ওয়েবার সম্পূর্ণ নেতিবাচক ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন ; তাঁর মতে হিন্দুধর্ম নিষ্ক্রিয়তা, ইহজগৎ বিমুখতা, হতাশা, দুর্বোধ্য হেঁয়ালিপনা ও কর্মফলের অমোঘতা শিক্ষা দিয়ে ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক কর্মোদ্যোগ গ্রহণের কার্যকরী বিরোধিতা করেছে।

বাস্তব ঘটনা ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ওয়েবারের তত্ত্ব সমর্থন করা দুরূহ। ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগের উপর ধর্মীয় নৈতিকতার প্রভাব নির্ণয়ে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিত মহলে প্রচলিত শব্দ 'আত্মা' বা 'চেতনা' বারবার ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালে ঐ শব্দের ব্যবহার অভিপ্রেত মনে হয়

না, পরিবর্তে নৃতাত্ত্বিক 'সাংস্কৃতিক বহিরাকৃতি', 'ব্যক্তিত্বের মৌল সংগঠন' বা 'সাংস্কৃতিক চরিত্র' ইত্যাদির ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। ওয়েবারের ভারত সংক্রান্ত রচনায় স্বজাতিকেন্দ্রিক ধ্যানধারণার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা ঠিক, তিনি হিন্দুধর্মের দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক দিকগুলি হিসাবের মধ্যে না এনেও স্বনির্বাচিত ধর্মীয় পুঁথিপত্র ও ইউরোপীয় ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির আদর্শ একটি প্রতিরূপ রচনায় নিঃসন্দেহে সফল হয়েছিলেন। তাঁর সূত্রগুলির ভিত্তিতে ঐ প্রতিরূপ রচনা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।[31]

দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে ঐ প্রতিরূপ ধ্রুব হয়ে থাকবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ওয়েবার নিজেই বলেছেন, অভিজাত গৃহে শ্রম ও সেবার সমাবেশের মতই কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের বিপুল সমাবেশের মুখে পড়ে বর্ণপ্রথার নিয়মকানুন প্রয়োজনমত শিথিল হয়েছে। উচ্চবর্ণের লোকদের সেবায় নিযুক্ত গৃহভৃত্যরা ধর্মবিধি অনুযায়ী অস্পৃশ্য বিবেচিত হয়নি, পরিচ্ছন্ন বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে। কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্র বর্ণনির্বিশেষে সকল নরনারীর ব্যবহারে ধর্মীয় বাধানিষেধ না থাকায় 'কারিগরের হাত সর্বদাই পরিষ্কার' প্রবাদটির উৎপত্তি ঘটেছে। বর্ণব্যবস্থা ব্যবহারিক প্রয়োজনে ভারতবর্ষে শিথিল থেকেছে, আবার পুঁথিপত্রের শাস্ত্রীয় বিধানে অনড় থেকেছে। অর্থাৎ, ওয়েবারের মতে বর্ণব্যবস্থা স্থিতিস্থাপকতার গুণে সমৃদ্ধ হয়ে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

সীমিত সংখ্যক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে ওয়েবার হিন্দু নৈতিকতার স্বরূপ নির্ধারণে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার উপদেশ তিনি উপলব্ধি করেননি। নিষ্ঠাভরে নিষ্কামভাবে দৈনন্দিন কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে গৃহী, নারী ও শূদ্ররাও মোক্ষলাভ করতে পারে বলে গীতায় ঘোষণা করা হয়েছে। তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী ও বহু জাতীয়তাবাদী নেতারা পরবর্তীকালে প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার অনুরূপ একটি নৈতিকতার সন্ধান গীতায় খুঁজে পেয়েছেন এবং ঐ নৈতিকতাকে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কর্মদর্শনের চালিকাশক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ভারতবর্ষের কুর্গ অঞ্চলে বর্ণপ্রথার উপর সমীক্ষা চালিয়ে এম. এন. শ্রীনিবাস সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকদের জীবনযাত্রার অনুকরণ করে উচ্চবর্ণসুলভ গুণাবলীর

অধিকারী হতে সচেষ্ট।[32] নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণের গুণাবলীতে উত্তরণ-প্রক্রিয়ার নামকরণ তিনি করেছিলেন সংস্কৃতায়ন। পরবর্তী বহু সমীক্ষায় স্বয়ং শ্রীনিবাস ও অন্যান্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। আবার, নিম্নবর্ণের মানুষের সামাজিক জীবন উচ্চবর্ণের মানুষদের যুগে যুগে প্রভাবিত করেছে তা-ও তাঁরা দেখেছেন।

বর্ণপ্রথা ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় শুধুমাত্র স্থবিরতার শক্তিকে জোরদার করেছে এমন নয়। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে বর্ণপ্রথার ক্রিয়া ও গতিপ্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বলা যায়, হিন্দুধর্ম সামন্তবাদী পরিবেশে ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগের ভাবী সম্ভাবনার প্রতিকূল শক্তি হিসাবে যেমন একদিকে কাজ করেছে, আবার আর্থ-সামাজিক স্থবিরতার নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায়ও সন্ধান করেছে।

বিবেকানন্দ, দয়ানন্দের শিক্ষা ও মতামত হিন্দু নৈতিকতার আমূল সংস্কারে নিয়োজিত ছিল। ব্যক্তিমানুষের সংস্কারমুক্ত, নির্ভয় কর্তব্যপালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাঁরা হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্কারসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে তাঁদের শিক্ষা হিন্দুধর্মের 'বুর্জোয়া সংস্কার' ও ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগের অনুসারী জীবনদর্শন প্রবর্তনে কতটা সক্ষম হয়েছে তা আজও বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। এই কারণে ওয়েবারের তত্ত্বের মূল্যায়ন ভারতীয় পরিস্থিতিতে আজও অপ্রাসঙ্গিক নয়।

জাতীয় চেতনার অভাব

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় ক্লাইভ মন্তব্য করেছিলেন যে, পলাশী যুদ্ধের সময় দর্শক হিসাবে সমবেত কয়েক শত-সহস্র দেশীয় মানুষের 'যদি ইউরোপীয়দের ধ্বংস করার ইচ্ছা থাকত তবে তারা তা লাঠি আর পাথরের ঢিল ছুঁড়ে সমাধা করতে পারত।' এই মন্তব্য থেকে ঐতিহাসিক ডঃ নিমাইসাধন বোস সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তখন সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল।'[33] ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক একই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে সমকালীন ভারতে ভারতীয় কেউ ছিলেন না, ছিলেন বাঙালী, শিখ, রাজপুত,

মারাঠা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী বাসিন্দা। 'তাঁদের দৃষ্টি নিজেদের প্রদেশের দিগন্তের ওপারে বিস্তৃত হত না; তখনকার দিনগুলিতে ভারতবর্ষ বলে কোন দেশের ধারণা ছিল না।'[34] মার্কসবাদী বিশ্লেষণে বিশ্বাসী সমাজ-বিজ্ঞানী এ.আর. দেশাই মনে করেছেন, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে রূপ ও পরিধির বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতিতে জাতীয় চেতনার কোন স্থান ছিল না। তিনি বলেছেন, তখন জাতীয়তাবাদ তথা জাতীয় সংস্কৃতি উদ্ভবের অনুকূল বস্তুগত বা চেতনাগত ভিত্তির অভাব ছিল। বস্তুগত ভিত্তি বলতে তিনি সর্বভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের কথা বলেছেন, আর চেতনাগত ভিত্তি বলতে এ ধরনের অস্তিত্ব সম্পর্কে চৈতন্যের উপস্থিতি বুঝিয়েছেন।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে ব্রিটেনের বণিকশ্রেণীর মূলধন এক পকেট থেকে যাত্রা করে পশম প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের পসরা নিয়ে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ করে অন্য পকেটে মুনাফা নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে বণিক মূলধনের ক্রমবৃদ্ধি বণিকশ্রেণীকে ক্ষমতাবান করে তুলতে থাকে। সামন্তপ্রভুদের দাপটের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বণিক ধনতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি শিল্পোৎপাদন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিলে বণিক মূলধন উপনিবেশগুলি থেকে সুলভে কাঁচামাল এনে ফ্যাক্টরি শিল্পে সেগুলিকে শিল্পজাত পণ্যে রূপান্তরিত করে স্বদেশে ও উপনিবেশগুলির বাজারে অর্জিত বিক্রয়লব্ধ মুনাফার পাহাড় গড়তে লেগে যায়। শিল্পসমৃদ্ধ ধনতন্ত্র বণিক ধনতন্ত্রের অপসারণ কায়েম করে শিল্পায়নের উৎসমুখ খুলে দেয়। কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্য যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থা গড়ে তোলে; ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক বাজার গড়ে উঠতে থাকে। নূতন নূতন শিল্পনগরের আবির্ভাব গ্রামীণ জীবনের রূপান্তর ঘটাতে থাকে। সামরিকবাহিনী, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, প্রশাসন ইত্যাদির উপর ধনিকশ্রেণী নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে সামন্তশ্রেণীকে পিছু হঠতে বাধ্য করে। সমাজে নূতন নূতন শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে। নূতন শ্রেণীগুলি আর্থ-সামাজিক সুযোগসুবিধাগুলি ভোগের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজের অংশীদার হয়ে পড়ে। ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে একই রাষ্ট্রীয় পতাকার নীচে বিভিন্ন শ্রেণীগুলি সমবেত হয়, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংঘবদ্ধ হয়। এই সংঘবদ্ধতা জাতীয়তাবাদের বন্ধন নিবিড়তর করে আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক প্রগতির পথ সুগম করে।

ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে পশ্চিমী দেশগুলির মত ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটেনি ; ভিন্নতর পরিবেশে বিচিত্রতর শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার দিগন্ত দৃশ্যমান হয়েছে। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর পক্ষে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্ন বিলম্বিত করা সম্ভব হয়েছিল এবং জন্মের পরেও স্বৈরতন্ত্রী অভিভাবকত্বে দীর্ঘকাল নবাগতকে নিয়ন্ত্রণ করা গিয়েছিল। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী, বিশেষ করে সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে, ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত শ্রেণীগুলির সাথে আপোষরফা করে জাতীয়তাবাদী শক্তির উন্মেষের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থবহ যে সীমিত শিল্পায়ন ঘটেছিল তা-ই ভারতীয় আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর পিতৃত্বের অধিকারী। এই শ্রেণী বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে জন্মগ্রহণ করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে সচেতন কৈশোরে পদার্পণ করে। কৃষিপ্রধান ভারতে শিল্পায়ন শুরু হলে 'পেটি-বুর্জোয়া' শ্রেণী বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী শ্রেণীগুলির মধ্যে বিরাজ করে স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধিতে উঠে পড়ে লাগে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশায় নিযুক্ত হয়ে সারা ভারতে নূতন একটি শহুরে সামাজিক সমস্বার্থ গোষ্ঠী গড়ে তোলে। কৃষিক্ষেত্রে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর অবস্থান সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষুদ্র গণ্ডী পেরিয়ে শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলে ঔপনিবেশিক ভারতে বিচিত্র শ্রেণীবিন্যাসের চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়।

ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের ফলে ভারতীয় আধুনিক শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয়। সামন্তবাদী শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলির দ্বন্দ্বসংঘাত তীব্রতর হয়। আবার, গ্রাম-নগর, উন্নত-অনুন্নত অঞ্চল, ইত্যাদি নানা ধরনের পারস্পরিক স্বার্থসংঘাতের উদ্ভব ঘটে। সর্বোপরি, শোষক-শোষিত নির্বিশেষে ভারতীয় সকল শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর মৌল স্বার্থসংঘাত উপস্থিত হয়। আর্থনীতিক স্বার্থের প্রয়োজনে ভারতীয় শ্রেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে যূথবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে গ্রানাইট ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করে। তাছাড়া, ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীগুলি সর্বভারতীয় চরিত্রে বিধৃত হয়ে শোষক ও শোষিতদের সংগ্রামকে জাতীয় স্তরে উন্নীত করে। প্রদেশ, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির বিভেদ শ্রেণীস্বার্থের আঘাতে দুর্বল হতে শুরু করে।

সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ ব্রিটিশ আমলে ত্বরান্বিত হয়েছিল। কিন্তু ঐরূপ বিকাশের পূর্বে ভারতীয়দের স্বদেশপ্রেম বা সংগ্রামের কোনরূপ ঐতিহ্য ছিল না এমন নয়। স্বদেশের ধারণাটি এবং সংগ্রামের আদর্শ ও রীতিনীতি দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনকালে যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। ধনতন্ত্রের জন্মের পূর্বে পশ্চিমী দেশগুলিতে যেমন জনসাধারণ অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদিতে বিভক্ত থেকে গোষ্ঠী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বীরোচিত সংগ্রাম করেছিল, ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতেও ঐ ধরনের নানা গোষ্ঠী অনুরূপ চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাব প্রদর্শন করেছিল। জাতীয় অর্থনীতি, আধুনিক সংযোগব্যবস্থা ও যুগোপযোগী শিক্ষার ফলে পশ্চিমী দেশগুলিতে যেমন, ভারতেও তেমন, গোষ্ঠী চেতনা জাতীয় চেতনায় সম্প্রসারিত হয়। ভারতে এই ধরনের সম্প্রসারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নানা ধরনের বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল: আন্তর্গোষ্ঠী বিরোধে উস্কানি দিয়ে জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিকাশ শ্লথগতি করে দিতে তৎপর ছিল। তা সত্ত্বেও ভারতীয় নিম্নবর্গের জনসাধারণ ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল। এই সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, ঔপনিবেশিক দমনপীড়ন, অর্থনীতির রূপান্তর, শিক্ষাবিস্তার, পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি ভারতবাসীর চিন্তা ও কর্মের জগতে জাতীয় চেতনার দিগন্ত উন্মোচিত করে।

৩ ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর

ব্রিটিশপূর্ব ভারতের কৃষিব্যবস্থা

প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে ভূমির মালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের অধিকার অজানা ছিল এমন নয়। তাম্রপত্র, খোদিত বয়ান, দলিল-দস্তাবেজ ও বংশতালিকায় রাজানুগ্রহে ভূমিস্বত্ব লাভের এরূপ বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহাসিকদের সাধারণ মতৈক্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে কৃষিজমিতে **'ব্যক্তিমালিকানার প্রয়োগ সার্বজনীন নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল মাত্র।'** আবার, ঐ মালিকানা শুধু সংশ্লিষ্ট জমির ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ও ভোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তত্ত্বগত দিক থেকে নবাব, নৃপতি, রাজা, বাদশাহ্‌রাও রাজ্য বা সাম্রাজ্যের কৃষিজমির মালিক ছিলেন না; কৃষি-উৎপাদনের নির্দিষ্ট একটি অংশ তাঁদের প্রাপ্য ছিল মাত্র।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে জমির মালিকানা জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়গুলির করায়ত্ত ছিল। গ্রামে বসবাসকারী জাতি, উপজাতি বা সম্প্রদায়গুলির কৃষক-সমাজ সমষ্টিগতভাবে কৃষিজমির স্বত্বাধিকারীর মর্যাদা ভোগ করত। প্রাচীনকাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় রাজশক্তি এই কৃষকসমাজের অধিকার হরণ করে জমিমালিক নূতন কোন শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হয়নি। সার্বভৌম শক্তি জমির মালিকানা ভোগ করত না বলেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে জমির মালিকানা হস্তান্তরিত করা যেত না। সার্বভৌম শক্তি গ্রামগুলির ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার রাজপ্রতিনিধি বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হস্তে ন্যস্ত করত। ঐ ব্যক্তিরা গ্রামের বাৎসরিক উৎপাদনের উপর নির্দিষ্ট হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করে সার্বভৌম শক্তির সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করতেন মাত্র।

ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মোগল সম্রাটেরা নানাক্ষেত্রে নূতনত্ব প্রবর্তন করলেও কৃষিজমির ক্ষেত্রে মৌল সম্পর্কগুলির বিশেষ কোন পরিবর্তনসাধনে অগ্রসর হননি। মোগলপূর্ব আমলে যেমন, মোগল যুগেও তেমন, কৃষকেরা ব্যক্তিগতভাবে জমিমালিক ছিল না। কাজেই ভূমিরাজস্ব পূর্বের মত সমগ্র গ্রামের উপর ধার্য হত; গ্রামভিত্তিক ভূমিরাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি জমির

স্বত্বাধিকারী হিসাবে গ্রামের দাবির স্বীকৃতির নির্দেশক ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির ভূমিরাজস্ব মোগল আমলে শস্যের পরিবর্তে অর্থের মাধ্যমে গৃহীত হত।

মধ্যযুগের ইংল্যাণ্ডের সামন্তপ্রভুদের খাস খামারের মত কোনরূপ জমির মালিকানা ভারতীয় সামন্তপ্রভুদের ছিল না। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষিউৎপাদনের রীতিপদ্ধতি, উৎপাদিত ফসল, সেচব্যবস্থার প্রয়োগ সবকিছুই এমন পৃথক ধরনের ছিল যে, জাতীয় পর্যায়ে কৃষিব্যবস্থার কোন অস্তিত্ব ছিল না। মেষপালনের মত অর্থকরী ব্যবসা পরিচালনার জন্য ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ পশুচারণভূমি তৈরীর অনুরূপ কোন তাগিদ ভারতে বর্তমান ছিল না। অধ্যাপক পার্সিভাল স্পীয়ার ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের টিউডর যুগের ভূস্বামীদের সঙ্গে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের সাদৃশ্য বর্ণনা করে তাঁর অজ্ঞানতার পরিচয় দিয়েছেন।[1] কর্ণওয়ালিশ ভারতের কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রবর্তনের কথা স্বপ্নেও ভাবেননি; তাঁর এবং তাঁর মনিব পিট্ ও ডাণ্ডাসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ, স্থায়ী ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করা।

ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থতার পথ খুঁজতে গিয়ে ধীরে ধীরে ভারতে ঔপনিবেশিক, ধনতান্ত্রিক কৃষির জন্ম দেয়।

ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব ও ভূমিরাজস্বের প্রকারভেদ

ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ বিজয় ভারতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে; ভারতীয় কৃষি সামন্তবাদের ভিত্তিভূমি থেকে স্থানচ্যুত হয়ে বিদেশী ধনতন্ত্রের সংস্পর্শ ও নিয়ন্ত্রণে নূতন জমিতে শিকড় প্রোথিত করতে থাকে। বহু শতাব্দীর সামন্তবাদী কৃষি ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে।

রাজস্ব আদায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে কোন একটি নির্দিষ্ট নীতি ভারতে অনুসৃত হয়েছিল বলে মনে হয় না। বহু নীতির উদ্ভব ঘটেছিল। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার তারতম্য এবং মোগল শাসনের অবসানের পর চুক্তির স্বাধীনতা, হিতবাদ ও মুক্তবাণিজ্যের পশ্চিমী ধ্যানধারণার সম্মিলিত আঘাতে গ্রামীণ সম্প্রদায় ও কৃষকদের অধিকারগুলির ভগ্নদশা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্নরূপী আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে বহু ধরনের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার জন্ম দেয়।[2] ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে

'জমিদারি', 'রায়তওয়ারি', 'তালুকদারি', 'মহলওয়ারি', 'মালগুজারি' এবং 'গ্রামওয়ারি' ব্যবস্থা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

জমিদারি ব্যবস্থা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বারাণসী ও উত্তর সরকার অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় জমিদারেরা সরকারকে নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব যোগাতেন, জমিদার ও চাষীপ্রজার সম্পর্ক পারস্পরিক চুক্তিতে নির্ধারিত হত।

উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের পতনের পর্যায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরাজস্ব নীতি গড়ে উঠেছিল। অযোধ্যা অঞ্চলে তালুকদারি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মহলওয়ারি, দিল্লী ও পাঞ্জাবে গ্রামওয়ারি এবং মধ্যপ্রদেশে মালগুজারি প্রচলিত ছিল। মালগুজারেরা সরাসরি জমির মালিকানা ভোগ করত ও রাজস্ব প্রদানের অধিকারী ছিল; মহলওয়ারি অঞ্চলে জমির মালিকানা ব্যক্তিগত হলেও রাজস্ব লম্বারদারদের মাধ্যমে প্রদেয় ছিল। গ্রামওয়ারি ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানার নীতির সাথে গ্রামভিত্তিক সমষ্টিগত রাজস্ব প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বোম্বে ও মাদ্রাজের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সরকার ও রায়তদের সঙ্গে প্রতিবার ভূমি বিলি-বন্দোবস্তের সময় ভূমিরাজস্বের হার নূতনভাবে নির্ধারিত হত। রাজস্ব ও উৎপাদনের মোট পরিমাণের হার ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমরূপ ছিল না নিম্নোক্ত তালিকায়[৩] তা স্পষ্ট :

অঞ্চল	শতকরা হার
বঙ্গদেশ	৫.৬
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ	৮
মাদ্রাজ	১২ থেকে ৩১
বোম্বে	২০ থেকে ৩৩
পাঞ্জাব	১০

রায়তওয়ারি অঞ্চলে সরকারের রাজস্ব দাবি সর্বাধিক ছিল। চাষীপ্রজার দিক থেকে বলা যায় যে, বঙ্গদেশ ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জমিদারি অঞ্চলে মোট উৎপন্নের এক-পঞ্চমাংশ খাজনা হিসাবে দিতে হত, অন্যান্য অঞ্চলে আরও অনেক বেশী দিতে হত।

বিভিন্ন রাজস্বব্যবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও ভারতের কৃষি ব্যক্তিমালিকানার ধনতান্ত্রিক নীতি রূপায়ণে অভ্যস্ত হতে থাকে। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি-জমির মালিকানা ধ্বংস হতে থাকে। শোষণ ও বঞ্চনার মধ্য দিয়ে বিদেশী ধনতন্ত্রের স্বার্থান্ধ নির্দেশে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথটির হদিশ পায়।

কৃষিক্ষেত্রে ভূমি সংক্রান্ত সম্পর্কের মৌল পরিবর্তন ভারতের ব্রিটিশপূর্ব কৃষি অর্থনীতি ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সামন্তযুগীয় স্থবিরতার অন্তিমলগ্ন ত্বরান্বিত করে। জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা ব্রিটিশ আইনের আদর্শানুগ ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠা করে ভূমিখণ্ডকে একটি বাণিজ্যিক বস্তু বা সেবার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। আর্থনীতিক বাজারে অন্যান্য বস্তুর মত ভূমিকেও ক্রয়, বিক্রয় ও বন্ধকের সামগ্রী করে তোলা হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ কৃষির ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। বলা বাহুল্য, এরূপ সম্ভাবনা কৃষিপ্রধান ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নানা ধরনের ফসল ফলাতে সহায়ক হয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় কৃষির ধনতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে নিশ্চয়ই, কিন্তু এরূপ উত্তরণের সুযোগ না পেয়ে ভারতের বহু অঞ্চলের কৃষকেরা প্রতিকূল অবস্থায় জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকে। কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় কৃষির ধনতান্ত্রিক রূপান্তরে দুঃখবোধ করা (এ. আর. দেশাইর ভাষায় 'কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন' করা) অযৌক্তিক। লক্ষ লক্ষ দরিদ্র কৃষকের জীবনযাত্রার ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের দিকটি বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় কৃষির মৌল পরিবর্তনের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিহ্বল হওয়া বোধহয় আরও বেশী অযৌক্তিক! মীরাট, পাঞ্জাব, দক্ষিণ ভারতের আদ্র বদ্বীপ অঞ্চল, গুজরাট, বোম্বে প্রভৃতি এলাকার ধনী কৃষকেরা আখ, তুলা ও তামাক ইত্যাদি ফসল ফলিয়ে লাভবান হয়। ব্রিটিশ আমলে জাঠ কৃষকদের সমৃদ্ধিশালী অবস্থা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। কিন্তু ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষকেরা কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিপুল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়ে পর্যুদস্ত হতে থাকে। ভারতীয় আর্থনীতিক ইতিহাস লিখন সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বাজার-দামের উত্থান-পতন এবং বাণিজ্যিক শস্যের ক্রমোর্ধ্বগতি রেখার সঙ্কেতে কৃষককুলের চাষ-

আবাদকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। দেড়শ-দু'শ বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে জমির ব্যক্তিমালিকানা ভোগ করেও ভারতীয় কৃষকেরা বা জমি-মালিকেরা 'নির্ভরশীল' কৃষির চালচিত্র রচনায় অংশগ্রহণ করতে কেন বাধ্য হয়েছিলেন, ভারতীয় চিরাচরিত ইতিহাস লিখন ঐ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অপারগ।[4] অতি সাম্প্রতিককালে এরূপ সদুত্তর খোঁজার প্রয়াস চলছে।

ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়; কিন্তু স্বাধীন বিকাশে বিশিষ্ট না হয়ে ভারতীয় কৃষি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে 'নির্ভরশীল' চরিত্রে বিধৃত থেকেছে। এই নির্ভরশীলতা প্রধানত রাষ্ট্র, জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীর হস্তক্ষেপ এবং প্রকৃতির প্রতিকূলতা নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতার ফলশ্রুতি।

মার্কসবাদী ও অ-মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের অনেকে মূলধনের বিশ্বজোড়া কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করে ভারতীয় ঔপনিবেশিক কৃষির চরিত্র বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছিলেন। আবার অনেকে নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলকে চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণের বিষয়বস্তু করে চাষীদের অবস্থা পর্যালোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। একদিকে ভারতীয় কৃষির ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের কড়া তত্ত্বের হাতুড়ি ও অন্যদিকে চাক্ষুষ সাক্ষ্যপ্রমাণের বেদীর মাঝখানে পড়ে ভারতীয় ক্ষুদ্র চাষীর সমস্যাসঙ্কুল জীবনকাহিনী পিষ্ট হয়ে ঐতিহাসিকদের ভিন্নতর কোন বিশ্লেষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ভারতীয় চাষী আজও তাঁর 'কর্মের আর ঘর্মের' সামগ্রিক ইতিহাস সঠিকভাবে বিবৃত করতে সক্ষম ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় আছে।

জমিদারি ও রায়তওয়ারি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক কৃষি

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করে। এই বন্দোবস্ত ব্রিটিশপূর্ব ভারতের বন্দোবস্তকে চুরমার করে দেয়। রাজা বা নবাব এবং কৃষকসমাজের মধ্যবর্তী ছোটখাট শাসক, জমিদার, জায়গীরদার প্রভৃতি বহুবিধ মধ্যবর্তী রাজস্ব সংগ্রাহক চাষীদের মতই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগেকার ভারতে জমির সাথে স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এঁরা কেউ জমির সাথে চিরাচরিত নানা ধরনের বন্ধনে যুক্ত চাষীকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারতেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। জমির

দলিল বা চুক্তিপত্রের অধিকারীর স্বার্থরক্ষা করা ও ব্রিটিশ আইনের সম্পত্তির অধিকারের পবিত্রতা বজায় রাখার তাগিদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি ও জীবিকার্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তাছাড়া, এই বন্দোবস্ত ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী নির্ভরশীলতার বাস্তব গ্রামীণ রূপটিকে তছ্‌নচ করে দেয়।

বহু কারণে কর্ণওয়ালিশের বন্দোবস্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধারদের মনঃপুত হয়। এই বন্দোবস্ত ভূমি বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ আইন ও অর্থনীতি সংক্রান্ত ধ্যানধারণার ছকে রচিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ কৃষকের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করার চেয়ে কয়েক হাজার জমিদারের কাছ থেকে তা আদায় করা সহজতর ছিল। ভারতীয় জনসাধারণের আন্দোলন বা বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অনুগত মিত্র সৃষ্টি করার কাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সহায়ক হয়েছিল। শাসকশক্তির অনুগ্রহে ব্রিটিশ ভারতের জমিদারদের উৎপত্তি ঘটেছিল এবং ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতি তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের অস্তিত্ব রক্ষায় গভীরভাবে আগ্রহী ও ভারতীয় জনতার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে সক্ষম, ধনী, বিশাল একটি ভূম্যধিকারী গোষ্ঠী সৃষ্টি করে বৃহৎ একটি সুবিধা আদায় করে দিয়েছিল।[5] গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা অসামরিক সাহায্য দানের বিনিময়ে অনুগত ভারতীয়দের জমিদারি দান করে জমিদার তৈরী করার রীতি এরূপ গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করেছিল। মোট কথা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে রাজস্ব প্রদানের চুক্তিতে যাঁরা জমিদার হন তাঁরা নিঃসন্দেহে রাজভক্ত ছিলেন। এই রাজভক্তি ঔপনিবেশিক শাসনের বনিয়াদ রচনায় অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভের কাজ করেছিল। এই স্তম্ভটির পরিকল্পনা রচনায় কর্ণওয়ালিশ ও লণ্ডনের লিডেনহল অফিসের কর্মকর্তারা দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন: অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকেই তাঁরা কোম্পানি রাজের সমর্থক ভারতীয় জমিদারশ্রেণীর সম্ভাব্য রূপটি অঙ্কন করে দিয়েছিলেন।

জমিদারদের দেয় ভূমিরাজস্ব চিরস্থায়িভাবে নির্ধারণ করে ১৭৯৩ সালের আইন সরকারের পক্ষে আর্থনীতিক দিক থেকে অল্প কিছুদিন বাদেই অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিল। ভূমি সংক্রান্ত বিলিব্যবস্থার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্তের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। জমির উপর জমিদারদের

ব্যক্তিমালিকানা কায়েম করা হয় ঠিকই, কিন্তু দেয় রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির ক্ষমতা সরকারের করায়ত্ত থাকে। ব্রিটিশ ভারতের শতকরা প্রায় কুড়ি ভাগ অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বর্তমান ছিল, আর তিরিশ ভাগে সাময়িক বন্দোবস্ত। বাদবাকি প্রায় একান্ন ভাগ অংশে বিরাজ করেছিল রায়তওয়ারি ব্যবস্থা।

নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব দানের চুক্তিতে যাঁরা সর্বপ্রথম জমিদারি লাভ করেছিলেন তাঁরা দু'-এক বছরের বেশী জমিদার থাকতে পারেননি। অনাবৃষ্টি বা বন্যায় শস্যের প্রভূত ক্ষতি হলে তাঁরা চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা দিতে অক্ষম হন। কোলকাতার ব্যাঙ্কমালিক ও মহাজনেরা ঐ অর্থ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়ে জমির দলিলগুলি ক্রয় করেন। মোগল যুগের অভিজাত ব্যক্তিদের হাত থেকে জমি ব্রিটিশদের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যে লাভবান হিন্দু পরিবারগুলির করায়ত্ত হয়। রায়, সেন, ঠাকুর প্রভৃতি পরিবারগুলি শহরবাসী থেকেও গ্রামীণ এলাকার জমিদারির মালিক হতে থাকেন। এই পরিবারগুলির সন্তানসন্ততিরা বংশপরম্পরায় জমিদারি থেকে প্রাপ্ত আয়ের সুযোগে ব্রিটিশ-প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে ইঙ্গ-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সমন্বয় বা সরাসরি পশ্চিমাকরণের পক্ষপাতী হন।[৫] ১৮৫৭-৫৮ সালের মহাবিদ্রোহে এঁদের কাছ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সহায়তা লাভ করেছিলেন এবং এই সহায়তা বিদ্রোহ চূর্ণ করে দিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় গ্রামগুলিতে ক্রমে ক্রমে জমিদার, বণিক ও মহাজনদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। দরিদ্র, নিরন্ন, লাঞ্ছিত কৃষকেরা নিজেদের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র জমির চৌহদ্দিতে ফসল ফলাবার জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, পর্যুদস্ত হয়ে, এঁদের শোষণের শিকার হয়। ধনতন্ত্রের পূর্বেকার প্রযুক্তিবিদ্যার ভিত্তিতে কৃষকদের উপরে শোষণ আরোপিত হয়েছিল; কৃষকদের শ্রমশক্তি না কিনে তাদের উৎপাদিত ফসল কিনে নিয়ে জমিদার-বণিক-মহাজন অশুভ ত্রিমূর্তি লাভবান হয়েছিল। অথচ ভারতীয় কৃষক সমাজের অপরিসীম দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা এবং জমি থেকে বিপুল হারে কৃষক উৎখাত এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, যেখান থেকে অনায়াসে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক কৃষির আবির্ভাব ঘটতে পারত। ইউরোপে যেমন ঘটেছিল ভারতে তেমন কিছু ঘটেনি। যেরূপ তীব্র গতিতে কৃষক ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটছিল, তার

তুলনায় অত্যন্ত শ্লথ গতিতে বাণিজ্যিক ও মহাজনী মূলধন শিল্প-নিযুক্ত মূলধনে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ভূমিমালিকেরা পুঁজিপতিতে পরিণত হননি বা কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ সাধনে তৎপর হননি।[7] নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানির সঙ্কেত সত্ত্বেও ভারতীয় চাষী নিজের শ্রম বিক্রির বাজার খুঁজে পায়নি, নিস্ফল মাথাকুটে জমিহীন, বেকার শ্রমিকের জীবনের সীমাহীন যন্ত্রণায় নিজেকে সঁপে দিতে বাধ্য হয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে **ভারতীয় কৃষিতে ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশ সম্ভব হয়নি**। তার সর্বপ্রধান কারণ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিকতার দাপট। কৃষি থেকে লব্ধ অর্থ পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু পুঁজির মালিকেরা কৃষির যন্ত্রিকরণের জন্য ঐ পুঁজি বিনিয়োগ করার সুযোগ লাভ করেননি। স্বাধীন ধনতান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ব্রিটিশ ভারতে সম্ভব হয়নি।

অসংখ্য জাল বিস্তার করে ব্রিটিশ মূলধন ভারতীয় কৃষিকে বেষ্টন করে রেখেছিল ; বাণিজ্য, ঋণদানে নিযুক্ত মূলধন, জমিদার, খাজনা-শুল্ক-কর ইত্যাদি অসংখ্য সূত্র ধরে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসল লোপাট করে নিত। ব্রিটিশ মূলধন ভারতীয় কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসল লুটে নিয়ে স্বদেশে শিল্প-সমৃদ্ধ ধনতন্ত্রের বনিয়াদ রচনা করেছিল। ভারতীয় কাঁচামাল ব্রিটেনের কল-কারখানায় শিল্পদ্রব্যে পরিণতি লাভ করে সারা পৃথিবীর বন্দরে-নগরে বিক্রীত হয়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেছিল, আর ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিকে করেছিল রিক্ত, পঙ্গু ও যন্ত্রণাকাতর। ব্রিটিশ মূলধন ভারতের অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক পথে ঠেলেছিল ; এবং একথাও ঠিক যে, দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম, বিপ্লবী আন্দোলন ইত্যাদির সম্মিলিত প্রভাবে বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ রাজ ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক কিছু কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তি ভারতীয় ধনতন্ত্রের আদিযুগের দশকগুলিতে বণিক-মহাজন-জমিদারের শোষণের শত-সহস্র বন্ধনে কৃষককে আবদ্ধ রেখে এবং ভারতীয় শিল্পপতির উদ্ভবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ভারতীয় ধনতন্ত্রের প্রতিবন্ধী রূপ রচনায় তৎপর ছিল। গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনীতির স্বার্থে ভারতীয় অর্থনীতিকে অধস্তন ও পঙ্গু রাখা ঐ শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। স্বাধীন, দ্রুত বিকাশোন্মুখ ভারতীয় ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় অর্থনীতি সামন্তবাদী পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল বলা

সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু সামন্তযুগীয় লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে বজায় ছিল না বা সামন্তবাদের সাথে আপোষরক্ষা করা হয়নি এমন নয়। আবার, ঐ সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণ, পূর্ণ বিকশিত ধনতান্ত্রিক চরিত্র অর্জন করেছিল এমন বক্তব্য সমান ত্রুটিপূর্ণ। সামন্তবাদী কৃষির ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত শর্তগুলি[৪] পালিত হওয়া একান্ত জরুরী :

ক. মূলধন বিনিয়োগ ও আর্থনীতিক বাজারের মাধ্যমে লাভসহ ঐ মূলধনের প্রত্যাবর্তনের পথে বাধাবিঘ্নের অপসারণ ;

খ. শহরশিল্পগুলির কারিগরী জ্ঞান সরবরাহ ও স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী, সুলভ মূল্যের যন্ত্রপাতি যোগানের যোগ্যতা অর্জন ;

গ. কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে জীবিকার সন্ধান দিতে সমর্থ নগর-অর্থনীতির বিকাশ।

শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র সামন্তবাদী বাধাবিঘ্নের অপসারণের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশ সম্ভব নয়, শহরশিল্প ও উপযুক্ত বাজার সৃষ্টি করাও অত্যাবশ্যক। জার্মানীর তুলনায় ফ্রান্সে পূর্ণ বিকশিত ধনতান্ত্রিক কৃষির জন্মের সময় বিলম্বিত হয়েছে প্রধানত ধীরগতি শিল্পায়নের ফলে। কৃষিক্ষেত্রে সামন্তবাদের উচ্ছেদ বহু আগে ঘটলেও মন্দগতি শিল্পায়ন জমির উপর নির্ভরশীলতায় হ্রাস ঘটাতে পারেনি। ভূমির প্রতি আকর্ষণ খাজনা ও মূল্যকে বরাবর উর্ধ্বমুখী রেখে সম্পন্ন চাষীকে কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি ও আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করার উৎসাহ থেকে বঞ্চিত করেছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতের প্রাচীন শহরশিল্পগুলি বিনষ্ট হওয়ায় এবং আধুনিক ভারতীয় শিল্পের বিকাশ না ঘটায় কৃষির আধুনিকীকরণ অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি করা যন্ত্রপাতি ভারতীয় চাষীর প্রয়োজন ও ক্রয়ক্ষমতার সাথে সম্পর্কবিহীন থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, যন্ত্রপাতি যথাযোগ্যভাবে রক্ষা করা ও মেরামতির ব্যবস্থা করা শিল্পক্ষেত্রে জাতীয় অনগ্রসরতা এবং, বিশেষ করে গ্রামীণ পশ্চাৎপদতার পরিপ্রেক্ষিতে, অসম্ভব ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতীয় অর্থনীতি স্বকীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবৈশিক পরিবেশে ভারতীয় প্রাথমিক বা প্রত্যক্ষ উৎপাদকের পক্ষে কৃষি বা শিল্প যেখানেই হোক না কেন, পুঁজিপতি হিসাবে আবির্ভূত

হওয়া সম্ভব ছিল না। দালাল, বণিক, জমিদার, মহাজন, আমলা, ধনী বুদ্ধিজীবীদের অনেকে ব্রিটিশ শিল্প, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, বীমা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হয়েছিলেন। ভারতীয় পুঁজিপতিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোন না কোনভাবে কৃষক বা কারিগরের উৎপাদিত ফসল ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে যুক্ত ছিল; প্রত্যক্ষভাবে কৃষি বা শিল্পোৎপাদনের কার্যে ঐ অংশ লিপ্ত ছিল না। পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিপতিরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ উৎপাদকের ভূমিকায় নিযুক্ত ছিলেন। কৃষি বা শিল্প—উভয় ক্ষেত্রের পুঁজিপতিদের সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কার্ল মার্কস লিখেছেন, ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলিতে উৎপাদক নিজেই বণিক ও পুঁজিপতিতে পরিণত হন।[৩] ঔপনিবেশিক ভারতে এরূপ পরিণতি ঘটেনি। এরূপ পরিণতি প্রতিরোধে বিদেশী শাসকশ্রেনী সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টির আশঙ্কা ঐ শ্রেণীকে ভারতীয় উৎপাদকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণে প্ররোচিত করেছিল।

ঔপনিবেশিক কৃষির চরিত্র ও রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের সর্বত্র উৎপাদনের শক্তিগুলিকে ধ্বংস করেছিল বা আর্থনীতিক বিকাশের গতিকে স্তব্ধ করতে সক্রিয় ছিল এমন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃষি, শিল্প ও যানবাহনের আধুনিকীকরণে ঐ শাসন উৎসাহী ছিল। কিন্তু আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলি ভারতের প্রায় সর্বত্র এত প্রাচীন এবং গতিশীলতার পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল যে, আধুনিকীকরণের প্রয়াস দর্শনীয় হয়ে উঠবার অবকাশ পায়নি। প্রাচীন, স্থবির ঐ সম্পর্কগুলির অবসান ঘটাতে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ছিল না, শুধুমাত্র ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বিপণন কেন্দ্র হিসাবে ভারতকে শোষণ করার জন্য যুগোপযোগী বনিয়াদ রচনার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

ভারতকে শোষণ করার এরূপ আধুনিক পদ্ধতিটি বলবৎ রেখে ঔপনিবেশিক প্রাচীন পদ্ধতিগুলি ব্রিটেন পরিত্যাগ করেছিল এমন নয়। সামরিক বল-প্রয়োগের মাধ্যমে লুণ্ঠনের আয়োজন, রাজস্ব সংগ্রহের নির্মম নীতি ও পদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছুই আধুনিক পদ্ধতিটির পাশাপাশি বজায় ছিল। জমিদারি ও রায়তওয়ারি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চরম অসমঞ্জস চরিত্রে বিধৃত ছিল। উভয় ব্যবস্থাই চাষীদের জন্য বা জমির মালিকের স্বার্থে তৈরী না হয়ে, হয়েছিল

রাজস্ব নির্ধারণের মালিক সরকারের স্বার্থে। জমির ব্যক্তিমালিকানা ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রকৃত ধারণার উপহাস ছিল মাত্র, কেননা বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষের হাতেই ছিল ব্রিটিশ ভারতের ভূভাগের চরম মালিকানা। শুধু আইনের দিক থেকে নয়, আর্থনীতিক বাস্তব ঘটনার দিক থেকেও তাই। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমিমালিক কৃষকের ভূমিরাজস্বের পরিমাণ উৎপাদিত শস্যের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ পর্যন্ত দাঁড়াত।[10] ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি 'প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ' ভূমিরাজস্ব আত্মসাতে কখনো কার্পণ্য করেনি। ভূমিরাজস্ব জমিমালিক কৃষকের পক্ষে অনেক সময় উদ্বৃত্ত ফসলে সঙ্কুলান হত না; তখন অত্যাবশ্যক ফসলের অংশ থেকেই ঐ রাজস্ব সরকারী কোষাগারে দিতে হত। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষিজমির বাজারদাম কমে যেত।

ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির ফলে রায়তওয়ারি অঞ্চলে অনেক কৃষক নির্ধারিত রাজস্ব জমা দিতে অক্ষম হয়ে পড়ত। অক্ষম কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত হত, নীলামে অন্যের কাছে বিক্রয় হয়ে যেত। গ্রামীণ সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকের জমি কর্ষণের অধিকার হরণ করার উপর প্রাচীন ভারতে অজস্র বাধানিষেধ ছিল। মোগল আমলে রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ঘটত না এমন নয়, কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীরা ভূমিরাজস্ব প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের জমি নীলামে তুলে কখনো অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতেন না। উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এইচ. ওয়াই. এস. কটন ব্রিটিশ ও মোগল ব্যবস্থার পার্থক্য প্রদর্শন করার সময় ঐরূপ তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশ ভারতের কৃষিনীতি সর্বদা নির্ধারিত হলেও ঐ নীতি ভারতীয় কৃষির মৌল রূপান্তর ঘটায়: ভারতীয় জমিমালিকেরা আইন নির্দেশিত পরিমাণ ভূমিরাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে ব্যক্তি-মালিকানার অধিকার পেয়ে আর্থনীতিক বাজারের দিকে দৃষ্টি রেখে ফসলের উৎপাদনে লিপ্ত হন। ক্ষুদ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়ের জন্য শুধুমাত্র উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি পেয়ে জমিমালিকেরা ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহী হন। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কৃষিব্যবস্থার স্বয়ংসম্পূর্ণতার উদ্দেশ্য লুপ্ত হয়ে যায়। নগদ অর্থ লাভের দুরন্ত তাগিদ সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের কৃষিব্যবস্থায় সার্বিক ঐক্য এনে জাতীয় কৃষির জন্ম দেয়। জাতীয় কৃষি বিশ্বের ধনতান্ত্রিক বাজারের চাহিদা ও যোগানের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। ভারতীয় কৃষি ধনতান্ত্রিক

পথে পদক্ষেপ করে। কিন্তু পরাধীনতার কারণে ভারতীয় কৃষির স্বার্থ ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থের অনুগত ছিল। কাজেই ধনতন্ত্রের স্বাধীন বিকাশে ভারতীয় কৃষি সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠেনি, সম্পন্ন কৃষকসমাজও সৃষ্টি হয়নি। নিজস্ব স্বার্থের সংরক্ষণে স্বাধীন নীতি গ্রহণের অধিকার বঞ্চিত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা আমূল ধনতান্ত্রিক সংস্কারের পথে পদসঞ্চারে অসমর্থ হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির উপর নির্ভরশীল ভারতীয় কৃষি অনাধুনিক থাকতে বাধ্য হয়।

ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে 'ফ্যাক্টরি' বা কারখানাগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক ব্যবহারে আধুনিক শিল্পায়নের সূতিকাগৃহ হয়ে উঠলে নবজাতকের আবির্ভাব-সংবাদ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরেও পৌঁছে যায়। আধুনিক শিল্পের তৈরী ট্রাক্টর, রোপণযন্ত্র, ঝাড়াই-মাড়াইর কল ইত্যাদি কৃষিতে ব্যবহৃত হতে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটতে থাকে। উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি জমির উপর মানুষের চাপ কমাতে থাকে। সংবদ্ধ, বৃহৎ কৃষিখামারের উৎপত্তি ঘটে। কৃষকসমাজের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান ঊর্ধ্বগামী হয়।

ভারতে কৃষি ও শিল্পের সম্পর্কের অনুরূপ বিকাশ সম্ভব ছিল না। ভারতীয় কৃষি কোটি কোটি মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা, বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিবন্ধকতা ও আধুনিক শিল্পের অপ্রতুলতা ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলির কারিগরদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল ; নিজেদের জীবিকা থেকে উৎখাত হয়ে তাদের অধিকাংশ চাষবাসের কাজে হাত লাগাতে সচেষ্ট হয়। তাদের একাংশ বৃহৎ শিল্পগুলির অঙ্গনে কর্মরত থেকে সর্বহারাশ্রেণীর অংশ হয়ে ওঠে, অথবা প্রাচীন দেশীয় শিল্পের আওতায় মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়ে উৎপাদনের কাজে ব্যস্ত থেকে নিজস্ব দুঃখদুর্দশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সর্বস্বান্ত কারিগরদের উপস্থিতিতে কৃষিজমির উপর প্রচণ্ড চাপ বৃদ্ধি পায়, জমি খণ্ডিত হতে থাকে।[11] উদ্‌বৃত্ত বা মুনাফা সৃষ্টিতে অক্ষম কৃষিব্যবস্থা কৃষকদের আয় কমাতে থাকে। যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার ইত্যাদি ব্যবহারের ব্যয় বহন করার সামর্থ দরিদ্র কৃষকদের ছিল না। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য সুযোগ গ্রহণ করে আধুনিকীকরণের ধারাটির প্রবাহ কৃষিক্ষেত্রে সৃষ্টি করার ক্ষমতা দরিদ্র, নিরন্ন কৃষকের ক্ষমতার বাইরে ছিল।

ভূমিরাজস্বের বিপুল দাবি মিটিয়ে সংসার প্রতিপালন করা চাষীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। সংসারের পক্ষে প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র ক্রয় করা তার পক্ষে দুরূহ ছিল। মহাজন ও সমবায় সমিতিগুলির কাছে ঋণ করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। ঋণে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে ঋণ পরিশোধ করার কথা ভাবাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নিয়মিত সুদ যোগান দিতেও সে অপারগ হয়ে পড়ত। উচ্চহার সুদে গৃহীত ঋণের বোঝায় ভারাক্রান্ত দরিদ্র চাষীর পক্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, শক্তিশালী হাল-বলদ ইত্যাদি ক্রয় করে জমির একর প্রতি লব্ধ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অসম্ভব ছিল। অপুষ্টির শিকার হয়ে ভারতীয় চাষী পরিশ্রমের ক্ষমতাও অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতীয় কৃষি স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেও অসমর্থ হয়ে অধঃপতনের দিকে যাত্রা করেছিল। একর প্রতি ফলন ধারাবাহিকভাবে ক্রমহ্রাসমান হয়েছিল।

চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রেণীর মানুষের আয়ের স্বল্পতা, প্রকৃতি-নির্ভর কৃষির সঙ্কটমুখীনতার প্রবণতা, আন্তর্জাতিক বাজারের পক্ষপাতপূর্ণ খেয়ালি-পনা, মহাজন ও বণিকদের পক্ষে অজ্ঞ, অসহায় কৃষকদের শোষণ করার অবাধ সুযোগ, জমির খণ্ডিকরণে আইনগত বাধার অনুপস্থিতি ইত্যাদি বহুবিধ কারণ একযোগে ক্রিয়াশীল থেকে ভারতীয় কৃষিকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে তুলেছিল। যন্ত্রিকরণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদি প্রবর্তনের বাস্তব ভিত্তি ঔপনিবেশিক ভারতে অনুপস্থিত ছিল। ক্ষুদ্র পরিসর জমিতে কর্মরত দরিদ্র, দুর্বল কৃষকেরা কঙ্কালসার হালবলদ ও মান্ধাতার আমলের লাঙল নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের বৃহৎ খামারে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার ইত্যাদি নিয়ে কার্যরত সম্পন্ন চাষীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বলা বাহুল্য, অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় কৃষকেরা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তিশালী 'ট্রাস্ট', 'কার্টেল' ইত্যাদির কারসাজিতে ভারতীয় কৃষকদের পক্ষে বাজার সৃষ্টি করা বা ন্যায্য মূল্য লাভ করার আশা সুদূরপরাহত হয়ে উঠেছিল।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের চাপে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকদের মালিকানা থেকে কৃষিজমি ব্যাপক হারে জমিদার, বণিক ও মহাজনদের কুক্ষিগত হয়ে পড়তে থাকে। এই শ্রেণীর জমিদারেরা কোম্পানি আমলের আদিযুগের জমিদারদের তুলনায়

স্বতন্ত্র ছিলেন। এঁরা গ্রামে বসবাস করে কৃষির কাজে আত্মনিয়োগ করে কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করতে উৎসাহী ছিলেন না, কৃষিজমির খাজনার নিশ্চিত সরবরাহে শহরজীবনের বিলাসব্যসনে পূর্ণ আরামপ্রদ জীবনের বনিয়াদ রচনা করতে তৎপর ছিলেন। এঁরা কৃষিজমি ক্রয় করে খাজনা প্রদানের শর্তে প্রজা বা রায়ত সৃষ্টি করতেন। লাভ-ক্ষতি, জমির বাজার-দর, জমির জন্য মানুষের বুভুক্ষা ইত্যাদি নানা দিক বিচার করে প্রজারাও অনেক সময় খাজনা প্রদানের শর্তে উপ-প্রজা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবে কৃষিজমি হাত ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত যে ভাড়াটে বা উপ-প্রজার তত্ত্বাবধানে কর্ষিত হয়ে শস্য উৎপাদনে নিয়োজিত হত, সেই জমি উদ্বৃত্ত আয় তো দূরের কথা, অত্যাবশ্যক আয় অর্জনেও ব্যর্থ হত। জমিদার থেকে শুরু করে মধ্যবর্তী সব প্রজা ও উপ-প্রজার খাজনা মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব কার্যত শেষতম ভাড়াটে কৃষককেই বহন করতে হত।

সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে জমিদারি অঞ্চলগুলিতে অবশ্য কৃষিজমির প্রকৃত মূল্য উর্ধ্বগামী থাকে ; ভূমিলক্ষ্মীর কৃপায় জনসংখ্যাও বাড়ে। জমির খাজনা অত্যধিক হয়ে ওঠে। এরূপ পরিবেশে জমিমালিকের পক্ষে স্বয়ং চাষবাসে লিপ্ত না হয়ে ভাগচাষীর সহায়তা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত হয়ে উঠেছিল। বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে দেখা যায় যে, ভাগচাষী ও জমিমালিকের কর্মদক্ষতার পার্থক্য না থাকলে জমিমালিকের পক্ষে ভাগচাষী নিয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালের বঙ্গদেশের প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান এই তথ্যের সাক্ষ্য বহন করে :

আয় বা খরচের খাতসমূহ	১৯৩৬	১৯৪৪
একর প্রতি জমির ফলন	১২·৫	১২·৪
মন প্রতি মূল্য (টাকা)	৩·৪	১০
এক একরের মোট ফসলের মূল্য (টাকা)	৪২·৫	১২৫
শ্রমিক বাবদ ব্যয় সহ চাষবাসের ব্যয় (টাকা)	১৮·৯	৫৭·৬
ভাড়াটে শ্রমিকের সহায়তায় জমিমালিকের নিজস্ব চাষবাসের নীট আয় (একর প্রতি ; টাকার হিসাবে)	২৩·৬	৬৮·৪
ভাগচাষীর সঙ্গে সমান ভাগাভাগির চুক্তিতে জমিমালিকের একর প্রতি প্রাপ্ত আয় (টাকা)	২১·২	৬২·৫

উপরোক্ত তালিকা[12] বিশ্লেষণে দেখা যায়, মালিক নিজে শ্রমিক নিয়ে চাষবাস করলে এবং সমস্ত রকম ব্যয়ভার ও ঝুঁকি গ্রহণ করলে যা মুনাফা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা তার চেয়ে মাত্র পাঁচটাকা কম মুনাফা গ্রহণে সম্মত হলে শুধুমাত্র চাষীশ্রমিকের সাহায্যে চাষ করিয়ে সব রকম ঝুঁকি ও ঝামেলা থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ বর্তমান ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ভূস্বামী স্বয়ং চাষবাসে লিপ্ত হবেন আশা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

ভারতীয় ঔপনিবেশিক কৃষিতে নানা ধরনের শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে। এক মেরুপ্রান্তে জমিদারশ্রেণী, অপর মেরুপ্রান্তে দরিদ্র কৃষকের মাঝখানে অসংখ্য মধ্যবর্তী শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে। প্রজা, উপ-প্রজা প্রভৃতির সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনই বাড়তে থাকে জমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ জমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা ভয়াবহ রূপ ধারন করে। শিল্পক্ষেত্রের সর্বহারাশ্রেণীর মত এরাও ছিল শোষিত, এদেরও হারাবার মত কিছু ছিল না। ভারতীয় কৃষিতে নানা ধরনের স্বার্থবাহী লোকজন ভীড় জমালেও ক্রমে ক্রমে শ্রেণীর মেরুকরণ ঘটছিল অতি দ্রুত। শোষক ও শোষিত এই দুভাগে শ্রেণীবিভাগ ত্বরান্বিত হচ্ছিল।

ব্রিটিশ আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা কৃষকদের অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী হলেও এই ব্যবস্থার গুণ ছিল এই যে, ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার সৃষ্টির ফলে ভারতীয় কৃষিতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে। এই কারণে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ঘৃণ্য হলেও জমিদারি ও রায়তওয়ারি (ভূমিব্যবস্থা) এশীয় সমাজের ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্টি করে অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।'[13] ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জমিদার ও প্রজারা ব্রিটিশ স্বৈরতন্ত্রের অন্যায় দাবিদাওয়া, কর আরোপ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিচারালয়ে ধ্বনিত করেছিলেন। ভি. আই. পাভলভ ব্রিটিশ ভারতের ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার প্রবর্তনকে প্রগতিশীল কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। কেননা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নানা দাবিদাওয়া সত্ত্বেও জমিদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থা কৃষিতে বৃহৎ ভূসম্পত্তির দাবিকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ছিল সামন্তপ্রভুদের ভূসম্পত্তির উপর ব্রিটিশ জঙ্গী প্রশাসকদের হস্তক্ষেপ; বিদ্রোহের ফলগুলির মধ্যে অন্যতম একটি ছিল ভারতীয় ভূস্বামীদের ভূসম্পত্তির অধিকার রক্ষার পূর্ণ

প্রতিশ্রুতি। ১৮৫৭-৫৯-এর বিদ্রোহের সর্বভারতীয় সমাজপরিবর্তনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ভূমিমালিকানার সংহতিসাধনের প্রয়াসের মধ্যে নিহিত ছিল। এই প্রয়াস অবশ্য পূর্ণতা লাভ করেনি।

ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন সারা ভারতে ভূমিমালিকদের সঙ্গে এক রকম আচরণ করেনি। গুজরাট, মহারাষ্ট্রের ভূমিমালিকদের তুলনায় বঙ্গদেশের জমিদারেরা অনেক বেশী অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ সালের পর থেকে বাঙালী জমিদারদের শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে অবশ্য সরকারী আনুকূল্যের অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুহ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, ভিন্নতর রাষ্ট্রনীতিক ব্যবস্থার দাবিতে পরিচালিত সম্ভাব্য কৃষক বিদ্রোহের আশঙ্কা থেকেও তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের বিরোধিতায় অগ্রসর হননি। বাঙলার জমিদারেরা ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির মূর্তিমান প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কৃষকসমাজ এবং তাদের উৎপন্ন ফসলের উদ্বৃত্ত আহরণে লিপ্ত শাসনকর্তৃপক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে তাঁরা উভয়ের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পালনের অসম্ভব কাজটি সম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব প্রদান ও উৎপন্ন ফসলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ খাজনার হার প্রবর্তনের মাধ্যমে তাঁরা পরস্পর বিরোধী দুটি পক্ষের মিত্র হতে চেয়েছিলেন। চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের ভক্ত ছিলেন, আবার চাষীদের উপর ধার্য খাজনার হারের তারতম্যের মাধ্যমে স্বদেশবাসীর মঙ্গলবিধান করা সম্ভব ভেবেছিলেন। শিল্পের পথে পদক্ষেপ না করে এবং ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধানে ভূমিকা পালন করেও জমিদারশ্রেণী দীর্ঘকাল ভারতীয় সমাজে প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন।[14] ঔপনিবেশিক কৃষির বিচিত্র সৃষ্টি এই জমিদারশ্রেণী!

এই জমিদারশ্রেণী থেকে জন্মলাভ করেও রামমোহন রায় কৃষির উদ্বৃত্ত কৃষিউন্নয়নের স্বার্থে রায়তওয়ারি অঞ্চলে ভূমিকর ও জমিদারি অঞ্চলে খাজনা নির্দিষ্ট করে দেবার জন্য ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সের কমিটির সামনে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ শ্রেণীর বেশীর ভাগ ব্যক্তিরাই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সারা উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থক দোসরে পরিণত হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে উচ্চগ্রামে

পৌঁছুলে ঐ শ্রেণীভুক্ত বা ঐ শ্রেণীর সাথে যুক্ত নেতৃবৃন্দ সরকারের কাছে দেয় কর জমা দিতে স্বদেশবাসীদের বারণ করলেও জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা বন্ধ করতে পরামর্শ দেননি। এমন কি, অরবিন্দের মত জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতাও দেননি। তিলক দিয়েছিলেন। গান্ধী একমাত্র 'ভারত ছাড়' অন্দোলনের সময় জমিদারদের প্রাপ্য খাজনা বন্ধ করে দেবার সম্ভাবনার কথা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে-কইতে পেরেছিলেন। ঔপনিবেশিক কৃষি দীর্ঘকাল জাতীয়তাবাদী চিন্তার দিগন্তকে কায়েমী স্বার্থের কৃষ্ণমেঘে আচ্ছন্ন রেখেছিল।

তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক কৃষির প্রধানতম প্রগতিশীল তাৎপর্য ছিল এই যে, ভারতীয় গ্রামগুলির কৃষিউৎপাদন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীরূপে পরিগণিত হয়ে জাতীয় গুরুত্বের অধিকারী হয়। কৃষির সমস্যা জাতীয় সমস্যার অন্যতম বৃহৎ উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়। সমগ্র ভারতের অর্থনীতির সাথে কৃষি জৈবিক বন্ধনের নিবিড়তায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভারতীয় গ্রামগুলির চাস-আবাদের সমস্যাগুলি (যেমন, জমির খণ্ডিকরণ, কৃষকের দারিদ্র্য, দুর্বিষহ ঋণের বোঝা, মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার, উচ্চমান সারের অভাব, গবাদি পশুর অপ্রতুলতা ও হীনস্বাস্থ্য কৃষকের শ্রমের ফসলে ভাগ বসাতে তৎপর শোষকের দল এবং ঔপনিবেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের খোদ কৃষকস্বার্থ বিরোধী নীতি) শুধুমাত্র গ্রামীণ জনতার লক্ষ্য ও উদ্বেগের বিষয় না থেকে সমগ্র ভারতীয় জনগণের চিন্তাভাবনা ও উৎকণ্ঠা জাগ্রত করতে থাকে। শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, পুঁজিপতি সকলেই ভারতীয় কৃষির মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন; কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের বাঁচা-মরার প্রশ্নটি সম্পর্কযুক্ত হয়। ভারতীয় কৃষির উন্নতি-অবনতি সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থের সাথে সংযুক্ত হয়ে জাতীয় গুরুত্বের অধিকারী হয়ে ওঠে।

অচিরেই ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও কৃষির গুরুত্বের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হতে থাকে। সকল রাজনৈতিক দল, দলগুলির অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল গোষ্ঠীসমূহ ও বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী সর্বভারতীয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য চিন্তাভাবনা শুরু করে। রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে কৃষির অনুন্নত অবস্থার জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হতে থাকে এবং রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলিতে কৃষির উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য জোরদার দাবি করা হতে থাকে। ভারতীয়

বুদ্ধিজীবীরা পুস্তক, নিবন্ধ, বক্তৃতা ও আলোচনায় কৃষির উন্নয়ন সাধনের জন্য সর্বভারতীয় পরিকল্পনা রচনা করতে থাকেন। চাষী, ভাগচাষী, রায়ত, জোতদার, আড়তদার এবং জমিহীন কৃষক প্রভৃতি চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত সকল ধরনের নরনারী নিজ নিজ স্বার্থের অনুকূলে কৃষিসংস্কারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। নানা ধরনের স্বার্থ কখনো মৌল ঐক্যে বিধৃত হয়ে, আবার কখনো পরস্পর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে ভারতীয় কৃষির শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ববিদীর্ণ সর্বভারতীয় রূপটিকে স্পষ্টতর করে তুলতে থাকে।

ত্রিশের দশকের বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক মন্দায় পর্যুদস্ত ভারতীয় কৃষি সকল স্তরের মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করে। কৃষক, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী এবং বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা সবাই কম-বেশী দুর্দশার মধ্যে পড়েন। মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় কৃষকদের দুঃখদারিদ্র্যের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলেও দরিদ্র চাষীদের পক্ষে অবস্থার উন্নতি ঘটান সম্ভব হয়নি। তারা শস্য গুদামজাত করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে পারত না বলে ব্যবসায়ীদের নির্দেশিত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য হত। বর্দ্ধিত মূল্যের সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু বাবসায়ীর মুনাফা লুটেছিল।

মন্দার বৎসরগুলিতে জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে সারা ভারতে সকল শ্রেণীর ভাড়াটে কৃষকদের রোষবহ্নি প্রজ্জলিত হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের বৎসরগুলিতে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি কৃষকসমাজের বিভিন্ন অংশের উপর বিভিন্ন রূপ ফলাফল বিস্তার করেছিল। কৃষির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর কৃষক নিজেদের মধ্যে স্বার্থসংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে; পূর্বেকার জমিদার বনাম কৃষক ঐক্য রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। মন্দা ও যুদ্ধের সম্মিলিত চাপে জমিদারশ্রেণীরও দুরবস্থা শুরু হয়। জমিদারি অ-লাভজনক হয়ে উঠতে থাকে।

ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক কৃষির সামাজিক ফলাফল

ঔপনিবেশিক পটভূমিতে ধনতান্ত্রিক লক্ষণাক্রান্ত ভারতীয় কৃষি সামাজিক জীবনে নানাবিধ ফলাফলের জনক হয়ে উঠেছিল। শ্রেণীসম্পর্কের ক্ষেত্রে উদ্ভূত পরিস্থিতির আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে করা হয়েছে। আর, কৃষিনির্ভর ভারতীয় সমাজজীবনে পরিলক্ষিত অন্যান্য ফলাফল নিম্নে বর্ণিত হয়েছে:

১. সীমাহীন দারিদ্র্য

জনৈক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতীয় 'সমৃদ্ধির মাত্রা' কৃষকসমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করেই নির্ধারণ করা সম্ভব। এরূপ পর্যালোচনা নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য দেয় যে, ব্রিটিশ ভারত মাঝামাঝি ধরনের সমৃদ্ধির মুখও দেখেনি কখনো। সারা ভারতে রায়তওয়ারি অঞ্চলগুলির কৃষকেরা ভূমিরাজস্বের দাবি পূরণ করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল; উত্তর ভারতের ভূমিব্যবস্থাও কৃষকদের উপর অত্যাচার কায়েম করতে কসুর করেনি (বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত)। একমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতেই চাষী প্রজাদের অবস্থা, আপেক্ষিক বিচারে, কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাদের অবস্থা সমৃদ্ধির কোন লক্ষণেই চিহ্নিত ছিল না।

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অধোগতিতে বিপুল সংখ্যক ভারতীয় কৃষির জমিতে ভীড় করে। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে কৃষকদের সর্বনাশ ও ধ্বংসের মুখোমুখি হতে হয়। তারা ছিল ভারতীয় জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ; তাদের নব্বুই ভাগের দৈনিক দু'বেলার অন্নসংস্থান ছিল না, ভদ্র জীবনের উপযোগী কাপড় ছিল না, মানুষের বসবাসের যোগ্য ঘরবাড়ি ছিল না। একশ বছরে এরূপ দরিদ্র ভারতের রূপকার ব্রিটিশ শাসন শান্তিশৃঙ্খলা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বের দাবি জানালে সপ্রশংস অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রয়োজন অতি সামান্য দাঁড়ায়। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে কয়েক বৎসর কৃষকের অধিকার, মর্যাদা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য উদারনৈতিক আইন রচিত হতে থাকে।[15] কিন্তু সেগুলিকে বাস্তবে খুব কমই প্রয়োগ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আইনের মর্মার্থ ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তর মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'-তিনটি দশকে ভারতে আইন ও প্রশাসনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল: 'জমির ফসলের উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মুষ্ঠি দৃঢ়তর করা, জমিদার ও প্রজা উভয়ের অধিকার বিলোপের ব্যবস্থা করা এবং কৃষিপ্রধান একটি জাতিকে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণবিহীন ইচ্ছার উপর অধিকতর নির্ভরশীল করে তোলা।'[16] ভূমিরাজস্বের পরিমাণের অনির্দিষ্টতা, উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ বিভিন্ন কারণে ও অজুহাতে কৃষকের হস্তচ্যুত করার পাকা বন্দোবস্ত, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর কর আরোপ এবং কৃষকস্বার্থ বিরোধী

সাম্রাজ্যবাদী নানারূপ ব্যবস্থা ভারতীয় কৃষকজীবনকে দরিদ্রতম পর্যায়ে অধঃপতিত করেছিল।

যন্ত্রপাতির সুবিধা বঞ্চিত, প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল, মান্ধাতার আমলের লাঙল ও হীনস্বাস্থ্য হালবলদের সহায়তায় কর্মরত এবং ঋণভারে জর্জরিত চাষীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভাবতীয় কৃষিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন 'অন্তর্গঠনের দিক থেকে অনুন্নত' রাখার জন্য প্রয়াসী ছিল। ভূমিরাজস্বের দাবি মেটাতে ও ক্ষুধার অন্ন জোগাতে চাষীকে উচ্চহার সুদে ঋণগ্রহণ করতে হত, মৌসুমি বৃষ্টির অভাবে অজন্মা দেখা দিলে তাকে পথের ভিখারী হতে হত। দুর্ভিক্ষের বছর কাতারে কাতারে কৃষক পরিবারের লোকজন মৃত্যুর শিকার হত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সাতবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, মারা গিয়েছিল আনুমানিক ১৫ লক্ষ লোক; দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল (১৮৫১-১৮৭৫-এ ৬ বার, আর ১৮৭৫-১৯০০তে ১৮ বার) এবং সরকারী হিসাবে মৃত্যুর অনুমিত সংখ্যা ছিল ২ কোটি।[17] ডব্লিউ. এস. লিলি 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইট্‌স প্রব্‌লেম্‌স' বইতে সরকারী তথ্য সংগ্রহ করে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর সংখ্যা নিম্নরূপে উপস্থাপিত করেছেন:

বৎসর	মৃত্যুর সংখ্যা
১৮০০-২৫	১,০০০,০০০
১৮২৫-৫০	৪০০,০০০
১৮৫০-৭৫	৫,০০০,০০০
১৮৭৫-১৯০০	১৫,০০০,০০০

ব্রিটিশ শাসন ভারতে দুর্ভিক্ষে ত্রাণব্যবস্থা পরিচালনায় দক্ষতা ও তৎপরতা প্রদর্শনের জন্য অভিনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু অন্ধ ব্রিটিশ-বিরোধী সমালোচকের সঙ্গেও এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে, ঐরূপ ত্রাণ সর্বগ্রাসী মৃত্যুর অগ্রসরমান উর্মিমুখর মহাসমুদ্রের বিরুদ্ধে বালির বাধের মত নগণ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল।

২. ঋণভারে ন্যুব্জ কৃষকসমাজ

বিগত শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গাহাঙ্গামার পর থেকে কৃষকদের ঋণগ্রস্ততার দিকে সরকারী নজর পড়তে শুরু করে। দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত কমিটি (১৮৭৫) হিসাব কষে দেখিয়েছিল যে, ঐ অঞ্চলের বাসিন্দাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৭১ টাকা। ১৮৮০ সাল নাগাদ ভারতীয় কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা ভয়াবহ পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশনের রায়ে দেখা যায় যে, 'জমিমালিক শ্রেণীগুলির এক-তৃতীয়াংশ গভীরভাবে এবং পরিত্রাণ লাভের উপায়হীন অবস্থায় ঋণভারে জর্জরিত ; আর, অন্তত এর সমান এক অংশের মুক্তিলাভ সাধ্যাতীত না হলেও, ঐ অংশও ঋণগ্রস্ত বটে।' তারপর দশক থেকে দশকে গ্রামীণ জনতার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯০১ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন তথ্য পরিবেশন করেছিলেন যে, বোম্বেতে এক-চতুর্থাংশ লোক ঋণের দায়ে জমি হারিয়েছিল। ১৮৯৫ সালে স্যর ফ্রেডারিক নিকলসন মাদ্রাজের গ্রামীণ ঋণভারের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা। ১৯১১ সালে ম্যাকলাগান সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ ঋণভারের পরিমাণ নির্ণয় করেছিলেন ৩০০ কোটি টাকা। ১৯২৫ সালে এম. এল. ডার্লিং অনুরূপ খাতে হিসাব দেখিয়েছিলেন ৬০০ কোটি টাকা। ১৯২৯ সালে ব্যাঙ্কব্যবস্থা অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে ৯০০ কোটি এবং ১৯৩৭ সালে কৃষিঋণ বিভাগের হিসাবে ১৮০০ কোটি টাকার গ্রামীণ ঋণের পরিসংখ্যান প্রদর্শিত হয়েছিল। সাইমন কমিশনের রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছিল যে, 'কৃষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহাজনদের কাছে ঋণী হয়ে বাঁচে।'

১৯২৯ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে গ্রামীণ ঋণের পরিমাণের বিপুল বৃদ্ধির প্রধান কারণ অবশ্য ছিল বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক মন্দা। কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হঠাৎ নিম্নগামী হলে ভারতীয় কৃষকদের আয় অর্ধেকের কম হয়ে পড়ে। কর ও ভূমিরাজস্বের বোঝা সমানই থাকে। জমিদারি অঞ্চলগুলিতে খাজনা দিতে অপারগ কৃষকবৃন্দ বনাম দাবিদার জমিদারদের মামলামোকদ্দমাতে অনাবশ্যক অর্থব্যয়ের ফলে কৃষকসমাজ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি মোকাবিলায় সরকারী প্রয়াস প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য ছিল। ১৮৮৩ সালের ভূমি উন্নয়ন ঋণের আইন এবং ১৮৮৪ সালের কৃষকদের জন্য ঋণের আইনের বিধান অনুযায়ী 'টাকাভি' ঋণদান নীতি অর্থের

অপ্রতুলতায় ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়। স্যর ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ন এবং স্যর রেমণ্ড ওয়েস্টের কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশ সরকারী উৎসাহ লাভে বঞ্চিত হয়। স্যর ফ্রেডারিক নিকলসনের জমিব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব আকাশকুসুমে পরিণত হয়।

লর্ড কার্জনের সময় (১৮৯৯-১৯০৫) গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি আইন (১৯০৪) রচিত হয়। উদ্দেশ্য সাধনে এই আইন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কার্জন।[18] তাঁর ধারণা ছিল যে, সমস্যাটির উৎপত্তির কারণ চাষীদের অমিতব্যয়িতা ও মামলামোকদ্দমার প্রতি আসক্তির মধ্যে নিহিত ছিল। এই কারণে ১৯০৪ সালের আইন 'কৃষক, কারিগর ও সীমিত সামর্থের ব্যক্তিদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন ও সহযোগিতা' গড়ে তোলায় উৎসাহ দিতে প্রণীত হয়েছিল। ঐ সমিতিগুলির অর্থসঙ্কুলানের ব্যবস্থা তিনি করতে চেয়েছিলেন কৃষক, কারিগর প্রভৃতি মানুষের 'সম্মিলিত সঞ্চয়' থেকে এবং ঐ অর্থ ঋণভার প্রশমনে ও ভাবী ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনা দূর করতে ব্যবহার করার জন্য ১৯০৪ সালের আইন নির্দেশ দিয়েছিল। দরিদ্র মানুষদের সঞ্চয় একত্রিত করে গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি দূর করার চেষ্টা কয়েক বালতি জলের সাহায্যে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড প্রশমনের প্রয়াসের সমতুল ছিল। ১৯০১-০৫ সালে ১২,০০০ সমবায় সমিতির চলতি মূলধন ছিল ৫,৪৮,০০,০০০ টাকা; ১৯১৬-২০ সালে ২৮,০০০ সমবায় সমিতির চলতি মূলধন ছিল ১১,৫১,৮০,০০০ টাকা।[19] সাড়ে এগার কোটি টাকার মূলধন ১৯২১ সালে গ্রামীণ ঋণের বোঝা (রক্ষণশীল হিসাব মতে: ৪০০,০০০,০০০ পাউণ্ড) লাঘব করার ক্ষেত্রে বিশাল মরুভূমিতে ক্ষুদ্র মরুদ্যানের বেশী কিছু প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম হয়নি।

কার্জন যা বুঝে উঠতে পারেননি তা হল এই: গ্রামীণ ঋণের সমস্যাটি ভারতীয় কৃষকদের অভ্যাস, স্বভাব ইত্যাদির সঙ্গে যতটা যুক্ত ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী যুক্ত ছিল কৃষিতে লিপ্ত বা সম্পর্কযুক্ত মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে। অর্থাৎ, জমিদার-প্রজা, সরকার-কৃষক সম্পর্কের সাথে যুক্ত খাজনা ও ভূমিরাজস্বের বোঝার পরিমাণ গ্রামীণ ঋণের পরিমাণের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ছিল। অনুন্নত অর্থনীতি ও সুদের চড়া হার বোঝার ভার দীর্ঘস্থায়ী করতে সহায়ক হয়েছিল।

১৯০০ সালে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের কয়েকজন প্রখ্যাত

ইংরাজ কর্মচারী ও বিচারক লণ্ডনে আলোচনায় মিলিত হয়ে সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে খাজনা, ভূমিরাজস্ব ও ভূমিস্বত্ব সম্পর্কে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন। ঐ স্মারকলিপির মূলকথা ছিল প্রত্যেক প্রদেশের ভূমিকর, খাজনা, ভূমিরাজস্ব ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদে নির্দিষ্ট করে দেবার সুপারিশ। স্যর রিচার্ড গার্থ ও স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্নের মত স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম ঐ স্মারকলিপিতে উল্লেখ ছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ঐ একই সময়ে ভাইসরয়ের কাছে ঐ স্মারকলিপির অনুরূপ মর্মে কয়েকটি খোলা চিঠি লেখেন। কিন্তু স্মারকলিপি বা চিঠি সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কোনরূপ পরিবর্তনে সক্ষম হয়নি। জন লরেন্সের ক্যালভিন-অনুসারী কর্মোদ্যোগ বা চার্লস উডের উদার-নৈতিক মানবতাবাদ থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছিল।[20] ব্রিটিশ অভিভাবকত্বে ভারতবাসীর মঙ্গলবিধান তত্ত্বে বিশ্বাসী কার্জন খাজনা ও ভূমিরাজস্বের নির্দিষ্ট হার প্রবর্তনে সম্মত হননি; ভূমিরাজস্ব পাঁচ বছর (বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) বা সাত বছর (অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশ) বাদে বাদে নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন। খাজনার পরিমাণ অযোধ্যায় শতকরা ৬½ ভাগে সীমিত হয়েছিল, মধ্যপ্রদেশে ৩৩ ভাগে। বঙ্গদেশে মূল প্রজার খাজনার চেয়ে উপ-প্রজার ক্ষেত্রে শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি কার্জনের আইনের অনুমোদন লাভ করেছিল। বঙ্গদেশের ভূমি-স্বত্ব আইনের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা তিনি প্রয়োজন বোধ করেননি।

কার্জন-পরবর্তী ভারতে রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। জমিদারশ্রেণী শুধুমাত্র খাজনা প্রাপকের ভূমিকা পালনে রত থাকে। এই শ্রেণীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১১ ও ১৯২১ সালের আদমসুমারি থেকে দেখা যায় যে, প্রতি ১০০ খাজনা প্রাপকের অধীনস্থ কৃষকদের সংখ্যা প্রতিটি প্রদেশে হ্রাস পেতে থাকে[21]:

প্রদেশ	১৯১১	১৯২১
বঙ্গদেশ	২,৭৪৩	২,৪০৭
বোম্বে	১,৯১৩	১,৬২৫
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৬,১২৫	৩,৮০৮
মাদ্রাজ	২,৩৮০	৭৭৯
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১,৩৪৭	৯০
পাঞ্জাব	১,১৪৬	১,০৯৮

অ-কৃষক শ্রেণীগুলি ব্রিটিশ ভারতে কৃষকশ্রেণীগুলির শ্রমের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কৃষি বা কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহান্বিত ছিল না।

দরিদ্র, শোষিত, মূঢ়, মূক ভারতীয় কৃষকসমাজের পক্ষে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে চাষবাস করা সম্ভব ছিল না। আর্থনীতিক বাজারে কোণঠাসা হয়ে এবং সরকারী পাওনার দায় মেটাতে তাদের ঋণ গ্রহণ করতে হত; আবার, ঋণের সুদাসল মেটাতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ত। এই সর্বনাশের ফলে তারা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ত। এই আবর্ত তাদের দারিদ্র্যকে ঘনীভূত করে ক্রমশ মরা-বাঁচার সীমারেখার প্রান্তে নিক্ষিপ্ত করেছিল।

৩. কৃষিজমির খণ্ডিকরণ

ভারতীয় জনগণের তিন-চতুর্থাংশ ব্রিটিশ আমলে কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বিনষ্ট করে ব্রিটেন ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশে পরিণত করলে জমির উপর ভারতবাসীর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আদমসুমারির সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানগুলি লক্ষ্য করলে কৃষির উপর ক্ষতিকারক, অপচয়মূলক, বিপুল চাপের বিশালতা অনুভব করা যায়; শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসাধারণের সংখ্যা যখন শতকরা হিসাবে ৪ থেকে ৫ ভাগের বেশী কখনো ছিল না, তখন কৃষির উপর নির্ভরশীল ভারতীয়দের সংখ্যা শতকরা হিসাবে নিম্নরূপ ছিল[22] :

১৮৯১	৬১·১
১৯০১	৬৫·৫
১৯১১	৭২·২
১৯২১	৭৩·০
১৯৩১	৭৫·০

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে কৃষিজমিতে জনতার এরূপ চাপ কখনো পরিলক্ষিত হয়নি। ১৮৮০ সালে দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, যথোপযুক্ত চাষবাসের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যার তুলনায় উদ্বৃত্ত বিশাল

একটি জনসংখ্যা কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হিসাবে বিরাজিত। ১৮৮০ সালের পরে ঐ নির্ভরশীলতা প্রতি দশকে বেড়ে চলে। অথচ আবাদযোগ্য ৩০·৬ ভাগ জমি জলসেচের অভাবে এবং সরকারী অনুদান বা অন্য কোন আর্থিক সাহায্যের নীতি গ্রহণের অনীহায় ব্রিটিশ আমলে অনাবাদী রয়ে যায়।

পশ্চিমী দেশগুলিতে শিল্পায়ন কৃষি থেকে সরিয়ে জনসাধারণের এক বিশাল অংশকে শিল্পে নিযুক্ত করে। জনসংখ্যার চাপমুক্ত কৃষি শিল্পে উৎপাদিত যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে কৃষিউৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হয়, আর শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকবৃন্দ বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সুযোগে মাথাপিছু উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি ঘটায়। ভারতে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ; আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার হারের চেয়ে দেশীয় শিল্প ধ্বংসের হার বেশী থাকায় কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের অবকাশ কখনো ঘটেনি। ইউরোপীয় দেশগুলির অভিজ্ঞতার তুলনায় ভারতের অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ হয়েছিল। আধুনিক কিছু কিছু শিল্পের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও ব্রিটিশ আমলের ভারত 'শিল্পায়ন-অধোগামিতা' প্রত্যক্ষ করেছিল। ১৮৭৬ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ফরাসী দেশে কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা শতকরা ৬৭·৬ থেকে ৫৩·৬, ১৮৭৫ থেকে ১৯১৯ সালে জার্মানীতে অনুরূপ সংখ্যা ৬১ থেকে ৩৭·৮, ১৮৭১ থেকে ১৯২১ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে ঐ সংখ্যা ৩৮·২ থেকে ২০·৭ এবং ডেনমার্কে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা ১৮৮০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে ৭১ থেকে ৫৭ ভাগে নেমে আসে। আর, ভারতে ১৮৯১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে কৃষির উপর নির্ভরশীল শতকরা জনসংখ্যার ভাগ ৬১·১ থেকে বেড়ে ৭৫·০ ভাগে দাঁড়ায়।[23]

কৃষিজমির উপর জনসংখ্যার বিপুল চাপ জমির খণ্ডিকরণ অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। আরও বহুবিধ কারণ কৃষিজমির ভাগাভাগি ও খণ্ডিকরণ সমস্যার উদ্ভব ঘটায়। কৃষিজমিতে ব্যক্তিমালিকানার উদ্ভব একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থায় কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেয়। একান্নবর্তী পরিবার বিভক্ত হয়ে পড়লে কৃষিজমিও বিভক্ত হয়ে পড়ে।

জমিদার, জমিমালিক, এমন কি প্রজারাও খাজনার প্রতিশ্রুতিতে জমির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ জমি ভূমিহীন চাষীদের চাষ করতে দিলে কৃষিক্ষেত্র খণ্ডিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না।

জমির খণ্ডিকরণ ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলির হঠাৎ ব্যাপক ধ্বংসের

ফলে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ; আধুনিক শিল্পগুলিতে সর্বস্বান্ত কারিগরদের একাংশ শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হলেও বিশাল অংশ কৃষিজমিতে ভীড় করে।

ধনতান্ত্রিক কৃষির জন্মের সাথে সাথে পশ্চিমী দেশগুলিতে সংবদ্ধ, বিশাল আয়তন খামারের সৃষ্টি হতে থাকে। ভারতে অনুরূপ ঘটনা ঘটেনি। 'ল্যাণ্ড প্রবলেম্‌স ইন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখার্জী উল্লেখ করেছিলেন, কোন কোন অঞ্চলে খণ্ডিত কৃষিজমি এমন ক্ষুদ্রায়তন হয়ে পড়েছিল যে, লাঙল চালান অসম্ভব ছিল ; কোদাল, বেলচা ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হত। এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত হতে বাধ্য।

ক্ষুদ্র ক্ষেতজমিতে চাষাবাদে রত কৃষক দরিদ্র জীবনযাপন করত। জমিতে উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষমতা তার ছিল না। আধুনিক যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সার এবং স্বাস্থ্যবান হালবলদের সংস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ক্ষুদ্র ক্ষেতজমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষক দরিদ্র ছিল, আবার এই দারিদ্র্যের কারণেই জমির উৎপাদনশক্তি বাড়াতে না পেরে কৃষক আরও দরিদ্র হয়ে পড়ত। সমকালীন সমীক্ষা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, একর প্রতি কৃষি-জমিতে ভারতীয় কৃষকের আয় ২৫ টাকা হলে, জাপানী কৃষকের আয় অন্তত তার পাঁচগুণ ছিল।[24]

পশুখাদ্যের অভাব খণ্ডিত-বিখণ্ডিত জমির মালিক বিশেষভাবে অনুভব করেছিল। খড়বিচালি যথেষ্ট না থাকায় ও খাদ্যাভাবের জন্য হালবলদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

উপরোক্ত বহু কারণের কারসাজিতে ভারতীয় কৃষি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে পারেনি। গ্রামীণ শিল্পগুলি ধ্বংসের ফলে কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্য নষ্ট হলে কোটি কোটি ভারতবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিজমিতে ভীড় করে উৎপাদন ব্যাহত করে। রজনীপাম দত্তর ভাষায় বলা যায় যে, ভারতীয় কৃষি ব্রিটিশ 'সাম্রাজ্যবাদের উপাঙ্গ' বা অনুবন্ধের অমর্যাদায় বিধৃত হয়।

৪. বাণিজ্যিক কৃষির উদ্ভব

সমগ্র ভারতের সর্বত্র কৃষিতে একই ধরনের ভূমিসম্পর্ক স্থাপন না করলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভূমিরাজস্ব টাকাকড়ির মাধ্যমে গ্রহণের রীতি চালু করে বিপ্লবাত্মক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে। জমির মালিকানার ধরন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সমরূপ না হলেও সর্বত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতি

প্রচলিত হয়েছিল। ফলে, জমির মালিক আর্থনীতিক বাজারের প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল ফলাতে উৎসাহী হয়, নগদ অর্থলাভ করে ভূমিরাজস্ব বা খাজনা ইত্যাদির দায় মেটাতে এবং জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে তৎপর হয়। নির্দিষ্ট গ্রামীণ সম্প্রদায়ের খাদ্য যোগানর দায়িত্ব তাদের স্কন্ধ থেকে প্রত্যাহৃত হলে তারা নিজেদের লাভ-লোকসান বুঝে শস্য নির্বাচন ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে সুযোগ লাভ করে। বাজারনির্ভর চাষবাসের এই প্রবণতা বাণিজ্যিক কৃষি নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

জমিদার ও জমিমালিকদের প্রজা, উপ-প্রজা প্রভৃতিরাও বাজারের মতিগতি বুঝে নগদ অর্থলাভের প্রয়োজনে কৃষিকার্য পরিচালনা করতে অভিলাষী হয়। জমিদারি খাজনা, প্রজাকে দেয় অধস্তন প্রজার খাজনা এবং মহাজনকে দেয় সুদ বা আসলের অংশ ইত্যাদি নানা ধরনের দাবি মেটানর জন্য কৃষকের পক্ষে তেজী বাজার-চাহিদাযুক্ত ফসল উৎপাদনের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কোন বিকল্প থাকে না। জমির উর্বরাশক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পরস্পর সংলগ্ন গ্রামগুলি এক-একটি বিশেষ বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে বুৎপত্তি অর্জন করে বিশেষিত হতে থাকে—যেমন, কোন কোন গ্রাম তুলা, কোন কোন গ্রাম পাট, আবার কোন কোন গ্রাম গম, তৈলবীজ বা আখ উৎপাদনে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে থাকে।

নেপোলিয়নের পতনের পর ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ইউরোপের বাজার ছেয়ে ফেলতে থাকে। ব্রিটেনের মত ক্ষুদ্র দেশে স্থানীয় ফ্যাক্টরিগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল রকম কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব ছিল না। কাজেই উপনিবেশগুলি থেকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সুলভে আমদানি করে শিল্প-বিপ্লবের মুনাফায় স্ফীতোদর ফ্যাক্টরিগুলির চাহিদা মেটাতে ব্রিটিশ সরকারকে উদ্যোগী হতে হয়েছিল। আর্থনীতিক নীতির নানা ফন্দীফিকিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে ব্রিটেনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এভাবে খান্দেশ, বেরার ও গুজরাট অঞ্চলে তুলা এবং পূর্ববঙ্গে পাটের উৎপাদন বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

রপ্তানিযোগ্য ফসল না হলেও উৎপাদন অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট শস্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে : ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গদেশ চাল, পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশ গম এবং দাক্ষিণাত্য তামাক ফলাতে বিশিষ্ট হতে থাকে। বিশেষিকরণের ফলে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং উৎপন্ন ফসলের সিংহভাগ বাজারে আসতে শুরু করে।

সরকারী খাজনা বা রাজস্ব মেটাতে ও মহাজনের সুদ দিতে নগদ অর্থের আশু প্রয়োজন থাকায় চাষী মাঠ থেকে ফসল তুলেই বাজারে হাজির হত বা মাঠ থেকেই ফড়ে, ব্যবসায়ীদের হাতে ফসল নগদ অর্থের বিনিময়ে তুলে দিত। ব্রিটিশ আমলে আধুনিক যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থার বিস্তার কৃষির পণ্যসম্ভার ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারগুলিতে বা বন্দরগুলিতে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলে ভারতীয় কৃষি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কৃষি ও শিল্পের যুগযুগান্তব্যাপী কূপমণ্ডুক সংবদ্ধতা হারিয়ে যেতে থাকে। ভারতীয় কৃষির সামনে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের বাজারের দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ভারতের কৃষিউৎপাদনের সাথে বিশ্বের বাজার-দরের ওঠানামার সংযোগ ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্বের ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিমালিকানার প্রতিষ্ঠা, মুনাফার জন্য উৎপাদন ও ধনতান্ত্রিক বাজারের সুবিধা-অসুবিধায় অংশগ্রহণের সুযোগে ভারতীয় অর্থনীতির মধ্যযুগীয় স্থবিরতা ঘুচতে থাকে। ভারতীয় ভূমিসম্পর্কের পরিবর্তনের হাত ধরে বাণিজ্যিক কৃষি ধনতন্ত্রের বিকাশে সহায়ক হয়ে উঠতে থাকে।

বাণিজ্যিক কৃষি নির্দিষ্ট ফসলের অধীনে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে বিশিষ্ট করে ক্ষেতজমির সুষ্ঠু আর্থনীতিক ব্যবহার কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিত করে। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক কৃষি চাষবাসের মুনাফাবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। তবে ঐ মুনাফা চাষীর ভাগ্যে জুটেছিল অতি সামান্য।

পশ্চিমী দুনিয়ায় কৃষিপণ্যের উদ্বৃত্ত ও গ্রামীণ শ্রীবৃদ্ধির সাথে বাণিজ্যিক কৃষির উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি জড়িত ছিল। বাণিজ্যিক কৃষি চাষীদের বিভিন্ন পণ্য ও শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিশেষিত করে এবং ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের অধীন করে জাতীয় উৎপাদনের বিপুল বৃদ্ধি ঘটায়। ধনতান্ত্রিক কৃষির বিকাশের এই 'স্বাভাবিক' রূপটি ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বেশ কিছুটা বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিক রূপ বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ও জবরদস্তিমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে নির্ধারিত হয়েছিল।[25]

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক রূপের প্রকৃতি একরকম ছিল না। চা উৎপাদন ব্রিটিশ মালিকানায় সংগঠিত হয়েছিল। নামমাত্র মজুরিতে নিযুক্ত

ভারতীয় শ্রমিকেরা প্রায় ক্রীতদাসের জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। অগ্রিম দাদন দিয়ে নীলচাষীদের নানারূপ বাধ্যবাধকতায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ও পীড়নমূলক কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করে সাহেব নীলকরেরা আন্তর্জাতিক বাজারে মুনাফা লুটেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সারা দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে ভারতের বহির্বাণিজ্য, জাহাজ চলাচল ও বীমাব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কর্তৃত্ব বজায় ছিল। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লভ্যাংশের সিংহভাগ ঐ শ্রেণীরই করায়ত্ত হয়েছিল। বাদবাকি অংশের বেশীর ভাগ ভারতীয় বণিক ও মহাজনদের মুনাফা বাড়িয়েছিল। কৃষকদের লাভ হয়েছিল সামান্যই। সংযুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার আখ উৎপাদনকারী, পাঞ্জাব ও মাদ্রাজের কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী বদ্বীপ অঞ্চলের কার্পাস উৎপাদনকারী বা পূর্ববঙ্গের পাটচাষী আন্তর্জাতিক বাজারের অনুকূল পরিস্থিতিতেও জমিদার, মহাজন ও বণিকদের প্রাপ্য মিটিয়ে বিত্তবান হয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতীয় চাষী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাথে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের মধ্যস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সদা-পরিবর্তনশীল চড়া আন্তর্জাতিক বাজার-দামের সুবিধা তারা খুব কমই গ্রহণ করতে পারত, অথচ পড়ন্ত বাজার-দামের সব রকম ক্ষতি ও লোকসান তারাই বহন করতে বাধ্য হত।

ভূমিরাজস্ব ও খাজনার দায় মেটাতে চাষীরা দরিদ্র মানুষের কম দামী খাদ্যশস্য (বাজ্‌রা, জোয়ার, ডাল ইত্যাদি) না ফলিয়ে বেশী দামী খাদ্যশস্য বা বাণিজ্যপণ্য ফলাতে উৎসাহী হত। ফলে, দুর্বৎসরগুলিতে গরীব মানুষদের দুঃখদারিদ্র্য চরম পর্যায়ে পৌছুত।

টাকা ও পাউণ্ড স্টার্লিং বিনিময় এত উচ্চ হারে বাঁধা ছিল যে, আন্তর্জাতিক বাজারে হীনবল হয়ে উঠলে টাকার নাভিশ্বাস ঘটত। বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশকে পৃথিবীব্যাপী মন্দার সময় ভারতীয় কৃষকের দুর্দশার অন্যতম কারণ ছিল টাকা ও পাউণ্ডের কৃত্রিম উচ্চ বিনিময় হার।

ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তর ধনতান্ত্রিক কৃষির সুষ্ঠু বিকাশ না ঘটিয়ে চাষীর দুঃখদুর্দশাকে দীর্ঘস্থায়ী করে ব্রিটিশ ধনিক ও ভারতীয় বণিক এবং মহাজনদের মুনাফা অর্জনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। ক্লিফোর্ড গীরট্‌জ ওলন্দাজ-শাসিত জাভায় 'কৃষির কুণ্ডলীকরণের প্রক্রিয়া' বর্ণনা করেছেন।[26] অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া ভারতেও ক্রিয়াশীল

থেকে চাষীর দুঃখদুর্দশা অথবা বাড়িয়েছিল, বিনিময়ে তাকে আর্থিক সঙ্গতি বা স্বস্তি দিয়েছিল সামান্যই।

ভারতীয় কৃষকসমাজ বাণিজ্যিক কৃষির উৎপত্তির ফলশ্রুতি হিসাবে গ্রামীণ কারিগর, তাঁতী প্রভৃতিদের শিল্পদ্রব্য থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষকদের দেয় বাৎসরিক ফসল সরবরাহ বন্ধ হলে একদিকে যেমন গ্রামীণ শিল্পগুলি দুর্বল হতে থাকে, কৃষকরাও তেমন শিল্পদ্রব্যের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটাতে নিকটবর্তী শহর, হাট বা বাজারের শরণাপন্ন হতে থাকে। বন্দর, রাস্তাঘাট ও দ্রুত যানবাহনের বিকাশ ঘটলে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ভারতীয় গ্রাম ও নগরের বাজার দখল করতে থাকে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকলগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় তাঁতীরা পিছু হঠতে শুরু করে; শেফিল্ড, লিভারপুল, ম্যানচেষ্টার, বার্মিংহাম প্রভৃতি শিল্পনগরগুলির লৌহ ও ইস্পাতনির্মিত দ্রব্য ভারতীয় কারিগরদের সর্বনাশ ডেকে আনতে থাকে। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র ভারতীয় কৃষির গ্রামীণ কূপমণ্ডুক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ভেঙ্গে জাতীয় কৃষির রূপকার হলেও ভারতের দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। আবার ভারতীয় কৃষিকে ব্রিটেনের শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহে প্রলুব্ধ করে (প্রধানত শুল্কনীতির কারসাজিতে) এবং ভারতের দেশীয় শিল্পগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতে ধনতন্ত্রের ঔপনিবেশিক একটি ঐতিহাসিক ধাঁচ রচনায় ব্রতী হয়েছিল।

বাণিজ্যিক কৃষি ভারতে শিল্পবিপ্লবের পূর্বসূরী বা সহোদর হিসাবে আবির্ভূত হয়নি। ভারতে যে ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তার স্বরূপ বুচানন নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছিলেন:

'ভারত যেসব পরিবর্তনগুলির সম্মুখীন হয়েছে সেগুলিকে শিল্পবিপ্লব বলে বর্ণনা না করে বাণিজ্যিক বিপ্লব বলা শ্রেয়। দেশের বিশাল আকৃতি ও বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় ফ্যাক্টরিশিল্প এখন পর্যন্ত অত্যন্ত নগণ্য।

রেলওয়ে প্রবর্তন এবং অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের বিকাশ গম, তুলা, পাট, চা ইত্যাদি ধরনের বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে বিশেষিকরণ ঘটিয়েছে। পূর্বে স্থানীয় কারিগরদের স্থানীয় ব্যবহারেই গ্রামের কৃষির কাঁচা ফসল ব্যয়িত হত, (এখন) প্রধানত ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ফ্যাক্টরিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত বিশেষিকৃত পণ্যদ্রব্য রপ্তানি হয়ে থাকে। ভারতীয় গ্রামীণ কারিগরদের তুলনায় ইউরোপীয় উৎপাদকেরা রেলওয়ে ও বাষ্পচালিত

জাহাজের সুবাদে ভারতীয় কৃষকদের সুবিধাজনক শর্ত দিতে সক্ষম হত। বলাই বাহুল্য, ভারতীয় কারিগরদের প্রচণ্ড অসুবিধার কারণ হলেও আন্তর্জাতিক বিশেষিকরণ ও বাণিজ্যের পাল্লায় স্থানীয় অর্থনীতি স্থানচ্যুত হয়েছে।'[27]

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলুপ্তি

কার্ল মার্কস 'নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এ ১৮৫৩ সালের ১০ই জুনের 'দি ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' নিবন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'ভারতের আধা-বর্বর, আধা-সভ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থনীতিক ভিত্তি গুঁড়িয়ে দিয়ে ব্রিটেন এশিয়ায় সর্বপ্রধান, প্রকৃত পক্ষে একমাত্র, সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছিল।'[28] প্রাচীন সভ্যতার বিলুপ্তি, বংশানুক্রমিক পেশা বা বৃত্তি থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন এবং অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার সাগরে তাদের নিমজ্জমান অবস্থা তাঁকে গভীর বেদনাহত করলেও, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ঐ বিপ্লবকে গ্যেটের কাব্যসুষমামণ্ডিত চারটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কেন জানিয়েছিলেন ?

প্রথমত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের শক্ত বনিয়াদ রচনা করেছিল। মানুষের চিন্তা ও মননকে উদ্যমহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কূপমণ্ডূক করে এগুলি স্বৈরতন্ত্রের ধারক ও বাহকে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি বর্ণপ্রথা ও ক্রীতদাস ব্যবস্থার অস্তিত্বে সংক্রামিত হয়ে উঠেছিল।

তৃতীয়ত, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি মানুষের অন্তরাত্মাকে ভুবনবিজয়ীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত না করে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাসে পরিণত করেছিল। ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজিক সংগঠনের হাতে জীবন ও জীবিকার সব কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে ভারতীয় জনসাধারণ অধঃপতিত অস্তিত্বে অভ্যস্ত হয়েছিল। সার্বভৌম মানুষের রূপকার না হয়ে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি উদ্যমবিহীন, আত্মসমর্পণে উদগ্রীব, চিরাচরিত নিয়মকানুন বিনা বাক্যব্যয়ে মান্য করতে উন্মুখ এবং প্রাকৃতিক বস্তু বা জীবজন্তুর আরাধনায় তৃপ্ত মানুষ তৈরীতে লিপ্ত ছিল।

'হিন্দুস্থানে সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে ইংল্যাণ্ড নিঃসন্দেহে জঘন্যতম স্বার্থসমূহের তাড়নায় প্রভাবিত হয়েছিল এবং ঐগুলি চরিতার্থ করতে

নির্বোধের আচরণ করেছিল।' তা সত্ত্বেও মার্কস মানবমুক্তির স্বার্থে এই সামাজিক বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী মনে করেছিলেন। '...ইংল্যাণ্ডের অপরাধগুলি যা-ই হোক না কেন, মার্কস লিখেছিলেন, 'ঐ বিপ্লব সংঘটনে ইতিহাসের অসচেতন হাতিয়ার হিসাবে' ঐ দেশ ক্রিয়াশীল ছিল।[২৭]

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অভ্যন্তরস্থ কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের নিবিড় ঐক্য শেষ পর্যন্ত ভেঙ্গে দিতে সক্ষম হয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় প্রাচীন সমাজের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানে। কৃষির সাথে অধস্তন জৈবিক সহযোগিতায় আবদ্ধ হস্তশিল্প ও কারিগরশিল্পের মধ্যযুগীয় আদর্শটিকে শতাব্দীব্যাপী নিরন্তর চেষ্টায় পর্যুদস্ত করতে ঐ শাসন সক্ষম হয়েছিল। বয়নশিল্প ভারতের শিল্পগুলির মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী অগ্রগণ্য ছিল; সারা পৃথিবীর বাজারে ভারতীয় বস্ত্রের উৎকর্ষ ও শিল্পকর্ম সমাদৃত হত। ব্রিটিশ শাসন ভারতের 'তাঁত ভেঙ্গে দেয়, আর ঘূর্ণমান চাকা ধ্বংস করে।' তারপর ইউরোপের বাজার থেকে ভারতীয় বস্ত্রের বহিষ্কার ছলে-বলে-কৌশলে সম্ভব করে। এরপর ব্রিটিশ মিলগুলির সুতো ভারতে রপ্তানি শুরু হয়—১৮২৪ সালে মাত্র ১,০০০,০০০ গজ, ১৮৩৭ সালে ঐ পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ৬৪,০০০,০০০ গজে দাঁড়ায়। ঢাকার জনসংখ্যা ১,৫০,০০০ থেকে কমে ২০,০০০ এ নামে। ব্রিটিশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়ে বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত ভারতীয় শহরগুলির পতন ঘটে। এরূপ পতন যে ব্রিটিশ শাসনের সবচেয়ে নিন্দনীয় ফলশ্রুতি ছিল এমন নয়। সারা ভারত জুড়ে কৃষি ও শিল্পের ঐক্য ভাঙতে ব্রিটিশ বাষ্পশক্তি ও প্রযুক্তিবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্বও নিয়োজিত হয়েছিল।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ব্রিটিশ প্রণীত আইনের বিধানে স্ব স্ব গ্রামের আশপাশের তৃণভূমি ও বনভূমি ব্যবহারের অধিকার হারালে কৃষির চরিত্র পরিবর্তিত হতে থাকে। কৃষিভূমি, বনভূমি ও তৃণভূমি সর্বত্র ব্যক্তিমালিকানা বা রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রবর্তিত হলে গ্রামীণ জনসাধারণের পূর্বতন পারস্পরিক আর্থনীতিক সহযোগিতার প্রয়োজন হ্রাস পেতে থাকে। বাজারে কৃষিদ্রব্য বিক্রি করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার লক্ষ্য গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সমষ্টিবদ্ধ জীবনের ভিত্তিমূলে ভাঙন ধরাতে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক সম্পর্কের উদ্ভব আর্থ-সামাজিক সহযোগিতামূলক সম্পর্কগুলির অবসান ঘটাতে থাকে।

গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির নিজস্ব কাজকর্মগুলি প্রয়োজনের অভাবে বা

অব্যবহারে বিলীন হতে থাকে। গ্রামরক্ষা, গ্রামবাসীদের বিবাদ মীমাংসা ইত্যাদি কাজগুলি প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ঐক্য ও সামরিক বন্ধনে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ভারতের গ্রামগুলি আধুনিক সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক সম্পর্কের বিকাশ এই ঐক্যবন্ধনের শক্তিকে জোরদার করতে থাকে। আধুনিক যানবাহন ও সংযোগব্যবস্থার বিকাশ গ্রামগুলির আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ভাঙ্‌তে শুরু করে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে ভারতীয় জনজীবনের বিপুল পরিবর্তনের সাথে কে. এস. শেলভাঙ্কর ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের মানুষের জীবনের পরিবর্তনের সাদৃশ্য বর্ণনা করেছেন। মধ্যযুগীয় কাঠামোটির ধ্বংস, বিদেশী ব্যবসায়ীর অনুপ্রবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে চুক্তিসম্পর্কের বিস্তার, ব্যক্তিগত দায়-দায়িত্ব ও কর্মোদ্যোগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ মানুষের আবির্ভাব ষোড়শ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। শেলভাঙ্করের মতে অনুরূপ একটি বিশিষ্টতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারত বিধৃত হয়ে উঠেছিল।

ইতিহাসের অসচেতন প্রগতিশীল হাতিয়ার

ব্রিটিশ শাসনের ফলে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বিলোপ ঘটলেও, ঐতিহাসিক দিক থেকে ঐ কাজ সম্ভাব্য প্রগতিশীল তাৎপর্যে বিধৃত ছিল। এ. আর. দেশাই অভিমত প্রকাশ করেছেন, গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলুপ্তিতে 'আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল অশ্রু বিসর্জনের প্রয়োজন নেই।'[৩০]

অশ্রুজলে প্রতিক্রিয়াশীলতার মিশ্রণ নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির ধ্বংসের করুণ ইতিবৃত্ত ও সম্ভাব্য প্রগতিশীল তাৎপর্যের ক্রমহ্রাসমান পরিণতি অশ্রু সংবরণের উপায় রাখে না।

১৮৫৩ সালে 'নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এ লেখা দুটি নিবন্ধে কার্ল মার্কস এশীয় সমাজের চরিত্র ও ঐ সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছিলেন। এশীয় সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় উদাহরণ হিসাবে তিনি ভারতের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, প্রাচ্য-দেশীয় জনসাধারণের 'বিক্ষিপ্ত' অবস্থান ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায়গত জীবনে তাদের সমাবেশ প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের বনিয়াদ হিসাবে যুগযুগান্ত ক্রিয়াশীল ছিল। প্রাচ্যদেশের সভ্যতার নিম্ন পর্যায় ও ভূঅঞ্চলের বিশালত্ব

খাল ও জলাধারের মাধ্যমে কৃত্রিম জলসেচকে প্রাচ্যদেশীয় কৃষির ভিত্তি হিসাবে গড়ে তুলেছিল। এরূপ কৃষিব্যবস্থা এশীয় স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারে স্থায়িত্ব এনে দিয়েছিল। প্রাচ্যদেশীয় গ্রামগুলির ভূমিকা সম্পর্কে ও প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে এঙ্গেল্‌স ও লেনিনের ধারণা মার্কসের ধারণার সাথে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত।

অ্যাডাম স্মিথ চীন ও 'এশিয়ার কতিপয় সরকারের জলপ্রবাহ বিষয়ক কর্মোদ্যোগের সাদৃশ্য' লক্ষ্য করেছিলেন। চীন, ভারত ও প্রাচীন মিশরের শাসকদের মধ্যে সম্পদ আহরণের ক্ষমতা সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছিলেন। জেম্‌স মিল এশীয় সরকারের একটি ছককে প্রাচ্যদেশীয় সার্বজনীন নমুনা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এশীয় সমাজের সাথে ইউরোপীয় সামন্তবাদী সমাজের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক মনে করেছিলেন। মার্কস যখন তের বৎসরের কিশোর তখনই রিচার্ড জোন্‌স (১৮৩১ সালে) এশীয় সমাজের সামগ্রিক চিত্রটি অঙ্কণ করে ফেলেছিলেন। ১৮৪৮ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল এশীয় সমাজ সম্পর্কিত ধারণাটিকে তুলনামূলক আলোচনার বিষয় হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। কার্ল এ. উইটফোগেল মনে করেন, প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব এবং প্রাচ্যদেশীয় বা এশীয় সমাজ সম্পর্কিত ধ্যানধারণা মার্কস লাভ করেছিলেন ইংরাজ ক্রুপদী ধারার অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে।[31] বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তিনি ভূমিমালিকানার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষের অধিকারের অনুপস্থিতি এবং এশীয় উৎপাদনের ধরন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতার মৌল কারণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করে মার্কসের প্রতীতি জন্মেছিল যে, গ্রামীণ সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দ্বান্দিক উপায়ে ব্রিটেন ইতিহাসের অসচেতন হাতিয়ার হিসাবে আর্থ-সামাজিক প্রগতির রূপকার হয়ে উঠতে পারে। হবেই, এমন কোন যান্ত্রিক সিদ্ধান্ত তিনি করেননি। ভারতীয় সামাজিক শক্তিগুলি কিভাবে বিকশিত হবে এবং ঐ শক্তিগুলির ইচ্ছা, উদ্যম ইত্যাদি কিরূপ হবে তার উপরেই প্রগতির পথে জয়যাত্রার গতিশক্তি নিহিত ছিল বলে তিনি মনে করেছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের স্তরে পৌঁছে ব্রিটিশ ধনতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকের ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এমন

সব নীতি রূপায়ণে অগ্রসর হয়েছিল যে মার্কস-অনুমিত সম্ভাব্য প্রগতিমূলক কার্যক্রম পিছু হঠে গিয়েছিল।

ভারতের গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি যে আর্থনীতিক ও সামাজিক স্থবিরতার ধারক ও বাহক হিসাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐগুলির ধ্বংস নিঃসন্দেহে কাম্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র যে উদ্দেশ্য ও স্বার্থে এই কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়েছিল এবং যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল তা ভারতবাসীকে সীমাহীন দুঃখদুর্দশা, শোষণ, বঞ্চনা ও অবমাননার মধ্যে দীর্ঘকাল অন্তরীণ রেখেছিল। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ভারতবাসী উন্নততর আর্থনীতিক সাংগঠনিক রূপ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু মাশুল হিসাবে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর স্বার্থবহ ধনতন্ত্রের বিকলাঙ্গ দেহকে পরাধীন ভারতবাসী দীর্ঘকাল বহন করতে বাধ্য হয়েছিল।

৪ ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতি

বণিকের মানদণ্ড ও ভারতীয় পণ্য

উনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্তও ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ভারতের বাজারে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। অথচ ভারতের শিল্পদ্রব্য ব্রিটেনের বাজারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল নানাদিক থেকে: বিক্রির পরিমাণে, চাহিদার নিরিখে ও উচ্চমানের বিচারে। ফ্যাশনদুরস্ত ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা থেকে শুরু করে গৃহপরিচারক-পরিচারিকা পর্যন্ত সবাই সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় জিনিসপত্রে তৈরী পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য কিছু পরতে চাইতেন না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ব্রিটেনে ভারতীয় দ্রব্যাদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে যতদূর সম্ভব সস্তায় ভারতীয় জিনিসপত্র কিনে যতদূর সম্ভব চড়া দামে ব্রিটেনের বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। রেশম, সুতো, মশলাপাতি, উল, ঔষধপত্র, মসলিন, হীরা, দামী পাথর ইত্যাদি ভারত থেকে বিপুল পরিমাণে ক্রয় করে কোম্পানি স্বদেশে নিয়ে যেত। কিন্তু ভারত ও ব্রিটেনের বাজার-দামের পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে ভারতীয় কারিগরদের ও ব্রিটিশ উৎপাদকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডার বা অংশীদাররা যে শুধুমাত্র লাভবান হতেন এমন নয়।

কোম্পানির আর্থনীতিক কাজকর্মের সমালোচনা করেও সমকালীন বাণিজ্য তত্ত্বের প্রবক্তারা স্বীকার করেছিলেন যে, **একচেটিয়া অধিকারে ভারত থেকে আমদানি করা জিনিসপত্র ব্রিটেনের আর্থনীতিক স্বার্থের প্রতিবন্ধক হয়নি**। কেননা ঐসব জিনিসপত্রের অর্ধেকটাই আবার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইউরোপের বাজারগুলিতে রপ্তানি হয়ে মুনাফা লুটত। বি. এন. গাঙ্গুলী টি. ম্যানের একটি বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, কেমন করে ভারতীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য ব্যয়িত রৌপ্য ইউরোপীয় বাজারগুলি থেকে ভারতীয় জিনিসপত্র রপ্তানির মারফৎ ফিরে আসত। কাজেই ব্রিটেনের বাণিজ্য খাতে আয়-ব্যয় বাণিজ্য তত্ত্বের তৎকালীন রীতিপ্রকরণ মেনে চলতে সক্ষম হয়েছিল।

টি. ম্যান্ একবারের একটা ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, ৮৪০,০০০ পাউণ্ডে কেনা ভারতীয় জিনিসপত্র ইউরোপীয় বাজারে বেচে কোম্পানি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড লাভ করেছিল।[1] অর্থাৎ, ভারতের কাছ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্রের সমগ্র মূল্য ইউরোপীয় বাজারে ঐ জিনিসপত্রের এক-চতুর্থাংশ বিক্রয়ের মাধ্যমেই উঠে আসতে পারত।

'ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিকে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য ও শিল্পদ্রব্য সরবরাহ করবার বিপণি হিসাবে' ইংল্যাণ্ডকে গড়ে তুলতে ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির ব্যবসায়িক একচেটিয়া অধিকারের সমর্থন করেছিলেন। কার্ল মার্কস এই একচেটিয়া অধিকারের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেমন করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী কেবলমাত্র ভারতকে নয়, ইউরোপকেও নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় বা গুদামজাত করার কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের উপর কঠোর জরিমানা ধার্য করার ফলে ঐসব জিনিসপত্র অনেক সময় ব্রিটেনে না এসে সরাসরি ইউরোপীয় বাজারে মুনাফা লুটতে চলে যেত।[2]

ব্রিটিশ শিল্পবিপ্লবের গতিবেগ সৃষ্টিতে ভারত

শিল্পবিপ্লবের সূচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত আবিষ্কারগুলির উদ্ভাবনের সময় থেকে ধরা হলেও, ঐ বিপ্লব গতিবেগ লাভ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি থেকে। দুই দশকের কিছু বেশী সময় ধরে নেপোলিয়নের গোলার তাণ্ডব ও জ্যাকোবিন-বিরোধী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলার পর ১৮১৫ সালে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাণ্ডব ও সংগ্রামের বছরগুলিতে, বিশেষ করে নেপোলিয়নের নৌবাহিনীর ব্রিটেন অবরোধের সময়, ব্রিটেনের কাছে রেশম, পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের আমদানি-দুয়ারগুলি বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে কাঁচামাল সরবরাহ নিশ্চিত হলে ১৮১৫-পরবর্তী দশকগুলিতে বাষ্পচালিত শিল্পগুলির পণ্যসম্ভার সারা পৃথিবীতে সরবরাহ করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী লাভবান ও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে এবং ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করে।

১৮১৫ থেকে ১৮৬০-৭০ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্রের পূর্ণ

বিকাশ ঘটে। ব্রিটিশ ধনতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। কাজেই ভারতসহ সব ব্রিটিশ উপনিবেশে ধনতন্ত্রের উষালগ্নে অনুসৃত শাসন-শোষণের নীতি ও পদ্ধতি শিল্পনির্ভর ধনতন্ত্রের যুগেও নয়া রীতিপদ্ধতির পাশাপাশি দীর্ঘকাল অবস্থান করেছে। ভারতে অনুসৃত ঐ নীতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে এবং পরস্পর বিরোধী নানারূপ ফলাফল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ভারতীয় অর্থনীতির স্বাধীন বিকাশের অন্তরায় ঘটিয়েছে।

ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম ফল। এই ধনতন্ত্রের বিকাশ ও ব্যাপ্তিতে ভারতীয় জনগণ যত ক্লেশ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টভোগ করেছে দেশীয় উৎপাদনব্যবস্থার নির্মম ধ্বংস এবং বিদেশী ধনতন্ত্রের অসংলগ্ন, অপর্যাপ্ত, প্রতিক্রিয়াশীল কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে।

ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব, শিল্পায়ন ও ভারতের শহুরে হস্তশিল্প

ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব চরিত্রগত দিক থেকে শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ছিল; প্রযুক্তিবিস্তার ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের প্রভাব অত্যন্ত সীমিত ছিল। স্বদেশে খাদ্যশস্য বা কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঐ বিপ্লবের অগ্রগতি মোটেই দর্শনীয় ছিল না। কাজেই ব্রিটেনের পক্ষে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে সুলভে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য নিরন্তর ব্যস্ত থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সুবিধা দরে কাঁচামাল সরবরাহে এসব দেশগুলিকে বাধ্য করার জন্য ব্রিটেন আর্থনীতিক চাপ ছাড়াও অন্য ধরনের অতিরিক্ত নানা ব্যবস্থা (যেমন, বলপ্রয়োগ) গ্রহণ করেছিল। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, উপনিবেশগুলিকে বলপূর্বক অসম শর্তের জোয়ালে বদ্ধ করে বিশ্ববাণিজ্যের জন্ম হয়েছিল, আবার ঐ বিশ্ববাণিজ্যই বৃহদায়তন শিল্পের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল। রোজা লুক্সেমবার্গ সঠিক বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উপনিবেশগুলির স্বয়ম্ভরতা ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বব্যাপী ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে ঐগুলিকে অধস্তন ভূমিকায় যুক্ত করে দেয়।[৪] ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণী শহুরে হস্তশিল্পগুলির উপর আঘাত হানার সুযোগ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে ১৮১৩ সালের সনদ পাশ হবার পর থেকে বিশেষভাবে ব্যবহার করতে থাকে। ঐ শিল্পগুলির পণ্যসম্ভার ব্রিটেনের আমদানি বাজারে শুল্কের

মাধ্যমে দুর্মূল্য করে ও ব্রিটিশ ধনিকদের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের আমদানি বাজারে নামমাত্র শুল্কে আপেক্ষিকভাবে সুলভ করে তুলে ভারতীয় শিল্পায়নের দেশীয় পদ্ধতির মৃত্যু-পরোয়ানা জারি করা হয়। হোরেস উইলসনের উক্তি উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের অভ্যন্তরে শুল্কবিহীন-ভাবে বলপূর্বক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল; 'বিদেশী উৎপাদক সমান শর্তে মোকাবিলায় অক্ষম হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে অবদমিত রাখতে ও শেষ পর্যন্ত শ্বাসরুদ্ধ করতে রাজনৈতিক অন্যায়ের বাহু ব্যবহার করেছিলেন।'[4]

শ্রী বি. ডি. বাসু তাঁর 'রুইন অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড অ্যাণ্ড ইনড্রাসট্রিজ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কেমন করে ব্রিটিশ সরকার ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যকে হীনবল করে স্বদেশের শিল্পদ্রব্যের জন্য দেশীয় ও ভারতীয় বাজার গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় বাজার ব্রিটিশ শিল্পগুলির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় শহুরে হস্তশিল্পগুলি ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব শুরুর কিছুকাল পরেই 'হঠাৎ ও সম্পূর্ণ' অবলুপ্তির পথযাত্রী হয়।

ভারতীয় শহরশিল্পের অবলুপ্তির কারণ

ভারতীয় শহরশিল্পগুলির কারিগরেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলেই হোক আর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আমলেই হোক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক চাপের শিকার হয়ে বংশানুক্রমিক বৃত্তি থেকে উৎখাত হতে থাকে। এই কারিগরদের শিল্পবস্তুর প্রধান ক্রেতা ছিল দেশীয় রাজপরিবার-গুলি, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারিবৃন্দ ও বিদেশী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে একের পর এক দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে ছলে-বলে-কৌশলে। লর্ড ড্যালহৌসির আমলে একের পর এক রাজ্য (সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, কর্নাট, তাঞ্জোর, অযোধ্যা ও অন্যান্য বহু ক্ষুদ্র অঞ্চল) ব্রিটিশ ভারতের কলেবর বৃদ্ধি করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির রাজা বা নবাবেরা সিংহাসনচ্যুত হন, শহরশিল্পগুলির বাজার ধ্বংস হয়ে যায়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঐ শিল্পগুলি রক্ষার কোন চেষ্টা করেনি। ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর পক্ষে ব্রিটিশ উৎপাদনের স্বার্থরক্ষা না করে ভারতীয় কারিগরদের স্বার্থরক্ষা করা চিতাবাঘের কাছে চামড়ার উপর কালো ছোপ ত্যাগ করতে বলার সামিল ছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বণিকের মানদণ্ড নিয়ে ভারতে এসেছিল—সস্তায়

জিনিস কিনে চড়া দামে বেচা ছিল এই কোম্পানির উদ্দেশ্য। ভারতীয় পণ্যের উপর ব্রিটেনে অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক আরোপিত হলে কোম্পানি মুনাফার মাত্রা বজায় রাখতে ব্যয়সংক্ষেপের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই নীতি ভারতের কারিগরদের শোষণ ও লাঞ্ছনার ষোল কলা পূর্ণ করে তাদের জীবনযাত্রায় মৌল পরিবর্তন ঘটায়। তাঁতী ও কারিগরদের একচেটিয়া কর্তৃত্বের ফাঁসে বদ্ধ করে নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানির ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। দেশী বা বিদেশী অন্যান্য বণিকদের কাছে বর্দ্ধিত মূল্যেও তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র বিক্রির স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি শহরে রেশমশিল্পে নিযুক্ত তাঁতী ও কারিগরদের উপর শোষণমূলক নানা রকম ব্যবস্থা চাপিয়ে তাদের ভিখারী ও দাসের পর্যায়ের অধোগমনে বাধ্য করা হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারে শহরশিল্পগুলির উপর অক্টোপাস-সদৃশ শোষণ কায়েম করে কোম্পানির বণিকদের মুনাফার থলি স্ফীতোদর করা হয়েছিল। ঢাকার মসলিন শিল্পে নিযুক্ত নিঃস্ব কারিগর-তাঁতীরা বনে-জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ বণিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সন্ন্যাসী বিদ্রোহে এরূপ বহু কারিগর-তাঁতীর অংশগ্রহণ ঘটেছিল।[5]

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঢাকায় তাঁতী, সুতো কাটা ও বয়নশিল্পের অন্যান্য কারিগরেরা ৩০ লক্ষ টাকার নূতন অর্থসম্পদ সৃষ্টি করত; আর উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অনুরূপ খাতে অর্থসম্পদ সৃষ্টির পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশের কাছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা তখন বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার সুতো ও ১½ লক্ষ টাকার বস্ত্র ব্রিটেন থেকে আমদানি করতে শুরু করে দিয়েছিল।[6] বয়নশিল্পের এই অবনত অবস্থার অগৌরব অবশ্য রেশমশিল্পের উন্নতির ফলে কিছুটা লাঘব হয়েছিল। কিন্তু রেশমশিল্প ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মালিকানায় বড় কারখানার অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মাঝামাঝি ঐ শিল্পকারখানাগুলি ব্রিটিশ ধনিকদের হস্তগত হয়।

কোম্পানির সনদ ১৮৩৩ সালে নবীকরণ হলে বিটিশ মূলধন ভারতে আসতে শুরু করে। তখন ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলি ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়েছিল মাত্র। জমি থেকে উৎখাত হয়ে কর্মহীন কৃষক জীবিকার অন্বেষণে দিশাহারা ছিল। বাহ্যতঃ দেখতে গেলে ব্রিটিশ পরিচালনায় দেশীয় ও

ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর যৌথ সম্পদের লগ্নীতে শিল্পবিপ্লব সম্পন্ন করার পক্ষে সময়টা ছিল যথার্থ ; ঐরূপ বিপ্লব 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির জন্য চাকুরির ক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে পারত, জমি থেকে শিল্পে মূলধন স্থানান্তরিত করতে পারত এবং জমি থেকে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ দূর করতে পারত।' আবার, সংরক্ষণশীলতার নীতি গ্রহণের পক্ষেও সময়টা ছিল অনুকূল ; এরূপ নীতি 'শিল্পবিপ্লবের স্বার্থকে বিদেশী প্রতিযোগিতা থেকে এবং কৃষকসমাজের স্বার্থকে নীলকর, খাজনাদার ও মহাজনের কবল থেকে রক্ষা করতে পারত।'[7] ঔপনিবেশিক শাসন ঐ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে স্বদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ধ্বংস করে দিয়েছিল, ভারতীয় মধ্যবিত্ত মানুষের হতাশা বাড়িয়েছিল এবং কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছিল।

১৮১৪ সালের পর থেকে, বিশেষ করে ১৮৩৩ সালের পরে, **বৈষম্যমূলক শুল্কের গুরুভার** চাপিয়ে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য ব্রিটেনের বাজারে দুর্মূল্য করে তোলা হয়। ভারতের শহরশিল্পগুলিকে রক্ষার জন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মারাঠা আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, কোম্পানির দালালদের অত্যাচার, অভিজাতবর্গের ক্রমহ্রাসমান চাহিদা, ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুদ্ধবিগ্রহ, ইউরোপীয় বাজারে ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতিযোগিতা ভারতীয় শিল্পগুলির দুর্দশাকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুটি দশক পর্যন্ত টেনে আনে। দুর্দশাগ্রস্ত শহরশিল্পগুলি সর্বশেষে ব্রিটিশ শিল্পগুলির প্রতিযোগিতা ভারতের মাটিতেই অনুভব করতে শুরু করে। আমদানি-রপ্তানি শুল্কের বৈষম্যমূলক ব্যবহার, রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাজনৈতিক শক্তির অভিসন্ধিমূলক প্রয়োগ, সামরিক বলের সমর্থন এবং বিচারবিভাগের পক্ষপাতমূলক আচরণে ভারতের শহরশিল্পগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবল প্রতাপের প্রচণ্ডতায় ভূপাতিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারত ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শর্তে ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য কাঁচামাল সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়। রেলওয়ে, যানবাহন, সংযোগ, বন্দর, বন্দরনগর ইত্যাদির উন্নয়ন প্রয়াস ভারতের কাঁচামাল ব্রিটেনের দুয়ারে এবং ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতের গ্রামে, গঞ্জে, নগরে ও বাজারে পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টার সাথে গাঁটছড়া বাঁধে।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে নূতন ধরনের বিত্তবান ভারতীয় সৃষ্টি করে চলেছিল ; আধুনিক ব্যবসায়ী, ইউরোপীয় মনোভাবাপন্ন সরকারী কর্মচারী এবং সফল

মহাজনেরা সামন্তযুগীয়, ব্যয়সাপেক্ষ, অনুপম দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে সুলভ, শৌখীন, ব্যবহারযোগ্য ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের অনুরাগী ক্রেতা হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের লোকজন 'ইউরোপীয় ফ্যাশনের অনুবর্তী হওয়াকে আলোকলাভের বিশুদ্ধ প্রমাণ হিসাবে গণ্য করতেন।' ডি. আর. গাডগিল মন্তব্য করেছেন যে, 'যেভাবে এই শ্রেণী আচরণ করেছিল তা বোধহয় স্বাভাবিক ছিল কেননা এই শ্রেণী নিজেই ছিল সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতি।'[৪]

একদিকে যেমন বিদেশী শাসনের স্বাভাবিক ফল হিসাবে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা ভারতে সৃষ্টি হচ্ছিল, অন্যদিকে তেমন জবরদস্তিমূলক কতকগুলি সরকারী সিদ্ধান্ত ভারতীয় শহরশিল্পগুলির জিনিসপত্রের চাহিদা কমিয়ে দিচ্ছিল :

১. ভারতীয় কাগজশিল্প ঔপনিবেশিক বৈষম্যমূলক নীতির আঘাতে জর্জরিত হয়। স্যর চার্লস উড লণ্ডন থেকে ফতোয়া জারি করে কেন্দ্র ও প্রেসিডেন্সির সরকারগুলির কাজকর্মে ব্রিটিশ মিলে প্রস্তুত কাগজ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেন। বৃহত্তম ক্রেতার চাহিদা প্রত্যাহৃত হলে ভারতীয় কাগজশিল্প হীনবল হয়ে পড়ে।

২. ভারতীয় জাহাজশিল্প অনুরূপ বৈষম্যের শিকার হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটার্স বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ জাহাজের ব্যবহার আবশ্যিক ঘোষণা করে। ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

৩. ঢাল, তরবারি, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করা ও সেগুলিকে অলঙ্করণে সুসজ্জিত করার শিল্পটি সরকারী অনুৎসাহে ও নিষেধাজ্ঞায় ধ্বংস হয়ে যায়। কচ্ছ, সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বর্ণাঢ্য রাজকীয় শোভাযাত্রা সমকালীন ভারতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে নগর পরিক্রমায় বহির্গত হত। অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত শোভাযাত্রা সরকারী আদেশে নিষিদ্ধ হয়। ঐ ধরনের সাবেকী আমলের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও অলঙ্করণের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যেতে থাকে। অচিরেই ভারতীয় কারিগরশিল্পীদের দীর্ঘকালের অনুপম সৃজনশীলতাধন্য শিল্পটি অন্তিম লগ্নের প্রহর গুণতে থাকে।

৪. ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির অবলুপ্তি বা গুরুত্ব হ্রাসের ফলে

লৌহের চাহিদা হঠাৎ বিপুলভাবে হ্রাস পেতে থাকে; ভারতীয় লৌহ-নির্মিত দ্রব্য ব্রিটেনের বাজারে ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত শুল্কের বোঝা বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। ব্রিটিশ লৌহজাত দ্রব্য অনায়াসে লঘু শুল্কভারের নিশ্চয়তা পেয়ে ও ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের পছন্দের সমাদর লাভ করে ভারতের বাজার জাঁকিয়ে বসে। ভারতীয় লৌহশিল্প সংকুচিত চাহিদার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে বিপদ থেকে মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলে। বন সংরক্ষণ ও রেলওয়ে বিস্তারের নীতিতে কাঠকয়লার স্বচ্ছন্দ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে ধাতু গলানোর চুল্লীগুলি অকেজো হয়ে পড়তে থাকে। শোরাশিল্পও নানা ধরনের ক্ষার আবিষ্কারের ফলে প্রচণ্ড আঘাত লাভ করে। ব্রিটেন থেকে লৌহদণ্ডের ব্যাপক আমদানি ভারতীয় লৌহশিল্পের কাছে মৃত্যুদণ্ডের সমতুল বলে প্রতিভাত হয়েছিল।

ভারতীয় হস্তশিল্প ধ্বংসের সামাজিক ফলাফল

ব্রিটিশ বণিক মূলধন ভারতীয় কৃষি ও হস্তশিল্পের স্বাভাবিক ঐক্যের নিবিড়তাকে আর্থনীতিক বাজারের মুক্ত ক্রিয়াকলাপে দীর্ঘকাল চেষ্টা করেও ভাঙতে পারেনি; তখন শুরু হয় সরকারী আয় সংগ্রহ নীতির প্রবল প্রতাপ যথেচ্ছ ব্যবহারের মাধ্যমে ঐ ঐক্যের বিনাশ সাধন করে ভারতকে ব্রিটেনের একটি কৃষিক্ষেত্রের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। ভূমিরাজস্ব আদায়ের নীতি এ ধরনের কাজে বিশেষভাবে নিয়োজিত ছিল। হস্তশিল্পের কারিগরদের রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হয় এবং রপ্তানিযোগ্য কৃষিফসলের চাষীর উপর শুল্ক আরোপ করা হয়। ব্রিটিশ বণিক মূলধন অর্থনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়মকানুনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে জবরদস্তিমূলক রাজস্ব নীতি এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শক্তিপ্রয়োগের নানা ফন্দি-ফিকিরের কারসাজিতে প্রাচীন সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ ও শুধুমাত্র ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে সমর্থ ভারতীয় স্থবির অর্থনীতির অনড় কাঠামোটি ধ্বংস করে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ভারতবিজেতা জাতিগুলির মধ্যে ব্রিটিশরা নিঃসন্দেহে 'শ্রেষ্ঠতর বিজয়ী' আখ্যা লাভের যোগ্য। আর্থ-সামাজিক ও ঐতিহাসিক নানা বৈশিষ্ট্যে গরীয়ান এই জতির প্রভাব ভারতীয় জনজীবনের বহু ক্ষেত্রে অনুভূত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ চরমতম নিষ্ঠুরতায় ভারতকে শোষণ করতে কসুর করেনি, ঔপনিবেশিক যুদ্ধগুলি রক্তক্ষয় ও বর্বরতায়

কলঙ্কিত হয়নি এমন নয়; কিন্তু এই শোষণ ও রক্তক্ষয়ের অপরাধ বিচারের পরমুহূর্তেই যা লক্ষণীয় তা হল, ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও আর্থনীতিক প্রগতির ধারণায় সমৃদ্ধ ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে ভারতীয় আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার জোড় লড়াই।[৭] ভারতীয় সমাজ শুধুমাত্র ভরণপোষণের স্বয়ংসম্পূর্ণতার আর্থনীতিক আদর্শের উপর সংস্থাপিত ছিল বলেই ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, বণ্টন ও সামাজিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের সুযোগ মিলেছিল। ভারতের প্রাচীন অর্থনীতির ধ্বংস সাধন করার পরেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকে শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক ভূমিকার অপরাধে দোষী করা যায় না। গ্রামীণ ও শহরশিল্পগুলিকে হটিয়ে ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বৃহত্তম বাজারে পরিণত করলেও, বঞ্চনা ও বেদনার পাত্র পূর্ণ করে শেষ পর্যন্ত তা আধুনিক শিল্পায়নের ভিত্তি রচনা করে। ব্যাঙ্ক, বীমা, ট্রাস্ট, রেল, বন্দর, ডাক, তার, রাস্তা ইত্যাদি আধুনিক আর্থ-নীতিক সংগঠন ও সংযোগমাধ্যম ভাবী শিল্পায়নের পথ রচনা করতে থাকে। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সেবাদাস হয়েও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে আধুনিক শিল্পায়নের অসচেতন পথিকৃৎ হিসাবে আবির্ভূত হয়।

শহরশিল্পের দুর্দশা ও কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ শিল্পগুলির অবলুপ্তির পর বিদেশী শিল্পগুলির সস্তা জিনিসপত্র ভারতীয় শহরগুলির বাজার দখল করতে থাকে। গ্রামীণ কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্রের সরবরাহ একই সময় কমে আসতে থাকে। ঔপনিবেশিক নীতি ভারতের কারিগরদের বংশানুক্রমিক বৃত্তি থেকে উৎখাত করতে তৎপর ছিল বলেই এমন হচ্ছিল। স্বাভাবিক নিয়মে বিদেশী শিল্পজাত জিনিসপত্র গ্রামের মানুষের ঘরেও সমাদৃত হতে থাকে। কালক্রমে ভারতীয় আধুনিক শিল্পও বিদেশী শিল্পের পাশাপাশি গ্রাম ও শহরের মানুষের অত্যাবশ্যক, আরামপ্রদ ও বিলাসের দ্রব্যাদি সরবরাহে লিপ্ত হয়। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির বিচ্ছিন্নতা ঘুচতে থাকে; একই রকম শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে সার্বজনীন অভ্যাস গড়ে উঠতে থাকে। গ্রাম ও গ্রামের, নগর ও নগরের, নগর ও গ্রামের এবং বন্দর ও নগরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। আধুনিক শিল্পজাত জিনিসপত্রের লেনদেনের মাধ্যমে ভারত ও বিশ্বের বাজারের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে বহু অপরাধ সংঘটিত করেছিল; নিঃসন্দেহে

বহু শহরশিল্পের ধ্বংস সাধন সেগুলির মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় লৌহ, জাহাজ নির্মাণ ও ঢাকাই মসলিন শিল্পকে যেভাবে বিনষ্ট করা হয়েছিল তা যেকোন সভ্য জাতির পক্ষে কলঙ্কজনক কার্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।[10] কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় শহরশিল্পগুলির বেশ কয়েকটি সামন্তবাদী শাসকদের পছন্দ, মর্জি ও শোষণের উপর নির্ভরশীল ছিল। একটি উদাহরণ হিসাবে চান্দেরী বস্ত্রশিল্পের (চান্দেরী জেলায় তৈরী হত বলে বস্ত্রের নাম চান্দেরী) নাম উল্লেখ করা যায়। মুসলমান তাঁতীরা স্বল্পালোকিত, মাটির তলায় ভেজা প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে (ধুলাবালি থেকে রৌপ্যতুল্য মূল্যের চান্দেরী সুতোকে বাঁচাতে) গোয়ালিয়র ও ইন্দোরের রাজদরবারের প্রয়োজনে চান্দেরী বস্ত্র বুনত। কিন্তু তাঁতীদের ঐ বস্ত্র বাজারে বিক্রির স্বাধীনতা ছিল না, অগ্রিম দাদনের ভিত্তিতে তারা কাজ করত এবং দাদন দানের মালিকদের দালালরা তাদের কাজকর্ম দেখাশোনা করত। উচ্চমান চান্দেরী বস্ত্রের ব্যবহার সামন্তবাদী শাসকদের একচেটিয়া অধিকার ছিল; সাধারণ মানের চান্দেরী বস্ত্র শাসকদের আরোপিত শুল্কে দামী হয়ে বাজারে বিক্রি হত। শোষিত মুসলমান তাঁতীদের ঘর্ম ও রক্তের বিনিময়ে গড়ে ওঠা চান্দেরী বস্ত্রশিল্পের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করা উচিত কিনা বা কোন্ দিক থেকে কতটুকু করা উচিত ভেবেচিন্তে দেখার প্রয়োজন আছে। সঠিক কারণে মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ভারতের পশ্চাৎপদ অংশগুলিতে রাজস্ব সংগ্রাহক ও কারিগরদের মধ্যে প্রাচীন ঘুঁণে-ধরা, সামন্তবাদী সম্পর্ক বজায় ছিল। কৃষি থেকে বিচ্ছিন্ন আয় (প্রধানত উদ্বৃত্ত) খাজনা বা রাজস্ব ভোগের মালিকদের ভোগের স্বার্থে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত হত। মার্কসের রাজনৈতিক-আর্থনীতিক এই ছকটি থেকে রাজস্ব সংগ্রাহক, চাষী ও কারিগরদের সম্পর্কের চরিত্রটি অনুমান করে নেওয়া যায়।[11]

ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের আগেকার ভারতীয় শিল্পগুলি গ্রামীণ ও শহুরে কারিগরদের শোষণের সামন্তবাদী রূপে আবদ্ধ রেখেছিল। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক শিল্পায়ন তাদের জীবিকার হয় পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, না-হয় বেকার জীবনের লাঞ্ছনায় ও দারিদ্র্যে তাদের অবস্থা দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক এই শিল্পায়ন (ঔপনিবেশিকতার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও) ও ব্যবসা-বাণিজ্য ভারতের সমগ্র ভৌগোলিক এলাকাকে সুষম আর্থনীতিক সম্পর্কে গ্রথিত করে। গ্রাম বা নগর-ভিত্তিক অর্থনীতির দ্রুত ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পথ

চলে আঞ্চলিক আদান-প্রদানের আর্থনীতিক সংগঠনের ভিত্তি রচনা করে ভারতীয় আধুনিক শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্য একটি অখণ্ড আর্থনীতিক ভারত গড়ে তোলে।[12] গ্রামীণ, শহুরে বা প্রাদেশিক সত্তার বিলোপে ভারতীয় জনগণ আর্থনীতিক দিক থেকে সংবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতির আর্থনীতিক বনিয়াদ সৃষ্টি করে।

ভারতীয় শহরশিল্পগুলির ধ্বংসের ফলে সংশ্লিষ্ট সব কারিগরের অবস্থা যে খারাপ হয়েছিল এমন নয়। কারিগরদের একাংশ আধুনিক শিল্পগুলিতে নিজেদের কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হয় এবং উন্নততর কাজের পরিবেশ ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের স্বাদ পায়। ঔপনিবেশিক ভারতের মন্দগতি শিল্পায়ন খুব কম সংখ্যক কারিগরকে এভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারত। বিপুল সংখ্যক কারিগর গ্রামে গিয়ে জমির উপর ভীড় বাড়ায়। মূলধনবিহীন কারিগরদের জমির মালিক কৃষকের জীবন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না, কেউ কেউ ভাগচাষী, কেউ কেউ কৃষিজমিতে কর্মরত শ্রমিক, আবার কেউ কেউ আধুনিক সর্বহারার দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। এরা ক্রমে ক্রমে শোষিত জনগণের দলে যুক্ত হতে থাকে, আর্থনীতিক স্বার্থে গ্রথিত হয়ে সর্বহারা-শ্রেণীর দল ভারী করতে থাকে। অনুরূপভাবে উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির উপর প্রভুত্ব কায়েম করে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর পাশাপাশি ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বিলম্বিত জন্ম হয়। আবার, কৃষিনির্ভর ভারতে আধুনিক শিল্পের অপ্রতুলতায় ধনিক ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় সমাজ শুধুমাত্র বিভক্ত না হয়ে 'পাতি-বুর্জোয়া' শ্রেণীরও উদ্ভব ঘটায়। এক কথায়, ভারতীয় সমাজ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণীদ্বন্দ্বের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে; চাষী, ভাগচাষী, জমিমালিক, জমিহীন সর্বহারা, ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মরত লোকজন, মধ্যবিত্ত মানুষের দল, বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বসংঘাত পশ্চাৎপদ ধনতান্ত্রিক দেশের অবস্থা মূর্ত করে তোলে।

ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ চরিতার্থতার মধ্য দিয়ে যেভাবে ও যে ধরনের ধনতান্ত্রিক বিকাশ ভারতে ঘটছিল তা কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে কাম্য হতে পারে না। ইউরোপীয় মহাদেশের দেশগুলিতে, বিশেষ করে ব্রিটেনে, আধুনিক শিল্পগুলি কম শ্রমব্যয়ী উৎপাদনের রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে ব্যয়সংক্ষেপ ঘটায়; সুলভ শিল্পজাত দ্রব্যগুলি দেশীয় কারিগরদের হস্তশিল্পের

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়ে দেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হলে ঐ হস্তশিল্পগুলি আর্থনীতিক বাজার থেকে হঠতে শুরু করে। কিন্তু ঐ শিল্পগুলির কারিগরেরা ক্রমবর্ধমান আধুনিক শিল্পের অধীনে নিযুক্ত হয়ে সম্ভাব্য দারিদ্র্য ও বেকারির হাত থেকে রক্ষা পায়। ভারতে এরূপ ঘটেনি। বিদেশী শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্পের কারিগরেরা কর্মচ্যুত হয়ে শেষ পর্যন্ত আধুনিক শিল্পে সবাই নিযুক্ত হয়েছিল এমন নয়।

গ্রামীণ শ্রমশিল্পের অবনতি: একটি অসমতল প্রক্রিয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও স্থানীয় পরিস্থিতিগত কারণে ভারতের হস্তশিল্পগুলি ক্রমাবনতির সার্বজনীন রূপকে প্রকট করে তোলে; কিন্তু অবনতির প্রক্রিয়াটি ভারতের সব অঞ্চলে একই সময়ে, একই স্বরূপে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এমন নয়। ব্রিটিশ শিল্পসভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমে ক্রমে ভারতের অনুন্নত গ্রামীণ শিল্পপ্রয়াসের টুঁটি চেপে ধরে; গ্রামীণ শিল্পগুলি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং সস্তা দাম ও উন্নত মানের ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যগুলির সাথে অসম প্রতিযোগিতায় তাদের উৎপাদিত জিনিসপত্র ভারতের বাজারেই অনাদর লাভ করে পিছু হঠতে থাকে। কিন্তু লক্ষ্য করার মত ঘটনা এই যে, **সব হস্তশিল্পই একই সময়ে অন্তিম যাত্রায় সামিল হয়নি**। যেসকল শিল্প ভারতীয় কৃষির প্রাচীন অনুন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির চাহিদা মেটাত সেগুলি দীর্ঘকাল অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল।[13] ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় কৃষিতে প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তাই গ্রামীণ শিল্পগুলির কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির চাহিদা থাকায় সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি অনাবশ্যক হয়ে ওঠেনি।

স্থানীয় যেসব গ্রামীণ শিল্প ভোগ্যপণ্যের যোগানে নিযুক্ত ছিল সেগুলিও দীর্ঘকাল টিঁকে ছিল গ্রামীণ জনসাধারণের পুরোন রুচি ও পছন্দকে সন্তুষ্ট করতে। পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, অলঙ্কার ও মস্তকাবরণের ব্যবহারে ভারতীয় গ্রামীণ জনসাধারণের মধ্যে বর্ণভিত্তিক পার্থক্য থাকায় ব্রিটিশ শিল্পগুলির পক্ষে তাদের বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের চাহিদা মেটানো ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রথম যুগে সম্ভব ছিল না। ভারতীয় গ্রামীণ ও শহরশিল্প শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐ চাহিদা মিটিয়ে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করায় ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের

প্রতিযেগিতাকে বেশ কিছুকাল প্রতিহত করতে পেরেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার কিছু পর থেকে অবশ্য পূর্ণ বিকশিত ব্রিটিশ শিল্পায়ন ভারতীয় জনগণের পছন্দ ও রুচিকে খনিকটা সমরূপ করে, বৈচিত্র্যময় ভারতীয় ভোগ্যপণ্য চাহিদাকে আমল দিয়ে, ভারতীয় ভোগ্যপণ্যের বাজারকে শিল্পজাত ব্রিটিশ ভোগ্যপণ্যের বন্যায় ভাসিয়ে, সস্তা দামের প্রলোভন সৃষ্টি করে ভারতীয় ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

ভারতের হস্তচালিত গ্রামীণ তাঁতশিল্প ১৮৫০ সালের পর থেকে ব্রিটেনের যন্ত্রচালিত বস্ত্রশিল্পের সস্তা দামের কাপড়ের প্রতিযোগিতায় হীনবল হয়ে পড়তে থাকে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক বাণিজ্যশুল্ক নীতি ; ভারতীয় বস্ত্র ব্রিটেনের বাজারে শতকরা ৭৫ হারে আরোপিত করের সম্মুখীন হত। ত্রিশের দশকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিম্নলিখিত হারে ভারতীয় বয়নশিল্পের উপর করের বোঝা চাপিয়েছিল : ব্যবহৃত কাঁচামালের উপর শতকরা ৫ ভাগ, সুতোর উপর ৭.৫ ভাগ, তৈরী কাপড়ের উপর শতকরা ২.৫ ভাগ, এবং কাপড় তৈরীর স্থান থেকে বাইরে অন্য কোথাও রঙ ছাপানোর উপর ২.৫ ভাগ।[14] ভারতে তৈরী কাপড়ের খরচ এভাবে ১৫ থেকে ১৭.৫ ভাগ বেড়ে যেত। অন্যদিকে ব্রিটিশ মিলগুলির বস্ত্রসম্ভার মূল্যের শতকরা ২.৫ ভাগ বাণিজ্যশুল্ক গুণে ভারতের বাজারে অনুপ্রবেশের সুযোগ পেত। ভারতীয় তাঁতী তার উদ্ভাবনী মনের সৃজনশীল কল্পনা ও নিপুণ হাতের কর্মকুশলতা সত্ত্বেও ল্যাঙ্কাশায়ার, লিভারপুল, ম্যানচেষ্টারের ব্রিটিশ বুর্জোয়ার মিলগুলির সাথে বাণিজ্যযুদ্ধে পর্যুদস্ত হয়। প্রধানত দুটি কারণে এই পরাজয় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল— ১. ব্রিটেনের রাষ্ট্র-শক্তি বুর্জোয়া শ্রেণীর কুক্ষিগত থাকায় শ্রেণীস্বার্থে ভারতীয় তাঁতী ও বস্ত্রশিল্পের উপর বৈষম্যমূলক বাধানিষেধ ও শুল্ক আরোপ করা সম্ভব হয়েছিল ; ২. ব্রিটেনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটায় ভারতীয় শ্রমিক ও কারিগরের তুলনায় ব্রিটিশ শ্রমিক-কারিগরদের উৎপাদন ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই পরিমাণ জিনিস উৎপাদনে ব্রিটেনের সামাজিক দিক থেকে প্রয়োজনীয় যে পরিমাণ শ্রমের আবশ্যকতা ছিল, ভারতে তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ শ্রম-সময় ব্যয়ের প্রয়োজন হত। অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্রপাতির সুবিধাপ্রাপ্ত অধিক উৎপাদনশীল ব্রিটিশ শ্রমিক-কারিগরদের তৈরী জিনিসপত্র উৎপাদনে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ব্যয়সংকোচের সুযোগসুবিধা ভোগ

করার অবকাশ পেত। অনুরূপ সুযোগসুবিধার দরজা ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদকদের কাছে খোলা ছিল না। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শক্তির সহায়তা না পেয়ে মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ভারতীয় শ্রমিক-কারিগরের উৎপাদনশীলতা স্থিতাবস্থায় থেকে ব্রিটিশ শ্রমিক-কারিগরদের তুলনায় হতাশাব্যঞ্জকভাবে পিছিয়ে পড়ে। ১৭৬৪ সালে ঘূর্ণমান মাকু আবিষ্কারের ফলে ব্রিটিশ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যায় ২০০ গুণ, ১৭৮৫ সালের আবিষ্কৃত তাঁত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অনেক উন্নত হয়ে উৎপাদনশীলতাকে বাড়িয়ে দেয় আরও চল্লিশ গুণ। ১৮২৯-১৮৩১ থেকে ১৮৫৯-৬১ সময়সীমায় ঘণ্টা পিছু সুতো তৈরীর হার শতকরা ১৭০ ভাগ বেড়ে যায়, আর ৭ গুণ বেড়ে যায় বস্ত্র তৈরীর হার। সাথে সাথে বস্ত্রমূল্যও হ্রাস পেতে থাকে।[15] ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ের ভারতে পোশাক তৈরীর উত্তম শ্রেণীর তুলাজাত ব্রিটিশ কাপড়ের গজ প্রতি মূল্য ছিল দশ আনা (এখনকার পয়সায় ৬২), শয্যাভরণের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাপড গজ প্রতি তিন থেকে পাঁচ আনা, অথচ সুলভে ক্রীত বিদেশী সুতোয় তৈরী ভারতীয় কাপড়ের দাম অনুরূপ ব্রিটিশ কাপড়ের দামের দ্বিগুণ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ ও ভারতীয় তুলোর সুতোর দামে বিপুল পার্থক্য দৃশ্যগোচর হয়ে উঠতে থাকে: ইংল্যাণ্ডের সুতোর দাম অর্ধেক হ্রাস পায়, আর ভারতীয় সুতোর দাম অপরিবর্তিত থাকে। বলা বাহুল্য, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধি ইংল্যাণ্ডের সুতোর দাম দর্শনীয়ভাবে কমাতে সহায়তা করেছিল। অনুরূপ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ-বঞ্চিত ভারতীয় তাঁতীরা সুতো উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচ ঘটাতে না পেরে ইংল্যাণ্ডের সুতো ব্যবহার করাই লাভজনক মনে করতে থাকে। নিম্নোক্ত তিনটি তালিকা[16] থেকে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের তুলো, সুতো, শ্রমের খরচ, বস্ত্রসম্ভার আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ইত্যাদির পরিসংখ্যান অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করলে ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রচালিত তাঁতশিল্পের তুলনায় হস্তচালিত ভারতীয় তাঁতশিল্পের শোচনীয় ক্রমাবনতি প্রকট হয়ে পড়ে:

১. ১৮৩২ সালে এক পাউণ্ড তুলোর সূতো প্রস্তুত করতে তুলো ও শ্রম বাবদ খরচ (ভারত ও ইংল্যাণ্ডে)

	ইংল্যাণ্ডে			ভারতে		
মান নির্ণায়ক সংখ্যা	তুলোর দাম	শ্রমের দাম	মোট দাম	তুলোর দাম	শ্রমের দাম	মোট দাম
৪০	১ শি. ৬ পে.	১ শি. ০ পে.	২ শি. ৬ পে.	৩ পে.	৩ শি. ৪ পে.	৩ শি. ৭ পে.
৬০	২ শি. ০ পে.	১ শি. ৬ পে.	৩ শি. ৬ পে.	৩½ পে.	৫ শি. ৮½ পে.	৬ শি. ০ পে.
৮০	২ শি. ২ পে.	২ শি. ২ পে.	৪ শি. ৪ পে.	৪½ পে.	৮ শি. ১০½ পে.	৯ শি. ৩ পে.
১০০	২ শি. ৪ পে.	২ শি. ১০ পে.	৫ শি. ২ পে.	৫ পে.	১১ শি. ১১ পে.	১২ শি. ৪ পে.
১২০	২ শি. ৬ পে.	৩ শি. ৬ পে.	৬ শি. ০ পে.	৫ পে.	১৬ শি. ০ পে.	১৬ শি. ৫ পে.
১৫০	২ শি. ১০ পে.	৬ শি. ৬ পে.	৯ শি. ৪ পে.	৬ পে.	২৫ শি. ০ পে.	২৫ শি. ৬ পে.
২০০	৩ শি. ৪ পে.	১৬ শি. ৮ পে.	২০ শি. ০ পে.	৬ পে.	৪৪ শি. ৭ পে.	৪৫ শি. ১ পে.
২৫০	৪ শি. ০ পে.	৩১ শি. ০ পে.	৩৫ শি. ০ পে.	৮ পে.	৮৩ শি. ৪ পে.	৮৪ শি. ০ পে.

২. সূতোর দাম

(মাইল প্রতি সূতোর, পেন্সের হিসাবে)

মান নির্ণায়ক সংখ্যা	ইংল্যাণ্ডের সূতোর দাম		ভারতীয় সূতোর দাম
	১৮১২	১৮৩০	১৮১২—১৮৩০
৪০	১ ১/২	৩/৪	২ ১/৮
৬০	১ ৩/৮	৩/৪	২ ৩/৪
৮০	১ ৫/১৬	৩/৪	২ ৩/৪
১০০	১ ১/৪	১ ৩/১৬	৩
১২০	১ ৩/১৬	১ ৩/১৬	৩ ১/৪
১৫০	১ ১/২	১	৪ ১/১৬
২০০	২ ৩/৮	১ ৩/৪	৫ ৩/৮
১৫০	৩ ৩/৮	২ ৩/৪	৮

৩. সূতী বস্ত্র ও ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য

(টাকার হিসাবে)

সূতীবস্ত্র

বৎসর	রপ্তানি	আমদানি	সূতো আমদানি
১৮১৩-১৪	৫,২৮১,৫৫৮	৯২,০৭০	
১৮১৫-১৬	৮,৫৪০,৭৬৩	২,৫৫৯,৬৪২	
১৮:৫-২৬	৫,৮৩৪,৬৩৮	৪,১২৪,১৫৯	১২৩,১৪৬
১৮৩২-৩৩	৮২২,৮৯১	৪,২৬৪,৭০৭	৪,২৮৫,৫১৭

১৮১৩ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে বস্ত্র আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়: রপ্তানি লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পায়, আমদানি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায়; সূতো আমদানিও ঘটতে থাকে।

শিল্পসৌন্দর্যে অনুপম বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসকশক্তি ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্ব খর্ব করে স্বদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটাতে অন্যায় ও অপরাধের পথ পরিক্রমায় কখনো অনীহা প্রদর্শন করেনি। মসলিন, চান্দেরী

প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র উৎপাদনে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতা ব্রিটিশ আর্থনীতিক বাজারে উচ্চমূল্যে পুরস্কৃত হতে থাকলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উচ্চতন কর্তৃপক্ষ ঐরূপ তাঁতশিল্পকে হীনবল করতে সর্বতোভাবে প্রয়াসী হয়।

জেম্স টেলরের মতে ১৭৮৫ সাল থেকে ঢাকাই মসলিন বহির্বাণিজ্যে পিছু হঠতে থাকে, আর এ সময় থেকেই ব্রিটিশ মস্‌লিন সাধারণ ভারতীয় মসলিনের মানের সমতুল হয়ে উঠছিল। ১৮২১ সালে বিপুল পরিমাণ তুলোর সুতো ব্রিটেন থেকে ভারতে আমদানি করা হয়; প্রকৃতপক্ষে ১৮২৮ সাল থেকে ঢাকা জেলার তাঁতীদের স্বার্থ প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে: ১৮৩১ সালে ৬,৬২৪,০০০ পাউণ্ড ব্রিটিশ সুতো আমদানি করা হয়। শ্রীযুক্ত কে. এন. চৌধুরীর হিসাব থেকে জানা যায় যে, ১৭৮৩ সালে ঢাকা শহরে তাঁতীদের সংখ্যা ছিল ২৫,২০০; তুলো সরবরাহকারী ৩৩,৩০০ কৃষক, সুতো প্রস্তুতকারী ৮০,০০০ রমণী, নকশা রচনায় পটিয়সী ৫০০০ মহিলা এবং রঙ্ করার কাজে দক্ষ ৩০০০ কারিগরের সমষ্টিগত উদ্যোগ ও কর্মে ঢাকার তাঁতশিল্প সংগঠিত ছিল। এরূপ শিল্পটির কাজকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর করের বোঝা চাপিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে ঢাকায় উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের পরিমাণের তুলনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে উৎপাদন এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-ষষ্ঠাংশ হ্রাস পায়। ঢাকার বস্ত্র রপ্তানির মোট মূল্য ১৮১৭-১৮ সালে ছিল ১,৫২৪,০০০ টাকা, ১৮২১-২২ সালে ১,২১৬,০০০ টাকা, ১৮২৫-২৬ সালে ৬২৯,০০০ টাকা এবং ১৮৩১-৩২ সালে ৩৬০,০০০ টাকা। বছর দশেক বাদে ঢাকার হাল এরূপ দাঁড়িয়েছিল: ফি বছর ব্রিটেন থেকে ঢাকা আমদানি করত ৩০০,০০০ টাকা মূল্যের সুতো ও ১৫০,০০০ টাকা মূল্যের মিলজাত বস্ত্রাদি। আলিবর্দী খাঁর সমকালীন বাংলায় ঢাকার কোন তাঁতীর পক্ষে একদিন বাজারে ৮০০ মস্‌লিন বস্ত্রখণ্ড নিয়ে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব ছিল না।[17] কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঐরূপ তাঁতীর দর্শনলাভ অসম্ভব ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ভারতের আর্থনীতিক জীবনে যে ক'টি অপরাধ সংঘটিত করেছে তার মধ্যে মস্‌লিন শিল্পের ধ্বংস অন্যতম প্রধান। উৎপাদনের ব্যয়, চাহিদা, যোগান, মূল্য ইত্যাদি কোন কারণেই এই শিল্পের ধ্বংস অনিবার্য ছিল না। একমাত্র ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যিক স্বার্থেই এই শিল্পের ধ্বংস সাধন করা হয়।

সারা ভারতের বস্ত্রসম্ভার ব্রিটেনের বাজারে বৈষম্যমূলক, উচ্চহার করের শিকার হয়ে উচ্চমূল্য হয়ে উঠে ব্রিটিশ ক্রেতাসাধারণের আনুকূল্য হারায়, অথচ ব্রিটিশ মিলজাত বস্ত্রাদি নামমাত্র করের সুবিধা পেয়ে আপেক্ষিকভাবে স্বল্পমূল্য হয়ে উঠে ভারতীয় ক্রেতাদের আকর্ষণ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ভারত ব্রিটিশ মিলগুলির বিপুল পরিমাণ বস্ত্রসম্ভারের বাজারে রূপান্তরিত হতে থাকে। আর ঐ মিলগুলির কাঁচামাল তুলো উৎপাদনে নিজেকে নিয়োগ করতে বাধ্য হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী বৈদেশিক বাণিজ্যে বস্ত্রদ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালনে অভ্যস্ত **ভারত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ব্রিটেনের বস্ত্রকলগুলির সেবাদাসে পরিণত হয়।** পরাধীনতা, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বলপ্রয়োগ ইত্যাদি বহু কারণের যৌথ ক্রিয়ায় এরূপ অবমাননাকর, ক্ষতিকারক ও ভয়াবহ রূপটি ভারতে প্রকট হয়ে উঠেছিল।

তাঁতশিল্পের এই দুর্গতির দিনে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকচক্রবালে রূপালী আলোর একটি রেখা অবশ্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় বাজার যখন ব্রিটেনের বস্ত্রসম্ভারে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় বস্ত্রাদি যখন ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজারে অসম প্রতিযোগিতার শিকার হয়ে ঠাঁই লাভে বঞ্চিত হচ্ছিল, তখন নীল ও জাফ্রানী ফুলের মত বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের মূল্য তিন গুণ থেকে চার গুণ বেড়ে তাঁতবস্ত্রের খাতে উদ্ভূত লোকসানের কিছুটা সুরাহা করেছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান তাতে হয়নি, কেননা আন্তর্জাতিক বাজারদরের ওঠাপড়ার সঙ্গে রঙ্ করার ঐসব দ্রব্যের নিবিড় যোগাযোগ থাকায় ভারতীয় আর্থনীতিক স্বার্থ চরিতার্থতা লাভে কখনো সুস্থির হতে পারেনি।[18] তাছাড়া, চাষের পর্যায়ে ঐগুলির মূল্য এত নিম্নে ধার্য করা হয়েছিল যে, ভারতীয় চাষীর পক্ষে অন্যান্য দ্রব্য (যেমন, ধান) চাষের তুলনায় ঐগুলির চাষ বেশী লাভজনক ছিল না। নীল প্রভৃতি কৃষিপণ্যের শিল্পপণ্যে রূপান্তর ও বস্ত্রাদি রঙ্ করার রঞ্জক পদার্থের আন্তর্জাতিক বিপণন প্রথম থেকেই ব্রিটিশ মূলধনের মর্জির উপর নির্ভরশীল ছিল। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণের পথে দুস্তর বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়েছিল। এমন কি স্থানীয় গ্রীক ও আর্মেনীয় বণিকদের পক্ষেও অসুবিধাগুলি এমন মারাত্মক হয়ে উঠেছিল যে, অটোমান সাম্রাজ্য ও ইরানে ভারতের বস্ত্র রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

তাঁতশিল্পের মত অন্যান্য বহু গ্রামীণ ও কারিগরী শিল্প ঔপনিবেশিক আর্থ-নীতিক নীতির ফাঁস এড়াতে না পেরে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় হীনবল হয়ে পড়ে, আবার কিছু কিছু শিল্প অস্তিমযাত্রার প্রহর গোনে।

শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংল্যাণ্ডের যন্ত্রপাতি ও পরবর্তীকালে ভারতস্থ কারখানাগুলির উৎপাদনের প্রতিযোগিতায় পড়ে ভারতীয় গ্রামীণ সূত্রধর বা কাঠমিস্ত্রীদের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠতে থাকে। লৌহনির্মিত লাঙল, ইক্ষুপেষণ যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহারের দ্রুত বিস্তার সূত্রধরদের কোণঠাসা অবস্থায় ফেলে। তাদের অনেকে শহরের আসবাব তৈরীর কাজে লিপ্ত হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেও বেশীর ভাগই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হয়।

গ্রামীণ চর্মশিল্পীদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল আরও ভয়াবহ। ভারতীয় গ্রামীণ আর্থনীতিক জীবনের দরিদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট হলে তাদের কাছে জীবজন্তুর চামড়া দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে। ভারত বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠলে ভারতীয় চর্মদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বহু শহরকেন্দ্রিক চর্মশিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। তাছাড়া, ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর জুতো, কোমরবন্ধ, ইত্যাদির চাহিদা মেটাতে সামরিক ছাউনি-শহরগুলিতে (কানপুর, বেরিলি, মীরাট প্রভৃতি) বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয়।[19] মৃত জীবজন্তুর মালিক বা পাইকারদের পক্ষে গ্রামীণ চর্মশিল্পীদের কাছে ঐগুলি বিক্রয় না করে শহরগুলির কারখানায় চড়া দামে বিক্রয় করে বেশী মুনাফা লোটা সম্ভব হয়েছিল। কাঁচামালের অভাবে গ্রামীণ চর্মশিল্পীরা জীবিকান্বেষণে কেউ কেউ শহরের চামড়ার কারখানাগুলিতে শ্রমিক বনে যায়, আবার কেউ কেউ জমিহীন কৃষক হয়ে দরিদ্রতর জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়।

ভারতের গ্রামগুলিতে বস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদে রঙের বাহার সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত হাজার-হাজার গ্রামবাসীর অর্থ উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। শহরের কারখানাগুলিতে উৎপন্ন কৃত্রিম রঙ, গ্রামীণ রঞ্জক শিল্পকে প্রচণ্ড আঘাত হানে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি এই শিল্প সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কেরোসিন তেলের বহুল ব্যবহার গ্রামের কলুদের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদাতে বিপুল হ্রাস ঘটায়। গৃহ, পথঘাট ইত্যাদি আলোকিত করার কাজে কলুদের গুরুত্ব কমে যায়। এমন কি রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত তৈল সরবরাহের ক্ষেত্রেও অর্থনীতির অমোঘ নিয়মে শহরগুলিতে বিলম্বে স্থাপিত তেলকলগুলির প্রাধান্য

স্থাপিত হয়। গ্রামীণ কলু চোখঢাকা বলদের মত নামমাত্র লাভের ঘানির চারপাশে উদয়াস্ত ঘুরপাক খেতে থাকে।

বিদেশ থেকে আমদানি করা কলায়ের বাসনপত্র সস্তা ও টেঁকসই হওয়ায় দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে অনায়াসে সমাদর লাভ করে। স্বচ্ছল গ্রাম-বাসীদের মধ্যে অবশ্য তামা ও পিতলের ধাতুনির্মিত বাসনপত্রই আকাঙ্খিত বস্তু হিসাবে বিবেচিত হতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে কুম্ভকারেরা চাহিদার মন্দায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যবসার সম্মুখীন হয়। কিন্তু কুম্ভকারদের পেশা ঔপনিবেশিক ভারতে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা লাভ করেনি। দারিদ্র্য-সীমার নিম্নে অবস্থানরত ক্রেতাসাধারণ ধাতুনির্মিত ও কলায়ের বাসনপত্রের আপেক্ষিক উচ্চমূল্যের জন্য প্রলোভন দমনে বাধ্য হয়ে চিরাচরিত মৃৎপাত্রের মৃত্তিকাবন্ধনে সংবদ্ধ থাকে। এরূপ ক্রেতাসাধারণের অভাব ঔপনিবেশিক ভারতের মত আজিকার ভারতেও ঘটেনি বলে কুম্ভকারেরা পেশাগত গোষ্ঠী হিসাবে কখনো বিলীন হয়নি।

ঔপনিবেশিক ভারতে কামারদের গুরুত্ব খুব একটা হ্রাস পায়নি। নগর-গুলির শিল্প, কারখানা, ধাতুশালা ইত্যাদির মজুরিতে প্রলুব্ধ হয়ে কামারদের একটি অংশ গ্রাম ত্যাগ করে শহরের শ্রমিকশ্রেণীতে নাম লেখায়। কিন্তু গ্রামীণ কামারদের সেবাকর্মের চাহিদা ব্রিটিশ ভারতে বরাবর বজায় ছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষিকার্যে যন্ত্রপাতির ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিল না। মান্ধাতার আমলের, আদিম প্রকৃতির যন্ত্রপাতি ভারতীয় কৃষিকে বিড়ম্বিত রেখেছিল। ঐ ধরনের যন্ত্রপাতি গ্রামীণ সূত্রধর ও কামারদের কাছেই লভ্য ছিল। মেরামতির কাজও তাদের সাহায্যে ভালভাবে চলত। কাজেই ঔপনিবেশিক ভারতে কামারদের জীবিকা ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল এমন নয়।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং শোষণমূলক ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষগুলি গ্রামীণ শিল্প ও কারিগরদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। সূত্রধর বা কামারেরা দুর্ভিক্ষের সময়েও কিছু কাজকর্ম খুঁজে পেত, কিন্তু তাঁতীদের পক্ষে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সাধারণ শ্রমিকের মত কায়িক পরিশ্রমের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটার পরও এদের পক্ষে আর পূর্বতন জীবিকায় ফিরে আসা

সম্ভব হত না। ১৮৯৬ সালের ফিনান্স কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, তাঁতীরা দুর্ভিক্ষের তাড়নায় 'নিজেদের জীবিকা থেকে বিচ্যুত হয়' এবং এদের মধ্যে অনেকেই 'আর কখনো ঐ জীবিকায় ফিরে আসে না' এবং 'সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে মিশে গিয়ে শ্রমিক জনতার সংখ্যা বাড়ায়।'

সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায়, ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ কারিগরী শিল্পের অবনতি ঘটেছিল। সব শিল্পই কম-বেশী প্রতিকূল শক্তির আঘাতের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, **ঐ আঘাত ভারতের সকল অঞ্চলে সকল গ্রামীণ শিল্পের কারিগরদের আর্থনীতিক স্বার্থের পরিপন্থী হয়েছিল এমন নয়।** ভারতের আর্থনীতিক ইতিহাসের কতিপয় সাম্প্রতিক গবেষক প্রমাণ করেছেন যে, কোন কোন অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রামীণ শিল্পের কারিগরেরা শহরের নূতন গড়ে-ওঠা শিল্পগুলিতে শ্রমিকের জীবিকা গ্রহণ করে আর্থনীতিক দিক থেকে লাভবান হয়। ঔপনিবেশিক শিল্পায়ন ও নগরীকরণ সর্বাত্মক আর্থনীতিক বিপর্যয়ের বন্যায় গ্রামীণ কারিগরদের ভাসিয়ে দিয়েছিল এমন নয়, অঞ্চল ও শিল্প বিশেষে কারিগরদের শহরস্থিত শিল্পগুলির সফল ভবিষ্যতের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়ে সীমিত আর্থনীতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল।

৫ আধুনিক ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি ও বিকাশ

অনাগত শিল্পবিপ্লব প্রসঙ্গে

উপজাত দ্রব্যের মত কারখানা-ভিত্তিক বৃহৎ শিল্প ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় হস্তশিল্প ও দেশীয় উৎপাদনের চিরাচরিত শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহৎ কারখানার কোন স্থান ছিল না। ঐ সময়ে অবশ্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ বণিকেরা নূতন শিল্পদ্রব্য ও আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি প্রবর্তন করার ব্যাপারে প্রয়াসী হয়েছিল। এই প্রয়াসের অন্যতম একটি ফল হিসাবে 'বাণিজ্যিক বিপ্লবের' উদ্ভব ঘটেছিল। এই বিপ্লব পঞ্চাশ-ষাট বছর বাদে শিল্পবিপ্লবের সূচনা করতে পারত, কিন্তু করেনি। সম্ভাবনার মুকুল পুষ্পিত পরিণতির আগামী প্রহর গুণে গুণে বৃথাই স্বপ্নের জাল বুনেছে। ব্রিটিশ যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্য ভারতের আমদানিকে ক্রমশ স্ফীত করতে থাকে। ভারতীয় কারিগরদের শিল্পপ্রয়াস আঘাতের পর আঘাতে বিনষ্ট হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পপতিরা কয়েকটি শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও, সেগুলি সরকারী নির্দেশে সীমিত ও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকে; জাতীয় অর্থনৈতিক বনিয়াদ সৃষ্টির ব্যাপারে এ শিল্পগুলির মৌল গুরুত্ব ছিল না।

অনাগত শিল্পবিপ্লব নিয়ে ভাবনাচিন্তা আগেও চলেছিল, আজকালও চলছে। ফ্রিয়েড্‌রিশ লিস্টের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত সহ ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকে শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনার মৃত্যুর জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করে থাকেন।[1] তাঁদের বক্তব্য এই, সম্ভাবনার টুঁটি চেপে ধরে গলায় ফাঁস লাগান হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার স্বদেশের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে অবাধ বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করেছে, আবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রথম লক্ষণ দেখেই সংরক্ষণের পথে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু সর্বদাই ব্রিটিশ স্বার্থের বেদীমূলে ভারতীয় স্বার্থকে বলি দিয়েছে।

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা (রজনীপাম দত্ত, ব্যারান প্রমুখ ব্যক্তিরা) মনে করেন যে, ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের অভিভাবকত্বের জন্যই ভারতের শিল্পায়ন শ্লথ,

অসমতল ও পঙ্গু অবস্থায় দীর্ঘদিন কালযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। আবার, সমাজতত্ত্ববিদদের একাংশের ধারণা যে, **প্রতিকূল আর্থনীতিক কারণ ছাড়াও আরও বহুবিধ কারণ ভারতে শিল্পবিপ্লবের পথে বাধা হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল**। ঐ কারণগুলি প্রধানত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বলে তাঁরা অভিহিত করেছেন।[2] ভূমিরাজস্বের যে-পরিমাণ দাবি ভারতীয় কৃষকের ক্রয়ক্ষমতাকে বা সঞ্চয়ের সামর্থকে ধ্বংস করে এবং অলস ধনীর জাঁকজমক ও ভোগবিলাসে পুঁজি ব্যয়ে উৎসাহ দিয়ে ব্রিটিশ শাসন ভারতে শিল্পবিপ্লবের সূচনাকে দূরাগত করে রাখতে প্রয়াসী ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে কারণগুলি ঐ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে বিলম্বিত করেছিল সেগুলি হল: গ্রামীণ ব্যবস্থার স্থবিরতা, বর্ণব্যবস্থার অনড়তা, অদৃষ্টবাদের প্রতি ভারতীয় মনের আকর্ষণ। এই কারণগুলির মিলিত প্রভাবে ভারতীয় মহাজন বা বণিকের পক্ষে উৎপাদনের নায়ক হয়ে ধনিক বনে যাওয়া সম্ভব হয়নি বা স্বল্পকালীন ফাট্‌কার চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে অর্থলগ্নী করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পথপ্রদর্শক হওয়া ভাগ্যে ঘটেনি।

সংরক্ষণবাদী, মার্কসবাদী ও প্রথিতযশা সমাজতত্ত্ববিদদের সাথে সুর মিলিয়ে আর্থনীতিক ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদেরা সাম্প্রতিককালে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলির শিল্পে অনগ্রসরতার কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁদের গবেষণা ও বক্তব্য থেকে ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পায়নে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ডের অভাব সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা সম্ভব। ডি. সি. কোলম্যান শিল্পবিপ্লবের জন্য প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি ছাড়াও আরও তিনটি অত্যাবশ্যক উপাদানের উল্লেখ করেছেন: 'জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পে ব্যাপক ও বিস্তৃত বিনিয়োগ এবং শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগজনিত উল্লেখযোগ্য ফলশ্রুতি।'[3] অধ্যাপক লুইস্, রোস্টো ও এস. পোলার্ডের বক্তব্য অনুধাবন করে ঔপনিবেশিক ভারতে বৃহৎ শিল্পের অনুপস্থিতি ও শিল্পবিপ্লব সম্ভাবনার অপমৃত্যু সম্পর্কে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ধারণা করা চলে। এস. পোলার্ড মনে করেন যে, শিল্পোন্নত দেশগুলি 'পারিবারগত সাদৃশ্যে' ধন্য: ঐসব দেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রথমে গড়ে উঠেছিল; ঐ শিল্প আবার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনিবার্য করে তোলে।[4] উভয় শিল্প একযোগে কয়লা, পেট্রল, বিদ্যুৎ, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির উৎস অন্বেষণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। তাছাড়া, রাস্তা, খাল, জাহাজ, রেল ইত্যাদি খাতে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ, গৃহনির্মাণ ও

জনকল্যাণমূলক কার্যে বর্ধিত ব্যয়, কারিগরী শিক্ষার ব্যপক প্রসার, সামাজিক ধ্যানধারণার বিপুল পরিবর্তন, জলসেচ, নিষ্কাশন ও কৃষিতে যন্ত্রিকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ শিল্পবিপ্লবের পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত। আর্থনীতিক উন্নয়নের জয়যাত্রার পথে 'প্রথম উৎক্ষেপ' বিভিন্ন স্তরে উন্নয়নের সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতেই একমাত্র সম্ভব বলে অধ্যাপক রোস্টো বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে ঐরূপ উৎক্ষেপের জন্য আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন।[5] অধ্যাপক লুইস্ মনে করেন যে, জাতীয় আয়ের অন্তত শতকরা ১২ ভাগ শিল্পায়নের জন্য নির্দিষ্ট না হলে বিপ্লবাত্মক ফল লাভ করা অসম্ভব।

উপরে উল্লিখিত অবস্থা ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের পরিস্থিতিতে বর্তমান ছিল না। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতীয় সর্বহারার শ্রমে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করে স্বদেশে মুনাফা পাচারে ব্যাপৃত ছিল বলে মূলধনের অভাব ভারতীয় শিল্পায়নের মেরুদণ্ড খাঁড়া করতে দেয়নি। যেসব ভাগ্যবান ভারতীয় শিল্প ব্রিটিশ মূলধন লাভ করেছিল সেগুলি রপ্তানির জন্য প্রধানত উৎপাদনে লিপ্ত ছিল। মৌল শিল্প স্থাপনের ভারতীয় প্রয়াস কখনো বিদেশী মূলধন বা সরকারী মূলধনের আনুকুল্য লাভ করেনি। ভারতীয় রেলব্যবস্থা ব্রিটিশ ধনিকদের বাণিজ্যিক মুনাফা লাভের ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় অর্থনীতির দিগন্তে শিল্পবিপ্লবের অস্ফুট সম্ভাবনা উদিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দ্বিপ্রহরে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় পশ্চাৎপদ কৃষি, সরকারী সাহায্যের অভাব এবং আধুনিকীকরণে নিবেদিতপ্রাণ প্রভাবশালী ভারতীয় গোষ্ঠীর বিলম্বিত আবির্ভাব শিল্পক্ষেত্রে ভারতের দ্রুত অগ্রগতির পথ অবরোধ করেছিল। ব্রিটিশ মূলধনের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, বিপুল পরিমাণে ঐ মূলধন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে লগ্নী হতে পারেনি। সমকালীন যুগে ব্রিটিশ মূলধন কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সামান্য পরিমাণে ঐ মূলধন ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কখনো কখনো ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে লগ্নী হয়েছিল মাত্র।[6] ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য যখন বিদেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হচ্ছিল তখন সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে সঞ্জীবিত করে তোলার বিকল্প কয়েকটি পথ খোলা ছিল। কিন্তু পরাধীন দেশের পক্ষে কোন পথ ধরেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। জার্মানীর মত সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা যেত; ফরাসী দেশের মত সারা দেশের ক্ষুদ্রতম সঞ্চয়

একত্র করে জনকল্যাণের বড় বড় প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ ঘটান চলত ; আবার সোবিয়েত ইউনিয়নের শৈশব অবস্থায় ভোগ্যপণ্যের চেয়ে মূলধন দ্রব্যের উৎপাদনে যেমন মনোনিবেশ করে বিপুল শিল্পোৎপাদনের ভিত্তি রচনা করা হয়েছিল, তেমনটিও করা চলত।

ভারতে শিল্পবিপ্লব সমাধা করার কোন কার্যক্রম ব্রিটেনের ছিল না। ছিল না এই কারণে যে, ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজার ছিল ভারত। শিল্পোন্নত প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করা ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর কাম্য ছিল না।

ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পায়ন : প্রকৃতি নির্ণয়

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন বিজয়ী জাতির নজির নেই যা শুধুমাত্র বিজিত জাতির মঙ্গলার্থে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। বিশেষ করে বিজিত দেশে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্য না থাকলে ঐ বিজয়ী জাতি বিজিত অর্থনীতির উপর শোষণ কায়েম করতে যে প্রলুব্ধ হবে বলাই বাহুল্য। ব্রিটেনের ধনিক-শ্রেণী ঐ প্রলোভন জয় করার কোন সঙ্গত কারণ দেখতে পায়নি। কিন্তু বিজিত জাতিকে শোষণ করার ব্যাপারে ওলন্দাজ, দিনেমার, স্পেনীয় বা ফরাসী ধনিকশ্রেণীর তুলনায় ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ভূমিকা কৃষ্ণতর বর্ণে অঙ্কণ করা ঠিক নয়।[7] ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ও শিল্পগুলির মূলধন যূথবদ্ধ হয়ে 'ফিনান্স ক্যাপিটাল'-এর রূপধারণ করে উদ্বৃত্ত মূল্যের হার স্ফীত করার মধ্য দিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়তে ভারতে এসেছিল। গড়েওছিল তাই।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাতের সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ ও ধ্যানধারণার ছাঁচে গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে থাকে। ফলে, ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শাসন-শোষণে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী থেকেছে। একশ্রেণীর ব্রিটিশ উদারনৈতিক ভদ্রলোকের সন্ধান প্রায় সর্বদা পাওয়া গিয়েছে যাঁরা ভারতে তাঁদের স্বদেশবাসীদের কুশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে কুণ্ঠিত হননি।

অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশসমূহে বসবাসকারী জাতিগুলির তুলনায় ভারতীয়দের সভ্যতা-সংস্কৃতি উন্নততর থাকায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে

গ্রামীণ এলাকায় কৃষিজমির উপর ভীড় জমায়। কৃষিজমির উপর বিপুল জনসংখ্যার চাপ জমির খণ্ডিকরণ ডেকে আনে, কৃষকের আয় কমায়, ট্রাক্টর ইত্যাদি যন্ত্রপাতির ব্যবহার অসম্ভব করে তোলে। পশ্চাৎপদ কৃষি ও দরিদ্র কৃষকসমাজ শিল্পবিপ্লব সম্ভাবনার সামান্য মেঘসঞ্চারকে অচিরে নির্মেঘ আকাশের শূন্যতায় পর্যবসিত করে।

শিল্পায়নের উষাকালে ভারতীয় শিল্পগুলির উপর ব্রিটিশ মূলধনের নিয়ন্ত্রণ অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল। অনুরূপ প্রভাব একচেটিয়া কারবারের সূত্রেও বিস্তৃত হয়েছিল। তাছাড়া, 'হিন্দু নৈতিকতার' প্রভাব শিল্পায়নে ভারতীয় উদ্যোগ সৃষ্টিতে খুব কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল বলে মনে হয় না।

ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক শিল্পের জন্ম ও বিকাশ

সম্ভাব্য শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা বিচারে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্নে ভারত অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলির তুলনায় অগ্রসর ছিল। শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকের সংখ্যা, শিল্পপণ্যের পরিমাণ, শিল্পপণ্যের মোট মূল্য এবং বিভিন্ন পথে শিল্পপ্রয়াসের বিস্তারের নিরিখে ভারত সমকালীন উন্নয়নশীল অর্থনীতির দাবিদার রাষ্ট্রগুলির তুলনায় উন্নততর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এই অগ্রসরতা বা উন্নততর মর্যাদা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসরতার উৎকর্ষের দ্যোতক না হয়ে অন্যান্য আফ্রো-এশীয় দেশগুলির শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতারই সূচনা করে। ধনতান্ত্রিক শিল্পবিকাশে সফল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির তুলনায় ভারতের শিল্প দুর্বল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল—কায়িক শ্রমকে হটিয়ে যন্ত্রশক্তি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বশেষ পর্যায়েও তথাকথিত ভারতীয় 'শিল্পবিপ্লবকে' ধন্য করেনি।

ভারতের ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক সংগঠনের প্রধানতম দুর্বলতা ছিল পশ্চাৎপদ কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সঙ্কীর্ণ, অপর্যাপ্ত ক্ষেত্রে বিস্তৃত শিল্পপ্রয়াস। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রেট ব্রিটেনের হস্তচ্যুত হবার অব্যবহিত পরেও, ১৯৪৮-৪৯ সালে বাৎসরিক জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, আর ঐ আয়ের শতকরা ১৭·১ ভাগ বা ১ কোটি ৪ লক্ষ ৮ হাজার টাকা মাত্র শিল্প থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। কর্মে

নিযুক্ত ভারতবাসীর মাত্র শতকরা ৯·৬ ভাগ (১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৫ হাজার) শিল্পে নিযুক্ত ছিল।[8]

ভারতের শিল্পপ্রয়াস বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের শিল্পগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় আয়ের শিল্পোদ্ভূত অংশের শতকরা ৫৮·৮ ভাগ এই ধরনের শিল্পগুলি থেকে আসত। খনি ও যন্ত্রশিল্পের মত সংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পে নিযুক্ত সমগ্র কর্মীদের শতকরা মাত্র ২৫·৯ ভাগ (৩৫ লক্ষ) ব্যাপৃত ছিল। বাদবাকি ৭৪·১ ভাগ (৯৯ লক্ষ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিতে নিযুক্ত ছিল।[9]

কোম্পানি আমলে ভারতীয় শিল্পায়ন

ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ পর্যায়ক্রমিক কতগুলি বিভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি পর্যায় ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের নীতি, বিদেশী ও দেশী মূলধনের পরিমাণ ও প্রকৃতি, উৎপাদনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা এবং শিল্পের পণ্যসম্ভার আর্থনীতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও কাটতির সম্ভাবনা দ্বারা বিশেষভাবে অন্যান্য পর্যায়গুলি থেকে পৃথকীকৃত। প্রথম পর্যায়টিকে কোম্পানি আমলের পর্যায় নামকরণ করা যেতে পারে। এই পর্যায়ে কোম্পানির মুনাফা আমদানি-রপ্তানির অনুকূল বাণিজ্যিক আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বভাবতই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজস্ব চাহিদা ও রপ্তানির প্রয়োজন মেটাতে ভারতের মাটিতে শিল্পোৎপাদন ঘটাতে অনাগ্রহী ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি কোম্পানি সরাসরি বা ব্রিটিশ উৎপাদকদের মাধ্যমে কয়লা, ধাতু, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই প্রয়াস বিভিন্ন কারণে স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল মাত্র।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তনের পর থেকে ভারতে আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কোম্পানি আমলের ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদানের নীতি পরিত্যক্ত হয়; ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করে অনুভূত হতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালীন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারতে পাঠানোর খরচ এবং সময়ের অপচয় বিশেষ করে উপলব্ধি করেছিল। এই

উপলব্ধির ফলশ্রুতিতে কয়লা, অস্ত্রশস্ত্র, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্রের কারখানা ইত্যাদির মত ভারীশিল্প সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং বৃহত্তর ভাবী শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে সামগ্রিকভাবে মূর্ত করে তোলে।[10]

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী ভারতে শিল্পায়ন

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিকে সুয়েজ খালের মধ্য দিয়ে ব্রিটেন থেকে অল্প সময়ের ব্যবধানে ভারতে পণ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হলে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতের শিল্পায়নে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণের নীতি পরিত্যাগ করে। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যে শিল্পনীতি অনুসৃত হতে থাকে তাকে বলা যায় 'না উৎসাহ দান, না বৈষম্যকরণের নীতি'। ব্যক্তি-মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে 'মুক্ত বাণিজ্য' নীতির মূল ভাবটি অনুসৃত হতে থাকে। ঐ সময় পর্যন্ত শিল্পায়ন নিয়ন্ত্রণের কোন আইনকানুন ভারতে রচিত হয়নি। সম্ভবত দুর্বল, অধস্তন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভীত ছিল না বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়নের ইতিহাসের মূল দিক্‌চিহ্নগুলি বা কাল-বিভাগ নির্বাচনের ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাকালকেই ভারতের আধুনিক ভারীশিল্প বিকাশের ঊষাকাল বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রধানতম কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ভারতের ঔপনিবেশিক ধাঁচে শিল্পায়ন সম্ভব করে তোলে। লর্ড ড্যালহৌসি রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন সম্পর্কে ওকালতি করে যে বয়ান রচনা করেছিলেন তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক শোষণ কায়েম করার অভিপ্রায়ে ভারতে রেলপথ সৃষ্টি করা হয়েছিল। নদীজপমালাধৃত প্রান্তরের দেশ ভারতে স্বল্প ব্যয়ে জলপথ ও জলযান সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সারা দেশব্যাপী অবাধ অন্তর্বাণিজ্যের বিকাশ না ঘটিয়ে প্রচুর অর্থব্যয়ে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থরক্ষার অনুসারী হয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ার, ম্যানচেস্টার প্রভৃতি উত্তর ইংল্যাণ্ডের শহরগুলির বস্ত্রকলগুলিতে ভারতের দূরদূরান্ত থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তুলা সরবরাহ করা, ক্রমোন্নত ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার ভারতের নগরে ও গ্রামে পৌঁছে দেওয়া এবং

ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থলগ্নীর ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার প্রয়োজনে ভারতে রেলওয়ে ব্যবস্থার পত্তন ঘটেছিল। রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতে আধুনিক শিল্পের জনকরূপে প্রতিভাত হবে বলে কার্ল মার্কস যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। প্রথমে রেলওয়ের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে ও পরে রেলওয়ের চাহিদা ছাড়াও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে নানা ধরনের শিল্প ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত ব্রিটেনের শিল্পগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহকারী ও ব্রিটিশ মূলধনের অস্বাভাবিক মুনাফালাভের উপযোগী বিনিয়োগের দেশ হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়ে যে-সকল শিল্প ভারতে গড়ে উঠতে থাকে সেগুলি প্রধানত কাঁচামাল প্রক্রিয়াগত পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে রপ্তানিযোগ্য করে তুলবার কাজে নিয়োজিত হয়। তুলা তৈরী, তুলা ধোনা, কলের সাহায্যে কার্পাস বীজশূন্য করা, এবং পাটের সুতো, তেল ও চা তৈরী করার মত শিল্পগুলির শিল্পপ্রয়াস এই সময়ে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। পাটশিল্প ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিল্পগুলি বিদেশী রাষ্ট্রে দ্রব্যসম্ভার রপ্তানির জন্য প্রধানত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ধাতুশিল্প, কয়লাশিল্প বা রেলওয়ের মত বৃহৎ শিল্পগুলি কাঁচামাল রপ্তানির দেশ ভারতের মূল চরিত্রকে কোনক্রমেই পরিবর্তিত করতে পারেনি, কেননা এই শিল্পগুলিও কাঁচামাল সৃষ্টি বা রপ্তানিতে সক্রিয় ছিল।

চর্মশিল্প, জুতা তৈরীর শিল্প ও পশমশিল্প ঔপনিবেশিক সেনাবাহিনীর প্রয়োজন মেটাতে প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হয়।

রপ্তানির প্রয়োজনে শিল্পপ্রতিষ্ঠার নীতি ভারতে শিল্পায়নের ভৌগোলিক চরিত্রটি নির্ধারণ করে দেয়। খনিশিল্পের অবস্থান ও সামরিকবাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের কানপুর-ভিত্তিক শিল্পগুলির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে বলা যায় যে, বিদেশে রপ্তানির কাজে লিপ্ত দ্রব্যগুলির প্রস্তুতকারী শিল্পগুলি স্বাভাবিক কারণেই বন্দরনগর কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে গড়ে উঠেছিল।

নীল, চা, কফি, পাট, কয়লা, খনি, পশম, জুতা, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র তৈরী করার শিল্পপ্রয়াসে ব্রিটিশ মূলধন প্রধানত নিযুক্ত ছিল; ভারতীয় মূলধন প্রধানত বস্ত্র উৎপাদন, কার্পাস সুতো তৈরী, কার্পাসের বীজ অপসারণ, ময়দা, চাল এবং বনস্পতি তেল তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল। ভারতীয় প্রয়াসের পাশাপাশি ব্রিটিশ কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান অবস্থান করেনি এমন নয়, আবার

ব্রিটিশ মূলধনের প্রাধান্যের পাশাপাশি সীমিত ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধন নিয়োজিত হয়নি এমন নয়।

১৮৫০ থেকে '৫৫ সালের মধ্যে প্রথম বস্ত্রশিল্পের কারখানা, গুটিকয়েক পাটশিল্পের কল এবং কয়লা খনি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৯ সালের শেষাশেষি ভারতে বস্ত্র তৈরীর কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৬। ১৮৮০ সালে ভারতে ৫৬টি কয়লা খনি ক্রিয়াশীল ছিল; ১৮৮২ সালে পাটশিল্পের ২০টি কারখানা চালু ছিল।

১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নূতন কোন শিল্পের উদ্ভব ভারত প্রত্যক্ষ করেনি। বস্ত্র, পাট ও কয়লাশিল্পে অবশ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। বস্ত্র তৈরীর কারখানার সংখ্যা ১৮৯৪-৯৫ সালে ১৪৪-এ গিয়ে পৌঁছয়; ঐ বৎসর পাটশিল্পের কারখানার সংখ্যা এবং কয়লা খনির সংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়ায় ২৯ ও ১২৫।

ভারতের শিল্পায়ন প্রয়াসের ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে মহাগোবিন্দ রানাডে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারত উত্তমরূপে এমন পথে পদক্ষেপ করেছে যে, তার ধনিকেরা এতকাল যেরূপ ভাবোন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হয়ে অগ্রসর হয়েছে সেরূপ একইভাবে ঐ নীতি অনুসৃত হলে ভারতের শিল্পমুক্তির লক্ষ্য সার্থক না হয়েই পারে না।'[11]

বিংশ শতাব্দীর আরম্ভকালের কিছু আগে-পরের কয়েক বৎসরে (১৮৯৫-১৯০৫) ভারতে শিল্পায়নের গতিবেগ, বিশেষ করে বস্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতি, কিছুটা রুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কারণের যৌথ চাপে। ভয়াবহ দুটি দুর্ভিক্ষ ভারতের কৃষকসমাজকে হৃতসর্বস্ব করে তোলে। ১৯০২ সালে শক্তিশালী ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনিকসমাজের তুলা নিয়ে ফাটকাবাজির ফলে তুলার বাজার-দাম হু হু করে বেড়ে যায়। ভারতীয় বস্ত্রকলগুলি প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলা করতে গিয়ে মন্দীভূত গতিবেগে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াসে রত থাকে।

স্বদেশী আন্দোলন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় আধুনিক শিল্প

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে উত্তাল দিনগুলিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্বদেশী শিল্পায়নের আওয়াজ তোলে। এই আওয়াজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল এমন নয়। প্রায় এক দশক পরে, প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্নে, বস্ত্র ও পাটশিল্প অবশ্য বেশ কিছুটা উন্নতি ঘটিয়েছিল—মিলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ২৬৪ ও পাটশিল্পের ক্ষেত্রে ৬৪ পর্যন্ত পৌঁছয়। তাছাড়া, পরিবহন ও জ্ঞাপন ব্যবস্থার বিস্তার এবং মিলগুলির কাঁচামাল সরবরাহ ও শিল্পজাত দ্রব্য চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তির যোগান দিতে কয়লাশিল্প ক্রমোন্নতির দিকদর্শন বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯১৪ সালে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫১,৩৭৬।

ডি. এইচ. বুচানন বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতি সন্তোষজনকভাবে স্থিতিশীল ছিল। 'কার্পাস তুলার মাকুর সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়, শক্তিচালিত তাঁতের সংখ্যা চতুর্গুণ হয়ে যায়; পাটের তাঁত সংখ্যা সাড়ে চার গুণ বাড়ে, আর কয়লা উত্তোলন সামর্থ বৃদ্ধি পায় ছয় গুণ।' উক্ত সময়সীমার মধ্যে পেট্রোলিয়াম, স্বর্ণ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, প্রাকৃতিক রবার, শোরা প্রভৃতি শিল্প আত্মপ্রকাশ করে। কিছু নূতন চালের কল ও কাঠের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। লোহা, পিতলের জিনিসপত্র তৈরীর কারখানাও গুণগত ও সংখ্যাগত দিকথেকে দ্রুত উন্নতিলাভ করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প জন্মলাভ করে পঙ্গু সন্তান হিসাবে, কেননা প্রধানত রেলওয়ের মেরামতির প্রয়োজনে এই শিল্পের কাজকর্ম নিয়োজিত ছিল। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত আত্মপ্রকাশ এই সময়ে ঘটলেও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে এই শিল্প সক্ষম হয়নি।

অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে নূতন নূতন শিল্পোদ্যোগ চিনি, কাগজ, দেশলাই, কাঁচ, সাবান, সিমেন্ট, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র এবং বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে পথ খুঁজে পায়। আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার চাপে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প দেশীয় বাজারের চাহিদার যোগান দিতে উঠে পড়ে লেগে যায়; শেষ পর্যন্ত ফল এরূপ দাঁড়ায় যে, রপ্তানির পরিমাণ অপেক্ষা দেশীয় বাজারে বিক্রীত বস্ত্রসম্ভারের পরিমাণ বেশী হয়ে যায়। দেশলাই ও শক্তি উৎপাদন ছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে নিযুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধন প্রাধান্য অর্জনে সমর্থ হয়। মূলধনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষাশেষি ভারতে লগ্নীকৃত ব্রিটিশ মূলধনকে ছাড়িয়ে যায়।

ভারতীয় শিল্পগুলির অভ্যন্তরীণ বাজারমুখীনতার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় নূতন শিল্পকারখানাগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের মৌলনীতির পরিবর্তন ঘটতে

থাকে। বন্দরনগরগুলিতে অবস্থানের সুযোগ না খুঁজে ঐ কারখানাগুলি দেশের অভ্যন্তরে দূরদূরান্তে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে স্বদেশী শিল্পায়ন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সপক্ষে যে জীবনদর্শন ও কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছিল তা সর্বাংশে ত্রুটিমুক্ত ছিল না। নরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতাদের কেউ কেউ ভারতের প্রাচীন কুটির ও হস্তশিল্পের প্রতি সশ্রদ্ধ-সপ্রেম, ইতিহাস-রোমন্থনের মাধুর্যমণ্ডিত আবেশ অনুভব করলেও, প্রায় সব নরমপন্থী নেতাই ভারীশিল্পের ভিত্তিতে শিল্পায়নের আধুনিক পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। চরমপন্থী নেতারা পশ্চিমী শিল্পায়নের ছক্ বা নমুনাটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্বদেশী শিল্পায়নের নূতন একটি ছক্ রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের আর্থনীতিক তত্ত্বগত বিরোধ পশ্চিমী ছকের আংশিক পরিবর্তন এবং হস্তশিল্প, হস্তচালিত তাঁত ও চরকার উপর ভারতীয় শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব অর্পণের মধ্য দিয়ে ঐক্যমত খুঁজে পায়। পশ্চিমী শিল্পায়নের ছকটি স্বদেশীযুগে জনপ্রিয়তা হারায় সামাজিক ও আদর্শগত নানা কারণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমী সভ্যতার ধনী-দরিদ্র দুই মেরুপ্রান্ত সৃষ্টির প্রবণতা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও পার্থিব ধনসম্পদ-লাভের তাড়নায় উন্মত্ত প্রয়াস সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে এশীয় বা ভারতীয়, শিল্পসভ্যতার একটি রূপরেখা রচনায় ব্রতী হন। অ্যানি বেসান্ত, নিবেদিতা হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয়দের প্রাচ্যসভ্যতার সমর্থনে নানা বক্তব্য ঐ রূপরেখা রচনায় উৎসাহ যোগায়।

'যন্ত্রপাতি সাধারণ মানুষের দুর্দশা বাড়ায়, আর মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তির কেবলমাত্র উপকার করে। ...হস্তশিল্প প্রত্যেকের জন্য খাদ্যসংগ্রহ করে, সকলের জন্য স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে এবং সুযোগ্য ও ধর্মভাবাপন্ন মানুষ সৃষ্টি করে।'[12] নরমপন্থী-চরমপন্থী নির্বিশেষে এরূপ একটি মনোভাব যন্ত্রচালিত তাঁতের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করে হস্তচালিত তাঁতের সপক্ষে প্রচার অভিযানে আত্মনিয়োগ করে। অর্থনীতিক বিচারে যন্ত্রচালিত-হস্তচালিত তাঁত-কেন্দ্রিক তর্কবিতর্কের কোন সদর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতীয় পরিবেশে উভয় প্রকার তাঁতেরই প্রয়োজনীয়তা ছিল। ১৯০৬ সালে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল শক্তিচালিত তাঁতে উৎপন্নের দ্বিগুণ। মোটা ও

মাঝারি কাপড়চোপড়ের ক্ষেত্রে শক্তিচালিত তাঁত যেমন অগ্রগতি সম্ভব করে তুলছিল, মিহি ও একেবারে মোটা ধরনের বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে হস্তচালিত তাঁত তেমনই পূর্বাবস্থা প্রায় বজায় রেখেছিল। তাছাড়া, ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতগুলি বোম্বের বস্ত্রকলগুলির তৈরী সুতোর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করত। আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ১৯০৫ সালের ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে বোম্বের প্রখ্যাত মিলমালিক ভি. ডি. থ্যাকার্সে হ্যাভেল-প্রবর্তিত উন্নততর হস্তচালিত তাঁতের বহুল ব্যবহার সমর্থন করেছিলেন।[13] তিনি সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে, হস্তচালিত তাঁত আসলে শক্তিচালিত তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, পরিপূরক। চীনদেশে ভারতীয় সুতোর বাজার অনিশ্চিত হয়ে উঠলে হস্তচালিত তাঁতে মিলগুলির তৈরী সুতোর বহুল ব্যবহার ঘটিয়ে মুনাফা লোটা মিলমালিকদের কাছে একমাত্র পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। হস্তচালিত তাঁত ঐ সুতো ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতীয় বস্ত্রকলগুলির 'স্বেচ্ছাসম্মত দালাল'রূপে প্রতিভাত হতে থাকে।

বোম্বের মিলগুলি আবার মিহি কাপড় তৈরী করার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকলগুলির দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলাজাত সুতো ব্যবহার করত। কাজেই স্বদেশী আন্দোলনেরযুগে বিদেশীবস্ত্র ও সুতো এবং শক্তিচালিত তাঁতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশীয় হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে উজ্জীবিত করার প্রয়াস প্রায় অলঙ্ঘনীয় বাধার দুয়ারে মাথা কুটতে বাধ্য হয়েছে। বঙ্গদেশে বাঙালী মূলধনে গড়ে ওঠা বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের শেয়ার বিক্রী করতে স্বদেশী আন্দোলনের অনেক নেতা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আবার তাঁরাই উচ্চকণ্ঠ হয়ে হস্তচালিত তাঁতের পক্ষে সওয়াল করে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন। কিছু পরবর্তীকালে গান্ধী এই অদ্ভুত, বিচিত্র অবস্থা থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মুক্তি দেন ; চরকা জনপ্রিয় করে তিনি বিদেশী বস্ত্রকলগুলির স্বার্থ ও দেশীয় হস্তচালিত তাঁতগুলির বস্ত্রকল-নির্ভরতার মূলে কুঠারঘাত করতে সমর্থ হন। মিলমালিক শিল্পপতিদেরও চরকা বিরোধিতার বিশেষ প্রয়োজন হয়নি, কেননা ইতিমধ্যে মিলগুলি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছিল।

স্বদেশী যুগের নেতৃবৃন্দ বৃহৎ মূলধনের বিরোধিতা করে স্বল্প মূলধনে পারচালিত কুটির ও হস্তশিল্পের ভাবী স্বর্ণময় যুগের স্বপ্ন সার্থক করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সোবিয়েত ঐতিহাসিক রিসনীর ও গোল্ডবার্গ এ ধরনের স্বদেশী আর্থনীতিক চিন্তাকে 'পেটি-বুর্জোয়া' আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের

শ্রেণী নির্ণায়ক চিন্তা সঠিক হয়ত নয়; ধনতন্ত্রের বিকাশে স্বদেশী আর্থনীতিক চিন্তা যে সহায়ক ছিল না তাতে সন্দেহ নেই।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতার ধাক্কায় বা সাংগঠনিক অনভিজ্ঞতায় বা মূলধনের অভাবে ধনতন্ত্রের যাত্রাপথের পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ করে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল কেমিক্যালের মত দু'একটি প্রতিষ্ঠান স্বদেশী স্মৃতি জাগরূক রাখতে বেঁচে থাকে।

আর্থনীতিক চিন্তার দিক থেকে দেখতে গেলে স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে ঐ আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে সুফলপ্রসূ হয়েছিল। জাতীয় স্বাবলম্বন, বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার বর্জন, যন্ত্রনির্ভর শিল্পায়নের পরিবর্তে জনবহুল ভারতে শ্রমনিবিড় শিল্পায়ন ইত্যাদি ধারণাগুলি স্বদেশী যুগে জাতীয় চৈতন্যের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল। এই ধারণাগুলির উপর ভিত্তি করে গান্ধী পশ্চিমী ধনতন্ত্র-বিরোধী স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ভারতীয় রূপরেখাটি রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐ রূপরেখা অপ্রতিরোধ্য ধনতন্ত্র রুখতে বা ভাবী ভারতীয় আর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অনুসৃত হয়েছে কিনা বলা শক্ত।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, পণ্য-অর্থের সম্পর্ক ও ধনতান্ত্রিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার জন্ম ও বিস্তার সংশ্লিষ্ট দেশের অভ্যন্তরে শিল্পপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে প্রামাণ্য হয়ে ওঠে। ভারতে দেশীয় মূলধনের সামর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ক্রমহ্রাসমান শক্তির দ্যোতক হয়ে উঠতে থাকে। সুইডেন, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, জার্মানী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি সুযোগ বুঝে দুর্বল ব্রিটেনের আর্থনীতিক কব্জা শিথিল করে ভারতীয় বাজার দখল করতে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী উপলব্ধি করে যে, বিদেশী প্রতিযোগিতায় তাদের গাড়ি, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র ও বস্ত্রসম্ভারের ভারতীয় বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা আসন্ন। ভারতীয় শিল্পপতিদের অবস্থাও তখন সঙ্গীণ হয়ে উঠেছিল। বিদেশী প্রতিযোগীদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির উৎপন্ন দ্রব্যের সাথে প্রতিযোগিতা করবার জন্য নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমন কি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মত শিল্পগুলিও প্রতিযোগিতার পাল্লায় পড়ে ক্ষতির অঙ্ক গুণতে থাকে।

ভারতীয় শিল্পগুলির প্রয়োজন ছিল সরকারী সাহায্য ও অনুদান এবং সংরক্ষণ নীতির সুরক্ষা। যতদিন সম্ভব হয়েছে ভারতীয় শিল্পগুলির দাবিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নস্যাৎ করে দিয়েছে। যখন ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের স্বার্থে সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ কাম্য মনে করেছে তখনই কেবলমাত্র ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ঐ নীতি স্বার্থান্ধ প্রবৃত্তিতে রূপায়ণ করেছে। স্যার ভ্যালেনটাইন কিরলের মত লেখকও স্বীকারোক্তি করেছেন যে, অতীতে ভারতীয় শিল্পায়নের বিকাশে ব্রিটেনের ভূমিকা খুব একটা প্রশংসা-জনক ছিল না এবং কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির চাপেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি ঔদাসীন্য (ঈর্ষার মনোভাব যদি না-ও বলা হয়) ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ১৯২১ সালের সরকারী বাৎসরিক রিপোর্টে স্বীকারোক্তি প্রকাশ পায় যে, ব্রিটিশ আর্থনীতিক স্বার্থ রক্ষার তাগিদ অন্যতম কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে ভারতীয় শিল্পগুলিকে সাহায্য করবার প্রশাসনিক উদ্যোগ শুরু করে দিয়েছে। 'ভারতের নৈতিক ও পার্থিব উন্নতি (১৯২১)' শীর্ষক দলিলে বলা হয় যে, 'যুদ্ধের কিছু পূর্ববর্তী সময়ে পথিকৃৎ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও সরকারী অর্থসাহায্যের মাধ্যমে ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহদানের কয়েকটি প্রয়াস হোয়াইটহলের কার্যকরী বিরোধিতায় বানচাল হয়ে যায়।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে বিদেশী পণ্যের আমদানি প্রচণ্ডভাবে হ্রাস পেলে ভারতীয় শিল্পগুলি অভ্যন্তরীণ বাজারে একাধিপত্যের সুযোগ পায়; আবার যুদ্ধের চাহিদা যোগান দিয়েও ভারতীয় শিল্পপতিরা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও বর্ধিত কলেবর মুনাফা লাভের সুযোগ লাভ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী উপলব্ধি করেছিল যে, উপনিবেশ হিসাবে ভারতকে কুক্ষিগত করে রাখতে হলে শিল্পবিকাশের একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। ১৯১৫ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারত সচিবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে, ভারতে শিল্পায়নের ভিত্তি রচনা না করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ দেশ বিদেশী শিল্পোন্নত জাতিগুলির 'দ্রব্যসম্ভারে আকীর্ণ' হয়ে উঠবে। ১৯১৬ সালে শিল্প কমিশন ভারতীয় শিল্পায়নের চিন্তাভাবনা সুপারিশের উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়। ১৯১৮ সালের মণ্টাগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে বলা হয় যে, 'আর্থনীতিক, সামরিক ও রাজকীয় স্বার্থের নিরিখে এখন থেকে ভারতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নততর ব্যবহার জরুরী মনে হয়।

সাম্রাজ্যের শক্তিতে শিল্পসমৃদ্ধ ভারত কতখানি যে শক্তি সংযোজন ঘটাবে তা আমরা পরিমাপ করতে পারি না।'

বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতি ও ভারতীয় আধুনিক শিল্প

বিদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করে নির্বাচিত ভারতীয় শিল্পগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়োজনে ১৯২৩ সালে সংরক্ষণ নীতি চালু করা হয়। একটি কেন্দ্রীয় বাণিজ্যশুল্ক পরিষদ গঠিত হয়। লৌহ, ইস্পাত, চিনি, দেশলাই, বস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি শিল্পকে এই নীতির আওতায় এনে অনুরূপ শিল্পে উৎপন্ন বিদেশী জিনিসপত্রের উপর এমন চড়া হারে আমদানি শুল্ক চাপান হয় যে, দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা তুলনামূলকভাবে অনেক সুবিধাজনক হয়ে পড়ে।

লক্ষণীয় যে, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের কার্যকরীভাবে ভারতের বাজারে দুর্বল করে দিতে সক্ষম হয়, অথচ **ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর আর্থনীতিক স্বার্থে ঐ নীতি একটি আঁচড়ও কাটেনি**। যে-সকল শিল্পজাত দ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল সেগুলি প্রধানত জাপানী, ইন্দোনেশিয়ার ওলন্দাজ, সুইডিশ, বেলজিয়ান ও ফরাসী ধনিকশ্রেণীর শিল্পকারখানায় উৎপন্ন ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এক ঢিলে দু'পাখী মারে—ভারতীয় জনমতের, বিশেষ করে শিল্পপতিদের, অভিলাষ চরিতার্থ করার আংশিক ঔদার্য প্রকাশের সুযোগ লাভ করে এবং নিজের সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভারতীয় বাজার থেকে হঠিয়ে দেওয়ার কৌশল বাস্তবায়িত করে।

তাছাড়া, সংরক্ষণ নীতি শুধুমাত্র সীমিত ক্ষেত্রে প্রযুক্ত থেকে ভারতের আর্থনীতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেছিল এমন নয়; এই নীতি এমনভাবে পরিচালিত হয়েছিল যে, সংরক্ষিত শিল্পগুলির সাথে যুক্ত অন্যান্য শিল্পগুলি অরক্ষিত থেকে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির আচ্ছাদন মিলেছিল, অথচ বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ক্যালসিয়াম-ক্লোরিন-অক্সিজেন যৌগিক এবং রঙীন করার রাসায়নিক মালমসলা বা বস্ত্র শক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মাড় বা কলপ তৈরী করার সাথে যুক্ত শিল্পগুলি সংরক্ষণ নীতির সাহায্য লাভ না করে কর্মমুখর হয়ে উঠবার সুযোগ লাভ করেনি। ফলে, বস্ত্র উৎপাদন বিশেষ করে বিশ্বের বাজারের উপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ভারীশিল্পগুলির ক্ষেত্রে

সংরক্ষণ নীতি এমন কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, ঐগুলি প্রধানত রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণে তৎপর হয়েছিল।

অধিকন্তু, দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী দশকগুলিতে পূর্বতন বৈষম্যমূলক ঋণদান, মুদ্রাজনিত ও আর্থিক নানা ধরনের পক্ষপাত ভারতের শিল্পায়নের গতিবেগ রুদ্ধ করে দিতে সক্রিয় ছিল। এরূপ নীতি 'রাজকীয় অগ্রাধিকার' নামীয় গালভরা নীতির হাত ধরে একদিকে যেমন ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ ধনিকদের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য আমদানিতে উদার হস্তে সুবিধা যুগিয়েছিল, অন্যদিকে তেমন ভারতীয় কাঁচামাল ও অর্ধ-শিল্পজাত পণ্যসামগ্রীর ব্রিটেনে স্বচ্ছন্দ প্রবেশ সুনিশ্চিত করেছিল।

সর্বশেষে, উল্লেখ করা যায় যে, স্বাধীন, স্বয়ম্ভর ভারতীয় শিল্পায়নের প্রয়াস ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে শুধুমাত্র আর্থনীতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আঘাত-প্রাপ্ত হয়েছিল এমন নয়। **রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করেও ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই আঘাত জোরদার করেছিল।** ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতের প্রথম রেল কারখানার উৎপাদিত সরঞ্জাম কর্তৃপক্ষ ক্রয় করতে অস্বীকার করেছিল, মালিকের কাছ থেকে কারখানার মালিকানা হস্তগত করে ঐ কারখানার বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। তিরিশের দশকের শেষের দিকে বোম্বের কয়েকজন শিল্পপতি মার্কিন ক্রাইসলার্ কোম্পানির সাথে যৌথ কর্তৃত্বে একটি মোটরগাড়ির কারখানা স্থাপন করার আবেদন জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হন।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালীন শিল্পায়ন

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শিল্পনীতি ভারতের শিল্পগুলির অসম বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সংরক্ষণ নীতির অনুসরণে ভোগপণ্য শিল্প ও হাল্কা শিল্প বেশ কিছুটা দ্রুততায় বিকাশ লাভ করে, কিন্তু ভারীশিল্পগুলি শ্লথগতিতে অগ্রসর হতে থাকে। আন্তর্শিল্প অসমানুপাতিক অগ্রগতি ক্রমে ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী মূলধন সঞ্চয়ে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে; কিন্তু প্রচণ্ড ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়াতে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে আর্থনীতিক বাজারের পুনর্বণ্টন ছাড়া ভারতীয় শিল্পায়নের স্বাধীন বিকাশ অসম্ভব ছিল। ভারতীয় ও ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে তীব্রতা লাভ করতে থাকে।[14]

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে চিনি, সিমেন্ট, শক্তি, ধাতু ও রাসায়নিক

শিল্পগুলি ধারাবাহিক অগ্রগতি বজায় রাখতে পেরেছিল। এই শিল্পগুলি প্রধানত ভারতীয় বাজারের জন্য উৎপাদনে লিপ্ত ছিল। শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে ভারতীয় মূলধন প্রাধান্য অর্জনে সামর্থ লাভ করেছিল। ত্রিশের দশকের বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক সঙ্কটের বছরগুলিতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয় এবং বেশ কিছু কারখানা-ভিত্তিক শিল্পের বিস্তারে প্রধান রূপকার হয়ে ওঠে।

দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা যোগানে রত শিল্পগুলির উদ্ভবের ফলশ্রুতিতে শিল্প অবস্থানের ভৌগোলিক চিত্রটি পরিবর্তিত হতে থাকে। নূতন নূতন উৎপাদনকেন্দ্র ভারতের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে—বিহার (সিমেণ্ট, চিনি ও ধাতুশিল্প), উত্তরপ্রদেশ (চিনি, বস্ত্র ও কাঁচশিল্প), মধ্যপ্রদেশ (বস্ত্রশিল্প) এবং কতকগুলি প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যে। বিকেন্দ্রিকরণের প্রক্রিয়াটি কয়লা, বস্ত্র প্রভৃতির মত প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলিতেও প্রভাব ফেলতে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৎসরগুলিতে শিল্পায়ন

ভারতীয় ফ্যাক্টরি শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অভূতপূর্ব গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য বিশ্ববাজারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রীর পরিমাণে বিপুল হ্রাস ঘটে—১৯৩৮-৩৯-এর তুলনায় ঐরূপ আমদানি ১৯৪১-৪২ সালে শতকরা ৭৪·২ ভাগে দাঁড়ায়, ১৯৪২-৪৩-এ ৩৭·৬, ১৯৪৩-৪৪-এ ৩৯·৬ এবং ১৯৪৪-৪৫-এ ৭১ ভাগে পৌছয়। আমদানির খরচ জিনিসপিছু দ্বিগুণ হয়। বিদেশী জিনিসপত্রের প্রতিযোগিতার হ্রাস ঘটলে ভারতীয় শিল্পায়নের সুযোগ বর্ধিত হয়। মুনাফার হার হঠাৎ বাড়ে।

সমরাস্ত্রের প্রয়োজনে যুদ্ধের সময় অসংখ্য অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি স্থাপিত হয়েছিল। সরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯১ থেকে ৭০৩-এ দাঁড়ায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পূর্ব গোলার্ধের সদস্য-দেশগুলির ১৯৪০ সালের সম্মেলনে যুদ্ধপ্রয়াস সংহত করার জন্য একই রকম জিনিসপত্র একাধিক দেশে উৎপাদনের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারত সাধারণ ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য, আর অস্ট্রেলিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমন্বয়ে জটিলতর শিল্পজ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের দায়িত্ব লাভ করে। কিছু ভারতীয় ভারীশিল্প এই সময় গড়ে

ওঠে। যুদ্ধের গতি মিত্রশক্তির অনুকূল হলে ঐ ধরনের শিল্পবিস্তারে ব্রিটেনের আগ্রহ কমে যায়।

যুদ্ধকালীন সময়ে কয়েকটি শিল্পে উৎপাদন দর্শনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়[15] :

শিল্প	১৯৩৮-৩৯ (ভিত্তি বৎসর)	১৯৩৯-৪০	১৯৪০-৪১	১৯৪১-৪২	১৯৪২-৪৩	গড়
লৌহ-ইস্পাত	১০০	১১০	১২৫	১৫০	২০০	১৪৬
বয়নশিল্প	১০০	৯৪	১০০	১৫৩	৯২	১১০
পাটশিল্প	১০০	১০৬	৯১	১০৩	৮৫	৯৬
চিনিশিল্প	১০০	১৯১	১৬৮	১২০	১৬৩	১৬০
কাগজ	১০০	১১৮	১৪৯	১৫৯	১১২	১৩৪
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১০০	১০৯	১১৫	১৩৫	১৩৫	১২৩

নূতন ধরনের শিল্পপ্রয়াসের কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায়[16] :

	১৯৩৮	১৯৪৫
মেসিন-টুল্‌স (হাজার হিসাবে)	০·১	১২·০
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যার একক)	—	৬৫০
বিদ্যুৎ মোটর (হাজারের এককে)	০·২	১২·০
রেলওয়ে ওয়াগন (হাজারের এককে)	২·৫	৪·৮
সিমেণ্ট (দশ লক্ষ টনের হিসাবে)	১·৫	২·০
সোডা এ্যাশ (হাজার টনের হিসাবে)	—	১২·০
সালফিউরিক অ্যাসিড (হাজার টনের হিসাবে)	২৫·৬	৫৯·০
অ্যামোনিয়াম সালফেট (হাজার টনের হিসাবে)	১১·০	২২·৪
সুপার ফসফেট (হাজার টনের হিসাবে)	২·০	৪·৫
প্লাইউড (দশ লক্ষ স্কোয়ার মিটার হিসাবে)	১·১১	৪৬·৪

যুদ্ধের সময় অ্যালুমিনিয়াম, ফেরো-অ্যালয় প্রভৃতি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বাধীন ভারতের সরকারের প্রথম আর্থ-

নীতিক উপদেষ্টা পি. জে. টমাস মন্তব্য করেছিলেন যে, যুদ্ধের সময় 'পুরোন শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়, নূতন যন্ত্রপাতির কারখানা স্থাপিত হয় এবং নূতন কারিগরী নৈপুণ্য অর্জিত হয়।' মন্তব্যটির মধ্যে অবিমিশ্র সত্য নিহিত আছে এমন নয়।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশিক ভারতে পরস্পর বিরোধী ফলাফলের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে বহু নূতন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পুরোন শিল্পগুলির উৎপাদন নীতি পরিবর্তিত হয়। বিদেশী প্রতিযোগিতা হ্রাস ও কয়েকটি ভারীশিল্প প্রতিষ্ঠা ভারতীয় শিল্পায়নের বনিয়াদে মৌল পরিবর্তন আনে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে বহু শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা রাতারাতি প্রত্যাহৃত হয়। বিদেশী প্রতিযোগিতা শুরু হয়। বহু ভারতীয় ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে সরকার পরিচালিত ফ্যাক্টরির সংখ্যা ৫৫৬-তে নামে। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বয়নশিল্পে পূর্বের তুলনায় মুনাফার হার শতকরা ৩৬ ভাগ হ্রাস পায়। হাল্কা শিল্পগুলিতেও উৎপাদন যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কমে। বয়নশিল্প ও হাল্কা শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৩৩৫,০০০ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধকালীন ঔপনিবেশিক ভারতীয় শিল্পপ্রয়াস 'কৃত্রিম ও অস্থায়ী' ধরনের ছিল বলে শ্রী এল. সি. জৈনের অভিমত সঠিক বলে প্রতীয়মান হয়।[17]

একচেটিয়া কারবার ও ভারতীয় শিল্প

পশ্চিমী দেশগুলিতে ধনতন্ত্র অবাধ প্রতিযোগিতার পথ দীর্ঘ পরিক্রমার পর অন্তর্নিহিত শক্তিগুলির যোগসাজসে একচেটিয়া কারবার-প্রধান ধনতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি ঐরূপ ধনতন্ত্রের অধীনে উৎপাদনের শক্তিগুলি গড়ে তুলে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উন্নত হয়ে ওঠে। কিন্তু **ভারতের ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের জন্মলগ্নে একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব নবজাতকের ভাবী জীবনের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করে।** অনুন্নত ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবার ক্ষতিকর ফলাফল ডেকে এনেছিল। উৎপাদনের শক্তিগুলি কুক্ষিগত করে একচেটিয়া কারবারের প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণে সহায়ক না হয়ে জনগণের আশাআকাঙ্খার বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত ক্ষমতাশালী একটি কেন্দ্র সৃষ্টি করেছিল। সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের তাগিদে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালিত

হয়ে জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় দিকগুলিতে শিল্পায়নের বিস্তারে প্রায়শ বাধা দিয়েছিল। অবাধ প্রতিযোগিতার অভাবে জিনিসপত্রের উৎপাদনের মান ও মূল্য ভোগকারী জনসাধারণের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিমী দেশগুলিতে উৎপাদনের শক্তিগুলি বিকশিত হয়ে অর্থনীতিকে উন্নত পর্যায়ে উন্নীত করার পরে অবাধ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া কারবারের পথ সুগম করেছিল। বিদেশী ধনিকশ্রেণীর অভিভাবকত্বে গড়ে-ওঠা ভারতীয় ধনতন্ত্রের অনুন্নত অবস্থায় একচেটিয়া কারবার উৎপাদনশক্তির পূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল।

পশ্চিমী দুনিয়ার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি স্বদেশীয় সরকারগুলির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক নীতি রচনা ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয়েছিল। রাষ্ট্রশক্তি ও একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ামক শক্তি একই শ্রেণীসূত্রে গ্রথিত ছিল। ভারতে ঐরূপ সূত্রগ্রন্থি ছিল না। ভারতীয় একচেটিয়া কারবারগুলি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আর্থনীতিক নীতি রচনা ও নিয়ন্ত্রণে প্রভাবশালী ছিল না। ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণী ঐরূপ প্রভাব বিস্তারে সক্ষম ছিল।

ভারতীয় শিল্পায়নের মন্দ ভাগ্য আরও একটি দিকে পরিস্ফুট হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় পরিচালিত একচেটিয়া কারবারী সংস্থাগুলি (রেলওয়ের মেরামতি কাজে লিপ্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরীতে নিয়োজিত কারখানা) ভারতীয় অর্থনীতির উন্নতির সহায়ক না হয়ে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সেবাদাসের ভূমিকায় রত ছিল বলা যায়। রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয় বা সামরিক বিষয় কেন্দ্রীয় আইনসভার আলোচনার বহির্ভূত রাখা হয়েছিল। রেলওয়ে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর মুনাফার ক্ষুধা চরিতার্থ করে শেষ পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে সরকার পরিচালিত সংস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণের ইচ্ছায় বা প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার আলোচনায় তা কখনও নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ব্রিটিশ ভারতের রেলওয়ে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষার প্রহরী হিসাবে কর্মরত ছিল না। রেলওয়ে পরিচালনায় ঐ শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রে জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ রেলওয়ে পরিচালনায় ক্রিয়াশীল ছিল।

ভারতে শিল্পায়নের আরম্ভ ও একচেটিয়া কারবারী সংগঠনের জন্ম প্রায় একই সময় থেকে; আধুনিক শিল্পের সূচনাকালের দু'দশকপর থেকেই একচেটিয়া কারবারী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে বলা যায়। ব্যবসা, শিল্প, ব্যাঙ্কিং সর্বত্রই

ঐ ধরনের সংগঠনের প্রভাব বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে উঠতে থাকে। অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় প্রকার রীতিতে সংঘবদ্ধ ব্যবসায়িক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান-গুলি ক্রমশ ভারতীয় আর্থনীতিক জীবনের নিয়ামক হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪০ সাল নাগাদ ৪০টি ট্রাস্টের অধীনে ৪৫০টি প্রতিষ্ঠান ১১০ কোটি টাকা লগ্নীতে নিয়োজিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলি শিল্প, যানবাহন, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি সকল প্রকার ব্যবসায়িক কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। ভারতীয় একচেটিয়া কারবারী সংগঠন হিসাবে টাটা, বিড়লা, ডালমিয়া ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল এবং ব্রিটিশ ট্রাস্টগুলির মধ্যে কিলিক্ নিক্সন্স, স্যাস্থন্স, অ্যাণ্ড্ ইউল, ব্যাড়িস, জার্ডিন অ্যাণ্ড স্কীনার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। টাটা এসময় ২২টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করত—৪টি সুতোকল, ৪টি বিদ্যুৎ ও ৪টি শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র, ১টি বিমান সংস্থা, ১টি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, ১টি তৈল কারখানা, ১টি বীমা কোম্পানি এবং একটি হোটেল। আবার, অ্যাণ্ড্ ইউল অ্যাণ্ড কোম্পানি পূর্ব ভারতে ১১টি পাটকল, ১১টি কয়লাখনি, ১৫টি চা ও ২টি রবার বাগান, ১টি কাগজ ও ১টি তৈল কোম্পানি এবং একটি ভূসম্পত্তির মালিকানা ভোগ করত।[18] বিস্তৃত ক্ষেত্রে টাটা বা অ্যাণ্ড্ ইউল কোম্পানিগুলির আর্থনীতিক কর্মকাণ্ড ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারের ধরন ও ব্যাপ্তির পরিচয় বহন করে।

১৯৪৭ সালের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় ধনিকশ্রেণী বিদেশী একচেটিয়া কারবারগুলিকে শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা পিছু হটিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই শ্রেণী শিল্পসংস্থাগুলির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল, অভ্যন্তরীণ বাজারের বৃহত্তর অংশ নিজের দখলে এনেছিল এবং বহু স্থানীয় শিল্পে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করেছিল। উৎপাদন ও মূলধনের ঘনীভবনের ক্ষেত্রে ভারতীয় একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি অনুরূপ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় অগ্রবর্তী ছিল। 'গোষ্ঠীভুক্ত ৬৯টি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করত ২১০ কোটি, ২টি ইঙ্গ-ভারতীয় গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান ২০ কোটি, ৩৩টি বিদেশী গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান ৯০ কোটি, বিদেশী একচেটিয়া কারবারের ১৪টি শাখা-প্রতিষ্ঠান ২০ কোটি এবং তিনটি দেশীয় রাজ্যের সরকার ১০ কোটি টাকা নিয়ন্ত্রণ করত।'[19] টাটা গোষ্ঠীর সম্পত্তি ও দায়দায়িত্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৩০০ কোটি, ডালমিয়া-জৈন গোষ্ঠীর ২০০ কোটি, বিড়লা ১০০ কোটি টাকা এবং মার্টিন-বার্ন, বার্ড-হেইলগার্স এবং অ্যাণ্ড্ ইউল এই

তিনটি বৃহত্তম বিদেশী ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থার অনুরূপ সম্পত্তি ও দায়িত্বের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৪০ লক্ষ, ২৪ কোটি ৬০ লক্ষ ও ২১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।[20] বৃহত্তম ভারতীয় একচেটিয়া কারবারগুলির মূলধনের ঘনীভবন ভারতে কার্যরত ব্রিটিশ অনুরূপ কারবারগুলির তুলনায় অনেক বেশী ছিল।

স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে বিদেশী মূলধন পরিমাণের দিক থেকে ভারতীয় মূলধনের তুলনায় হীনবল ছিল। কিন্তু পরিসংখ্যানগত এই পরাভব প্রকৃত ক্ষমতার নির্দেশক ছিল না। কেননা ব্রিটিশ মূলধন ভারতীয় রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে (ঋণ, অর্থ যোগান, বৈদেশিক বাণিজ্য, যানবাহন) জীবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষপুষ্ট হয়ে বিশেষ সুযোগসুবিধা লাভের অধিকারী ছিল। ব্রিটিশ একচেটিয়া মূলধন নূতন শিল্প স্থাপনে বিলম্ব ঘটাতে সক্ষম ছিল, সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের সম্ভাবনাযুক্ত শিল্প উৎপাদনে প্রতিদ্বন্দ্বী হঠিয়ে স্বকীয় প্রভুত্ব স্থাপন করতে ও অভ্যন্তরীণ বাজারে শিল্পদ্রব্যের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে প্রধান শক্তি হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারত এবং ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা নিজস্ব স্বার্থের অনুকূলে পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারত। বিদেশী একচেটিয়া কারবারগুলি ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের শতকরা ২৭ বা ২৮ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করত।

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা ও ভারতীয় শিল্পায়ন

নূতন শিল্প গড়া ও শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক বিচারে ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার ভূমিকা গঠনমূলক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে ভারতে ব্রিটিশ ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে অর্থ সরবরাহে লিপ্ত দেশী দালাল প্রতিষ্ঠানগুলির ধ্বংসাবশেষের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছিল।[21] আশ্চর্যের কিছু নেই, এই ব্যবস্থা পূর্বতন দালাল প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু লক্ষণে বিধৃত হয়ে পড়ে।

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা প্রথমে পারিবারিক সংগঠনের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছিল (যেমন, টাটা অথবা করিমভাই ইব্রাহিম অ্যাণ্ড সন্‌স), পরে সীমিত ব্যক্তিগত অংশীদারত্বের রূপ ধারণ করে; কিন্তু প্রায়শ সরাসরি অংশীদার হিসাবেও ম্যানেজিং এজেন্সীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে (যেমন, মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি)। পারিবারিক সংস্থা হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্সী আমেদাবাদ অঞ্চলে গড়ে ওঠে, কোলকাতা ও বোম্বেতে অংশীদারী প্রতিষ্ঠান

হিসাবে। যৌথ মূলধনী কারবার হিসাবেও ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থা গড়ে ওঠে (মাদ্রাজের বিনী অ্যাণ্ড কোম্পানি) ; কিন্তু এই ধরনের সংস্থা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষণাক্রান্ত ছিল, কেননা ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের পরিচালক সংস্থায় নিয়োগ করতে পারতেন।

ভারতের প্রথম যুগের ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পক্ষেত্রে কলাকৌশলের বিশেষজ্ঞ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেননি, করেছিলেন বাণিজ্যক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সরবরাহের যোগ্যতার ভিত্তিতে। তাঁদের দায়িত্ব বাষ্পশক্তি পরিচালিত যানবাহন থেকে চাশিল্প এবং পাটশিল্প থেকে কয়লা খনি পরিচালনার ব্যাপারে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। অর্থলগ্নীর অপ্রতুলতায় বিশুষ্ক ভারতীয় অর্থনীতিতে তাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অর্থ বিনিয়োগ ঘটিয়ে কিছুটা জল সরবরাহ করতে পেরেছিলেন।

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা ত্রুটিতে ও সমালোচনায় আবিল হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতে শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনাকে বিলম্বিত করে দিতে এই ব্যবস্থা তৎপর থেকেছে ; রপ্তানিযোগ্য শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা সৃষ্টিতে এই ব্যবস্থা সহায়ক হয়নি। এই ব্যবস্থা একচেটিয়া কারবারের ফাঁস অর্থনীতির গলায় পরিয়ে দিয়েছে।

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থায় ত্রুটির সীমা নেই, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, এই ব্যবস্থা বেশ কর্মক্ষম ছিল। শুল্ক বোর্ডের সামনে উপস্থাপিত সাক্ষ্য ও তথ্যাদির ভিত্তিতে বলা চলে যে, 'এই ব্যবস্থা ছাড়া ভারতীয় শিল্পায়নের গতি শ্লথতর হত এবং ব্রিটিশ মূলধন ও উদ্যোগের পক্ষে ভারতে ক্রিয়াশীল থাকার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ত।' ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে যৌথ মূলধনী কারবারের সংখ্যা ১৩০৯ থেকে বেড়ে ২৭৮৯, অনুমোদিত মূলধন ৪১ কোটি ৬০ লক্ষের কিছু বেশী থেকে বেড়ে ২$\frac{১}{২}$ শত কোটি টাকা এবং আদায়ীকৃত মূলধন ২৯ কোটি ১০ লক্ষের কিছু বেশী থেকে একশত কোটি টাকার কিছু বেশীতে গিয়ে পৌছেছিল।[22]

স্যর জর্জ প্যাইস্ হিসাব কষে দেখিয়েছেন যে, ভারত ও সিংহলে ১৯০৯-১০ সালে ৩৬৫,৩৯৯,০০০ পাউণ্ড আর্থনীতিক কাজকর্মে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এইচ. পি. হাওয়ার্ড শুধুমাত্র ভারতের অর্থনীতিতে এরূপ অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেছিলেন ৪৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড।[23] ব্রিটিশ মূলধন ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার সূত্র ধরে ভারতীয় অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করেছিল তার একটি মোটামুটি ধারণা ঐ অর্থের পরিমাণ থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ মূলধন : স্বাধীন শিল্পায়নের গতিরোধ

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় শিল্পায়নের অন্যতম প্রধান তিনটি ত্রুটি ছিল আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতার সঙ্গী হিসাবে শিল্পপ্রয়াসের অপ্রতুলতা, মূলধনের ঘনীভবন এবং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতীয় শিল্পগুলির জন্ম, বৃদ্ধি ও বিকাশে হরেকরকম বাধাবিঘ্ন আরোপ।

এই ত্রুটিগুলির সঙ্গে ব্রিটিশ মূলধনের ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। এই মূলধন ভারতে কলকারখানা, মেসিন তৈরী ইত্যাদিতে বিশেষভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত হয়নি, কেননা ভারতকে শিল্পে স্বয়ম্ভর করে তোলা ঔপনিবেশিক কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ভারীশিল্প বা মেসিন তৈরীর ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করা ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর কাম্য ছিল। ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ মূলধনের সাথে ব্রিটিশ মেসিন শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অতএব এই মূলধন মেসিন শিল্প গড়ার কাজে মোটেই উৎসাহী ছিল না। বরং ব্রিটিশ মেসিন ও অন্যান্য ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে বিক্রি করার কাজে লিপ্ত ছিল। দেশগঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভারীশিল্প ভারতে ব্রিটিশ মূলধনে গড়ে ওঠেনি। ঐ মূলধনের সাথে ব্রিটিশ একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠানগুলি ও ব্রিটিশ সরকার তথা ব্রিটিশ-ভারতীয় শাসনকর্তৃপক্ষের নিবিড় সংযোগের ফলে ভারতীয় শিল্পপ্রয়াস স্বাধীন ইচ্ছায় অর্থনীতির সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে পারেনি এবং খুব বেশী মুনাফাজনক শিল্পেও নিয়োজিত হতে পারেনি। ঔপনিবেশিক আমলে মন্দগতি শিল্পায়ন, মূলধনের ঘনীভবন এবং ভারীশিল্পের অভাব ব্রিটিশ মূলধনের কার্যকলাপে ভারতীয় অর্থনীতিতে স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় ধনিকশ্রেণী শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও মূলধন সঞ্চয়ের অনুকূল পরিবেশ রচনায় ক্রমশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। বিদেশী মূলধন ভারতে স্থায়িভাবে নিয়োজিত রাখা এবং বিদেশী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সমান মর্যাদায় ও সুযোগ-সুবিধায় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণে এই শ্রেণী ক্রমশ দাবি উত্থাপনের সাহস ও সামর্থ অর্জন করেছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতিতে এই শ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকদের কিছুটা দুর্বল করতে সক্ষম হয়; কিছু কিছু কারখানা ব্রিটিশ ধনিকদের কাছ থেকে কিনে নেয় এবং অনেক কলকারখানা

নিজেই প্রতিষ্ঠা করে। তা সত্ত্বেও স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতের শিল্পবিনিয়োগে বিদেশী মূলধনের ভূমিকা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল।

স্বাধীনতার পর বিদেশী সম্পত্তি, দায়দায়িত্ব ইত্যাদির প্রথম আদমসুমারিতে (১৯৪৮) দেখা যায় যে, শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৬·২ ভাগ খনি, ৩৪·৩ ভাগ বস্ত্রকল এবং মাত্র ৮·১ ভাগ লৌহময় ধাতু শিল্পে উৎপাদনরত ছিল। শিল্পবিনিয়োগের ৭১·৮ ভাগ বিদেশী মূলধন ছিল ব্রিটেনের এবং ৬·৪ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।[24]

১৯৪৭ সালের ভারতীয় কারখানা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিদেশী বেসরকারী কোম্পানিগুলি ১০০৮টি কারখানার মালিক ছিল এবং শ্রমিক নিয়োগ করেছিল ৬৫৪,০০০। অর্থাৎ, ভারতস্থ কারখানাগুলির শতকরা ৮·৪ ভাগ এবং সংগঠিত শিল্পের শতকরা ২৪·৩ ভাগ শ্রমিক বিদেশী নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানাগুলির মালিক ছিলেন বিদেশী মালিকেরা। এক হাজারের বেশী শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানাগুলির ৩০·২ ভাগের মালিক ছিলেন তাঁরা। এই কারখানগুলি বৃহত্তম কারখানাগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের শতকরা ৩৮·২ ভাগ অংশের নিয়োগকর্তা ছিল।[25]

স্বাধীনতার পূর্বাহ্নে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ৫৫৭টি কারখানার মালিক ছিল। ঐগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৮৬,৮০০। কাজেই বিদেশী একচেটিয়া কারবারী সংস্থা ও ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যৌথভাবে ভারতের মোট কলকারখানার শতকরা ১৩·১ ভাগ অংশের মালিক ও শ্রমিকসংখ্যার ৩৪·৯ ভাগ অংশের নিয়োগকর্তা ছিল।

আধুনিক বৃহৎ শিল্প ও ঔপনিবেশিক ভারতীয় অর্থনীতি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ভারতীয় অর্থনীতির নিম্নবর্তী পর্যায়গুলিতে ধনতন্ত্র-পূর্ব সাংগঠনিক রূপ বজায় রেখেছিল। এই পর্যায়গুলির পুনরুৎপাদন চক্র স্বতন্ত্র বিশিষ্টতায় বিধৃত হয়ে হস্তশিল্পের উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। অপরদিকে অর্থনীতির উচ্চ পর্যায়গুলিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছিল।

ব্রিটিশ শাসনে ভারত শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন, পণ্যদ্রব্য-অর্থ সম্পর্কের বিকাশ ও ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিস্তারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। নিম্নতর পর্যায়গুলির উৎপাদন-পুনরুৎপাদনের ভিন্নতর চক্রটি উচ্চতর পর্যায়গুলির

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির উপস্থিতিতে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মান্ধাতার আমলের উৎপাদনসম্পর্ক, নিম্নমান নৈপুণ্য ও সঞ্চয়ের অভাবে অর্থনীতির নিম্নতর পর্যায়গুলির আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মে বৃহৎ শিল্পগুলির উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না। বড় মেসিন, আধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ঐ ক্রিয়াকর্মের আধুনিকীকরণে ব্যবহারের সম্ভাবনা ছিল না। ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়েই একমাত্র ধনতন্ত্র-পূর্ব উৎপাদনব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত ও পরিচালিত আধুনিক শিল্পের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছিল। অর্থাৎ, চলতি মূলধনের পুনরুৎপাদনের মাধ্যমেই একমাত্র নিম্নবর্তী ও উচ্চ পর্যায়গুলির আর্থনীতিক ধনতান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। এই কারণেই হস্তশিল্প ও আধুনিক শিল্পের মধ্যে বিরোধ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক ভারতে গড়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা লাভের পরও কিছুকাল বজায় ছিল। ১৯৫২-৫৩ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গ্রামীণ জনসাধারণের ব্যবহৃত শতকরা ৪৫ ভাগ দ্রব্যসামগ্রী টাকাকড়ি লেনদেনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ছিল। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বা নগদ অর্থের বিনিময়ে চাষীরা তাদের ভোগ্যপণ্যের প্রায় অর্ধেক চাহিদা মেটাত। এই চাহিদার যোগান সরবরাহে আধুনিক শিল্পের ভূমিকা প্রায় ছিল না। এরূপ অবস্থায় আধুনিক বৃহৎ শিল্প নিম্নবর্তী আর্থনীতিক কাঠামোগুলির স্থায়ী মূলধন পুনরুৎপাদনে কোন ভূমিকা পালনে অক্ষম ছিল; চলতি মূলধনের পুনরুৎপাদনেও ভূমিকা গৌণ ছিল।[26]

ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল বলে আধুনিক শিল্পের পক্ষে নিজস্ব পুনরুৎপাদনের ব্যবস্থাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখা সম্ভব হতে পারত। মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে রত শিল্পগুলির অবদান ছিল। চলতি মূলধনের পুনরুৎপাদন এরূপ ক্ষেত্রে সহজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। ভোগ্যপণ্যের বিরাট একটি অংশ রপ্তানির জন্য উৎপাদিত হত। কাজেই ভারতের ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের শিল্পপণ্য ভারতীয় শিল্পগুলি উৎপাদনে অসমর্থ ছিল। এই কারণে বিদেশ থেকে বহু রকমের ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হত এবং বৃহৎ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদেরও হস্তশিল্পজাত বহু জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হত।

তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, স্থানীয় শিল্পগুলি নিম্নবর্তী আর্থনীতিক

ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রের তুলনায় ধনতান্ত্রিক কাঠামোতে সংস্থাপিত শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের পুনরুৎপাদনে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

স্থায়ী মূলধনের পুনরুৎপাদন পরাধীন ভারতে নানা জটিলতায় আকীর্ণ ছিল। স্বাধীনতার কয়েক বৎসর পরের (১৯৫১) হিসাবে দেখা যায় যে, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে জড়িত ৩৭০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের মধ্যে মাত্র ৩৭০ থেকে ৩৮০ কোটি টাকা ভারীশিল্পে নিযুক্ত ছিল। ৩৭০ থেকে ৩৮০ কোটি টাকা মোটামুটিভাবে মূল্য অবনতি বা অবচয় তহবিলে তখনকার দেয় অর্থের পরিমাণের সমান ছিল। এই কারণে ভারীশিল্পের পক্ষে স্থায়ী মূলধনের পুনরুৎপাদন সম্ভব করে তোলা অসম্ভব ছিল।

আধুনিক শিল্প অত্যন্ত শিথিলভাবে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন কাঠামোর সঙ্গে ঈষৎ সংস্পর্শযুক্ত ছিল। ফলে, সুষম বিকাশে শক্তিশালী শিল্পায়নের ভিত্তি পরাধীন ভারতে রচিত হয়নি। বহু কাঠামোযুক্ত ভারতীয় অর্থনীতির অস্তিত্ব ও সামাজিক শ্রমবিভাজনের অভাব ধনতান্ত্রিক নীতিতে সংবদ্ধ একটি কাঠামোযুক্ত অর্থনীতির আবির্ভাবে গুরুতর বাধা সৃষ্টি করেছিল।[27] শিল্পবিপ্লবের সম্ভাবনা পূর্ণিমার প্রতিশ্রুতিকে কাকজ্যোৎস্নায় পর্যবসিত হয়েছিল। ভারীশিল্প ও দেশগঠনের অন্যান্য অত্যাবশ্যক শিল্পের একান্ত অভাব ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় অর্থনীতিকে পশ্চাৎপদ রেখেছিল। ভারতের শিল্প ও ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রটি স্থায়ী ও চলতি মূলধন পুনরুৎপাদনের জন্য ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিশ্বের আর্থনীতিক বাজারের (বিশেষ করে ব্রিটেনের বাজার) সাথে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতার পরিমাপ এরূপ নির্ভরশীলতা থেকে স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর করায়ত্ত হওয়ায়, শিল্পে ও অভ্যন্তরীণ বাজারে অধিকতর শক্তিশালী হয়েও ভারতীয় ধনিকশ্রেণী আর্থনীতিক জগতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রায়শ অধস্তন ভূমিকার অধিকারী ছিল। স্বভাবতই ভারতীয় ধনিকশ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয়। নিজস্ব আর্থনীতিক স্বার্থরক্ষা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হয় এবং

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের চরিত্র নিজের অনুকূলে গড়ে তুলতে সক্রিয় হয়।

'হিন্দু নৈতিকতা' ও শিল্পে অনগ্রসর ভারত

পশ্চিমী দেশগুলির মত শিল্পোন্নত ধনতন্ত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে গড়ে তোলা অসম্ভব ছিল বলে ম্যাক্স ওয়েবার অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণভাবে এশিয়া এবং বিশেষভাবে ভারত ও চীনের ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর গবেষণা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছিল যে, প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার অনুরূপ নৈতিকতার অভাবে প্রাচ্যের দেশগুলিতে আর্থনীতিক উন্নয়নের ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ সৃষ্টি হয়নি। হিন্দুধর্মের 'অযৌক্তিক প্রকৃতি' শিল্পোন্নত ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল বলে তিনি মনে করেছিলেন। বর্ণপ্রথা, 'কর্ম'-সংক্রান্ত ধর্মতত্ত্ব, পুনর্জন্মবাদ, কর্তব্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, যাদুবিদ্যার উপর নির্ভরশীলতা, ধর্মীয় রীতিপ্রকরণের প্রাচুর্য এবং মুক্তির ইহবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গী ভারতে শিল্পায়নের প্রতিকূল শক্তি সঞ্চারে লিপ্ত ছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'সম্পত্তি ও মূলধন বৃদ্ধির যৌক্তিক তাগিদ সৃষ্টি না করে হিন্দুধর্ম যাদুকর, ধর্মোপদেশক, অতীন্দ্রিয়তার মোহাসক্তদের পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য অযৌক্তিক আহরণের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।'[২৪] ওয়েবার বলেছিলেন যে, হিন্দুধর্ম ধর্মীয় রীতিপ্রকরণ ও বর্ণপ্রথার চিরাচরিত নিয়মকানুনের মাধ্যমে পেশার পরিবর্তন ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণের বিরোধিতায় নিয়োজিত ছিল। ক্যালভিনের মতানুসারী প্রোটেস্টান্ট ধর্ম যেভাবে 'পরপারের জগতের মুক্তিভাবনাকে' 'ইহমুখীন মুক্তির' বিষয়বস্তু করে তুলেছিল, ওয়েবারের মতে হিন্দুধর্ম ঐ ধরনের কোন 'ইহমুখীনতা' সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের উপযোগী 'সামাজিক নৈতিকতার' কোন তাগিদ সৃষ্টিতে নাকি হিন্দুধর্ম ব্যর্থ হয়েছিল।

শ্বেতবর্ণের মানুষের কাঁধে কৃষ্ণবর্ণ বা বাদামী রঙের মানুষের বোঝার তত্ত্বে বিশ্বাসী ইউরোপীয়দের কাছে ওয়েবারের তত্ত্ব বেশ কিছুকাল সমাদৃত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলবার সুযোগ পেয়েছিল যে, শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতা ব্রিটিশ শাসনের কুফল নয়। শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নয়নসাধন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পত্তন করতে হলে হিন্দুধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন অনেকাংশে বর্জন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে

প্রচার করে ঐ কর্তৃপক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বহু অপকীর্তি ঢেকে রাখবার সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পায়নের মন্দগতির জন্য দায়িত্ব অস্বীকার করে ব্রিটিশ শাসকেরা হিন্দু তথা ভারতীয় মানসিকতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে সদ্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিভাগের ব্রিটিশ পরিচালক মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শিল্পোদ্যোগে আগ্রহী ঝুঁকিদারদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে, শিল্পের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে এঁদের কারও 'অস্পষ্টতম ধারণাও ছিল না।... অসুবিধার মূল প্রোথিত আছে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যে—বর্ণব্যবস্থার অভ্যন্তরে।'[২৭] ম্যাক্স ওয়েবারের সুরে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বর্ণব্যবস্থা শ্রমবিভাজনকে অনড়, অমোঘ ঘোষণা করে পারস্পরিক সহযোগিতা নিষিদ্ধ করেছিল, প্রগতিকে শ্লথতর করেছিল, স্বাধীন চিন্তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করেছিল, যুক্তিবাদ জলাঞ্জলি দিয়ে কর্তৃত্বের আদেশ-নির্দেশকে মান্য করতে শিখিয়েছিল এবং চিন্তাভাবনাকে শূন্যগর্ভ দর্শনচিন্তায় নিয়োজিত করেছিল। তাঁর সিদ্ধান্ত ম্যাক্স ওয়েবারের পাঠকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত মনে হবে: '...আধুনিক শিল্প মূলত পশ্চিমী ধারণাসঞ্জাত এবং একে অবশ্যই পশ্চিমী বা বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অনুধাবন করতে হবে।'

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনীতির বিকাশের মন্দগতির কারণ ব্যাখ্যায় ওয়েবার হিন্দু ব্যক্তিত্বের 'আদর্শ প্রতিরূপ' থেকে নির্ণীত মনস্তাত্ত্বিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। এই আদর্শ প্রতিরূপ রচনায় তিনি হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের গবেষণার উপর নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধানতম ত্রুটি ছিল এই, তিনি অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতার ভিত্তিতে হিন্দু ব্যক্তিত্বের চরিত্রের সঙ্গে আদর্শ প্রতিরূপের পার্থক্য নিরূপণে অসতর্ক ছিলেন। ''চিরাচরিত,' ঐতিহ্যবাদী হিন্দু সমাজের পরিবর্তনশীলতা তাঁর বিশ্লেষণে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেনি। অথচ এই পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন এমন নয়। কার্যক্ষেত্রে, বর্ণব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি হিন্দুদের জাগতিক ব্যাপারে পিছুটানে পশ্চাৎগামী করেনি। ভারতীয় শিল্পপতিদের আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ হিন্দু নৈতিকতার প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এমন নয়। বরং, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হিন্দুরা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-বিচার, বর্ণব্যবস্থা, যৌথ পরিবারব্যবস্থা ইত্যাদির সাথে আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের

প্রয়োজন ও দাবির যুগোপযোগী সামঞ্জস্য বিধান করে নূতন পথের সন্ধানী হয়েছেন। সাম্প্রতিককালের সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণায় লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতীয় সমাজের সর্বত্র সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বজায় ছিল। প্রয়োজনবোধে বর্ণব্যবস্থা সর্বদা স্থিতিস্থাপকতার গুণে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল।

ওয়েবারের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, 'মুক্তিকামনার উৎকণ্ঠা' থেকে ইহজীবনে পেশা ও বৃত্তি বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আত্মনিবেদনের মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ক্যালভিন-অনুসারী খ্রীস্টধর্মীয় মতাবাদে গড়ে উঠেছিল। ধনসম্পদ, ক্ষমতা, সাফল্য ইত্যাদি ব্যক্তিমানসে প্রতীতি জন্মায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সঠিক পথপরিক্রমায় রত; ওয়েবার মনে করেছিলেন যে, এরূপ একটি বিশ্বাস প্রোটেস্টান্টদের বর্ধিত উৎসাহে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জাগতিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করে ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগ বা প্রেরণা সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন তোলা যায়, হিন্দুধর্ম এরূপ প্রেরণা সঞ্চারে ব্যর্থ হবে কেন? এই ধর্মের প্রভাব জাগতিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক, নেতিবাচক, পরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়বাদী এবং ইহবিমুখ হবেই হবে?

প্রোটেস্টান্ট নৈতিকতার অনুরূপ বা সমতুল নৈতিকতার আদর্শটি সামনে রেখে গান্ধী, তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাঁদের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কর্মযোগের তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার নিষ্কাম কর্মের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করে তাঁরা হিন্দু সমাজকে বোঝাতে সফল হয়েছিলেন যে, কর্তব্যকর্ম অবিচলচিত্তে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সমাধা করার মধ্য দিয়েই মোক্ষলাভ করা সম্ভব। ওয়েবার হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল তাৎপর্য শুধুমাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, প্রগতিশীল ব্যাখ্যার সম্ভাবনা দেখতে পাননি।[৪০]

ভারতীয় আর্থনীতিক জীবনের পশ্চাৎপদতা ও শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সম্পর্কে ওয়েবারের তত্ত্ব পশ্চিমী দুনিয়ার তাত্ত্বিকেরা সবাই গ্রহণ করেছেন এমন নয়, তবে তাঁদের মধ্যেই ভারতীয় তাত্ত্বিকদের তুলনায় ঐ তত্ত্বের সমর্থক বেশী দেখা যায়। অবশ্য বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী আজও ওয়েবারের তত্ত্বের নিরিখে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অনগ্রসরতার ব্যাখায় উৎসাহী এবং তাঁরা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজের প্রাচীন মূল্যবোধ, একান্নবর্তী পরিবার ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে আধুনিকীকরণের 'বৈপ্লবিক' কর্মপন্থা অনুসরণের পরামর্শ দেন।

মিল্টন সিঙ্গার মাদ্রাজ শহরের শিল্পপতিদের সম্পর্কে গবেষণায় দেখিয়েছেন

যে, তাঁরা কেউই হিন্দুধর্মের দিক থেকে তাঁদের কর্মযজ্ঞে বাধাপ্রাপ্ত হননি। দু'তিন প্রজন্মের মধ্যেই তাঁদের পরিবারের সদস্যরা শিল্পে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বভারতীয় গুরুত্বে বিশিষ্ট হয়েছেন।[31] মাড়োয়ারি বা গুজরাটি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা হিন্দুধর্মের তথাকথিত 'রক্ষণশীল, ইহবিমুখ' নৈতিকতার শিকার হয়ে ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের তুলনায় আর্থ-নীতিক ক্ষেত্রে কম সফল হয়েছিলেন এমন নয়।

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের ফলে নিঃস্ব, পশ্চাৎপদ ভারতের চিত্রের তুলনায় হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত ইহবিমুখ জীবনদর্শনে ক্ষতিগ্রস্ত, পশ্চাৎপদ ভারতের চিত্রটি ইউরোপীয়, বিশেষ করে ব্রিটিশ, বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। স্বজাতির কার্যকলাপের প্রতি পক্ষপাতমূলক মমত্ববোধ থেকে শিল্পক্ষেত্রে ভারতের অনগ্রসরতার ব্যাখ্যায় ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শাসনের পরিবর্তে হিন্দুধর্মের নৈতিকতাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে স্বস্তিলাভ করেছিলেন।

শিল্পপ্রগতির সামাজিক তাৎপর্য

মন্দগতি, সীমিত প্রয়াস ও সঙ্কীর্ণ পরিধিতে বিধৃত শিল্পায়ন ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ পালিত হয়েছিল এমন নয়। তবুও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, শিল্পায়ন ভারতীয় জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম হয়েছিল।

শিল্পায়ন ভারতীয় অর্থনীতিকে সমরূপ সংবদ্ধতায় দৃঢ় করেছিল, ধনতন্ত্রের জন্মলগ্নকে ত্বরান্বিত করেছিল, **পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার ও উন্নয়নে সহায়ক হয়েছিল** এবং শিল্পোন্নত পশ্চিমী দেশগুলির সাথে ভারতের পরিচয় ঘটিয়েছিল। শিল্পায়ন কৃষিনির্ভর স্থবির ভারতীয় অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়ন করেছিল এবং ঐ অর্থনীতির বিভিন্ন স্তরে সংযোগ ও সাযুজ্য রচনা করে জৈব বন্ধনে সমগ্র আর্থনীতিক কার্যকলাপকে সংবদ্ধ করেছিল।

কলকারখানা-ভিত্তিক শিল্পায়ন দু'টি সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায়—**ধনিক ও সর্বহারা**। উৎপাদনব্যবস্থার মালিক ধনিকশ্রেণী ও শ্রমের যোগানে লিপ্ত সর্বহারাশ্রেণী কালক্রমে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। এই দু'টি

শ্রেণীর অংশগ্রহণে ঐ সংগ্রাম জোরদার হয়েছে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'বাবু' সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থনের অভাবে রক্তাল্পতায় ভুগেছে। কিন্তু ভারতীয় শ্রমিক বা **সর্বহারাশ্রেণীর আবির্ভাবের পর থেকে ঐ আন্দোলনে রক্তসঞ্চার ঘটেছে।** ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশও শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অর্থ ও সমর্থন যোগাতে অগ্রসর হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জঙ্গী সংগ্রামের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই, ইউরোপে ধনিকশ্রেণী ঐতিহাসিক দিক থেকে বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। বিপুল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে, সামন্ত-বাদী জগৎদৃষ্টি ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে, গ্রাম-নগরের ব্যবধান ঘুচিয়ে, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে এবং অন্যান্য বহুবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ঐ ধনিকশ্রেণী নূতন এক সভ্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এ ধরনের বিপুল ও গভীর ভূমিকা গ্রহণে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী নিঃসন্দেহে অপারগ ছিল। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে স্বাধীন কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে দেয়নি। বহু বিলম্বে, বহু প্রতিবন্ধকতার পর ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাবের পরেও ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অভিভাবকত্বে ঐ নবজাতক শ্রেণীর দীর্ঘ পথপরিক্রমা অব্যাহত থাকে। কিন্তু দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে পরিস্থিতির আনুকূল্যে ক্ষমতা অর্জন করে ঐ শ্রেণী বিদেশী অভিভাবক শ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের লক্ষণ প্রদর্শন করতে থাকে; উভয়ের স্বার্থ বিপরীতমুখী হয়ে উঠলে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর প্রভাবশালী অংশ জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষার আয়োজন করে।[৪৪]

শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত এই ধনিকশ্রেণী ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের শেষ তিনটি দশকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। **ভারতীয় শিল্পপতিদের অর্থ সাহায্য ছাড়া জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে আধুনিক গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গণভিত্তি রচনা করা আরও দুরূহ হত।** শ্রমিকশ্রেণীর অবদানে ঐ আন্দোলন ব্যাপকতর এবং কিছুটা জঙ্গী ভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

শিল্পায়নের ফলে ভারতে নূতন নূতন শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে। ঐ

শিল্পকেন্দ্রগুলি আশপাশ অঞ্চলের জনসাধারণকে চাকুরি ও অন্যান্য প্রলোভনের চৌম্বক আকর্ষণে সমবেত করে আধুনিক নগরজীবনের বনিয়াদ রচনা করে। পূর্বতন ভারতীয় নগরগুলির সঙ্গে এই নগরগুলির পার্থক্য ছিল মৌল ধরনের। প্রশাসনিক কেন্দ্র, ধর্মকেন্দ্র বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পূর্বতন শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। কালক্রমে এ ধরনের অনেক শহর গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে পরগাছার মত অস্তিত্ব বজায় রাখে। কিন্তু নূতন নগরগুলি শিল্পনির্ভর ছিল বলে পশ্চাৎ-ভূমির কর্মক্ষম জনসাধারণকে উৎপাদনমূলক কর্মে নিযুক্ত করে জাতীয় অর্থনীতিতে নূতন প্রাণসঞ্চারে সক্ষম হয়েছিল। এগুলি নিঃসন্দেহে 'পুনরুজ্জীবনমূলক' নগরের আখ্যা লাভের যোগ্য।

আধুনিক নগরগুলি স্বাভাবিক কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। জীবিকার প্রয়োজনে সম্মিলিত বিভিন্ন প্রদেশ ও শ্রেণীর মানুষ সমবেতভাবে শিক্ষাদীক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম, আমোদপ্রমোদ, খেলাধূলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে শহুরে জীবন গড়ে তোলে। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা শহর এলাকাতেই তাঁদের বুদ্ধির ফসল ফলিয়ে জীবিকার সংস্থান করতে প্রবৃত্ত হন। গ্রামীণ জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অজ্ঞতার পরিবর্তে শহুরে সংস্কৃতির জন্ম হয়। কিন্তু এই সংস্কৃতি পশ্চিমের দেশগুলির নগরসংস্কৃতির তুলনায় ভিন্নতর হয়ে ওঠে। গ্রাম-এলাকার তুলনায় ব্রিটিশ ভারতে শিল্পনগরের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য ছিল। গ্রামবাসীরা অপরিসীম দারিদ্র্যের তাড়নায় জীবিকার অন্বেষণে শহরে উপস্থিত হতেন। ঔপনিবেশিক শিল্পায়নের প্রয়াস বিপুল সংখ্যক নরনারীকে জীবিকার সন্ধান দিতে অপারগ ছিল। শহরগুলির দারিদ্র্য আসলে গ্রামীণ দারিদ্র্যের শহুরে প্রতিচ্ছবি ছিল মাত্র। গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু চিহ্ন ভারতের নগরসংস্কৃতির ললাটে সুন্দর-অসুন্দর মিশ্র ব্যঞ্জনায় শোভা পায়।

শিক্ষিত জনসাধারণের আবাসভূমি শহরগুলিতে জাতীয় চেতনার বিকাশ আরম্ভ হয়েছিল। ১৮১৫ সালে রামমোহনের কোলকাতা বসবাসের সময় থেকে ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় চেতনা শহরগুলিতে সীমিত ছিল। নিম্নবর্গের জনসাধারণ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ঐ সময়সীমার আগে বা অন্তর্বর্তী সময়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহে সামিল হলেও, সচেতন রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধিতে পরিশীলিত হয়ে ঐ বিদ্রোহের তাৎপর্য সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিন্যস্ত হয়নি।

শিল্পায়নের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুযোগসুবিধা উপলব্ধি করে ভারতীয় জনমত শিল্পায়নের বিস্তার দাবি করতে থাকে। বলা বাহুল্য, ভারতের সামাজিক শ্রেণীগুলি শিল্পের মালিকানা, শিল্পের বিন্যাস ও শিল্পের অগ্রাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যমত ছিল না। ব্যক্তিমালিকানা, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় মালিকানা—শিল্পায়নের এরূপ সকল রকম সামাজিক-সাংগঠনিক পদ্ধতির পক্ষে-বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু **শিল্পায়নের দাবিতে ভারতীয় জনমত ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠেছিল**। ভারতের আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা দূর করতে সর্বাগ্রে শিল্পায়ন প্রয়োজন এরূপ একটি বিশ্বাস রাজনৈতিক ও আদর্শগত পার্থক্য সত্ত্বেও সকল ভারতবাসীর মনে দৃঢ়মূল হয়ে সংস্থাপিত হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনায় শিল্পায়ন

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সারা উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে আর্থনীতিক উন্নয়নের মাধ্যম হিসাবে শিল্পায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে একটি প্রায়-ঐক্যমত বিরাজ করেছিল। আধুনিক শিল্পায়নকে তাঁরা আর্থনীতিক সকল সমস্যা সমাধানের সর্বরোগহর মহৌষধ বলে বিবেচনা করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারপন্থী নেতৃবৃন্দ ভারতের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্পের প্রতি মমত্ববোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেও তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ভারীশিল্পের বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত আধুনিক ভারতের দিকে।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অবশ্য শিক্ষিত ভারতীয় জনমত ভারতের পক্ষে উপযুক্ত শিল্পায়নের সঠিক ধরনটি নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনায় নিযুক্ত হয়। এই চিন্তাভাবনা পুঁথিগত প্রেরণায় সতেজ হয়নি, হয়েছিল সামাজিক ও আদর্শগত কতগুলি প্রশ্ন সমাধানের ঐকান্তিক তাগিদে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ধনতান্ত্রিক পশ্চিমী দেশগুলির ভারীশিল্প থেকে উদ্ভূত সামাজিক ব্যাধিগুলি সম্পর্কে ক্রমশই সজাগ হয়ে উঠেছিলেন; তাঁরা ঐসব দেশে সম্পদ ও রিক্ততার দুটি মেরু প্রত্যক্ষ করেছিলেন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সর্বোপরি জাগতিক, বস্তুবাদী সাফল্যের লালসার মত্ততায় নৈতিক ও নান্দনিক মূল্য-বোধের বিড়ম্বনাতে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কাজেই তাঁরা এমন একটি ভারতীয় তথা এশীয় পথের সন্ধানী হয়েছিলেন যা আর্থনীতিক সমস্যাগুলির

সমাধানের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে এবং সনাতনী সমাজের কালজয়ী মূল্যবোধগুলিকে সংরক্ষণ করবে।

১৯০৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, গ্রামীণ কুটিরশিল্পগুলির চেয়ে শহুরে শিল্পগুলির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা 'অনিবার্য' হয়ে উঠেছে। এরূপ অনিবার্যতা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের জঙ্গী অংশ মেনে নেয়নি। প্রথম বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার সময় অবশ্য উদারনৈতিক ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আর্থনীতিক চিন্তাভাবনায় সাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে: উভয় গোষ্ঠী স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ, বিশেষ করে কুটির ও গ্রামীণ শিল্পের বিকাশ, কাম্য মনে করতে থাকে। বৃহৎ শিল্প ও নগরকেন্দ্রিক ইউরোপীয় সভ্যতাসংস্কৃতির নমুনা বা নকশাটিকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণের আগ্রহে ভাঁটা পড়ে। বেসান্ত, মার্গারেট নোব্‌ল ও হ্যাভেল প্রমুখ ইউরোপীয় ব্যক্তিবর্গের ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা এই ভাঁটার টানকে আরও জোরদার করে। হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের প্রতি হ্যাভেলের ধর্মবিশ্বাসের সমতুল অনুরাগ শিক্ষিত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ডন' পত্রিকার ১৯০০ সালের মার্চ-জুন সংখ্যায় সতীশচন্দ্র মুখার্জীর 'ভারতীয় আর্থনীতিক সমস্যা' নিবন্ধটি ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌সের '১৮৪৪ সালের ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা' শীর্ষক পুস্তকটিকে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করে শিল্পবিপ্লবের ভয়াবহতা সপ্রমাণে নিয়োজিত হয়। সতীশচন্দ্রের মতে বৃহৎ শিল্প দুটি বৃহৎ অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে: সংখ্যালঘিষ্ঠ ধনিকশ্রেণী ও বিপুলায়তন শ্রমিক সংগঠনগুলির শোষণের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক বিপদের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করা। 'মহত্তর সংস্কৃতির' স্বার্থে তিনি একটি দ্বৈত অর্থনীতির রূপরেখা রচনা করেন। রেলওয়ে, খনি, রাসায়নিক শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে ধনতান্ত্রিক সংগঠন গড়ে তোলা এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে পরিবার-ভিত্তিক কুটিরশিল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[৪৪]

প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় স্বদেশী শিল্পায়ন প্রয়াস প্রধানত গ্রামীণ ও কুটিরশিল্প ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এই প্রয়াস আবার স্ববিরোধিতায় ক্লান্ত হয়েছে। হস্তচালিত তাঁতের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ ও শক্তিচালিত তাঁতের উপযোগিতা অনুধাবনে সম্যক ব্যর্থতা এই

স্ববিরোধিতাকে প্রকট করে তুলেছিল। আর্থনীতিক দিক থেকে সমকালীন ভারতে হস্তচালিত ও শক্তিচালিত উভয় প্রকার তাঁতের প্রসার ও উন্নয়ন কাম্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে তাঁতশিল্পের অধোগমন সত্ত্বেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতীয় মিলগুলির মোট উৎপাদনের তুলনায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণ ছিল। মিলগুলি মাঝারি ধরনের মিহি ও মোটা কাপড় তৈরীতে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল; অতি মিহি ও স্থূলতম জমিনের কাপড়চোপড় হস্তচালিত তাঁতে দক্ষতার সাথে প্রস্তুত হত। শক্তিচালিত ও হস্তচালিত তাঁতশিল্পের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ ছিল না; উভয়ে বৈরী ছিল না, পরিপূরক সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। মিলগুলির তৈরী সুতোর এক-তৃতীয়াংশ ভারতীয় হস্তচালিত তাঁতগুলি ব্যবহার করত।

স্বদেশী যুগে বল্গাহীন আবেগ ও অতিরঞ্জিত আশার কুহকে দিক্‌ভ্রান্ত ভারতীয় আর্থনীতিক চিন্তা গ্রামীণ ও কুটিরশিল্পের ভূমিকা ও গুরুত্বকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে অতিরিক্ত বিশালতায় অবাস্তব করে তুলেছিল। এই অবাস্তবতা আবার বর্ণপ্রথা ও সমকালীন যুগের সাথে সঙ্গতিবিহীন হিন্দুয়ানির স্পর্শে কলুষযুক্ত হয়ে উঠেছিল। যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'স্বদেশী' পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পায়নের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে ওঠে; এমন কি বর্ণপ্রথার ঐতিহ্য ও আচার-বিচার ইত্যাদিকে দেশীয় ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে অভিমত ঘোষণা করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের ভারতে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পমালিকদের বাস্তবতাশূন্য, কল্পনারঙীন, ভাবীকালের প্রতি মোহাবেশ লক্ষ্য করা যায়। রুশোর সময় থেকে শুরু করে জ্যাকোবিন ও নৈরাজ্যবাদীদের আদর্শ পেরিয়ে 'নারদনিক্‌দের' সময়কালীন ইউরোপে অনুরূপ একটি মোহাবেশ স্থায়ী হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই মোহাবেশ ভারতে বা ইউরোপে বৃহৎ শিল্পের উত্থান ও বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব রোধ করতে পারেনি।

গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের লুপ্ত গৌরব পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণের কৃতিত্ব গান্ধী ও গান্ধী-পরিচালিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের। এই প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে গোপালহরি দেশমুখ ও ভোলানাথ চন্দ্রের উদ্যোগ বা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় থেকে গুণগত বিচারে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। **গান্ধী হস্তচালিত ও শক্তিচালিত তাঁতের**

সম্পর্কটি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। খদ্দর শিল্পের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও আজীবন ঐ শিল্পের বিকাশে তৎপরতা প্রদর্শন নানা দিক থেকে বৈপ্লবিক তাৎপর্যের দ্যোতক ছিল। তিনি পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পায়ন, নগরীকরণ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকল্প ভারতীয় জনজীবনের নুতন একটি ছক্ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর 'রামরাজ্য' পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি পরিহার করে শ্রেণীশোষণবিহীন, ব্যক্তির কর্মোদ্যোগে বলীয়ান, ব্যক্তির ন্যূনতম বস্তুবাদী চাহিদা-ভিত্তিক ভাবী ভারত রচনার আদর্শে উৎসর্গীকৃত ছিল। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য ও ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীর যন্ত্রনির্ভর শিল্পায়ন প্রয়াসের অশুভ ফলাফল পরিহার করার অহিংস উপায় হিসাবে তাঁর কাছে খদ্দর শিল্পের স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠা ও সারা ভারতব্যাপী প্রসার একান্ত কাম্য ছিল। সুতো কাটা, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি কর্মকে একদিকে দেশীয় শিল্পায়ন ও অন্যদিকে দেশপ্রেমিক কর্তব্য পালন হিসাবে উপস্থাপিত করে তিনি শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে হাজার হাজার ব্যক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে সমবেত করতে পেরেছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের পরবর্তী দশকগুলিতে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিচারবুদ্ধি গভীরতর হলে ঐ শ্রেণী গান্ধীর নেতৃত্বের স্বরূপ, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর্যায়, ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং নিজস্ব কর্তব্য সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সুবিধা লাভের স্বার্থে ঐ শ্রেণী গান্ধী-পরিচালিত জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। গান্ধীর 'সম্পত্তির অছি তত্ত্ব' ঐ শ্রেণীকে ভীত করে তোলেনি।[34] খাদি জনপ্রিয় করার কার্যক্রমের দিক থেকেও ভারতীয় বস্ত্রকল মালিকদের উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। ভারতীয় জনগণের বস্ত্রের চাহিদা এতই পর্যাপ্ত ছিল যে মিল, হস্তচালিত তাঁত ও খাদি একযোগে বস্ত্র উৎপাদনে লিপ্ত হলেও চাহিদার অভাবে কোনটিই ক্লিষ্ট হবার আশঙ্কা ছিল না। তাছাড়া, যমুনালাল বাজাজ, জি. ডি. বিড়লা প্রমুখ ব্যক্তিরা গান্ধীর খাদি আন্দোলনে অর্থসাহায্য করেছিলেন, আবার বস্ত্রকলগুলি পরিচালনা করে মুনাফা বাড়িয়েছিলেন।

খাদি জনপ্রিয় করার পশ্চাতে প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধতা গান্ধীর উদ্দেশ্য ছিল এমন নয়। গান্ধী নিজেই চরকার প্রযুক্তিবিদ্যার আরোপ ও ...ত সক্রিয় ছিলেন, সাধারণ চরকার পরিবর্তে তিনি অম্বর চরকা

গ্রহণ করেছিলেন। খাদি তাঁর কাছে স্বদেশী শিল্পায়নের প্রতীক ছিল মাত্র। তাছাড়া, সকল ভারতবাসীর কর্মসংস্থান ও বস্ত্রসংস্থান খাদি উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব বলে তিনি মনে করেছিলেন। শিল্পায়নের পশ্চিমী ছকটি তিনি ভারতের পক্ষে অগ্রহণযোগ্য ভেবেছিলেন। অন্য কোন ধরনের শিল্পায়নের প্রয়োজন নেই এমন কথা তিনি বলেননি।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ তিনটি দশকে শিক্ষিত ভারতীয় জনমত আর্থনীতিক প্রগতির স্বার্থে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ঐক্যমত হয়ে উঠেছিল। শিল্পায়নের পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্য মতানৈক্য ছিল। সমাজতান্ত্রিক পথে শিল্পায়ন থেকে শুরু করে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণবিহীন ধনতান্ত্রিক শিল্পায়নের প্রতি সমর্থন-অসমর্থনে ভারতীয় মতামত বিভক্ত ছিল। **ভারীশিল্প বনাম কুটিরশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বিতর্কটি প্রাসঙ্গিকতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলেছিল।** উভয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতীয় মতামত নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত, অসম বিকাশে পঙ্গু ও পশ্চাৎপদ কৃষিতে দরিদ্র ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রবর্তন আবশ্যক বলে বুদ্ধিজীবী মহলে প্রত্যয় গড়ে উঠছিল।

এমন কি ভারতীয় শিল্পপতিদের মহলেও শিল্পায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। রাজভক্ত শিল্পপতি দালাল, গান্ধীবাদী কংগ্রেসী বিড়লা ও উদারনীতির সমর্থক টাটা সবাই এ ধরনের পরিকল্পনায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। টাটা-বিড়লা পরিকল্পনা, বোম্বে পরিকল্পনা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রস্তাব প্রকাশিত হতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার রচয়িতা শিল্পপতিরা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠাকে সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে বিবেচনা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের পরিকল্পনাগুলি ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা চিন্তা করেনি। বোম্বে পরিকল্পনায় ভূমিসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধনের কোনরূপ সুপারিশ ছিল না। ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ঐ পরিকল্পনায় আর্থনীতিক জীবনকে এমনভাবে সংগঠিত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে, কোন কোন অংশে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনা বিরাজ করবে, কোন কোন অংশে শুধুমাত্র পরিচালনা, আর বাদবাকি অংশে কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। 'বোম্বে পরিকল্পনা—একটি সমালোচনা' পুস্তিকায় ওয়াদিয়া ও

মার্চেন্ট অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, পরিকল্পনার রচয়িতারা 'দ্বৈত বা মিশ্র অর্থনীতির প্রস্তাব করেছেন : একটি ক্ষেত্র সম্পূর্ণ মুক্ত, অপরটি অংশত নিয়ন্ত্রিত এবং/অথবা রাষ্ট্র-পরিচালিত।'

বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও বিশেষত ত্রিশের দশক থেকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী চাকুরি, মজুরি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদায়ের আর্থনীতিক আন্দোলনের মধ্যে শুধুমাত্র নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে থাকে।

স্বাধীনতালাভের পূর্ববর্তী তিনটি দশক জুড়ে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা, ভারীশিল্পের মুখ্য ভূমিকা, পরিকল্পনার আবশ্যকতা এবং হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের সাথে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে **ভারতীয় প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা মোটামুটি নির্দিষ্ট একটি দৃষ্টিভঙ্গীতে বিধৃত হয়েছিল।** ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিল্পগুলির দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আর্থনীতিক উন্নয়নের ব্যাপারে পূর্বতন অবাস্তব চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। আর্যযুগের আর্থনীতিক সংগঠন, শুধুমাত্র গ্রামীণ শিল্পের উপর নির্ভরশীল অর্থনীতি, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি ইত্যাদি আদর্শ আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি হারিয়ে জনপ্রিয়তার এজলাসে বাতিল হয়ে যায়।

৬ গণজ্ঞাপন ও পরিবহন ব্যবস্থার বিস্তার ও ফলাফল

পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার গুরুত্ব

উৎপাদনব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি দিয়ে যেমন মানুষের সভ্যতার ধারাপথটির ক্রমান্বয় বিস্তৃতি উপলব্ধি করা যায়, শুধুমাত্র পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার কালানুক্রমিক উন্নতির মাধ্যমেও তেমন সভ্যতার অগ্রগমনের দিগন্তপ্রসারী পথটিকে চিনে নেওয়া যায়।

প্রাচীন কালে সামরিকবাহিনীর অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তী অংশগুলি ধূম বা অগ্নিসঙ্কেতের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করত। রানী প্রথম এলিজাবেথের সময় স্পেনীয় আর্মাডার আক্রমণে সন্ত্রস্ত ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীরা অগ্নিসঙ্কেতের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে ঘোর দুর্দিনের বার্তা বিনিময় করেছিল।[1] আর, আজ বিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের দুনিয়ায় মানুষ ধূম ও অগ্নিসঙ্কেতের যুগকে বহু পিছনে ফেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ধারাপথ বেয়ে মুদ্রাযন্ত্র, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ও মহাজাগতিক বার্তা সংগ্রহের যুগে প্রবেশ করেছে। পরিবহন ও গণজ্ঞাপন অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে দ্রুততর করেছে, আবার সভ্যতার মানোন্নতিতে ক্রমোন্নত হয়ে সভ্যতার ফসল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার উন্নতি জনসমষ্টিকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবাদ গড়ে তুলতে অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আবদ্ধ শতাব্দী থেকে জাতীয়তাবাদ উন্মেষের লক্ষণগুলি ইউরোপের স্থানে স্থানে আত্মপ্রকাশ করলেও অনুন্নত পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার জন্য সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও ফরাসী দেশের মত আধুনিকতার পথিকৃৎ রাষ্ট্র দুটিকেও জাতীয়তাবাদে শক্তিশালী, ক্ষমতাবান সত্তার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়েছে। গণজ্ঞাপনের বিপুল উন্নতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'তিনটি দশকে সম্ভব হয়ে উঠলে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড জাতীয়তাবাদে সংহত, আধুনিক জাতি হিসাবে আবির্ভূত হয়। দু'তিন দশক বাদে ভারতে ঔপনিবেশিক

শাসনকর্তৃপক্ষ আর্থনীতিক লাভের অঙ্ক স্ফীত করে তোলার লালসায় ও সামরিক প্রয়োজনে পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার উন্নতি নির্দিষ্ট স্বার্থ-নির্দেশিত পথে ঘটাতে শুরু করার সাথে সাথে ভারতে আধুনিক সংযোগ-ব্যবস্থার ভিত্তি খাপছাড়া, অসংলগ্নভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ভারতের জনসাধারণ সংযোগব্যবস্থার ফললাভে ক্রমশ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, স্বায়ত্ত শাসন লাভের আশায় উদ্দীপ্ত জাতি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে।

আধুনিক গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা মুদ্রাযন্ত্র, বেতারবার্তা, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল হলেও পরিবহনব্যবস্থাকে ঐ আধুনিক ব্যবস্থাটির মেরুদণ্ড বলা চলে। পরিবহনের মাধ্যমে যাত্রী ও মালপত্র যেমন পরিবাহিত হয়, ধ্যানধারণাও স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে বৈপ্লবিক সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে।

পশ্চাৎপদ ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। শিল্পের অনগ্রসরতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নিম্ন মান, কৃষক জনসাধারণের দুরবস্থা, গ্রামীণ জনসাধারণের দারিদ্র্য, স্থবির জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতীয় জনজীবন এবং লোভজর্জর বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্বাধীন ধনতন্ত্র ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল অনুন্নত অবস্থায় স্থায়িত্ব দিয়েছিল। এক কথায়, অনুন্নত অর্থনীতি দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থাকে কায়েম করেছিল, আবার দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত অর্থনীতির উন্নতির পথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল।

বুচাননের লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের সুযোগসুবিধা সীমিত পরিসরে রুদ্ধগতিতে ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। সীমিত সংখ্যক পণ্ডিত, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও তীর্থযাত্রী ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করলেও ভারতীয় জনসাধারণ বহির্পার্শ্বের সাথে সংযোগবিহীন গ্রামীণ পরিবেশে আমৃত্যু বসবাস করত বলা যায়। রেশম, ভেষজ ঔষধপত্র ও হীরা-মুক্তার মত স্বল্প ওজনের মূল্যবান জিনিসপত্রের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান স্থান থেকে স্থানান্তরে সম্ভব ছিল, কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য ভারী জিনিসপত্র (লবণ, লোহা ইত্যাদি) সড়ক

ও যানবাহন ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থার জন্য সমগ্র দেশে বা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে চলাচলের সুবিধা ভোগ করত না। এসব জিনিসপত্রের জন্য তারা একমাত্র স্থানীয় উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির উৎপাদন-ব্যবস্থাতে বিশেষিকরণ নীতি প্রায় অনুপস্থিত থাকায় আন্তর্সম্প্রদায় দ্রব্য বিনিময় বা বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনও বিশেষ অনুভূত হত না। কেবলমাত্র খাদ্যশস্য বেচাকেনার জন্য গঞ্জের হাটে-বাজারে প্রেরিত হত। মানুষ বা চতুষ্পদ প্রাণীর মাথায় বা পিঠে চেপে ঐ খাদ্যশস্য সাধারণত চলাচল করত। খুব দূরে প্রেরণ করতে হলে গরু বা মোষের গাড়ি ব্যবহৃত হত। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর শখা-উপশাখা দিয়ে অবশ্য জলপথে দেশের অনেক ভিতরে বাণিজ্যিক পণ্য পৌঁছুতে পারত। মোগল আমলে সুবাগুলির রাজধানীগুলি মুষ্টিমেয় সংখ্যক সড়কের কর্দমাক্ত পথে সংযুক্ত ছিল। শাহ্‌জাহানের আমলে গুজরাটের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে, কোন কোন অঞ্চলে জনসাধারণ যখন খাদ্যশস্যের অভাবে মাছির মত কাতারে কাতারে মরছিল তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ মাইল দূরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জলের দামে খাদ্যশস্য পাওয়া গেলেও যথেষ্ট ক্রেতা মিলছিল না। সড়কের অভাব হেতু এমনটি ঘটেছিল। হিন্দুযুগে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দুটি বাণিজ্যপথের অধিকার নিয়েই প্রধানত যুদ্ধবিগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়েছে; উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ ছাড়া বাণিজ্যপণ্যের নির্বিঘ্ন চলাচলের বিশেষ কোন পথ ছিল না।[২]

শতাব্দীর পর শতাব্দী স্থবির গ্রামীণ জীবনের অভ্যস্ততা, উদ্বৃত্তবিহীন কৃষি-অর্থনীতি, মূলধন ও আর্থনীতিক বাজারের অপ্রতুলতায় বিকাশবিমুখ শিল্পায়ন, পরিবহনব্যবস্থার আদিম অবস্থা এবং সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের সাথে সম্পর্ক-বিহীন জীবনযাত্রা জনজীবনকে গ্রাম্যতা, সঙ্কীর্ণতা ও আঞ্চলিকতা দোষে দুষ্ট করে তুলেছিল। বিশাল, ব্যাপ্ত এলাকা জুড়ে সামাজিক আদান-প্রদানের অভাবে জাতীয় চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটেনি; গ্রাম-ভিত্তিক, বর্ণ-ভিত্তিক পশ্চাৎপদ চেতনায় আবিল হয়ে ভারতীয় গণচেতনা খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।

'ঝড়গতি, দ্রুত অতি' রেলগাড়ি

আজকের ভারতীয় শিশু আকাশ-বাতাস-জল-গাছপালার মত রেলগাড়ি, মোটর, জাহাজ, এরোপ্লেন, বেতার, খবরের কাগজ, দূরদর্শন ইত্যাদিকে প্রকৃতিদত্ত জিনিসের মত স্বাভাবিক বলে ভাবে। শিশু এখনো যা জানে না তা হল এই, মানুষের নিজস্ব আবিষ্কারগুলি বিশ্ব তথা ভারতের বৈজ্ঞানিক প্রগতির ইতিহাসে অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার।

শুধু শিশু কেন, বয়স্ক চৈতন্যেও অনেক সময় যা গরহাজির দেখতে পাওয়া যায় তা হল ভারতীয় যানবাহন তথা গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের সময়কাল সম্পর্কে সম্যক ধারণা। যানবাহন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড রেলওয়ে ভারতে সংস্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে। ঐ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারতে প্রথম রেলগাড়ি বোম্বে-থানা একুশ মাইল দূরত্ব পঁয়তাল্লিশ মিনিটে অতিক্রম করে। হাওড়া থেকে হুগলী চব্বিশ মাইল দূরত্বে প্রথম ভারতীয় যাত্রীবাহী রেলগাড়ি চলে ১৮৫৪ সালের ১৫ই অগাস্ট।

১৮৫৯ সালের ভারতে রেলওয়ে লাইনের দৈর্ঘ ছিল ৪৩২ মাইল, দশ বৎসরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫০০০ মাইলে দাঁড়ায়। ঐ শতাব্দীর শেষদিকে ঐ দৈর্ঘ ২৫০০০ মাইলে গিয়ে পৌঁছায়।

ভারতে 'রেলওয়ে যুগ' শুরু হওয়ার মাত্র আঠাশ বৎসর আগে ব্রিটেনে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়। ১৮২৫ সালে ইংল্যাণ্ডের ডার্লিংটন ও স্টকটনের মধ্যে একটি বাষ্পীয় এঞ্জিন ও ৩৮টি কামরা জুড়ে যাত্রী ও মালপত্র বোঝাই করে প্রথম গাড়িটি যাতায়াত আরম্ভ করে। ১৮২৯ সালে ফ্রান্স, ১৮৩০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৩৫ সালে জার্মানী, ১৮৩৭ সালে রাশিয়া, ১৮৩৯ সালে হল্যাণ্ড ও ইতালী এবং ১৮৪৮ সালে স্পেন রেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তন করে।[৪]

ইংল্যাণ্ডে রেলওয়ের যুগ শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভারতে ঐ যুগের উদ্বোধন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কাম্য বা বাস্তব সম্ভাবনাযুক্ত মনে করেনি দ্বিবিধ কারণে। ঝুঁকিবহুল ও ব্যয়বহুল রেলওয়ে ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন করার মত আর্থিক সামর্থ কোম্পানির ছিল না বলে মনে করা হয়েছিল। তাছাড়া, ভারতের মত নদীমাতৃক দেশে ঐ ব্যবস্থার পরিবর্তে জলযান ব্যবস্থার উন্নতি-সাধন করা অনেক বেশী জরুরী বলে নানা মহলে অভিমত ব্যক্ত হয়েছিল। গোদাবরী ও কাবেরী নদীব্যবস্থার প্রধান স্থপতি স্যর আর্থার কটন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টারি একটি কমিটির সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় ভারতের মত দরিদ্র

দেশে সড়ক, জলপথ ও জলযান নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন।[4] রেলওয়ের উপর অগ্রাধিকার না দিয়ে সেচখাল খননের উপর সর্বপ্রথম নজর দেওয়া উচিত বলে প্রাক্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড লরেন্স অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ভারতীয় জলবায়ু, ভারতীয় ভূখণ্ডের প্রকৃতি, ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্য, ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় আচার-বিচার ইত্যাদি রেলওয়ে ব্যবস্থার সাফল্যকে বিঘ্নিত করবে বলে বিশেষজ্ঞ মহলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছিলেন। শুধুমাত্র ইংরাজ প্রশাসক ও বিশেষজ্ঞ মহলে রেলওয়ে প্রবর্তনের বিরুদ্ধে মতামত ধ্বনিত হয়েছিল এমন নয়, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসাবে রমেশচন্দ্র দত্তর নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি সেচখাল ও সড়ক নির্মাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ক্ষুদ্রাকৃতি লগ্নী করে ব্রিটেনে মূলধন অনেকক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফালাভের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছিল। অথচ ঐ একই মূলধন ভারতের মত বিশাল আয়তন, জনবহুল উপনিবেশে লগ্নী করে, স্বল্প মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করে এবং শ্রমিকের উদ্বৃত্ত শ্রমের স্ফীতকায় মূল্য পকেটস্থ করে মাত্রাবিহীন মুনাফালাভের লোভনীয় সুযোগ বর্তমান ছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে ভারতে ব্রিটেনের মূলধন বিনিয়োগে প্রয়াসী হয়। ঐ চাপ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ড্যালহৌসির রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বয়ানের (১৮৪৯) সমর্থনধন্য হয়ে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর নিজস্ব মূলধন বিনিয়োগের বিরুদ্ধ যুক্তিতর্কের দরজা ভেঙ্গে দেয়। ১৮৫৩ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী সীমিত দায়বদ্ধ বহু কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। খোদ ব্রিটেনে ভারতীয় রেলওয়ে শেয়ার কেনার জন্য এমন হিড়িক পড়ে গিয়েছিল যে, দালাল ও ফড়িয়ারাও বেশ কিছু পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স গুছিয়ে নেয়।[5] কোম্পানিগুলির কাজকর্ম ভারতীয় জনস্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে না পারায় অ্যাকওয়ার্থ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২২ সালে রেলওয়ে জাতীয়করণের নীতি গৃহীত হয়।

ভারতে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র উপমহাদেশের অভ্যন্তর থেকে কাঁচামাল রেলগাড়ির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে কোলকাতা-বম্বে-মাদ্রাজ প্রভৃতি

কখনো পর্যাপ্ত হয়ে ওঠেনি। তথাপি শতাব্দীর পর শতাব্দী পরিবহন ব্যবস্থায় অনগ্রসর ভারতে সড়ক ও রেলপথ বিস্তারের বিলম্বিত, সীমিত কার্যক্রম আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মরা গাঙে জোয়ারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

রেল বনাম সড়ক প্রতিযোগিতা

শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় সড়কপথে যান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবহার ভারতে অতি সাম্প্রতিক ব্যাপার বলে মনে হয়। ১৮৯৮ সালে মোটরগাড়ি ভারতে প্রথম আমদানি করা হয়। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতে মোটরগাড়ির মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০০; বলা বাহুল্য এরূপ গাড়ীর ব্যবহার ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ১৯২০ সালের পর থেকে মোটরগাড়ি, ট্রাক, লরী ইত্যাদির ব্যবহার ভারতে লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।[9] প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ভারতে বিপুল সংখ্যক মোটরযান বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। যুদ্ধ শেষ হলে ঐগুলি ভারতীয় শিল্পপতিরা ক্রয় করে শিল্পদ্রব্য বা কাঁচামাল পরিবহনের কাজে নিয়োগ করেন। সড়কপথে যন্ত্রচালিত যানবাহনের ব্যবহার সড়কপথের উন্নয়নের দাবিকে জোরদার করে তুলতে থাকে। তখন পর্যন্ত ভারতীয় সড়কগুলি ভারী যানবাহনের পক্ষে উপযোগী ছিল না; সড়কব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য নানা দিক থেকে দাবি উত্থিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ জয়াকর কমিটির সড়ক উন্নয়ন তহবিল সৃষ্টির সুপারিশ গ্রহণ করে।[10]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে বিটিশ ভারতে সড়ক উন্নয়নের কাজ ও মোটরযানের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৩০ সালের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা আর্থিক দিক থেকে ট্রাক, লরী ইত্যাদি ব্যবহার করা লাভজনক বিবেচনা করতে আরম্ভ করলে রেল বনাম সড়ক প্রতিযোগিতার উদ্ভব ঘটে। রেলওয়ে প্রতি বৎসর এই প্রতিযোগিতার ফলশ্রুতিতে দু'কোটি টাকা লোকসানের সম্মুখীন হতে থাকে। এই প্রতিযোগিতার চরিত্র অনুধাবন ও যথোপযুক্ত সুপারিশ রচনার জন্য ১৯৩২ সালে মিচেল-কার্কনেস কমিটি নিযুক্ত হয়; ১৯৩৩ সালে রেল-সড়ক আত্মহত্যাসুলভ প্রতিযোগিতা বন্ধের জন্য ঐ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩৫ সালে বিভিন্ন প্রদেশের যানবাহন সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে যানবাহন উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে নিযুক্ত

ওয়েজউড কমিটি মোটরযানের অসাধু প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেলওয়ের ন্যায্য স্বার্থ রক্ষার জন্য সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের সুপারিশ করে।

সড়ক, মোটরযান ইত্যাদির আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব

সড়কব্যবস্থার উন্নতি ও মোটরযানের ব্যবহার ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি নগরের শিল্পায়নের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বেড়াজাল ছিন্ন করে নবনির্মিত সড়কপথে দ্রুত ধাবমান যানবাহন দূর-দূরান্তরে নূতন নূতন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার অনুকূল শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে। সড়কগুলি ভারতীয় **শিল্পের বিকেন্দ্রিকরণ** সম্ভব করে তোলে। কাঁচামাল ও শিল্পদ্রব্য চলাচল অব্যাহত রাখতে সড়ক ও যান্ত্রিক যানবাহন রেলওয়ের সঙ্গে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। সড়কগুলি অনেক ক্ষেত্রে বহু গ্রামকে সংযুক্ত করে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বৃহত্তর বাজার সৃষ্টি করে।

ভারতীয় কৃষি সড়ক উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে লাভবান হয়। কৃষিজাত দ্রব্য, শাক-সবজী, ফল ইত্যাদি সড়কপথে শহরাঞ্চলে আনীত হতে থাকে এবং উৎপাদনকারীর মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে থাকে। আবার, কৃত্রিম সার, উন্নতমানের বীজ ইত্যাদি সড়কপথে চাষীর দুয়ারে হাজির হতে থাকে! পতিত জমি চাষাবাদের জন্য জমিমালিক উৎসাহিত হয়ে উঠতে থাকেন। বাণিজ্যিক কৃষির বিকাশে রেলওয়ে ও সড়কপথের বিস্তার অনুকূল ভূমিকা পালন করে; নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি সড়ক ও রেলপথে দ্রুত আনয়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আবার, উৎপাদিত শস্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বা বন্দরনগরগুলির মাধ্যমে বিশ্বের বাজারে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হতে থাকে। উন্নত সংযোগ ও যানবাহনের হাত ধরে ভারতের বাণিজ্যিক কৃষি পথপরিক্রমা শুরু করে।

সড়কব্যবস্থার উন্নয়ন লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর অন্নসংস্থানের সহায়ক হয়। দরিদ্র, নিরন্ন, অক্ষরজ্ঞানহীন বহু **মানুষ সড়ক নির্মাণের কল্যাণে চাকুরি লাভ** করে সংসার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে সড়ক নির্মাণে অংশগ্রহণের বিনিময়ে বেকার মজুরেরা খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়। সড়কব্যবস্থার উন্নতি দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যশস্যের অবাধ চলাচল সম্ভব করে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কিছুটা লাঘব করতে সহায়ক হয়।

সড়কব্যবস্থার উন্নতির সাথে রেলপথ, অন্তর্দেশীয় জলপথ ও সমুদ্রপথ এবং বিমানপথের উন্নয়নের কার্যক্রম নিবিড় সম্পর্কে জড়িত। সড়কপথের বিকাশ না ঘটলে রেলপথের বিকাশ অলাভজনক হয়ে উঠতে বাধ্য। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য বা খনিজদ্রব্যে সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে জনজীবনের উপযোগী রাস্তাঘাট গড়ে ওঠার পরে রেলপথের আবির্ভাব ঘটে। অনুরূপভাবে দেখান যায় যে, সংযোগকারী রাস্তাঘাট নির্মিত হলে জলপথ ও বিমানপথের প্রকৃত উন্নতি ঘটতে থাকে। মানুষ ও জিনিসপত্র স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দেবার উপযোগী সড়ক গড়ে উঠলে শুধুমাত্র যে স্থলযান ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে এমন নয়, অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থারও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ব্রিটিশ আমলে বিলম্বিত প্রয়াস সত্ত্বেও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতির রূপরেখাটি রচিত হয়েছিল বলা যায়। এই রূপরেখাটি যতই বাস্তবে সার্থক হয়ে উঠতে থাকে ততই ভারতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে।

সড়কপথের বিস্তার অসংখ্য ভারতীয় গ্রাম ও সীমিত সংখ্যক শহরগুলির একাকীত্ব ভেঙ্গে দিয়ে পারস্পরিক পরিচয় ও সংযোগ গড়ে তুলতে থাকে। সামাজিক নানাবিধ বন্ধনে গ্রাম ও নগরগুলি সংযুক্ত হয়ে পড়তে থাকে; দ্রুতগামী যানবাহন সড়কপথে চলাচল করে জনসাধারণের পারস্পরিক মেলা-মেশা বৃহত্তর গণ্ডীতে সম্ভব করে তুলে জাতীয় ঐক্যের সূচনা করতে থাকে।

সড়কপথে ধাবমান যানবাহন শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গ্রামের ছাত্রদের পক্ষে শহরাঞ্চলের কলেজগুলিতে শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। গণ্ডগ্রামের ছাত্ররা সড়কপথে নিকটবর্তী বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের বিদ্যায়তনে শিক্ষালাভের সুযোগ পেতে থাকে।

সড়কপথের বিস্তার ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি ভারতীয় জনজীবনের স্থবিরতা হ্রাস করে গতিশীল জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। নিজস্ব গ্রাম, শহর বা প্রদেশ ত্যাগ করে ভারতবাসীদের পক্ষে অন্যত্র গমনাগমন করে জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা ক্রমশ সম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। ভারতবাসীদের পারস্পরিক মেলামেশার ফলে গ্রাম বা ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ ভাবনাচিন্তা ও পশ্চাৎপদ প্রদেশের প্রগতিবিমুখ দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশ বিলীন হয়ে জাতীয় জীবনের ঐক্য পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। ধীর পদক্ষেপে আগমনরত গতিশীল জনজীবন উন্নত সংযোগব্যবস্থার প্রভাবে ক্রমবর্ধমান গতিবেগ লাভ করতে

থাকে। রাজনৈতিক সচেতনতা এই গতিবেগের শরিক হয়ে সারা ভারতে বিস্তৃত হতে থাকে।

সড়ক ও যানবাহনের উন্নতির ফলে সারা ভারতের আর্থনীতিক জীবনের সঙ্গে ভারতের গ্রাম, শহর ও অঞ্চলগুলি যেমন একদিকে যুক্ত হয়ে উঠতে থাকে, অন্যদিকে তেমন মানুষ এবং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে রাজনৈতিক ধ্যানধারণা স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের বিস্তৃতি সম্ভব করে তুলতে থাকে।

জাহাজ ও বিমানপথ সমাচার

সমুদ্রপথে ভারতীয় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য ঔপনিবেশিক আমলে বরাবর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। জাহাজনির্মাণ শিল্প ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার যুগেও ব্রিটেনের চেয়ে উন্নত ছিল। কিন্তু ব্রিটেনের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতে ঐ শিল্পের বিকাশে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিল। আবার, ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাগিদে শুধুমাত্র রেলপথ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় উদ্যোগী হয়ে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ অন্তর্দেশীয় জলপথের উন্নতি সাধনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছিল।

বিমানপথের উন্নয়নের জন্য ঔপনিবেশিক ভারতকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল। ১৮৭৭ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত অসামরিক বিমান চালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা ঘটেছিল; কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাতে অসামরিক বিমান চলাচলের পাকাপাকি ব্যবস্থা ১৯২৭ সালের পূর্বে গৃহীত হয়নি। ঐ সালে অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিমান চালনা শিক্ষার বহু ক্লাব ও এরোড্রোম স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ক্রয়ডন ও করাচীর মধ্যবর্তী রাজকীয় বিমান-পথের সুবিধা দিল্লী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। ১৯৩৮ সালে সাম্রাজ্যব্যাপী বিমান ডাক পরিকল্পনা চালু হয়। করাচী-কোলকাতা, করাচী-বোম্বে-মাদ্রাজ-কলম্বো এবং করাচী-লাহোর বিমানপথগুলি প্রথমে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতে অসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়।[11]

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রমাণ করে যে, ঐ অগ্রগতি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য

প্রয়োজনীয় সৈন্য ও রসদ পরিবহনের পক্ষে একান্ত অপর্যাপ্ত ছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে বিমান চালনার কারিগরী দক্ষতা অর্জনে বহু সংখ্যক ভারতীয় যুবক সাফল্য লাভ করেন। ভারতীয় বিমানবহরে যোগদানের জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালান হয়। প্রতি-রক্ষার কার্যে নিযুক্ত বিমানের সংখ্যা অনেক বাড়ান হয়। ১৯৪৩ সালে লর্ড লিনলিথ্‌গো ঘোষণা করেন যে, ভারতের বিমানবহর ক্রমশ বিপুল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছে।

১৯৪৭ সাল নাগাদ এগারটি বিমান কোম্পানি ভারতের অভ্যন্তরে যাত্রী ও মাল পরিবহনের কাজে বিমান পরিবহন লাইসেন্সিং বোর্ডের তালিকাভুক্ত হয়েছিল: ঐগুলির নাম ছিল—ভারত এয়ারওয়েজ; ওরিয়েণ্ট এয়ারওয়েজ; ডেকান এয়ারওয়েজ; ডালমিয়া জৈন এয়ারওয়েজ; এয়ার ইণ্ডিয়া; এয়ারওয়েজ ইণ্ডিয়া; মিস্ত্রি এয়ারওয়েজ; অম্বিকা এয়ারলাইনস; জুপিটার এয়ারওয়েজ; ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ এবং এয়ার সার্ভিসেস অফ ইণ্ডিয়া।[১৪]

রেলওয়ের স্বার্থরক্ষার খাতিরে অন্তর্দেশীয় জলপথের উন্নয়নের কার্যক্রম গৃহীত না হওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতি সুলভ পরিবহনের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। রেলওয়ের সংস্রববিহীন অঞ্চলগুলিতে রাজনৈতিক সংযোগের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিল। রাজনৈতিক সংযোগের বাহন হিসাবে বিমানপথের ব্যবহারও অত্যন্ত সীমিত তাৎপর্য বহন করেছিল। ভারতীয় জনগণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের অর্থলগ্নীতে দীর্ঘকাল অনীহা দ্রুতগামী এই বাহনের সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার থেকে জনগণকে বঞ্চিত রেখেছিল।

আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার বহুমুখী তাৎপর্য

রুদ্ধপ্রবাহে স্থবির ভারতীয় শিল্পায়নের শীর্ণ ধারাটি রেলওয়ে ব্যবস্থা পত্তনে বিস্তৃত হতে থাকে। রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং কৃষির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ সৃষ্টির সাথে সাথে রাজস্ব বৃদ্ধির সূত্রে ব্রিটেনের বাড়-বাড়ন্ত আয়, ভারতের অভ্যন্তরে কয়লা, লৌহ, তুলা ও পাটের মত কাঁচামাল প্রাপ্তি বা প্রস্তুতের সম্ভাবনা প্রভৃতি কারণগুলির সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় শিল্পায়ন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল বলে জোন্‌ বীচ্যাম্‌প, অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন

যে, ভারতের মত বিশাল দেশে রেলওয়ে ব্যবস্থা নিজস্ব নানা চাহিদা মেটানর জন্য এবং বিশেষ করে মেরামতির স্বার্থে ভারতীয় শিল্প বিকাশের সহায়ক হবে। হয়েওছিল তাই। কাঁচামাল কারখানার দুয়ারে হাজির করে ও শিল্পজাত দ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করে বা বন্দরে পৌঁছে দিয়ে আন্তর্জাতিক আর্থনীতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে রেলওয়ে ব্যবস্থা ঘূর্ণমান চক্রধ্বনিতে শিল্পায়নের বৈপ্লবিক জয়গান ধ্বনিত করে তুলেছিল।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের রেলওয়ে ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ধনিকদের মূলধনে পরিচালিত হয়েছিল বলে মুনাফা লাভের লোভ মুখ্য হয়ে উঠে ভারতীয় শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জনকল্যাণের আদর্শটিকে শিঁকেয় তুলে রেখেছিল। এই ব্যবস্থা প্রধানত ভারতীয় বন্দরনগরগুলিকে কৃষিপণ্য ও আধা-শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন সংগ্রহের কেন্দ্রগুলির সাথে সংযুক্ত করে দিতে তৎপর ছিল। ফলে কয়েকটি বন্দরনগর (বিশেষ করে কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ) এবং উৎপাদন সংগ্রহের সীমিত সংখ্যক কেন্দ্রগুলি আর্থনীতিক ও বাণিজ্যিক লেনদেনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে, অথচ সারা ভারতের মূঢ়, মূক, ম্লান মুখের কোটি কোটি ভারতবাসীর আবাসভূমি গ্রামগুলি আর্থনীতিক দুরবস্থার পূর্বতন তিমিরেই দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন থাকে। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির সারা দেহ রক্তাল্পতায় ভুগতে থাকে, কেবলমাত্র মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চার ঘটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দুটি ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটে: কয়েকটি বন্দর ও মুষ্টিমেয় কয়েকটি শহরকে কেন্দ্র করে শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা ও শিক্ষাবিস্তারে তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ একটি ভারতবর্ষ, আর শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত অপর একটি ভারতবর্ষ। শহর ও গ্রামের জনজীবনের আর্থনীতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মান আসমান-জমিন ফারাক হয়ে ঔপনিবেশিক আমল থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিকে অসমঞ্জস ও অসংবদ্ধ করে রেখেছিল। আশ্চর্যের কিছু নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঊষাকালে জাতীয়বাদের প্রবক্তারা গ্রাম-ভারত থেকে আবির্ভূত হননি; তাঁরা সবাই মুষ্টিমেয় মহানগরগুলি থেকে নিজেদের চিন্তাভাবনা ও ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত করেছিলেন। তাঁরা আর্থনীতিক বিচারে একই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, প্রায় একই রকম শিক্ষাদীক্ষা ও চিন্তাভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্বদেশচিন্তা, শ্রেণীস্বার্থ ও স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদও ছিল একই রকম। গ্রাম-ভারতের জনসাধারণের সাথে কথাবার্তা বা ভাববিনিময়ের বিষয়বস্তু তাঁরা

প্রধানত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে পৌঁছে দিতে অক্ষম হয়েছিলেন। গণজ্ঞাপন ও যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য গ্রাম ও শহরের মানুষের মধ্যে কাম্য সংযোগ গড়ে উঠতে পারেনি।

ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক স্বার্থে রেলওয়ে ব্যবস্থার চরিত্র ও রেলওয়ের গতিপথ নির্ণীত হলেও, রেল চলাচল শুরু হবার পর ভারতের প্রাচীন আর্থ-সামাজিক ভিত্তি নূতন নূতন শক্তির আঘাতে ভাঙতে শুরু করে, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির স্থবির, দারিদ্র্যময় স্বয়ম্ভরতা ধীরে ধীরে ঘুচতে আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে ধনতান্ত্রিক ব্রিটেনের সেবাদাস হিসাবে বিশ্ববাণিজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত, আর্থনীতিক দিক থেকে সংবদ্ধ নূতন এক ভারতবর্ষের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। **জাতীয় অর্থনীতির উদ্ভব** ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বস্তুগত ভিত্তি রচনায় অন্যতম প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

ও'ম্যালী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আধুনিক শিল্পগুলির জনক হিসাবে রেলওয়ে অনন্য ভূমিকা পালন করে; উৎপাদনে বিশেষিকরণ সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনব্যবস্থাকে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে সমৃদ্ধ করে। সারা দেশে বাণিজ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ সারা বৎসর নিশ্চিত করে জিনিসপত্রের মূল্য ভারতবর্ষব্যাপী সুষম করে তোলে। দুর্ভিক্ষ ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শক্তির লালসাজর্জর নীতির প্রয়োগে মনুষ্য-সৃষ্ট অঘটন হিসাবে একাধিকবার আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু খাদ্যশস্য সরবরাহের উপযোগী সারা দেশব্যাপী পরিবহন ব্যবস্থা চালু করে রেলওয়ে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা সৃষ্টির মূলোৎপাটনের জন্যও নিঃসন্দেহে কিছু কাজ করেছে। চাকুরি বা পেশায় নির্দিষ্ট স্থানে আজীবন বসবাসের অনিবার্যতা ঘুচিয়ে দিয়ে রেলওয়ে জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত মানুষের দেশব্যাপী চলাচলের সুযোগ করে দেয়। ভূমিদাস, বেকার প্রভৃতিকে শহরাঞ্চলের কলকারখানাগুলির দুয়ারে শ্রমক্রেতা ধনিক শিল্পপতির সামনে হাজির করে। ফলে, পশ্চাৎপদ সামন্ততান্ত্রিক ভারতের আর্থনীতিক পদযাত্রার কাল ক্রমে ক্রমে সমাপ্ত হয়ে আসতে শুরু করে এবং ভারতীয় অর্থনীতি ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের কুহেলীঘেরা প্রত্যুষের প্রহর গুণতে থাকে। ভারতে 'রেলওয়ে ব্যবস্থা **আধুনিক শিল্পের সত্যিকারের পূর্বসূরী** হবে' বলে কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হয়ে উঠতে শুরু করে।[13]

রেলওয়ে ও সড়কব্যবস্থা কৃষি এলাকায় ধীরে ধীরে হলেও 'শান্ত বিপ্লব'

সম্পন্ন করে। কৃষিজ উৎপাদনকে পরিবহন ব্যবস্থা বিক্রয়যোগ্য করে তোলে। ভারতীয় কৃষক বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনে উৎসাহী হয়। কৃষি অর্থনীতি ধীরে ধীরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে **ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দ্রুততর হতে থাকে**। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বৃহদাংশ পশ্চিমী ধাঁচের শিল্পায়ন, নগরীকরণ ও মধ্যবিত্ত সমাজের উন্নতমান জীবনযাত্রার স্বপ্নবিহ্বল হাতছানিতে মুগ্ধ হতে থাকে। আধুনিক শিল্পের প্রসারে তাঁরা উৎসাহী সমর্থক হয়ে ওঠেন। বাণিজ্যিক মূলধনের মালিক ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলি, জমিদারশ্রেণীর একাংশ, ভূমির মালিকানা থেকে লব্ধ আয়ে ধনী কিছু বুদ্ধিজীবী ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের গোড়া পত্তনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্য থেকে নূতন এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটতে থাকে —শিল্পে কর্মমুখর বুর্জোয়া। 'সাম্যবাদী ইস্তেহার'-এ মার্কস ও এঙ্গেল্স বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা বলেছেন। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে অবিকল ঐরূপ ভূমিকা গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর সাথে অধস্তন সহযোগিতা বজায় না রেখে ভারতীয় বুর্জোয়া:শ্রেণীর পক্ষে বিকাশ লাভ করা অসম্ভব ছিল; রাজনৈতিক, সামরিক, আমলাতান্ত্রিক ও আর্থনীতিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থপর, কঠোর অভিভাবকত্ব না মেনে নবজাতক ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব ছিল। ঔপনিবেশিক আমল অবসানের তিন দশক আগে এই নবজাতক কৈশোরে পদার্পণ করলেও দীর্ঘকাল পরনির্ভরশীলতার কারণে তার পঙ্গু অবস্থা ঘোচেনি। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী স্বল্পকালীন প্রয়োজনে সদাসর্বদা ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সহযোগী হতে দ্বিধা করেনি; কিন্তু দীর্ঘকালীন লাভ-লোকসানের নিরিখে ঐ শ্রেণীর প্রভাবশালী একটি অংশ এরূপ সহযোগিতাকে আত্মঘাতী ভেবেছে। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রথম দিকে এই শ্রেণী স্বদেশীয় জনতার পাশে এসে দাঁড়াতে সাহসী হয়নি, কিন্তু জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম যখন বহুশ্রেণী-ভিত্তিক চরিত্র অর্জন করে শক্তিশালী হয়েছে তখন এই শ্রেণীর অগ্রণী অংশ জাতীয় স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। এই শ্রেণী দীর্ঘকালীন স্বার্থের বিচারে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অধস্তন সহযোগী না থেকে স্বাধীন ভারতে অগ্রণী শ্রেণীর ভূমিকা কাম্য মনে করেছে। ইউরোপীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মত ইতিহাসে বৈপ্লবিক ভূমিকা গ্রহণে অপারগ হলেও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের শেষ দশক তিনটিতে মোটামুটি প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল বলা যায়।

রেলওয়ে ব্যবস্থা না গড়ে উঠলে ভারতে **বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম কবে, কখন, কীভাবে ঘটত বলা শক্ত।**

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে রেলওয়ে, মোটর, লরী ইত্যাদি পরিবহনের বাহনগুলি ভারতের রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্যে বিধৃত করে। একদিকে এই বাহনগুলি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতে সংবদ্ধ ও সংরক্ষিত রাখতে যেমন ক্রিয়াশীল ছিল, অন্যদিকে তেমনই ঐ শাসনকে পরাভূত করবার জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপরেখা রচনার বস্তুগত ভিত্তি তৈরী করার কাজে সক্রিয় ছিল। গ্রাম, শহর, নগর, জেলা, বিভাগ ও প্রদেশের নরনারী নিজের এলাকার সীমা পেরিয়ে বাস, মোটর ও রেলগাড়ির দৌলতে অন্যান্য এলাকার নরনারীর সাথে আলাপ-আলোচনা, মিটিং-মিছিল, প্রস্তাব রচনা ও আন্দোলনের কার্যক্রম তৈরীতে ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তোলে। পত্রপত্রিকা, ডাক, তার, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি রাজনৈতিক সচেতনতার বাহক হয়ে সারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সহায়ক হয়। রেলওয়ে, মোটরগাড়ি ইত্যাদি প্রচলিত না হলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজ শাহ্ মেহ্‌তা, দীন্‌শা ওয়াচা প্রভৃতি উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের পক্ষে দেখা-শোনা-কথাবার্তায় ভাববিনিময় করা সম্ভব হত না। রাজনৈতিক সংস্থাগুলির সদস্যদের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে সভাসমিতি, অধিবেশন ইত্যাদিতে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করা অসম্ভব হত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, লিবারেল ফেডারেশন, অল ইণ্ডিয়া উইমেন্‌স্ কনফারেন্স, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এবং বহু যুব, ছাত্র ও কিষাণ সংস্থা আধুনিক যানবাহনের সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের কাজকর্মের ভিত্তি ও ব্যাপকতাকে সর্বভারতীয় চরিত্রানুগ করে তুলতে সক্ষম হয়।[14] **ভারতের মুক্তিসংগ্রাম আধুনিক যানবাহনের ক্রমবিস্তারের ইতিহাসের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত।** ঐ ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ছাড়া মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপকতার দ্রুততার কারণ সঠিক-ভাবে উপলব্ধি করা যায় না।

রেলওয়ে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে ভারতীয় ভাষাসমূহে লিখিত বইপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি সীমিত এলাকায় পঠিত হত। প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে অন্য প্রদেশে ঐগুলি পৌঁছুতে পারত না। আধুনিক যানবাহন, বিশেষ করে রেলগাড়ী, প্রচলিত হলে ঐগুলি প্রদেশ থেকে প্রদেশে পৌঁছে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নূতন একটি জাতীয় চৈতন্য ধীরে ধীরে জন্মলাভ করতে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ব্যবহৃত বইপত্র হাজারে হাজারে মুদ্রিত করা আধুনিক যানবাহন প্রচলিত হবার আগে সম্ভব ছিল না এমন নয়। কিন্তু ঐগুলি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গ্রামে ও শহরের হাজার-হাজার শিশুর হাতে পৌঁছে দেওয়া ছিল অসম্ভব। রেলওয়ে পত্তন ও সম্প্রসারণের সাথে সাথে ভারতীয় শিশুদের হাতে একই রকম পাঠ্যপুস্তক আসতে শুরু করে। গণশিক্ষার শীর্ণ ধারাটি উৎসমুখের বাধা ছিন্ন করে ধাবমান হয়। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ গণশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও আধুনিক যানবাহনের অন্যতম ফল হিসাবে গণশিক্ষা বিস্তারের ধারাটি নিজস্ব পথ খুঁজে পায়।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তা ও মননের ফসল আঞ্চলিক সীমানার গণ্ডী পেরিয়ে প্রদেশে প্রদেশে পৌঁছে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হতে শুরু করে। বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় গুরু বা প্রবক্তারা তাঁদের রচনার মাধ্যমেই কেবলমাত্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন এমন নয়, আধুনিক যানবাহনের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁরা নিজেরা ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে তাঁদের চিন্তাভাবনাকে অনেকখানি সর্বজনীন করে দিতে সক্ষম হন। ভারতীয় চিন্তা ও মননের ভাবমন্দাকিনী শাখানদী সৃষ্টি করে গণচিন্তার ভূমিতে পলিমাটি সংযোজনে কর্মমুখর হয়ে ওঠে। দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, দাদাভাই নওরোজী, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, রমেশচন্দ্র দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহ্‌রু, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোহন-দাস করমচাঁদ গান্ধী, সুব্রাহ্মনীয় আয়ার প্রভৃতিরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনাকে পরিবেশন করে আঞ্চলিকতা, প্রাদেশিকতা বা সম্প্রদায়গত দোষে দুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্বোধন করেন। সঙ্কীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা, বর্ণান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আঘাতে কোণঠাসা হতে আরম্ভ

করে। ভারতে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব ও বিকাশে আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অসাধারণ।

যানবাহনের আধুনিকীকরণের সাথে সাথে পেশা, চাকুরি, ব্যবসা ইত্যাদির প্রয়োজনে ভারতের এক প্রদেশের মানুষ অন্য প্রদেশে উপস্থিত হতে শুরু করেন; কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, আমেদাবাদ, পুণা, কানপুর, পাটনা প্রভৃতি নগরগুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বাসিন্দারা বসবাস শুরু করলে সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পায় এবং নগরগুলির প্রকৃতিতে সর্বভারতীয় ছাপ পড়তে থাকে। মাদ্রাজ থেকে বোম্বে, লাহোর থেকে কোলকাতা, দ্বারকা থেকে পুরী, গৌহাটি থেকে কানপুর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন শহর এবং প্রদেশবাসী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকীল, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, কেরানী ও সরকারী পদস্থ কর্মচারী জীবিকার প্রয়োজনে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করে যাতায়াত ও বসবাস আরম্ভ করেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষিত মানুষের পাশাপাশি বসবাসের ফলে ভারতীয় নূতন এক জীবনযাত্রার ধারাপথ সৃষ্টি হতে থাকে। রেলওয়ে পত্তনের ফলে বিপুল হারে গ্রাম-ভারতের মানুষ কোলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বে, কানপুর প্রভৃতি শহরের কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে যোগদান করতে সুযোগ পায়। শ্রমিকশ্রেণীর গঠনে প্রাদেশিকতার ছাপটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

আধুনিক যানবাহনের কল্যাণে শিক্ষাবিদ, বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদ, অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও শিল্পীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন, অধিবেশন ও প্রদর্শনীতে তাঁদের বক্তব্য ও শিল্পকর্ম উপস্থাপিত করবার সুযোগ লাভ করেন। রেলওয়ে ও অন্যান্য আধুনিক যানবাহনের স্বাচ্ছন্দ্য ও দ্রুতগামিতার ফলে তাঁদের পক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করে সতীর্থদের সাথে মেলামেশা সম্ভবপর হয়। বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানপ্রেমী, কলারসিক ভারতীয়দের এই মেলামেশা সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল।

আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার প্রভাবে ধর্মীয় ও বর্ণ-ভিত্তিক কুসংস্কার, কুপ্রথা, কদাচার ও অমানবিক আচার-আচরণ পরিবর্তিত হতে শুরু করে। মুদ্রাযন্ত্র একদিকে যেমন সংস্কারমুক্ত মানবতাবাদ প্রচারে সহায়ক শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যানবাহন ব্যবস্থা অন্যদিকে তেমন দৈনন্দিন জীবনে কুসংস্কার ও কুপ্রথার বেড়া ভাঙতে সক্রিয় থাকে। বিশেষ করে

পানাহার সংক্রান্ত বর্ণ-ভিত্তিক হিন্দু সমাজের বিধিনিষেধের নিগড় আলগা হতে শুরু করে। ভাড়া বা মাশুলের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তথাকথিত অস্পৃশ্যদের পক্ষপাতহীনভাবে স্থানান্তরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি ইত্যাদি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ভেদাভেদ সঙ্কীর্ণতর করে তুলতে থাকে। রেলগাড়ির একই কামরায় উপবীতধারী, ফোঁটা-তিলকে শোভিত-ললাট ব্রাহ্মণ এবং জীর্ণ বসন ও অপমান-লাঞ্ছনায় ক্লিষ্ট 'অস্পৃশ্য' আহার ও পানীয় গ্রহণে বাধ্য হন। বর্ণের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ হিন্দুরা ও সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার কল্যাণে পারস্পরিক মেলামেশা ও ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ করে সামাজিক সংহতির নূতনতর, ব্যাপকতর ও গভীরতর রূপকে ধীরে ধীরে মূর্ত করে তুলতে থাকেন।

ভারতীয় ভাষাসমূহ উনবিংশ শতাব্দী অবসানের দু'তিনটি দশক আগে বেশ কিছুটা স্বয়ম্ভর হয়ে নূতন নূতন পাক্ষিক পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, বইপত্র, ইত্যাদি প্রকাশে আত্মনিয়োগ করে। মাদ্রাজ, বোম্বে, লাহোর, করাচী, পাটনা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, পুণা, কোলকাতা ইত্যাদি শহর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা ইংরাজী ও মাতৃভাষার মাধ্যমে ভারতীয়দের দুয়ারে পৌঁছে দেয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার সহযোগী হিসাবে মুদ্রাযন্ত্রের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ঔপনিবেশিক শাসন ইতিহাসের অসচেতন যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে ভারতবর্ষে আধুনিক যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা প্রচলন করে ভারতীয় জনজীবনে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র ও পত্রপত্রিকার উদ্ভব

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক পর্যন্তও ভারতবাসীদের পক্ষে সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য ছিল। যানবাহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আদিম অবস্থায় এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব স্বাভাবিক ও অনিবার্য ছিল। ১৮৫২ সাল পর্যন্ত ভারতবাসী উট, হাতি, গরুর গাড়ি, নৌকা, ঘোড়া ইত্যাদি বাহন হিসাবে ব্যবহার করত। সাধারণভাবে পদব্রজে যাতায়াত প্রচলিত ছিল। ১৮৫০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' ডাকবিলির শহরগুলির মধ্যে

চিঠিপত্রের গতায়াতের গতি ঘণ্টায় দুই মাইল বলে বর্ণনা করেছিল। ১৮৪৫ সালে ভারতে ডাক-শহরের সংখ্যা ছিল ১৩৮, লর্ড ড্যালহৌসির সময়ে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪৭। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যে বড় বড় শহরগুলি রেলব্যবস্থায় যুক্ত হলেও চিঠিপত্র লেনদেনের ব্যাপারে অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটত : ১৮৬২ সালে কোলকাতা থেকে বোম্বে বা মাদ্রাজ চিঠি যেতে কম পক্ষে ৭ দিন লাগত, আগ্রা যেতে লাগত ৫ দিন, আর দিল্লী পৌঁছুতে ৬ দিন।[15]

এরূপ বিলম্বের কারণে সংবাদপত্রের প্রচার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ১৮২৮ সালে 'বেঙ্গল হরকরা'-র সম্পাদক জেম্‌স সাদারল্যাণ্ড হাউস অফ কমন্সের একটি সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেছিলেন যে, তাঁর দৈনিক সংস্করণটি ৮০০-র বেশী বিক্রী হত না। গ্রাহকেরা অধিকাংশ ছিলেন ইউরোপীয়, স্বল্প সংখ্যক ভারতীয় গ্রাহকও ছিলেন। ভারতীয় মালিকানা ও সম্পাদনায় ইংরাজীতে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'দি রিফর্মার' ১৮৩৩ সালে ৪০০ কপি বিক্রি হত; ১৭৫ কপি 'ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার', ২০৮ কপি 'বেঙ্গল ক্রনিক্‌ল', ২৪২ কপি 'বেঙ্গল হেরাল্ড', ২০০ কপি 'ইণ্ডিয়ান রেজিস্টার', ২০০ কপি 'দি এনকোয়ারার্' এবং ১০০ কপি 'জ্ঞানান্বেষণ' ঐ একই সময়ে বিক্রি হত।[16]

হিন্দু কলেজে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীদের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকা গত শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল, যেমন, 'দি রিফর্মার', 'দি পার্থেনন', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'দি হিন্দু পাইওনীয়ার', 'দি বেঙ্গল স্পেকটেটর' এবং 'দি এনকোয়ারার'। বাংলায় প্রকাশিত শ্রীরামপুর মিশনারিদের প্রভাবশালী পত্রিকাটির নাম ছিল 'সমাচার দর্পণ', কিন্তু ঐ কাগজের দৈনিক বিক্রয় ৪০০ কপির বেশী ছিল না। 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন অ্যাণ্ড ব্রাহ্মণ সেবধি', 'সংবাদ কৌমুদি' এবং রামমোহন রায় সম্পাদিত 'মিরাত-উল-আকবর' বিশের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের যৌথ উদ্যোগে 'বঙ্গদূত' ১৮৩০ সালে আত্মপ্রকাশ করে। কিছু পরবর্তীকালে মননশীল পত্রিকা 'সোমপ্রকাশ' আবির্ভূত হয়।

বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে ভারতীয় পত্রিকাগুলির সব ক'টি পার্শী সম্প্রদায়ের স্বত্বাধীন ছিল, সম্পাদকেরা সবাই ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মারাঠা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র পার্শী কাগজগুলির অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিল। গুজরাটি ভাষায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মম্বাইনা (বোম্বে)

সমাচার' মোবেড কাড়ুনজি মুর্জবানের সম্পাদনায় ১৮২২ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩১ সালে গুজরাটি ভাষায় দৈনিক কাগজ 'জাম-ই-জামসেদ' প্রকাশিত হয়। দাদাভাই নওরোজী সম্পাদিত 'রাস্ত্ গোফ্তার' ১৮৫১ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ সালেই প্রকাশিত হয় 'আকবর-ই-সওদাগর'।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন সংবাদপত্র ছিল না। ইংরাজী ভাষায় রচিত 'ক্রিসেন্ট' জি. এল. চেট্টির সম্পাদনায় ১৮৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির অত্যন্ত সীমিত প্রচারের জন্য ভারতীয়দের নিরক্ষরতা, অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য যেমন দায়ী ছিল, যেমনই দায়ী ছিল যানবাহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও অনাধুনিকতা এবং সরকারী ডাকমাশুলের মহার্ঘ্যতা। কোলকাতা থেকে একটি সংবাদপত্র ১৮৩২ সালের যেকোন দিন মাদ্রাজ পাঠাতে হলে ডাকমাশুল দিতে হত এক টাকা চৌদ্দ আনা (এক টাকা সাতাশি পয়সা)। লর্ড বেন্টিঙ্ক অবশ্য ডাকমাশুলের হার এরূপভাবে পরিবর্তন করেছিলেন যে, প্রথম চারশ মাইল পর্যন্ত চার আনা (পঁচিশ পয়সা) এবং পরবর্তী যেকোন দূরত্বের জন্য আরও পঁচিশ পয়সা আদায় করা হত।

১৮৬১ সালে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল্স অ্যাক্ট পাশ হলে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা শিক্ষিত ভারতীয় মহলে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। ১৮৬১ সালে বোম্বেতে 'দি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া', ১৮৬৫ সালে এলাহাবাদে 'দি পাইওনীয়র', ১৮৬৮ সালে মাদ্রাজে 'দি মাদ্রাজ মেইল', ১৮৭৫ সালে কোলকাতাতে 'দি স্টেট্সম্যান', ১৮৭৬ সালে লাহোরে 'দি সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' প্রকাশিত হয়।

হেমেন্দ্রকুমার, শিশিরকুমার ও মোতিলাল ঘোষের প্রচেষ্টার ফলে ১৮৬৮ সালে ইঙ্গ-ভারতীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে যশোরে প্রকাশিত হয় 'দি অমৃতবাজার পত্রিকা'। লর্ড লীটনের স্বৈরতন্ত্রী ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বাধানিষেধের নিষ্পেষণ এড়াতে ১৮৭৮ সালে ঐ পত্রিকাটি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রিকার রূপ পরিগ্রহ করে; ১৮৯১ সালে পুরোপুরি দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৭৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি বেঙ্গলী' কোলকাতায় প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালে বীররাঘবাচারি ও অন্যান্য কতিপয় স্বদেশপ্রেমী

ভারতীয়দের সমবেত প্রয়াসে মাদ্রাজে ইংরাজী সাপ্তাহিক 'দি হিন্দু' (১৮৮৯ সাল থেকে দৈনিক) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯০ সালে বোম্বেতে 'দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার' আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৯৯ সালে পাটনাতে ইংরাজী মাসিক পত্রিকা 'দি হিন্দুস্থান রিভিউ' সচ্চিদানন্দ সিংহের ঐকান্তিক প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০০ সালে মাদ্রাজে 'দি ইণ্ডিয়ান রিভিউ' এবং ১৯০৭ সালে কোলকাতাতে 'দি মডার্ন রিভিউ' ইংরাজী মাসিক পত্রিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে 'দি বোম্বে ক্রনিক্‌ল', 'দি মাদ্রাজ স্ট্যাণ্ডার্ড' (পরে নামকরণ হয় 'নিউ ইণ্ডিয়া'), 'সার্ভেন্ট অফ ইণ্ডিয়া', 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' এবং 'দি ইনডিপেণ্ডেন্ট' প্রকাশিত হয়। পরবর্তী দশকে আবির্ভাব ঘটে ইংরাজী দৈনিক 'দি হিন্দুস্থান টাইমস' ও 'দি পীপ্‌ল' ইংরাজী সাপ্তাহিকের। ঐ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ভাবধারা ধীরে ধীরে ভারতে বিস্তার লাভ করতে শুরু করে; অনুরূপ ভাবধারার বাহক পত্রপত্রিকাগুলি নূতন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'ক্রান্তি', 'স্পার্ক', 'নিউ স্পার্ক', 'দি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট', 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট', 'পীপল্‌স ওয়ার', 'ইনডিপেণ্ডেন্ট ইণ্ডিয়া' ইত্যাদি সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি প্রগতিশীল চিন্তাভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

ত্রিশের দশক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে দৈনিক সংবাদপত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পত্রপত্রিকার সংখ্যা দর্শনীয়ভাবে বাড়ে। ও'ম্যালী তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪১ সালে সতেরটি ভাষায় প্রকাশিত ৪০০০ মুদ্রিত সংবাদপত্র ও অন্যান্য নানাবিধ পাক্ষিক পত্রপত্রিকা ভারতে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন আর্থনীতিক গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংঘ এবং জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনে রত ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠী নিজেদের বক্তব্য বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারের জন্য সারা ভারতে বহু পত্রপত্রিকা মুখপত্র হিসাবে গড়ে তোলে।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের প্রগতিশীল ভূমিকা

শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, সাম্রাজ্যবাদ এবং রাজনৈতিক দাসত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মুদ্রাযন্ত্র ভারতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল

এমন নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে **জনমতের বাহক ও সংগঠক** হিসাবেও অনন্যসাধারণ কর্তব্য পালন করেছিল।

জন্মলগ্ন থেকে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র সমাজ সংস্কারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। বোম্বে, কোলকাতা, মাদ্রাজ সর্বত্রই **ভারতীয় সমাজের অমানবিক, অগণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গঠনে মুদ্রাযন্ত্র সহায়তা করেছিল**। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের অনধিকার এবং নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক প্রতিকূল আচরণের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে মুদ্রাযন্ত্র গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্ণব্যবস্থা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও মুদ্রাযন্ত্র নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত সকলেই সমাজসংস্কার আন্দোলনের নীতি, কার্যক্রম ও পদ্ধতি জনসাধারণের এজলাসে উপস্থাপিত করতে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা ও আধুনিক কার্যক্রম ভারতীয় পত্রপত্রিকায় সর্বদা অগ্রাধিকার লাভ করেছিল এমন নয়। প্রতি-ক্রিয়ার শক্তি সর্বদাই ঐরূপ কার্যক্রম বা চিন্তাভাবনার বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল।

রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারে মুদ্রাযন্ত্র অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্কীর্ণ পরিধি, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকারের উপর আক্রমণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ, জমিদার ও কৃষকদের স্বার্থহানি, শোষণ ও অপশাসন, বিচারবিভাগের পক্ষপাতিত্ব ও জাতিবৈরিতা, ভারতীয় ধনিকদের প্রতি প্রতিকূল আচরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনোভাব প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে 'হোমরুল,' স্বরাজ, 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস', স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র ইত্যাদি রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ধ্যানধারণাগুলির পরিচয় ঘটাতেও ঐগুলি বিশেষ ফলপ্রসূ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কালক্রমে ভারত ও বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পরিবেশন ও বিশ্লেষণ, সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের দৈনন্দিন বিবরণ ও মতামত উপস্থাপনা, কংগ্রেস তথা গান্ধীর বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক মতবাদের প্রবক্তা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলির মতবাদ ও কাজকর্ম ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলিতে স্থান লাভ করে জনমতকে রাজনৈতিক সচেতন-

তায় সমৃদ্ধ করেছিল। শহরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে এবং গ্রামে-গঞ্জের মানুষদের সমবেত পঠনে ব্যাপ্তিলাভ করে সংবাদপত্রগুলি ভারতীয় জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জন করেছিল। বর্তমান শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে 'মহাত্মা গান্ধী' বা 'গান্ধী মহারাজের' কার্যকলাপ, ভাবনাচিন্তা, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী কার্যক্রম বা 'লাল ঝাণ্ডার' শ্রমিক সমাবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ সারা ভারতে প্রচার করার সামর্থ ঐগুলি লাভ করেছিল বলা যায়।

সর্বভারতীয় স্তরে রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষাশেষি ভারত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল বলা যায়। বেকারি, বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের বেকারি, সর্বভারতীয় সমস্যার রূপ ধারণ করেছিল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। অস্ত্র আইনের বিধানে ভারতীয়দের নিরস্ত্র করা হয়েছিল। সরকারী চাকুরিতে বাস্তুকার, ডাক্তার প্রভৃতি পদগুলির উচ্চস্থানে ভারতীয়দের অধিষ্ঠান কার্যত নিষিদ্ধ ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা একমাত্র লণ্ডনে গৃহীত হত বলে বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ছাড়া অন্য কোন ভারতীয়ের পক্ষে ঐ পরীক্ষায় বসা অসম্ভব ছিল। লর্ড স্যালিসব্যারির প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এই মর্মে আইন প্রণীত হয় যে, উনিশ বৎসর অতিক্রান্ত হলেই (পূর্বতন ব্যবস্থায় ছিল তেইশ বৎসর) প্রার্থী ঐ পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা হারাবে। আবার, ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতীয়গণ একই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় অনেক রকম বৈষম্যমূলক সরকারী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর শিকার হতেন। বিভিন্ন বিশ্ববিত্যালয়গুলির কৃতকার্য ও অকৃতকার্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র চাকুরির বাজারে নিরাশ হতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে ভারতীয় যুবকদের পক্ষে সরকারী চাকুরির মোহ ছেড়ে স্বাধীন বৃত্তি বা জীবিকার সন্ধানী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বিশেষ করে মেধাবী যুবকেরা ঐরূপ মোহের বন্ধন ছিন্ন করে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা বা সম্পাদনায় এবং শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। বোম্বে, কোলকাতা, মাদ্রাজ, করাচী, লাহোর, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, পাটনা প্রভৃতি শহরগুলির বিখ্যাত পত্রিকাগুলি এঁদের অংশগ্রহণে, অর্থদানে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে জয়যাত্রা শুরু করে। রানাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সি. ওয়াই

চিন্তামণি, গোখেল, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী, জওহরলাল, এম. এন. রায়, জিন্নাহ্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ মুদ্রাযন্ত্রকে নিজেদের রাজনৈতিক মতামত, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি প্রচারের সার্থক বাহন করে তুলতে পেরেছিলেন। বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের মধ্যে আদর্শগত বন্ধন রক্ষা বা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনে আইনী, বে-আইনী পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশে তৎপর হয়েছিলেন।

ধ্যানধারণা মুদ্রিত শব্দের পাখায় ভর করে বিপুল সংখ্যক মানুষের মনোজগতে বিচরণ করে রাজনৈতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অন্দরমহলে প্রবেশ করে। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্র উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলির বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা-ভাবনাকে মুদ্রিত রূপের রথচক্রে স্থাপন করে জনগণমনের প্রান্তরে উপস্থাপিত করে। ঐরূপ চিন্তাভাবনা জনগণের সমর্থনে বিপুল শক্তিধর হয়ে ফ্রান্সে বাস্তিল কারাগারের পতন ঘটায়; সামন্তযুগের অবসান ঘটিয়ে ধনতন্ত্রের অভিষেক সম্পন্ন করে। মুদ্রাযন্ত্রের আশীর্বাদধন্য হয়ে দিদেরো, হলব্যাখ্, হেলভেসিয়াস, রুশো ও ভলটেয়ার প্রমুখ ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা সামন্তযুগে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক অত্যাচার, আর্থনীতিক শোষণ, রাজনৈতিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক জীবনের নিম্নমান এবং নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে তাঁরা জনমত সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহান ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন নেতৃবৃন্দ (মিরাব্যু, ড্যানটন, রোবেসপিয়ের, ম্যারাট প্রভৃতি) সামন্তবাদী সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধে তাঁদের বৈপ্লবিক কার্যক্রমের আয়ুধ প্রধানত মুদ্রিত শব্দের মাধ্যমেই তৈরী করেছিলেন। ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশেও সামন্তবাদের ভিত্তি দুর্বল করে তুলতে উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলি মুদ্রাযন্ত্রের প্রভূত সহায়তা লাভ করেছিল। আর্থ-সামাজিক জীবনের বনিয়াদের উপর নির্ভরশীল গণচেতনার একটি স্তরে মুদ্রণশিল্পের জন্ম হয়েছিল। আবার, এই মুদ্রণশিল্প গণচেতনাকে দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে ঠেলে দেয়। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি অগ্রগমনের পথপরিক্রমায় রত হয়।

মুদ্রাযন্ত্র ভারতে বৈপ্লবিক তাৎপর্য নিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল বলা যায়। মূঢ়, মূক ম্লান মুখে রাজনৈতিক ভাষা সরবরাহ করতে মুদ্রাযন্ত্র অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সংক্রান্ত সকল

ধরনের সংবাদ এবং ঐগুলি সম্পর্কে মতামত ছেপে ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি জনচেতনার মানোন্নয়নের বৈপ্লবিক দায়িত্ব পালন করে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদিযুগের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ পত্রপত্রিকা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জঙ্গী জাতীয়তা-বাদের প্রবক্তারা ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে স্বদেশপ্রেম ও যুগোপযোগী ধ্যানধারণার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ, নওরোজী, রানাডে, গোখেল, চীপলঙ্কর, ফিরোজশাহ্ মেহ্তা, তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ, গান্ধী, মতিলাল নেহ্রু, সুব্রাহ্মনীয় আয়ার, বীররাঘবাচারি ভারতীয় সংবাদপত্র জগতকে যৌবনদৃপ্ত করে তোলেন।

পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রগতিশীল বিদেশী মতবাদসমূহ ভারতীয় পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত রূপ ধারণ করে শিক্ষিত ভারতীয়দের মতামতের উপর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। কূপমণ্ডুকতায় আবিল সমকালীন ভারতীয় চিন্তাকে পত্রপত্রিকা মহাসাগরের সন্ধান দেয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বেই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠনের রূপরেখা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্কে ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি প্রবৃত্ত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক কাঠামোর ভালমন্দ নিয়ে বহু পত্রপত্রিকায় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। হিউম বা ওয়েডারবার্ন প্রমুখ ইংরাজদের উদার শুভেচ্ছায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি; ইংরাজী শিক্ষার যাদুমন্ত্রে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেনি। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে জর্জরিত ভারতবাসী আত্মরক্ষার সংগ্রামী প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়ে, আলাপ-আলোচনায় লিপ্ত হয়ে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন। ঔপনিবেশিক অর্থ-নীতির রাজনৈতিক সূতিকাগৃহে নবজাতক ঐ সংগঠনের আবির্ভাব ঘটেছিল। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মানসপুত্র হিসাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সংযোগব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বস্তুগত ভিত্তি রচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বিশেষ করে ভারতীয় সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা ঐ ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিল। গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আশীর্বাদ ললাটে

ধারণ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভূমিষ্ঠ হয়েছিল বলে জনৈক আমেরিকান গবেষক মন্তব্য করেছেন।[17]

পরবর্তীকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী গোষ্ঠীগুলি সম্মেলন, সভাসমিতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয় সাহায্য গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান, আদর্শগত প্রচারকার্য পরিচালনা ইত্যাদি সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ গান্ধীর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজটির ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে সারা ভারতের কংগ্রেস সদস্য ও সমর্থকেরা নেতৃত্ব ও নির্দেশের জন্য ঐ কাগজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। অনুরূপভাবে জাতীয়তাবাদী অন্যান্য গোষ্ঠী বা দলগুলিও কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে নিজেদের বক্তব্য সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে প্রচারের জন্য মুখপত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আবার, ছাত্র, শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যে **মতাদর্শগত প্রচারের বাহন** হিসাবেও পত্রপত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। মুদ্রাযন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতির খবর, বক্তৃতা, আলাপ-আলোচনা, দেশীয়-বিদেশীয় সংবাদ, প্রস্তাব ইত্যাদি নিয়মিত ছেপে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক জীবন ও চেতনা সম্ভব করে তুলেছিল।

মুদ্রাযন্ত্র বিভিন্ন প্রদেশগুলির বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীগুলির সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বহু রকমের সংবাদ পরিবেশন করে আন্তপ্র্রাদেশীয় ভাবধারার মিলন ও সমন্বয়ের রূপকার হিসাবে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন প্রদেশের জনজীবনের নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের একঘেঁয়ে, সমরূপ নিষ্পেষণে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। রাজনৈতিক একতার মাঝে ভারতীয় জনজীবনের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের চিত্রটি ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে জনমানসে মুদ্রিত হতে থাকে। ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি ভৌগোলিক ব্রিটিশ ভারতের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর বিচিত্র সংস্কৃতির সমাবেশের মধ্যে **সমরূপ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিগন্তে** স্বাধীন ভারতের আবির্ভাবের লগ্ন প্রত্যক্ষ করেছিল।

তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ নিজেদের মাতৃভাষায় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে স্বস্ব প্রদেশের জনসাধারণের

ব্যাপক অংশের সঙ্গে রাজনৈতিক সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হন। দেশীয় ভাষায় রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ধারাটি তাঁদের সচেতন, সযত্ন প্রয়াসে ক্রমশ দীর্ঘতর হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রাদেশিক সংবাদ-পত্র, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রকাশ করে নিজেদের **মতাদর্শের সপক্ষে গণ-ভিত্তি** রচনায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলি ঐরূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিতে **প্রাদেশিক সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে থাকে।** আন্তপ্র'াদেশিক অনুবাদে বিভিন্ন প্রাদেশিক কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকদের রচনা প্রকাশিত হয়। নির্দিষ্ট কোন প্রদেশের সাহিত্য প্রাদেশিক সীমাবদ্ধতায় সঙ্কুচিত না থেকে সর্বভারতীয় সাহিত্যের অংশীদার হয়ে ওঠে। কিষাণচন্দর, প্রেমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ভাল্লাথোল শিক্ষিত সকল ভারতীয়দের ঔপন্যাসিক বা কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জন্মলগ্ন থেকেই লড়াই করতে অভ্যস্ত হয়ে ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র ক্রমে ক্রমে সংগ্রামী চরিত্র অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী মুদ্রাযন্ত্রের উপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেছিলেন। হেস্টিংস ১৮১৮ সালে ঐরূপ বাধানিষেধ প্রত্যাহার করে নিলে ভারতীয় কয়েকটি ভাষায় সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করেছিল। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল অ্যাডাম ১৮২৩ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে রামমোহন রায় ও তাঁর সমতাবলম্বীরা শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে মেট্‌কাফের অস্থায়ী কার্যকালে ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহৃত হওয়ার পর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ কিছুটা স্বস্তির সময় অতিবাহিত করেছিল। ১৮৫৭ সালের ছাপাখানা আইন ছাপাখানাগুলির উপর নানারূপ সরকারী নিয়ন্ত্রণ চালু করে এবং মুদ্রিত পুস্তক বা পত্রপত্রিকার প্রচার বন্ধ করে দেবার অধিকার সরকারের উপর ন্যস্ত করে। ১৮৬৭ সালে 'প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অফ বুক্‌স অ্যাক্ট' পুস্তক, সংবাদপত্র ইত্যাদি মুদ্রণ ও প্রকাশের উপর নানারূপ নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই সময়ে ভারতীয় পত্রপত্রিকাগুলি জাতীয়তাবাদের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে সরকারী কাজকর্মের নির্ভীক

সমালোচনায় অংশগ্রহণ করছিল বলে ঐগুলির কণ্ঠরোধ করার ব্যবস্থা করা হয়। দমনপীড়ন সত্ত্বেও এক দশকের মধ্যে ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ প্রতিবাদের ক্ষীণকণ্ঠকে উচ্চগ্রামে তুলতে সমর্থ হয়। ১৮৭৮ সালে লর্ড লীটন 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' চালু করে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সরকার-বিরোধী মতামত স্তব্ধ করে দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঐ আইন পাশ হলে প্রতিবাদের আওয়াজ গর্জে ওঠে। ১৮৮২ সালে ঐ আইন লর্ড রিপনের আমলে রদ হয়। প্রথম বঙ্গভঙ্গের পর থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে সংবাদপত্রগুলি স্বদেশপ্রেমিক কর্তব্য পালনে কর্মমুখর হয়ে ওঠে। শব্দব্রহ্মের আঘাতকে দমনপীড়নের প্রত্যাঘাতে ফিরিয়ে দিতে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠতে থাকে: ১৯০৮ সালে পাশ হয় সংবাদপত্র (অপরাধে উস্কানিদান) আইন, আর ১৯১০ সালে বিধিবদ্ধ হয় মুদ্রাযন্ত্র আইন। দ্বিতীয় আইনটি দমনপীড়নের অন্যতম চরম নিদর্শন হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। একটি ভারতীয় হাইকোর্টের ইংরাজ বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিংস দ্বিতীয় আইনটির চার নম্বর ধারার সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, উক্ত ধারার কৌশলপূর্ণ বয়ানের সুযোগে যে-কোন রচনা বেআইনী ঘোষণা করা যেত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণকারী আইনগুলির বিরুদ্ধে সারা দেশে জাতীয়তাবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠলে ১৯২২ সালে 'প্রেস ল রিপিল অ্যাণ্ড অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট' পাশ করে ঐ আইনগুলি রদ করা হয়।

কিন্তু ১৯২৯ সাল নাগাদ জাতীয় আন্দোলন তীব্রতা লাভ করলে ঔপনিবেশিক সরকার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ধ্বংস করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে 'দি ইণ্ডিয়ান প্রেস ইমারজেন্সি পাওয়ার্স অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়; ১৯৩২ সালে ঐ আইনকে সংশোধিত করে আরও বেশী স্বৈরতন্ত্রের চরিত্রানুগ করা হয়। সংশোধিত আইন এমন বিচিত্র রূপ ধারণ করেছিল যে, নরমপন্থী সংবাদপত্র থেকে সন্ত্রাসবাদী রচনা পর্যন্ত যেকোন মুদ্রিত বিষয়বস্তু বাজেয়াপ্ত করা যেত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মাত্রা সরকারের নির্ধারণের এক্তিয়ার-ভুক্ত করে তোলা হয়েছিল। ১৯৩২ সালের 'ফরেন রিলেশান্স অ্যাক্ট' ও ১৯৩৪ সালে 'ইণ্ডিয়ান স্টেট্স অ্যাক্ট' ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রায় বিনষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছিল।

ভারতীয় জনমত উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ঔপনিবেশিক আমলের

শেষ পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে লিপ্ত থেকে সংগ্রামী চরিত্র অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল অ্যাডামের শাসনকালে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ সংঘটিত হলে যে প্রতিবাদলিপি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ ব্যানার্জী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের স্বাক্ষর বহন করে সুপ্রীম কোর্টে প্রেরিত হয়েছিল তা-ই এক শতাব্দীর অধিককাল দৃষ্টান্ত হিসাবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত ভারতীয়দের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ঐ প্রতিবাদলিপি মিস সোফিয়া কোলেটের ধারণায় ভারতীয় ইতিহাসে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'-র মর্যাদা লাভের যোগ্য।[18]

ভারতীয় সংবাদপত্র জগৎ নানা দিক থেকে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের প্রতিকূল ক্রিয়াকলাপে জর্জরিত ছিল। রয়টার্স ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সেবাদাস হয়ে বিদেশী ও ভারতীয় সংবাদ পরিবেশনে সাধুতার আদর্শ বিসর্জন দিয়েছিল। জঙ্গী ও বিপ্লবী রাজনৈতিক আদর্শ বা আন্দোলন সংক্রান্ত রচনা ও সংবাদ সংগ্রহের উপর নিষেধাজ্ঞা বাণিজ্য শুল্কনীতির মাধ্যমেও কার্যকর করা হত। বিভিন্ন রকম সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের উপর নানা ধরনের বাধানিষেধ প্রচলিত ছিল। অল ইণ্ডিয়া জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, অল ইণ্ডিয়া এডিটার্স কনফারেন্স, প্রগ্রেসিভ রাইটার্স কনফারেন্স, অল ইণ্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন, শ্রমিক, কৃষক, মহিলা ও ছাত্র সংগঠনগুলি এবং কংগ্রেসী, সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী সকলেই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক অভিমতের বর্ণালীতে ভারতের পত্রপত্রিকা

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে প্রচলিত সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকাগুলি তথ্য পরিবেশন ও বক্তব্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ শ্রেণীস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত ছিল।

'দি স্টেট্‌সম্যান', 'দি টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া', 'দি পাইওনীয়র', 'দি সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' এবং 'দি মাদ্রাজ মেইল' প্রভৃতি পরিচিত সংবাদ-পত্রগুলি সাধারণভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থন করত। আবার, এগুলির মধ্যে 'দি পাইওনীয়র' ভূমিমালিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষায় বিশেষ-ভাবে নিযুক্ত ছিল, 'দি মাদ্রাজ মেইল' ইউরোপীয় বাণিজ্যিক স্বার্থের রক্ষক

হিসাবে ভূমিকা পালনে রত ছিল। 'দি সিভিল অ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' ব্রিটিশ রক্ষণশীল মতামতের বাহন হয়ে উঠেছিল।

জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুলির অধিকাংশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। অবশ্য এই সমর্থনের মাত্রা ও গভীরতার তারতম্য ছিল। 'দি হিন্দু', 'দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্মার', 'দি মডার্ন রিভিউ' প্রভৃতি পত্রপত্রিকা-গুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারার উদারনৈতিক ধারার অনুসারী ছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কার্যক্রম সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে উপস্থাপিত করার কাজে এগুলি ব্যাপৃত ছিল বলা যায়। আবার, 'দি অমৃত-বাজার পত্রিকা', 'দি বোম্বে ক্রনিক্‌ল', 'দি বোম্বে সেন্টিনেল', 'দি হিন্দুস্থান টাইম্‌স', 'দি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড', 'দি ফ্রি প্রেস জার্নাল', 'ন্যাশনাল হেরাল্ড', 'ন্যাশনাল কল্‌' প্রভৃতি ইংরাজী দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলি ব্যবহার করে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের বার্তা ব্যাপক সংখ্যক ভারতীয়দের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সাগ্রহ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিলক, অরবিন্দ প্রমুখ প্রথম সারির জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মত শুধুমাত্র ইংরাজী ভাষার মাধ্যম ব্যবহারে তৃপ্ত না হয়ে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক সাংবাদিকতা গড়ে তুলতে জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'দি কেশরী', 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি কাগজগুলি জনগণের মধ্যে স্বদেশী রাজনীতির শিক্ষা পৌঁছে দেবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তিলকের মারাঠী ভাষার পত্রিকা 'দি কেশরী' ভারতীয় সাংবাদিকতা তথা মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক তাৎপর্যের অধিকারী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দু'তিনটি দশকে প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে প্রকাশিত পত্রপত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'জনশক্তি' ইত্যাদি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়ে বাঙালী সমাজের সংবাদতৃষ্ণা মেটাতে থাকে। অনুরূপ ভূমিকা মারাঠীদের ক্ষেত্রে পালন করে 'লোকমান্য', 'নবকল', 'কির্লো-সকর' ইত্যাদি এবং গুজরাটিদের ক্ষেত্রে 'বোম্বে সমাচার', 'জন্মভূমি',

'হিন্দুস্থান' ও 'প্রজামিত্র'। মালয়ালম ভাষায় 'মাতৃভূমি', তামিল ভাষায় 'স্বদেশমিত্রম' দক্ষিণ ভারতের মানুষের রাজনৈতিক সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটায়।

হিন্দী ভাষায় বিশিষ্ট কয়েকটি পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ঘটে: 'আজ', 'সৈনিক', 'বিশ্বামিত্র', 'বীর অর্জুন' ইত্যাদি। উর্দুতে প্রকাশিত হয় 'ইত্তেহাদ', 'আজমল,' 'তেজ', 'খিলাফৎ', 'রিয়াসৎ', 'আল্ জামিয়াত মদিনা', ইত্যাদি।

হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ ক্রমে ক্রমে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে উঠলে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলির মুখপত্রগুলি সাম্প্রদায়িক বিষ পরিবেশনের পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। 'আন্জাম', 'যুঙ্', 'মন্সুর', 'ইন্কিলাব', 'নওয়া-ই-ওয়াক্ত', 'পইসা আকবর', 'জমিন্দার', 'হাম্দম', 'আস্‌রে জাদিদ' ইত্যাদি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়ে সারা ভারতে মুসলিম লীগের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিল। অনুরূপ ভূমিকা পালনে রত ছিল দিল্লী থেকে ইংরাজীতে প্রকাশিত 'ডন্' ও কোলকাতা থেকে বাংলায় প্রকাশিত 'আজাদ' ও ইংরাজীতে প্রকাশিত 'স্টার অফ ইণ্ডিয়া'। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের হাতিয়ারের সংখ্যাও কম ছিল না, কিন্তু লক্ষণীয় যে, ত্রিশের দশকের শেষ দিকে কংগ্রেস-সমর্থক সংবাদপত্রগুলির তুলনায় মুসলিম লীগ-সমর্থক সংবাদপত্রগুলির সংখ্যা ও প্রচার অনেক বেশী ছিল।[19]

চল্লিশের দশকের গোড়ায় ভারতে প্রধানত তিনটি সংবাদসংস্থা কর্তব্যরত ছিল: 'রয়টার্স', 'অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস' ও 'ফ্রি প্রেস নিউজ সার্ভিস'। শাসন কর্তৃপক্ষ প্রথম দুটির গ্রাহক স্বত্ব গ্রহণ করেছিল এবং সরকারী সংবাদ ঐ দুটির মাধ্যমেই প্রচারিত হত। রয়টার্স ১৮৬০ সালে ভারতে সম্প্রসারিত হয়, আর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। ১৯২৭ সালে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রয়াসে 'ফ্রি প্রেস নিউজ সার্ভিস' প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ সংগ্রহ ও বণ্টনে এই সংস্থা ব্যাপৃত হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া স্থাপিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্যে উৎসাহিত ও সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ভারতীয়গণ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নিজস্ব ভূমিকার সংজ্ঞা জনগণের দরবারে পেশ করার প্রয়োজনে তাঁরা বেশ কয়েকটি পত্রপত্রিকা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এম. জি. দেশাই

সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'স্পার্ক' এবং লেস্টার হাচিনসন সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নিউ স্পার্ক', ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' ও কিছু পরবর্তীকালের 'পীপল্‌স ওয়ার', কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সাপ্তাহিক 'দি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট' ইত্যাদি পত্রপত্রিকা সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী ধ্যানধারণা প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক বহু গোষ্ঠী (জমিদার, শিল্পপতি, শ্রমিক, কিষাণ ইত্যাদি) এবং মহিলা, ছাত্র, অনুন্নত সামাজিক গোষ্ঠীগুলি নিজস্ব মতামত ও কার্যক্রম প্রচারের স্বার্থে পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছাত্রসমাজের মুখপত্র দুটি পত্রিকার নাম ছিল 'স্টুডেন্ট' ও 'সাথী'।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সাযুজ্য রচনা করে ভারতের পত্রপত্রিকাগুলি ক্রমশ আর্থনীতিক শ্রেণীগুলির স্বার্থবহ মতামত প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে। শ্রেণীদ্বন্দ্ব পত্রপত্রিকাতে প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, সাধারণ শত্রু হিসাবে বিরাজিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় শ্রেণীগুলির পত্রপত্রিকাসমূহ সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ ভারতে সাংবাদিকতা স্বদেশপ্রেমী, প্রতিভাবান সম্পাদকদের পরিচালনায় উত্তরোত্তর জাতিগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়। পত্রপত্রিকাগুলির রাজনৈতিক মতামত অবশ্যই শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে প্রভাবিত হয়েছিল, কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, আর্থনীতিক উন্নয়ন ইত্যাদি কতগুলি দাবিতে ভারতীয় সংবাদপত্রজগৎ ঐক্যমত হতে পেরেছিল।

রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, দাদাভাই নওরোজী, ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীররাঘবাচারি, বাল গঙ্গাধর তিলক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, হর্নিম্যান, অ্যানি বেসান্ত, মোতিলাল নেহ্‌রু, হজরৎ মোহানি, কে. এম. পানিক্কর, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, লেস্টার হাচিনসন, এম. জি. দেশাই, এম. এন. রায়, এস. এ. ডাঙ্গে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিদের পরিচালনায় ভারতীয় সাংবাদিকতা জনচেতনার মানোন্নয়ন সাধনে দর্শনীয় সাফল্য লাভ করেছিল।

৭ ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সমরূপ সংবদ্ধতা

ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র

ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতিতে ভারতে কর্মদক্ষ, কেন্দ্রীভূত, আধুনিক একটি শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই শাসনব্যবস্থা কখনো আদর্শ গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। কেননা, আব্রাহাম লিঙ্কনের 'জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের সরকারের' আদর্শ গণতান্ত্রিক রূপকল্পের বিশেষ কোন লক্ষণ ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের চরিত্রকে সমৃদ্ধ করেনি। সর্বদাই এই সরকার এক জাতির উপর অন্য জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। ব্রিটিশ জাতির স্বার্থ ও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই সরকার সর্বদা তৎপর থেকেছে; ভারতীয় জনগণের মঙ্গলের চিন্তা করা হয়নি এমন নয়, তবে ঐ চিন্তা প্রথম দু'টি উদ্দেশ্যের তুলনায় কম গুরুত্ব লাভ করেছে—কখনো অগ্রাধিকার পায়নি।

একথা অনস্বীকার্য যে, ব্রিটিশ জাতির স্বার্থে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। মুদ্রা ও শুল্ক ব্যবস্থা নানা ধরনের কৌশল অবলম্বনে ভারতীয় স্বার্থের ক্ষতি করে ব্রিটিশ স্বার্থের সেবাদাসে পরিণত হয়েছিল।[1] ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের সামরিক, অ-সামরিক বিভাগগুলির উচ্চপদগুলি ব্রিটিশদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। তাঁদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার আর্থিক দায় মেটাতে উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব ও কর আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনগণের অর্ধাংশেরও বেশীর ভাগ (অনেকের মতে, তিন-চতুর্থাংশ) লোক দরিদ্রতম জীবনযাপন করতেন।[2] মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্রিটিশ আমলে খেতে না পেয়ে মৃত্যুর শিকার হয়। নীল ও চা উৎপাদক ব্রিটিশ 'রেগি হাণ্টারের দল' রঙ্ ও 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ির' প্রলোভনে স্বজাতীয় প্রশাসকদের যোগসাজসে ভারতীয় জনসাধারণের উপর বর্বর অত্যাচার ও শোষণ কায়েম করেছিল। যে-কোন ধরনের অপরাধে অপরাধী ব্রিটিশের পক্ষে ভারতে বেকসুর খালাস

পাওয়ার অধিকার কার্যত বলবৎ হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের এই কলঙ্ক কোনদিন মুছে যাবার নয়।

শোষণ, অত্যাচার, জাতিবৈরিতা ও কলঙ্কের কালিমাযুক্ত ব্রিটিশ শাসন, ঐতিহাসিক দিক থেকে, ভারতে ঐক্যবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত, কর্মদক্ষ একটি প্রশাসনিক যন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে ব্রিটিশ শাসন ইতিহাসের মনোনীত হাতিয়ারের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ঐক্যের প্রকৃতি

ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে ভারতে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি এমন নয়। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর, শাহ্‌জাহান, ঔরঙ্‌জেব প্রমুখ সম্রাটদের আমলে সমগ্র ভারতকে একটি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করার দৃঢ় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। মোগল সম্রাটেরা ভারতের ভৌগোলিক এলাকার বৃহত্তর অংশকে মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভারতীয় জনসাধারণকে দৃঢ় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বন্ধনে সংবদ্ধ করতে সক্ষম হননি। ভারতের জনসংখ্যার বিপুল অংশ গ্রাম-ভারতের বাসিন্দা ছিল। লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ সম্প্রদায় গ্রাম-ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বয়ংশাসিত জীবনের নিশ্চয়তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রামীণ জন-সাধারণকে সংবদ্ধ রেখেছিল। গ্রামগুলি বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুন অনুসরণ করে সভা, পঞ্চায়েত ইত্যাদির মাধ্যমে আইন রচনা, শাসন পরিচালনা ও বিচারকার্য নির্বাহের দায়িত্ব পালন করত। আর্থনীতিক বা রাজনৈতিক সাধারণ কোন সংযোগসূত্রে গ্রথিত না হয়ে এক-একটি গ্রামীণ সম্প্রদায় স্বয়ংশাসিত সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। সম্রাট, বাদশাহ্‌, রাজা, নবাবদের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা মোটামুটি ভূমিরাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতে কখনো বিনষ্ট হয়নি।

ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন অবিরাম ঘটেছে; আক্রমণের পর আক্রমণ অব্যাহত গতিতে সংঘটিত হয়েছে; বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ রাজশক্তিকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে এবং পর্বতসঙ্কুল অঞ্চল অতিক্রম করে বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ

করেছে। কিন্তু ঘোর দুর্দিনেও স্বয়ংশাসিত গ্রামীণ সম্প্রদায় নোঙরের নৌকার মত বাধাবিপত্তির উত্তাল জলরাশিকে উপেক্ষা করে ভাসমান থেকেছে।[৪] শেষ পর্যন্ত বিদেশী বণিক জাতির মানদণ্ড ইতিহাসের দৈবচক্রে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হবার কিছুকাল পরেও গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

ইউরোপে সমরূপ ও ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা জাতীয় অর্থনীতি, দ্রুত এবং কর্মদক্ষ যানবাহন ও যুগোপযোগী গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশের সম্মিলিত প্রভাবে জন্মলাভ করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগেও ভারতে সংবদ্ধ ও সমরূপ কোন জাতীয় অর্থনীতি ছিল না। সামন্তবাদী সম্পর্কভিত্তিক, আঞ্চলিক বিভাগে খণ্ড-ছিন্ন ভারতীয় আর্থনীতিক জনজীবন সমরূপ ও সংবদ্ধ অর্থনীতির সন্ধান না পেয়ে ছন্নছাড়া অবস্থায় স্থবির হয়ে কালযাপন করছিল। পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার মান আদিম অবস্থায় অধঃপতিত ছিল। এরূপ অবস্থায় ভারতের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির পক্ষে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আর্থনীতিক জনজীবনকে পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে, প্রশাসনিক যোগসূত্রে যূথবদ্ধ করে জাতীয় অর্থনীতির বনিয়াদ রচনা করা সম্ভব ছিল না। আবার, জাতীয় অর্থনীতির অভাবহেতু রাজশক্তির পক্ষে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক ঐক্য গড়ে তোলাও অসম্ভব ছিল।

ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারত একটি অখণ্ড সত্তা হিসাবে বিরাজ করেছে দীর্ঘকাল। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের **রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে** ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুরূপ ঐক্য, কেন্দ্রিকতা ও সর্বত্র দৃশ্যমান উপস্থিতির অস্তিত্ব ছিল না। ভারতীয় রাষ্ট্র যুদ্ধ, শান্তি, রাজস্ব সংগ্রহ, মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা ইত্যাদি কয়েকটি কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রের উপস্থিতি জনজীবনের অতি সীমিত ক্ষেত্রে অনুভূত হত।

সমরূপ প্রশাসনিক ঐক্যের উদ্ভব

ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম প্রধান একটি সুফল হিসাবে সারা ভারতের প্রশাসনে সমকালীন ইউরোপীয় মানবিক ধ্যানধারণা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার প্রয়োগ সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে।[৫] কলা ও বিজ্ঞানের উচ্চতর শাখাগুলিতে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা, কারাগার সংক্রান্ত সংস্কার, কিশোর অপরাধীদের প্রতি সহৃদয় আচরণ, মধ্যযুগীয় বর্বর নিষ্ঠুরতার অবসান, ক্রীতদাস প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিলোপ, আদিম উপজাতিগুলির

উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম মানবিক ধ্যানধারণা প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়। আর, দুর্ভিক্ষের সময় উন্নত ধরনের ত্রাণব্যবস্থা, সড়ক, রেল, স্টীমার, টেলিগ্রাফ, সুলভ ডাকব্যবস্থা জলসেচের আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বনাঞ্চলের বিকাশ ও সংরক্ষণকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার আধুনিক আবিষ্কারগুলি প্রয়োগের উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা যায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সারা ভারতের প্রশাসনে **মানবধর্মিতা ও বিজ্ঞানধর্মিতার আদর্শ** রূপায়িত করতে সচেষ্ট হয়ে **ধারণাগত দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ একটি শাসনব্যবস্থা** গড়ে তুলেছিল।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে **আইনের শাসন** প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরূপ শাসন ভারতে অজ্ঞাত ছিল এমন নয়। কিন্তু সম্ভবত ব্রিটিশ শাসনকালেই একমাত্র এরূপ শাসন ব্যাপকতম প্রয়োগে সার্থক হয়েছিল।[5] উচ্চপদস্থ ব্যক্তি থেকে শুরু করে দরিদ্রতম ভারতীয় পর্যন্ত সকল ব্যক্তি এক রকম আইনের আওতায় বিচারলাভ করতেন। শাসনকর্তৃপক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির খেয়ালখুশি ইত্যাদির দিকে দৃকপাত না করে বিচারকের পক্ষে আইনের বিধানে রায়দান করা সম্ভব ছিল।

আইনের শাসনের সঙ্গী হিসাবে **আইনের চোখে সাম্যের আবির্ভাব** ঘটেছিল।[6] এই বৈশিষ্ট্যটি ভারতের বিচারব্যবস্থায় পূর্বে কখনো ছিল না। বর্ণব্যবস্থার নিগড়ে বাঁধা হিন্দু বিচারব্যবস্থা বা ইসলামীয় রাষ্ট্রের ধারণা এই বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবে প্রতিবন্ধকতা করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আইনের শাসন বা আইনের চোখে সাম্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বৈষম্যবিহীন-ভাবে ব্রিটিশ ভারতে প্রযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয়গণ ভারতীয়দের তুলনায় অনুকূল পক্ষপাতপূর্ণ বিচারের অধিকারী ছিলেন।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনের সর্বত্র প্রসারিত হয়ে **ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের আদর্শ** প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দু বা মুসলমান শাসনের যুগে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যক্তিস্বাধীনতা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে ঔদাসীন্যের সমার্থক করে তুলেছিল।[7] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় কিছু কিছু অনাচারের বিরুদ্ধে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ ঐ কর্তৃপক্ষ পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব রক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হয়ে ভারতের ধর্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সরকারী কর্মোদ্যোগ বন্ধ করে দেওয়া শ্রেয়,

মনে করে। ব্রিটেনের ধনতন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'তিনটি দশকে সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হলে ঐ দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের জোয়ারে ভাঁটার টান শুরু হয়ে যায়। ভারতীয় জনজীবনের সামাজিক উন্নতির জন্য প্রয়াসী হওয়ার চেয়ে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধান করে শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখা ঐ শ্রেণীর পক্ষে বেশী জরুরী হয়ে পড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ঐ শ্রেণীকে ভারতীয় ধর্মগুলি সম্পর্কে সতর্ক দূরত্বে অবস্থানের নীতিতে আস্থাবান করে তুলেছিল। সরকারী কর্মকাণ্ড ও ধর্মীয় জগতের সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিচ্ছেদ সমকালীন ভারতে কাম্য ছিল কিনা তা আজও বিচার-বিতর্কের বিষয়; কিন্তু যা সন্দেহাতীত তা হল এই যে, ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের ব্রিটিশ ভাবধারাপুষ্ট আদর্শটি প্রাচীন ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক আদর্শের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েও, দীর্ঘকাল ভারতীয় পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে, ভাবীকালের স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শে পরিণতি লাভ করে।

ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ শাসন, ঔপনিবেশিক স্বার্থে হলেও, বৈজ্ঞানিক রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল।[8] ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার তারতম্য সত্ত্বেও ভূমিরাজস্বের নির্দিষ্টতা, নির্ধারণের পদ্ধতি, আদায়ের প্রণালী ইত্যাদি ব্যাপারে ভারতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের সাথে সাথে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় একটি ঐক্য গড়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে প্রশাসনিক উৎকর্ষ এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যা ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইতিহাসের কোন যুগে প্রত্যক্ষ করা যায়নি।[9] ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে, স্বীকৃত সাধারণ কতগুলি ন্যায়ানুগ নীতির ভিত্তিতে প্রশাসন পরিচালনার কৃতিত্বে ব্রিটিশ শাসন উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভারতের গভর্নর জেনারেল ইচ্ছা প্রকাশ করলেও আইনের বিধান ছাড়া বা নির্দিষ্ট ব্যক্তির লিখিত আদেশ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা বা কারাগারে প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। 'হেবিয়াস কর্পাস'-এর অধিকার সারা ভারতে বর্তমান ছিল। অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর, ঔরংজেবের মত নরপতিরা নিশ্চয়ই শুনলে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়তেন যে, তাঁদের মুখের কথাতে যে-কোন ব্যক্তির কারাগারে গমন বা মৃত্যুবরণ অবশ্যম্ভাবী নয়।[10] ব্যক্তি-নিরপেক্ষ প্রশাসনের ঐতিহ্যটিকে বংশপরম্পরায় ব্রিটিশ প্রশাসকেরা ভারতে গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য

অর্জন করে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কৃতী ছাত্ররা ভারতের প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। ঔপনিবেশিক পরিবেশে হিতবাদী দর্শন বা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের শিক্ষাকে দরিদ্র, নিরন্ন, অশিক্ষিত, বাদামী রঙের ভারতবাসীর জীবনের উন্নতি ঘটাবার 'বিধি-নির্দিষ্ট' কাজে তাঁরা ঐকান্তিক-ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। শুধুমাত্র সাদা মানুষের বোঝা বইতে তাঁদের একমাত্র আগ্রহ ছিল এমন নয়, মোটা বেতনের প্রলোভনেও তাঁরা অনাগ্রহী ছিলেন না! ব্রিটিশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, হাইকোর্টের বিচারপতি, জেলা জজ, কালেক্টর, কমিশনার, উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার প্রভৃতি পদাধিকারী ব্যক্তিরা যোগ্যতা, সততা ও নিরপেক্ষতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বজায় রেখে এমনভাবে শাসন, বিচার ও আইনবিভাগীয় দায়দায়িত্ব পালন করেছিলেন যে, তাঁদের অধস্তন ভারতীয়রাও তাঁদের ভাবাদর্শে সরকারী দায়দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[11] কালক্রমে ক্রমশ এমন একটি মজবুত প্রশাসনিক যন্ত্র তৈরী হয়েছিল যা যেকোন বিশিষ্ট ব্যক্তি-নিরপেক্ষ থেকেও অনায়াসে ক্রিয়াশীল থাকত। টেনিসনের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি—'মানুষ আসে, আবার চলেও যায়, কিন্তু আমি অস্তিত্ব বজায় রাখি চিরকাল'—ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রশাসনের ক্ষেত্রে অতি সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। ইস্পাত সদৃশ কাঠিন্যে ঐ প্রশাসন পরিচিত ছিল, ঐ কাঠিন্যকে নমনীয় করার ক্ষমতা বাস্তব ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল, এমন কি ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভারও ছিল বলে মনে হয় না। এই **ইস্পাতকঠিন যন্ত্রটি** সমগ্র ভারতে সচল থেকে প্রশাসনিক সমতা এনে ভারতীয় ঐক্যের একটি নূতন দিক উন্মোচিত করেছিল।

এরূপ যান্ত্রিক ক্রিয়াশীলতায় সমৃদ্ধ প্রশাসন অবশ্য ত্রুটিমুক্ত ছিল না। ব্রিটিশ আই. সি. এস্. অফিসার স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথ্‌স্ নিজেই কবুল করেছেন যে, এরূপ প্রশাসন 'জনগণের অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা ও আশা-আকাঙ্খার নূতন নূতন দাবিদাওয়ার প্রতি অসংবেদনশীল' ছিল।[12] তাছাড়া, তিনি 'একেবারে অসত্য নয়' বলে কিছুটা স্বীকার করেছেন যে, ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন 'বিবেক-নির্দেশিত দূরত্ব' বজায়ে আগ্রহী আমলা তৈরী করত এবং স্বভাবতই এই আমলারা বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য ও সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। স্থানীয় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা, অনুভূতি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কবিহীন, ব্রিটিশ স্বার্থের অনুকূল, দৃঢ়,

দক্ষ, দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রশাসনের বন্ধনে সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সফল হয়েছিল।

সমগ্র ভারতে **উচ্চশিক্ষা ও সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী** ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় উপমহাদেশে ঐক্যবদ্ধ, সুষম প্রশাসনের ধারণাটির বাস্তব ভিত্তি রচনা করে। **সুলভ ডাক, রেল ও তার-ব্যবস্থা, বেতার, প্রাচীন সড়ক সংস্কার, নূতন সড়ক নির্মাণ, বিমানপথ সৃষ্টি** ইত্যাদি কার্যক্রম ঐ ভিত্তির উপরে সমগ্র ভারতকে **যানবাহন ও গণজ্ঞাপন** ব্যবস্থার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে প্রশাসনিক ইমারত গড়ে তুলেছিল। ঐরূপ ঐক্য ব্রিটিশপূর্ব ভারতের ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি।

প্রশাসনিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভিত্তি ও ইমারত যে শক্ত মাটির উপর দণ্ডায়মান ছিল তা ঔপনিবেশিক আমলে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা নূতন সামাজিক অর্থনীতি ছাড়া আর কিছু নয়। টাকাকড়ি-ভিত্তিক আর্থনীতিক ব্যাপক লেনদেন প্রবর্তন করে, ভূমিব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানা সৃষ্টি করে এবং ঐ ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনসংক্রান্ত সারগ্রন্থ, বিচারব্যবস্থা, ক্রয়-বিক্রয়-বন্ধক সংক্রান্ত চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে উপযোগী আইন রচনার ফলে ঐ সামাজিক অর্থনীতি ধনতন্ত্রের ছকটি অনুসরণ করতে শুরু করে। গ্রামীণ সভা ও বর্ণভিত্তিক সমিতিগুলির প্রশাসনিক, বিচারবিভাগীয় এবং নিয়মকানুন রচনা বা ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে শুরু করে। ব্রিটিশ ভারতে ভূমিরাজস্ব গ্রামীণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আদায় না করে ভূমিমালিকের কাছ থেকে সরাসরি আদায়ের রীতি চালু হয়। গ্রামগুলির শাসনকার্য রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের মাধ্যমে পরিচালনা করার প্রথা চালু হয়; তাঁরা গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির কাছে দায়ী থাকতেন না, থাকতেন উর্ধ্বতন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়তে থাকে এবং ক্ষমতাবিহীন, কর্মহীন দিনযাপনের গ্লানি বহন করে কালক্রমে নিঃশেষ হয়ে যায়। গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির অবলোপের জন্য অশ্রুবিসর্জনের আবশ্যকতা নাই, কেননা সামাজিক ও আর্থনীতিক স্থবিরত্বে ঐ সম্প্রদায়গুলি কালক্রমে প্রগতির পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ আমলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা পণ্যসামগ্রী উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় প্রকার বাণিজ্যই এই বৃদ্ধি বজায় রাখে। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে

শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে থাকে; পরবর্তীকালে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্ভব হলে দেশী ধনিকেরাও অনুরূপ ক্রিয়াকর্মে নিজেদের নিয়োজিত করে। ব্রিটিশ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক রাষ্ট্রের চরিত্র অর্জন করে। ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উপলভূমিতে উদ্ভূত নানবিধ আর্থনীতিক সম্পর্ক ও লেনদেন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জটিল এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যক আইন, সালিশী, শিল্পবিচারালয়, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক, বীমা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে উঠতে থাকে। শ্রমিক-মালিক, প্রজা-জমিদার এবং উৎপাদক, বণিক ও ব্যাঙ্কমালিকদের কর্মচারিবৃন্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ও অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সারা ভারতে সুষম একটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ব্রিটিশ ভারতের টাকাকড়ি ও মুদ্রা ভারতের সর্বত্র গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় নানাবিধ কমিশন, সংস্থা, সম্মেলন **ভারতীয় অর্থনীতির এককেন্দ্রিক চরিত্র** গঠনে সহায়ক হয়।

প্রশাসনিক ঐক্যের পাদপ্রদীপের নীচে

রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত দিক থেকে সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যডোরে সংবদ্ধ করতে সক্ষম হলেও ব্রিটিশ শাসন সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিতে পূর্ণ ছিল।

সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার তাঁবেদার দুটি গোষ্ঠী হিসাবে জমিদার ও দেশীয় রাজা-মহারাজা-নবাবদের সাথে আঁতাত সৃষ্টি সিপাহী বিদ্রোহ-পরবর্তী ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রশাসনিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে তাঁদের ব্যবহার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় উপমহাদেশে নিজেকে দীর্ঘকাল নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট ছিল।[13] শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কর্মচারী প্রভৃতি শ্রেণী বা পেশায় নিযুক্ত জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করা এবং কায়েমী স্বার্থের গোষ্ঠীগুলিকে তোষণ করা সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম কৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকাংশ স্বৈরতন্ত্রের পীঠস্থান বলে বিবেচিত হলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সিপাহী বিদ্রোহের শিক্ষা অনুসরণ করে ঐগুলিকে ব্রিটিশ ভারতের অঙ্গীভূত না করে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বহাল রাখে। বলা বাহুল্য, রাজা-

মহারাজা-নবাবদের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভের আশায় তাঁদের দিকে ঐ কর্তৃপক্ষ মিতালীপূর্ণ করমর্দনে লালায়িত হয়। ক্যুপল্যাণ্ডের মত ব্যক্তিও স্বীকার করেছেন যে, 'এরূপে ভারত দু'টি অংশে বিভক্ত হয়েছিল, উভয়ের শাসনপ্রণালীর ভিত্তি ও ধরন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।'

ব্রিটিশ শাসন ভারতে **এক জাতির উপর অন্য জাতির শাসন** হিসাবে আগাগোড়া অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।[14] সামরিক বিজয়ের পথ অনুসরণে ব্রিটিশেরা ভারতে ক্ষমতা দখল করেছিল। স্বভাবতই শাসনক্ষমতা করায়ত্ত রাখার তাগিদে তাঁদের গণতন্ত্র-পরিপন্থী নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। বাবু সঠিক বলেছেন যে, প্রশাসনিক ঐক্য ভারতে শুধুমাত্র ভারতবাসীকে সংহত করেনি, 'সাধারণ স্বার্থ ও অভিযোগের' দৃঢ় বন্ধনে তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধেও সঙ্ঘবদ্ধ করে। রাজনৈতিক সচেতনতার মান যতই উচ্চগ্রামে পৌঁছয় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ এবং গণতান্ত্রিক শাসনের দাবি ততই সোচ্চার হতে থাকে। শাসন সংস্কার, কেন্দ্রীয়-প্রাদেশিক-অধস্তন সরকারী কর্মে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতীয়করণের নীতি অনুসরণ, প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি, জাতিগত বৈষম্যনীতির অবসান, ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রসার, নির্বাচনের অধিকার, নির্বাচিত আইনসভার কাছে দায়িত্বশীল শাসনবিভাগের ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক স্ব-শাসন এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে কল্লোলিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মুক্তিসংগ্রামের দুর্বার তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করে।

ব্রিটিশ শাসন **ভারতীয় জনগণের দুঃখদারিদ্র্যের প্রতি সংবেদনশীল ছিল না**। ঐ শাসনের আমলে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবনহানি ঘটায়। 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে সাতবার দুর্ভিক্ষ হয়, অনুমান ১৫ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষের কবলে মারা যান। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল (১৮৫১ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত ছয় বার এবং ১৮৭৬ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত আঠার বার) এবং সরকারী হিসাবে মোট দুই কোটিরও বেশী মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন।'[15] ডব্লিউ. এস. লিলি তাঁর ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড ইট্স প্রব্লেম্স' গ্রন্থে দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যুর বিশদ পরিসংখ্যান দিয়েছেন।

১৮৬১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা, ১৮৭৩-'৭৪ সালে বিহার এবং ১৮৭৬-'৭৮ সালে হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, মহীশূর,

বোম্বে, পাঞ্জাব, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অন্তর্বর্তী ও পরবর্তী বৎসরগুলিতে ছোটখাট আকারে দুর্ভিক্ষের উপস্থিতি ঘটে। একের পর এক 'দুর্ভিক্ষ কমিশন' নিয়োজিত হতে থাকে—যেমন, ক্যাম্পবেল কমিশন, স্ট্র্যাচি কমিশন, লায়াল কমিশন ও ম্যাকডোনেল কমিশন।[16] কমিশন-গুলি যথারীতি ভালমন্দ সুপারিশ লিপিবদ্ধ করে। কিন্তু যখনই পরবর্তী সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে তখনই 'ভারতের অবস্থা দাঁড়িয়েছে শূন্য ভাঁড়ারবিশিষ্ট একটি জাহাজের মত।'

দুর্ভিক্ষের সময় ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্র দক্ষতার সঙ্গে ত্রাণকার্য পরিচালনা করলেও ঔপনিবেশিক সরকারের মানবিক গুণের কোন প্রমাণ ঐ কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। দুর্ভিক্ষগুলি এক হিসাবে মনুষ্যসৃষ্ট ছিল। ভারতীয় জনসংখ্যার ৮০ থেকে ৯০ ভাগ লোক কোন উপায়ন্তর না থাকায় চাষবাসের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৮৮০ সালে নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে বলা হয় যে, দুর্ভিক্ষের মূল কারণ হল কৃষিকার্যের উপর ভারতবাসীর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা; কোন কারণে কৃষিউৎপাদন ব্যাহত হলে বিকল্প জীবিকার আশ্রয় গ্রহণ করে তারা ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে অপারগ ছিল। বহু ধরনের প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতীয় মালিকানায় শিল্প বা কারখানা গড়ে উঠলে শৈশবে ঐ নবজাতককে শ্বাসরুদ্ধ করাই ছিল ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের স্বার্থান্ধ হুকুম। প্রাচীন দেশী শিল্পগুলি ঔপনিবেশিক নীতির ফলে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ভারতীয় কর্মী ও কারিগরের দল কৃষিকার্যে অংশগ্রহণ করে। তাদের বেদনার পেয়ালা পূর্ণ করতে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল **ভূমিরাজস্বের বিপুল দাবি**। ভারতীয় প্রয়াসে শিল্পায়নের বিরোধিতা করার ব্রিটিশ নীতির ফলেই কৃষিজমিতে এত ভীড় জমেছিল। আবার, উচ্চহারে বিপুল ভূমিরাজস্বের দাবি দরিদ্র কৃষকের শ্বাসকষ্ট ঘটাত। খরা, বন্যা, অজন্মা ইত্যাদির বছর চাষী মৃত্যুপথে যাত্রা করতে বাধ্য হত।

এরূপ পরিস্থিতিতে ত্রাণকার্যে ব্রিটিশ ভারতীয় আমলাতন্ত্রের দক্ষতা তলদেশে বৃহৎ ছিদ্রবিশিষ্ট কলসীকে মাঝে মাঝে কয়েক গ্লাস জল দিয়ে পূর্ণ করার প্রয়াসের মতই হাস্যকর ও অকিঞ্চিৎকর ছিল।[17]

ব্রিটিশ শাসনে **ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় অত্যন্ত করুণ জাতীয় দারিদ্র্যের সূচক** হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৬ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত মাথাপিছু আয় পরিমাপের যেসব প্রচেষ্টা হয়েছে, সেগুলির কোন ক্ষেত্রেই মাথাপিছু বাৎসরিক

আয় ৪৫ টাকার বেশী দাঁড়ায়নি। দাদাভাই নওরোজী ১৮৬৮ সালের ভিত্তিতে ঐ আয় ২০ টাকা বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। ১৮৮২-তে বারিঙ্ ও বারবোর্ ২৭ টাকা, ১৮৯৭-৯৮-তে লর্ড কার্জন ৩০ টাকা, ১৮৯৯-তে উইলিয়ম ডিগ্‌বি ১৮ টাকা, এফ. জে. এ্যাট্‌কিন্সন ১৮৭৫ ও ১৮৯৯-তে যথাক্রমে ২৭ টাকা ৩ আনা ও ৩৫ টাকা ২ আনা, ১৯১৩-১৪-তে ওয়াদিয়া ও যোশী ৪৫ টাকা ৫ আনা ৬ পাই এবং ১৯২১-২২-এ শাহ্ ও খামবাট্টা ৭৪ টাকা ভারতীয় মাথাপিছু বাৎসরিক আয় বলে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।[18]

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন ভারতবাসীদের নানাদিকে ঐক্যবদ্ধ করে। অপরিসীম দারিদ্র্য কোটি কোটি ভারতবাসীর জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে তাদের স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে যোগদান করতে প্রেরণা যোগায়। দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অভিশপ্ত জীবনের পরিবর্তে নূতন জীবনের আকাঙ্খায় তারা সংগ্রামের পথে পা বাড়ায়।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও জওহরলাল নেহ্‌রু বৈরী মনোভাব গ্রহণ করেননি; কিন্তু তাঁদের বর্ণনাতেও ঐ শাসন অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেনি।

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ব্রিটিশ শাসকেরা মারাত্মক ভুল করেছিলেন বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে তাঁরা কৃষকের জীবনে দুঃখদারিদ্র্য চিরস্থায়ী করে দিতে অসচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জমির চিরাচরিত মালিক চাষীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না করে শোষক ও পরগাছা জমিদারশ্রেণীর উদ্ভবে তাঁরা সহায়তা করেছিলেন।[19]

ব্রিটিশ ভারতের আদালতগুলিতে গরীবের পক্ষে সুবিচার লাভ করা সম্ভব ছিল না। গণিকালয় ও বিচারালয় এই অর্থে সমধর্মী হয়ে উঠেছিল যে, অর্থপ্রদান ব্যতীত উভয় আলয়ের কোনটিতেই প্রবেশাধিকার লাভ করা যেত না।[20] ব্যঙ্গাত্মক এই মন্তব্যের সাথে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ ভারতীয় বিচারব্যবস্থার আরও কয়েকটি ত্রুটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমত, দরিদ্র চাষীর পক্ষে সুবিচারের আশায় বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিচার প্রার্থনার সাধারণ ব্যয় বহন করাও তার পক্ষে দুঃসহ ছিল। দ্বিতীয়ত,

বিচারালয়গুলি চাষীর আবাসস্থল থেকে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। বিচারকদের সংখ্যাও কম ছিল; আইনের বিধান জটিল ছিল। তৃতীয়ত, বিচারের কাজ শ্লথগতিতে সম্পন্ন হত। চতুর্থত, ইংরাজ বিচারকেরা এদেশের নানা ব্যাপারে অজ্ঞ থাকায় সুবিচারে অক্ষম হতেন। ভারতীয় বিচারপতিরা সাহেব বিচারকদের মতামত অনুযায়ী রায় দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হত যাতে তাঁদেব রায় আপীল বিচারের সময় খারিজ না হয়ে যায়!

২. জওহরলাল নেহ্‌রু

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রশাসনিক ব্যবস্থাতে ভারতীয়করণের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজস্ব স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়ত করেছিল। কালক্রমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে বৃহত্তম ও একমাত্র (রেলওয়ে সহ) চাকুরি দেবার মালিক হয়ে দাঁড়ালে ব্রিটিশের প্রতিকূল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করার শক্তিও ঐ কর্তৃপক্ষের হস্তগত হয়। হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়, দরিদ্র, নিরন্ন, অশিক্ষিত কোটি কোটি ভারতবাসীদের মধ্যে বিরোধ ডেকে এনে, প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে, চাকুরিদানের প্রলোভনে তাদের বিভ্রান্ত করে ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় জনজীবনে চরম হতাশা ও অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।[21]

ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসন সমগ্র ভারতের শাসনব্যবস্থাকে ঐক্যবদ্ধ, আধুনিক ও বিজ্ঞানধর্মী করে তুলতে সক্ষম হলেও, ভারতীয় জনজীবন থেকে দুঃখ, দুর্দশা ও শোষণের জগদ্দল পাথর অপসারণ করতে তৎপরতা প্রদর্শন করেনি।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্পর্ক

সিপাহী বিদ্রোহের আগে দেশীয় রাজ্যগুলির সাথে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আইনগত সম্পর্ক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদির শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হত। রাজপুত ও মারাঠা রাজ্যগুলির সাথে মার্কুইস অফ হেস্টিংস ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফে যেসব চুক্তিগুলি সম্পাদন করেছিলেন, এবং ঐ চুক্তিগুলির আগে-পরে সম্পাদিত অন্যান্য সন্ধি ও চুক্তিগুলির সম্মিলিত সারমর্ম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক নির্ধারণ করে দিয়েছিল। লিখিত শর্তাদি পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, সকল দেশীয়

রাজ্য বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণের অধিকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছে সমর্পণ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক রাজ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাজন্যবর্গের পূর্ণ কর্তৃত্ব লিখিতভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৮১৭ সালের চুক্তিতে বরোদা রাজ্যের 'সার্বভৌমত্ব' ঘোষিত হয়েছিল; ১৮৪১ সালের চুক্তিতে গায়কোয়াড়কে 'একমাত্র সার্বভৌম' বলে অভিহিত করা হয়েছিল।[২২] কার্যক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লিখিত 'সার্বভৌম', 'একমাত্র সার্বভৌম' ইত্যাদি শব্দসম্ভারের বিশেষ কোন তাৎপর্য ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেশীয় রাজ্যগুলিকে **অধস্তন বা করদ রাজ্যের** চেয়ে বেশী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেনি। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতির মত ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম অধিকার ঔপনিবেশিক ভারতের কোন সময়েই ঐ রাজ্যগুলির ছিল না। কোম্পানির প্রয়োজনে ঐ রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে খেয়ালখুশিমত হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল, সামরিক অভিযান চালিয়ে কোন কোন রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, আবার কোন কোন রাজ্যের শাসক পরিবর্তন করা হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের আগে কোম্পানি ও দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত ছিল না। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড মন্তব্য করেছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের সীমা, রাজ্যগুলির আয়তন, গুরুত্ব, সন্ধি, চুক্তি, প্রথা, ঐতিহাসিক দৈবদুর্বিপাকের টানাপোড়েনে নির্ধারিত হয়েছিল—সাধারণ কোন সার্বিক নীতির অনুশাসনে নয়। সর্বোপরি, কোম্পানির অধীনে প্রত্যেকটি রাজ্যের সামরিকবাহিনীর কার্যকরী অংশ মোতায়েন থাকায় প্রতিটি রাজ্য কার্যত কোম্পানির অধীন হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ সমকালীন আইনজ্ঞরা এরূপ একটি ভাষ্য দাঁড় করিয়েছিলেন যে, **সর্বভারতীয় বাস্তব ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব আইনগত ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের পথিকৃৎ ছিল**; অর্থাৎ, দেশীয় রাজ্যগুলি কার্যত কোম্পানির অধীন ছিল বলে আইনগত ক্ষেত্রেও অধস্তন বলে বিবেচিত হয়েছিল।[২৪]

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি করদ রাজ্যের চেয়ে বেশী মর্যাদা ভোগ করত বলে মনে হয় না। হায়দ্রাবাদের নিজাম সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ভোগ করতেন, নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনে সক্ষম ছিলেন, প্রজাদের উপর কর স্থাপনে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারতেন এবং প্রজাদের জীবনমৃত্যুর নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিরাজ করতেন। অথচ, বহু ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র


১৮৫৭ সালের ভারত
আফগানিস্থান
কাবুল
আটক
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
রাওয়ালপিণ্ডি
কাংড়া
পাঞ্জাব
লাহোর
সিমলা
মুলতান
কুমায়ুন
বাহাওয়ালপুর
মিরাট
দিল্লী
নেপাল
সিকিম
দার্জিলিং
ভুটান
ভরতপুর
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
গোরখপুর
রাজপুতানা
জয়পুর
যোধপুর
গোয়ালিয়র
কানপুর
সিন্ধু
হায়দরাবাদ
আজমীর
ঝান্সী
দানাপুর
পাটনা
আসাম
এলাহাবাদ
বারানসী
মধ্যপ্রদেশ
ঢাকা
বঙ্গদেশ
চন্দননগর
ব্যারাকপুর
কলিকাতা
ত্রিপুরা
গুজরাট
ভূপাল
বরোদা
কাথিয়াবাড়
নাগপুর
সম্বলপুর
দিউ
সুরাট
বেরার
নাগপুর
দমন
কটক
ঔরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
বোম্বাই
পুনা
নিজাম
সাতারা
হায়দ্রাবাদ
বঙ্গোপসাগর
বিজাপুর
আরব সাগর
গোয়া
মছলিপত্তম
মহীশূর
মাদ্রাজ
ব্যাঙ্গালোর
ভেলোর
কুর্গ
মহীশূর
পণ্ডিচেরী
কোচীন
তাঞ্জোর
সিংহল
ব্রিটিশ অঞ্চল
৭২°
৮০°
৮৮°
৩২°
২৪°
১৬°
৮°

দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ যৎসামান্য বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ও ব্রিটিশ করের বোঝা পরিহারের ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোনরূপ ক্ষমতা ভোগ করতেন না।

ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি ও ব্রিটিশ ভারতের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐ বিদ্রোহ থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ দু'টি বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেছিল: প্রথমত, পশ্চাৎপদ কোন দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করাও জনমতকে উত্তেজিত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট; দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ শক্তি ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সন্ত্রস্ত করে তুলবার পক্ষে পর্যাপ্ত। এই দ্বিবিধ শিক্ষালাভ করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চারটি ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম চারটি দশক জুড়ে **দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলা** ও ক্রমে ক্রমে তাদের দুর্বল করে তোলার দ্বৈত নীতি অনুসরণ করতে থাকে।[২৭]

মৈত্রী গড়ে তোলার প্রয়াস মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে লক্ষ্য করা যায়। দেশীয় রাজ্যগুলির অখণ্ডতা, দেশীয় রাজন্যবর্গের সম্মান, সুযোগ-সুবিধা ও কর্তৃত্ব সুরক্ষিত রাখবার ব্যবস্থা গ্রহণ করার স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ঐ ঘোষণাপত্রে স্থান পেয়েছিল। দেশীয় রাজাদের দত্তক পুত্র গ্রহণের রীতি ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্যের বিনিময়ে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

অপরদিকে, **রাজ্যগুলির আইনগত ক্ষমতা হ্রাসের আয়োজনও লক্ষণীয়** হয়ে ওঠে। রাজপ্রতিনিধি হিসাবে ১৮৬২ সালে লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন অঞ্চলগুলিকে রাজনৈতিক দিক থেকে একটিমাত্র রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। তিনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্য বলে বর্ণনা দিতে তৎপর থাকেন। রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য দিক থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষমতা হ্রাসের প্রয়াস অব্যাহত রেখে রাজন্যবর্গের চিরাচরিত সম্মান রক্ষা ও তাঁদের শাসিত রাজ্যগুলির অস্তিত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক ঐক্যের বিস্তার

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছিল। অবক্ষয় শুরু হয়েছিল বিদ্রোহের বেশ কিছু আগে, স্থায়ী হয়েছিল সত্তরের দশক পর্যন্ত। অবশ্য কয়েকটি দেশীয় রাজ্য

সংশ্লিষ্ট দেওয়ান ও নৃপতিদের কৃতিত্বে (হায়দ্রাবাদের সালার জঙ্, ত্রিবাঙ্কুরের রাজা স্যার টি. মাধব রাও এবং জয়াজী রাও সিন্ধিয়া, পাতিয়ালার নরেন্দ্র সিং, গোয়ালিয়রের স্যার দীনকর রাও) অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির অধীনস্থ থেকে একটি অখণ্ড রাজনৈতিক-আইনগত ভারতের ধারণাকে মূর্ত করে তোলে। ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে অখণ্ড এই ভারতের প্রশাসন, শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে, **'একক দায়িত্ব'** হিসাবে প্রতিভাত হয়। 'একক দায়িত্বের' তত্ত্ব বা নীতি কতগুলি কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়।[25] রেলওয়ে সারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করে দিতে তৎপর হয়ে ওঠে; সর্বনিম্ন দূরত্বের নীতি অনুসরণ করে রেললাইনগুলির গতিপথ নির্ণীত হয়। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যের সীমারেখার বিভেদকে অস্বীকার করে রেললাইন স্থাপিত হয়। সারা ভারতে একরকম ডাকব্যবস্থা প্রচলিত হয়। একমাত্র চারটি রাজ্য—গোয়ালিয়র, পাতিয়ালা, নাভা ও ঝিন্দ্—স্বতন্ত্র ডাকব্যবস্থার অধিকারী ছিল। ভারতের সর্বত্র একপ্রকার টেলিগ্রাফ বা তারব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। কাশ্মীর অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক পরে ব্রিটিশ ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলে একটি স্বতন্ত্র তারব্যবস্থা গড়ে তুলবার অনুমতি লাভ করেছিল। বেশ কয়েকটি রাজ্যে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও ব্রিটিশ ভারতীয় টাকা-পয়সা অধিক গুরুত্ব ও সম্মান আদায় করে নেয়। আর্থনীতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের করায়ত্ত থাকায় সর্বভারতীয় একটি অর্থনীতির রূপকল্প গড়ে উঠতে থাকে।

বস্তুগত ভিত্তি ছাড়াও **নৈতিক** কতগুলি শক্তির সমবায়ে গঠিত ঐক্যবদ্ধতার প্রেরণা সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ডের জনসাধারণকে সংবদ্ধ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বোম্বে, কোলকাতা ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জ্ঞানবিজ্ঞানের মহৎ কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলে দেশীয় রাজ্যগুলির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি তাদের অনুমোদন ও স্বীকৃতি পেয়ে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষাবিস্তারে অগ্রসর হয়।[26] ব্রিটিশ ভারতের জন্য রচিত আইনসংহিতাগুলি দেশীয় রাজ্যগুলিতেও প্রচলিত হয়। প্রদেশের মহাধর্মাধিকরণগুলির নমুনা অনুসরণ করে দেশীয় রাজ্যগুলিতে ঐ ধরনের বিচারালয় গড়ে উঠতে থাকে। ধীরে ধীরে হলেও দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ ভারতের রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক যন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হতে থাকে।

একক রাজনৈতিক ভারতের ধারণাটি ১৮৬৮ সালের 'জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট'-এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৭] ঐ আইনে **'ব্রিটিশ ভারত'** শব্দসমবায়টি প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, সমগ্র ভৌগোলিক ভারতীয় উপমহাদেশটির জন্য **'ভারত'** শব্দটি অনুরূপরূপে নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক দিক থেকে অখণ্ড ভারতের স্বরূপটি পরিস্ফুট করে তোলার উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির প্রখ্যাত ব্যক্তিদের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্রের সাথে যুক্ত করার নীতি রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। পাতিয়ালার মহারাজা কেন্দ্রীয় সরকারের সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন। তাঁর কার্যকাল শেষ হলে রাজা স্যার দীনকর রাও ও রাজা স্যার টি. মাধব রাও অনুরূপভাবে ঐ সংস্থার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে তখন ব্রিটিশ ভারতের সরকারের একটি বিভাগ হিসাবে গণ্য না করে সমগ্র ভারতের সরকারের অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হত।

দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনে স্বৈরতন্ত্র বা নৈরাজ্য যাতে ব্রিটিশ রাজের নীরব দর্শকের ভূমিকায় প্রশ্রয় না পায় সে-বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রশাসনিক ঐক্যের অনুভূতি দেশীয় রাজ্যগুলির সুশাসনের সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, কুশাসনের সঙ্গে তেমনই অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল।[২৮] এই কারণে সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালেও দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ ঘটে। এরূপ হস্তক্ষেপ কিছু কিছু রাজ্যে অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু হস্তক্ষেপের মাত্রা ও প্রকৃতি ন্যায়নীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থসাধনে তৎপর ছিল। মালহর রাও গায়কোয়াড় নিঃসন্দেহে অত্যাচারী শাসক ছিলেন। তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁর বংশধরদের সিংহাসন দাবিও অগ্রাহ্য করা হয়। তাঁর সপক্ষে ওকালতি করার কিছু ছিল না। কিন্তু যে-রকম কঠোরতায় তাঁর শাস্তিবিধান করা হয়েছিল তা দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে ক্ষোভ ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। এই ত্রাস ও বিক্ষোভের উপশম ঘটাতে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে লব্ধ মহীশূর রাজ্যটিকে আদি স্বত্বাধিকারী রাজার কাছে প্রত্যর্পণ করা হয়। তাছাড়া, দেশীয় রাজন্যবর্গের শঙ্কার অবসান ঘটাতে এবং মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় উপাধিগুলি ঘোষণা করতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলির অনুপ্রেরণায় দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, এই দরবার ঐক্যবদ্ধ নূতন ভারতের দৃশ্যমান প্রতীকের ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় দেশীয়

রাজন্যবর্গ এই দরবার অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানাননি। বৃহৎ রাজ্যগুলি এই অনুষ্ঠানের প্রস্তাব অপমানকর মনে করেছিল।

লর্ড মেয়োর আমলে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনে ব্রিটিশ ভারতের শাসনের অনুরূপ প্রগতিশীল সংস্কারসাধনের জন্য বিভিন্ন রাজ্যে দেওয়ান মনোনীত করা হয়। নাবালক রাজা-শাসিত রাজ্যে রাজপ্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতে কর্মরত রাজপ্রতিনিধিদের অনেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। এই প্রভুত্ব দেশীয় প্রশাসনে ঐক্য আনয়নে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়েছিল। ড্যালি, লেপেল, গ্রিফিন, অ্যাটচিসন প্রমুখ ব্যক্তিরা দেশীয় রাজাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েও রাজ্যপ্রশাসনে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৭] দেশীয় রাজাদের শিক্ষাদান ও প্রশাসনিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার উপর লর্ড মেয়ো গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল আগে দেশীয় রাজ্যগুলিতে অবক্ষয়ের যে সূচনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গায়কোয়াড়ের সিংহাসনচ্যুতির পর থেকে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সময়সীমা জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলি বহুবিধ রাজনৈতিক-প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক কাঠামোর পত্তন ঘটাতে অভিলাষী ছিল। এই সময়সীমাকে দেশীয় রাজ্যগুলির পক্ষে স্থায়িত্বের কাল বলে চিহ্নিত করা হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির কর্তৃত্ব, সম্মান ও প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা এই সময় বর্ধিত কলেবর হয়ে উঠেছিল। **লর্ড মেয়োর নীতি এই উন্নতির মূলে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল ছিল।** দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শক্তি ও সম্পদ প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমকে সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

সীমিত সংখ্যক হলেও কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের সামন্তবাদী, সামরিক সংগঠনের লক্ষণাক্রান্ত প্রশাসনিক যন্ত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে অসামরিক জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংগঠনে পরিণতি লাভ করেছিল। এরূপ পরিণতি অবশ্য প্রগতিশীল নৃপতি-শাসিত কয়েকটি রাজ্যে সম্ভব হয়েছিল। সকল রাজ্যে নয়। ১৮৭৯ সালে স্যার টি. মাধব রাও প্রগতিশীল রাজ্যগুলিতে প্রশাসনিক যে-সকল আদর্শগুলি রূপায়ণের প্রয়াস লক্ষ্য করেছিলেন সেগুলিকে এভাবে চিহ্নিত করেছিলেন: 'দৃঢ়তা ও সংযমের সাথে

শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ও পর্যাপ্ত ধরনের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা, পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলা, প্রয়োজনীয় জনকল্যাণমূলক কাজকর্মের ব্যবস্থা করা, যথোপযুক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা, জনশিক্ষার ব্যবস্থা করা, করের বোঝা হ্রাস করা, মিতব্যয়িতার আদর্শ অনুসরণ করা এবং রাজ্য ও জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংযোগ স্থাপনে সক্ষম প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করা।'[30] এক কথায়, আধুনিক প্রশাসন গড়ে তোলা।

আধুনিক শাসনব্যবস্থার জন্মযন্ত্রণা ভারতের পশ্চাৎপদ বহু অঞ্চলে অনুভূত হয়েছিল। বিশেষ করে ঠাকুর ও অভিজাতদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাঁদের জায়গীরগুলিতে অপ্রতিহত ছিল বলে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব ঐসকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করা দুরূহ হয়ে উঠেছিল। আলোয়ার ও বিকানীরের অভিজাতরা যুগোপযোগী পরিবর্তনের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইতিহাসের প্রাচীন গরিমায় মর্যাদাবান রাজপুতনার আধা-সামন্তপ্রভুরাও অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে, পশ্চাৎপদ দেশীয় রাজ্যগুলিতে সামগ্রিকতাবাদী আধুনিক রাষ্ট্রের অস্পষ্ট রূপরেখাটি প্রত্যক্ষগোচর হতে থাকে।[31]

আধুনিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্থায়িত্ব অপেক্ষাকৃত অগ্রসর দেশীয় রাজ্যগুলিতে ১৮৭৫ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর এবং বরোদা রাজ্যের নৃপতি ও দেওয়ানদের প্রতিভা এই সংবদ্ধতা আনয়নে সক্রিয় ছিল। মহারাজা সয়াজী রাও গায়কোয়াড়, তৃতীয় সয়াজী রাও, আইলিম মহারাজা, শেষাদ্রি আয়ার, স্যার টি. মাধব রাও, স্যার দীনকর রাও, সানকুন্নি মেনন প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্রিটিশ ভারতের অনুকরণে রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আধুনিকীকরণের ভাগীরথী ধারা সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যগুলিতে আবাহন করেছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সৈন্যবাহিনীর একাংশ লর্ড ডাফ্‌রিনের আমলে (১৮৮৪-১৮৮৮) ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সাযুজ্য রচনা করে ভারতের প্রতিরক্ষায় অংশগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। এই ব্যবস্থা দু'দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমত, এই ব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সন্দেহ, বিদ্বেষ ইত্যাদি নিরসনের স্মারক; দ্বিতীয়ত, সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসাবে ব্যবস্থাটি গণ্য হবার যোগ্য।[32] ভারতের প্রতিরক্ষা

ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির **সম্মিলিত দায়িত্ব** হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে ভারতীয় ঐক্যের ধারণাটিকে জোরদার করে।

লর্ড কার্জনের আমলে (১৮৯৯-১৯০৫) দেশীয় রাজ্যগুলি ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত মেজাজে কিছুটা তিক্ত হয়ে ওঠে। **দেশীয় রাজাদের কার্জন ব্রিটিশ রাজশক্তির অধস্তন রাজনৈতিক কর্মচারী মনে করতেন**। তিনি তাঁদের নিজস্ব রাজ্যের বাইরে যাতায়াতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসাপেক্ষ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁদের রক্তবর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের স্বাধীনতার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। তাঁদের রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ কার্জনের নির্দেশে বৃদ্ধি পায়। স্বভাবতই কার্জনের উদ্ধত নীতির বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের অনেকে 'বিদ্রোহী' হয়ে ওঠেন। প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন 'দেশপ্রেমিক রাজা' তৃতীয় সয়াজী রাও। তিনি সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যান্য কয়েকজন রাজাও এই সময়ে নিজেদের কর্তব্য-পরায়ণতা ও বিচক্ষণতার প্রমাণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন; গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়া, মহীশূরের মহারাজা কৃষ্ণরায় (তৃতীয়) এবং বিকানীরের মহারাজা গঙ্গা সিং বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শীর্ণ ধারাটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ব্রিটিশ ভারতের ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরেও কল্লোলিত হয়ে উঠতে শুরু করে। ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির বিপদসঙ্কুল সম্ভাবনায় ত্রস্ত হয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গের সমর্থন লাভের আশায় আবার আঁতাতের অনুকূলে ফন্দীফিকির খুঁজতে তৎপর হয়।[33] ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই তৎপরতা বজায় ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'টি দশকে **কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রতিনিধিত্ব-মূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রাথমিক প্রয়াস** লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। এই রাজ্যগুলির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা একরকম ছিল না। তবুও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ভারতীয় আইন পরিষদের অন্ধ-অনুকরণে আইন রচনার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। মহীশূর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা ধীরে ধীরে গণতন্ত্রের অভিমুখী হয়। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিবাঙ্কুর জনপ্রতিনিধিত্বমূলক বহু কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠায় সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; ধারাবাহিকভাবে

এ-সকল প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ অধিকার লাভ করে। ত্রিবাঙ্কুরে আইন পরিষদ গড়ে ওঠে ১৮৮৮ সালে। ১৮৯৮ সালে ঐ পরিষদের কলেবর বৃদ্ধি ঘটে। ১৯০৪ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে 'শ্রীমুলাম্ জনপ্রতিনিধি পরিষদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক ব্যাপারে জনগণের আশা-আকাঙ্খা, অভাব-অভিযোগ, দাবি-সুপারিশ ইত্যাদি সরকারের কর্ণগোচর করা এই পরিষদের উদ্দেশ্য ছিল। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭০; ৪২ জন রাজ্যের ৩৫টি তালুক থেকে নির্বাচিত হতেন। বাদবাকি সরকার-মনোনীত সদস্য হতেন, কিন্তু মনোনীত সদস্যদের মধ্যে ১৪ জন সরকারী কর্মচারী হতেন না। দেওয়ান এই পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৯ সালে ত্রিবাঙ্কুরে আরও গণতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা হয়।

মহীশূর, হায়দ্রাবাদ বা ত্রিবাঙ্কুরের অভিজ্ঞতা থেকে এরূপ সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন নয় যে, দেশীয় রাজ্যগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্য যে, বেশীর ভাগ দেশীয় রাজ্যগুলিতে মধ্যযুগীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল, ব্যক্তির স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত ছিল না। আইনের শাসন অনেক রাজ্যে অপরিচিত ছিল। রাজা বা মহারাজা স্বৈর ক্ষমতার মালিক ছিলেন। নারীর সম্মান রক্ষার সুবন্দোবস্ত অনেক রাজ্যে ছিল না। বিলাসব্যসন, ভোগসম্ভোগ, অমিতব্যয়িতা, অনাচার ও দুশ্চরিতায় বহু দেশীয় নৃপতির চরিত্র ধিকৃত ছিল।[34] বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরে ক্রন্দনরত ছিল। ব্রিটিশ ভারতের নাগরিকেরা দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের তুলনায় নিঃসন্দেহে বেশী ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করতেন। শাসক জাতির তুলনায় ব্রিটিশ ভারতীয় নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের পরিমাণ সীমাবদ্ধ মনে হলেও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের তুলনায় তা প্রশস্ততর ছিল।

শ্রবণে তাঁর হৃদয়মনের চাঞ্চল্যকে তিনি 'ভাউরিসে ইপহিজেনিয়া' অপেরায় খ্রাইষ্টীয় রীতিতে ডায়নার ভক্তদের সঙ্গীত শোনার তন্ময়তার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[5]

ভারতবিদ্যার ইসলামীয় দিকটিও হেস্টিংসের কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করেছিল। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, উইলিয়ম ডেভি ও জোনাথন স্কট তাঁর শাসন-কালে আরবী-পারসী বিদ্যাচর্চায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি সাত সমুদ্র পেরিয়ে ইউরোপের পণ্ডিতমহলে ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা সম্পর্কে মুগ্ধ আগ্রহ ও শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছিল। ভল্‌টেয়ার ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং ইংরাজী ও ফরাসী অনুবাদের মাধ্যমে ভারতবিদ্যার দিকপালদের রচনাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন।[6]

ভারতবিদ্যা ও নষ্টনীড় রেনেসাঁ

হেস্টিংসের আমলে প্রাচ্য তথা ভারতবিদ্যার প্রসারকে ডেভিড কফ্‌ রেনেসাঁ বা নবজাগরণের আগমনী বলে অভিহিত করেছেন।[7] ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ইউরোপ ও প্রাচ্যদেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিলেন বলে কফ্‌ অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি মনে করেন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ও তাঁদের ভারতীয় অনুগামীরা অন্ধ পশ্চিমীকরণ বা ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের রোমান্টিক অনুকরণ না করে যুক্তিবাদ, সার্বজনীনতা ও পুরাতত্ত্বের গতিশীল জ্ঞানের কষ্টিপাথরে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুলিকে যাচাই করে সমকালীন ভারতে গ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন। 'ভারতের নবজাগরণের প্রথম শুকতারা' রামমোহন রায় তাঁর সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনে ব্যবহৃত তীরগুলি প্রাচ্যবিদের তূণাধার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে।

আরবী, পারসী বা সংস্কৃত ভাষায় লভ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি হেস্টিংসের জাতিগত কোন বৈরিতা ছিল না একথা সত্য, কিন্তু তিনি প্রাচ্য-বিদ্যায় উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করে ভারতে রেনেসাঁর ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন বলে প্রচলিত অভিমত অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট।

প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহ প্রদর্শন কোম্পানির আমলে খুব স্বল্পকাল স্থায়ী

হয়েছিল। হেস্টিংস ভারতীয় নবজাগরণ চাননি। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারী শাসন, আইনকানুন প্রচলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি দেশীয় জনসাধারণের আনুগত্য লাভের স্থায়ী বন্দোবস্ত করতে উৎসাহী ছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলন ব্রিটিশ বা ইউরোপীয় জনগণের কাছে হিন্দু ধর্মাদর্শের ধ্যানধারণা সম্পর্কে অনুকূল মতামত সৃষ্টিতে মোটেই সহায়ক হয়নি। এমন কি বিদেশী পণ্ডিতমহলেও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা লক্ষিত হয়নি। ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ভারতীয় 'জনসাধারণের প্রিয় হিন্দুধর্ম' ও 'দার্শনিক হিন্দুধর্মের' মধ্যে পার্থক্য রচনা করার কাজটি সমাধা করেছিলেন এই-যা। প্রথমটিকে তাঁরা সমালোচনা ও উপহাসের আঘাতে জর্জরিত করেছেন, আর দ্বিতীয়টিকে উচ্চপ্রশংসায় অভিনন্দিত করেছেন।[৪] উচ্চপ্রশংসার কারণ এই যে, দার্শনিক হিন্দুধর্মের অধিবিদ্যক ধ্যানধারণা, দার্শনিকতা, নৈতিকতা ও একেশ্বরবাদ খ্রীস্টধর্মের বিরোধী মোটেই নয়, বরং কাছাকাছি যায়। সারা ইউরোপ জুড়ে লক্ষ, কোটি ভয়ঙ্কর দেবদেবীর মূর্তি, বীভৎস রীতিনীতি ইত্যাদি হিন্দুধর্মের আলোচনার সাথে জুড়ে বই ছাপা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সাধারণ মানুষ হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়নি মোটেই। হায়, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ্যা!

ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ভারতের রাজনৈতিক জীবনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের অনেকেই স্বদেশে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন সর্বোৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা বলে তাঁরা সবাই বিশ্বাস করতেন। খ্যাতিমান ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ জোন্‌স ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক সরকারের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ভারতের পক্ষে আদর্শ শাসনব্যবস্থা বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।[৫] এক কথায়, ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ঔপনিবেশিক নৈতিকতার শিকার হয়ে ভারতের পরাধীনতার সপক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন। এই রকম একটি গোষ্ঠীর পক্ষে নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে ভূমিকা পালন করা দুঃসাধ্য ছিল।

বিপ্লব, নৈরাজ্যবাদ ও নাস্তিকতা বিরোধী শিক্ষা

১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহদানের উদ্দেশ্য নিয়ে স্থাপন করেননি। তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, ফরাসী বিপ্লবের ধ্যানধারণা সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে কোম্পানির সামরিক

ও অসামরিক কিছু কিছু ব্যক্তির রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতামতকে ছিন্নমূল করে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠ্‌ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে ব্রিটেন থেকে আগত অল্পবয়সী, স্বল্পশিক্ষিত কর্মচারীদের ধর্ম ও রাজকার্যের সঠিক নীতিগুলির সাথে পরিচিতি না ঘটিয়ে দিতে পারলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বনিয়াদ দুর্বল হয়ে উঠবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের জন্য ফরাসী বিপ্লবের 'নৈরাজ্যবাদ ও নাস্তিকতা' প্রতিরোধে সক্ষম একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যায় উৎসাহদানের কোনরূপ ইচ্ছা তাঁর ছিল না। কলেজটির পাঠক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি ভারত বা প্রাচ্যবিদ্যার যেটুকু অংশ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তা একান্তভাবে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্রশাসনিক যোগ্যতা ও স্থানীয় পরিবেশ সংক্রান্ত জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষাদীক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা করার কার্যক্রম তিনি গ্রহণ করেননি। 'ভারতীয়দের অদ্ভুৎ নীচতা' ও 'জলবায়ুর প্রতিকূল প্রভাব' থেকে ব্রিটিশ শিক্ষানবীশ রাজকর্মচারীদের রক্ষা করা এবং **ফরাসী বিপ্লবের ধ্যানধারণা থেকে তাঁদের মুক্ত রাখার মতাদর্শ** ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষাব্যবস্থায় সাংগঠনিক রূপ ধারণ করেছিল।[10]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশের ক্ষেত্রে যে গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছিল তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ঐ কলেজের ব্রিটিশ ও ভারতীয় শিক্ষকদের প্রাপ্য। ঐ ধরনের বিকাশের কোন অভিপ্রায় বা কার্যক্রম ওয়েলেসলীর ছিল না।

মিশনারি ও প্রাচ্যবাদী বক্তব্য—প্রসঙ্গ : পশ্চিমী শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে ভারতের জনসাধারণের কাছে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার দাবিতে ব্রিটেনে জনমত সংগঠিত হতে থাকে। এই দাবি সর্বপ্রথম আসে 'ক্ল্যাপহাম'[11] গোষ্ঠীর খ্রীস্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে।

'ক্ল্যাপহাম' গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ (চার্লস গ্র্যান্ট, উইলবারফোর্স, জ্যাকারি মেকলে, স্যামুয়েল থর্নটন প্রভৃতি) লণ্ডনে ব্রিটিশ সরকারের উপর ইংরাজী শিক্ষা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে আবশ্যিক করার জন্য অবিরাম চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁদের ধারণা ছিল ইংরাজী শিক্ষা ভারতবর্ষে 'ধর্মীয় কুসংস্কার,

অজ্ঞানতা ও নীতিবিহীনতার' মোহজাল ছিন্ন করে ভারতবাসীদের পশ্চিমী জগতের 'উন্নততর নৈতিকতার' সাথে পরিচয় ঘটিয়ে খ্রীস্টধর্মের মহৎ জীবনাদর্শ গ্রহণে প্রেরণা সৃষ্টি করবে। ১৭৯২ সালে লেখা একটি পুস্তকে গ্র্যাণ্ট এ ধরনের একটি বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। 'ক্ল্যাপহাম' গোষ্ঠীর সদস্যরা ভারতীয় চিন্তা ও মননের দুর্গতোরণ ভেঙ্গে ফেলে খ্রীস্টধর্মের মহান ভাবধারার আগমন সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভাঙ্গার কাজে তাঁরা ত্রিমুখী হাতিয়ার ব্যবহারের দাবি জানিয়েছিলেন: ইংরাজী শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা ও সমাজ-প্রগতির পশ্চিমী ধ্যানধারণা।

শ্রীরামপুরের 'ম্যাভারিক' খ্রীস্টধর্মযাজকেরা (কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রভৃতি) পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও খ্রীস্টধর্ম ভারতে আমদানি করার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু দ্বিবিধ এই উদ্দেশ্য তাঁরা সাধন করতে চেয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে। ভাষার মাধ্যম গ্রহণের ব্যাপারে তাঁরা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোনরূপ সংঘর্ষ অভিপ্রেত মনে করেননি। তাঁরা 'উন্নততর' ইউরোপীয় সভ্যতার সাথে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সামঞ্জস্য ও সমন্বয় ঘটাতে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির ভারতীয়করণে উৎসাহী ছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল হয় এমন কোন কার্যক্রম তাঁরা গ্রহণ করেননি; বরং ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সংযোগ এবং সমন্বয় সাধন করে ঐ ভিত্তিকে সবল করে তুলতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ হজসনের ধারণা ছিল, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ভারতীয় জনতা ও ব্রিটিশদের মধ্যে 'দুঃখজনক ব্যবধান' আরও প্রসারিত হবে এবং ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত হয়ে ক্ষমতা লাভ করে স্বদেশবাসীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন।[12] হজসন ও তাঁর সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের বক্তব্য সমকালীন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ মনোভাবের তুলনায় অনেক বেশী প্রগতিশীল ছিল বলে ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী মৌল নীতির সীমানা অতিক্রম করায় হজসন প্রমুখ ব্যক্তিদের বক্তব্য ঐ কর্তৃপক্ষের বিরূপতা অর্জন করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষাশেষি ব্রিটিশ সরকার পার্লিয়া-

মেন্টের হুইগ উদারনৈতিকতার চাপে ও প্রভাবে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী হয়ে উঠতে থাকে।[18] হোল্ট ম্যাকেঞ্জি ১৮৩২ সালে পার্লিয়ামেন্টের কাছে প্রেরিত রিপোর্টে এবং তাঁর আগে চার্লস মেট্‌কাফ তাঁর সহকর্মী বন্ধুকে লেখা চিঠিতে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জানালা খুলে দিয়ে 'অচলায়তন' ভারতে সমাজপ্রগতির মুক্ত বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টির সুপারিশ করেছিলেন।

শিক্ষানীতি সম্পর্কে হিতবাদী ও রক্ষণশীল বক্তব্য

উনবিংশ শতাব্দীর দুই হিতবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক, পিতা জেম্‌স মিল ও পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল, ভারতবাসীদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকদের মত ভারতকে একটি ক্ষয়িষ্ণু ও অধঃপতিত দেশ হিসাবে বিবেচন করতেন। তাঁদের ধারণা জন্মেছিল, ভারতে দুটি সভ্যতার সংযোগ ও সংগ্রাম চলছে—একটি উদীয়মান, নবীন ও আলোকপ্রাপ্ত এবং অপরটি প্রাচীন, মৃতপ্রায় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রথম সভ্যতাটির জ্ঞান-বিজ্ঞানের মৃতসঞ্জীবনীতে দ্বিতীয় সভ্যতাটির পুনরুজ্জীবন সম্ভব বলে তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

খ্রীস্টধর্ম প্রচারক ও মেকলেপন্থীদের মত ভারতবাসীদের উপর জোর করে ইংরাজী ভাষা চাপিয়ে সাংস্কৃতিক রূপান্তর সাধনের কোন পরিকল্পনা জেম্‌স মিলের ছিল না। হিন্দু-মুসলমানদের ভাষাগুলিতেই তিনি ভারতবাসীদের পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শন পাঠের ব্যবস্থা করতে আগ্রহী ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান, তাঁর মতে, অত্যন্ত নিম্নমান ও ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ ছিল। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন, ইউরোপীয় সাহিত্য বা কাব্য অনুশীলনের নয়।

জন স্টুয়ার্ট মিল অবশ্য ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও আইন-শাস্ত্র অধ্যয়ন ভারতীয়দের মনোন্নয়নে অপরিহার্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। সমগ্র ভারতীয় প্রজাদের ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের নীতি সমর্থন করেননি; ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-প্রাপ্ত একটি অভিজাত গোষ্ঠী সৃষ্টি করা তিনি কাম্য মনে করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: 'আমরা ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে যা আশা করতে পারি তা হল শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়া, এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরী করা যাঁরা ইউরোপীয়

সাহিত্য, উন্নত ধ্যানধারণা ও অনুভূতির সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে নিজেদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে ঐসব ধ্যানধারণা ও অনুভূতি বিস্তৃত করে দেবার কাজে লিপ্ত হবেন।'[14]

গণভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ না করে মিল ভারতের ক্ষেত্রে **'শিক্ষকদের শিক্ষক' অভিজাত একটি গোষ্ঠী** সৃষ্টির কথা বলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে পশ্চিমী শিক্ষা ভারতবাসীদের দুয়ারে পৌঁছুবে বলে তাঁর আশা ছিল। ভারতীয় সমাজের ঊর্ধ্বতম অংশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোর সংহত সমাবেশ ঘটিয়ে তারই দীর্ঘায়ত শিখায় সমাজের নিম্নতম অংশ পর্যন্ত আলোকিত করার বাসনা তাঁর ছিল বলে মনে হয়।

পশ্চিমী শিক্ষার মাহাত্ম্যে গর্বিত মিল হিতবাদী দর্শনের শোভনসুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত পশ্চিমীকরণের আদর্শটি ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। জি. সিরকিন ও নাতালি সিরকিনের 'দ্বৈত সত্তায় বিধৃত মিল'-এর তত্ত্ব (প্রথম সত্তায় প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয় সত্তায় ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক) সত্য হোক বা না হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, ইণ্ডিয়া হাউস থেকে ভারতের শিক্ষানীতি সম্পর্কে লিখিত তাঁর প্রতিবেদনগুলি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থাকে কিছুটা ভদ্র-সভ্য করে তোলার ঐকান্তিক প্রয়াসের ফলশ্রুতি মাত্র।

হিতবাদী দর্শন ভারতীয় জনগণকে পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষায় 'সুসভ্য' করে তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসনের অনুগামী হিসাবে গড়েপিটে তুলতে সচেষ্ট ছিল। তবে একথা ঠিক, ঐ দর্শনের প্রবক্তাগণ জবরদস্তিমূলক ইংরাজী শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন, ধর্মান্তরে উৎসাহ প্রদর্শন করেননি এবং শিক্ষাব্যবস্থায় মাতৃভাষাগুলির গুরুত্বও অনুধাবন করেছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশগুলির সর্ববিধ উন্নতিকে ব্রিটিশ জাতির নৈতিকতাবোধের অনুসারী করে তুলতে সর্বপ্রথম উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এডমণ্ড বার্ক, ফক্স প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকে 'অর্পিত দায়িত্ব' হিসাবে গ্রহণের তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন। **সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ও শাসিত জনসাধারণের মঙ্গলবিধানের জন্য কর্মোদ্যোগ** গ্রহণের মধ্যে রক্ষণশীল ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদেরা কোনরূপ বৈপরীত্য খুঁজে পাননি।

বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি

লর্ড বেন্টিঙ্ক ও টমাস ব্যাবিংটন মেকলে হিতবাদী দর্শন, খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও ভিক্টোরীয় উদারনৈতিকতার বিস্তারে আগ্রহী ছিলেন। হিতবাদী দর্শনের 'বাস্তবমুখীন আদর্শবাদ' এবং বেন্টিঙ্ক-মেকলের 'কল্পিত স্বপ্নরঙীন দূরদৃষ্টি' দুই-ই ভিক্টোরীয় যুগের গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতিফলন ছিল মাত্র। বেন্টিঙ্ক-মেকলের ধারণা ছিল এই, রেনেসাঁর যুগে ল্যাটিন ভাষাচর্চা ইউরোপে যে ভূমিকা পালন করেছিল ভারতে ইংরাজী ভাষার অনুশীলন অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে। আবার, খ্রীস্টধর্মের গোঁড়া প্রচারকদের মতই তাঁদের মনে হয়েছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি স্থবির, অবক্ষয়ে জরাজীর্ণ এবং কুসংস্কার, গোঁড়ামি, ব্যভিচার ও প্রতিক্রিয়াশীলতায় আকীর্ণ। মানের বিচারে, সমগ্র ভারত ও আরবের জ্ঞানভাণ্ডারের মূল্য ইউরোপের ভালো একটি লাইব্রেরির একটিমাত্র তাকের বইগুলির জ্ঞানসম্পদের চেয়ে উন্নততর নয় বলে রায় দিয়েছিলেন মেকলে।[15]

বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি ভারতকে পশ্চিমীকরণের আওতায় আনতে সক্রিয় ছিল। তাঁরা ইংরাজ জাতিকে পৃথিবীর 'মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা সুসভ্য জাতি' বিবেচনা করে আধুনিকীকরণের প্রাচ্যবাদী কর্মসূচীর ঠিক বিপরীত পন্থায় ইংরাজ জাতিভক্ত কর্মসূচীর রূপরেখাটি ভারতে অঙ্কন করেছিলেন। সভ্যতা-সংস্কৃতির সার্বজনীন উত্তরাধিকারের প্রত্যয় তাঁরা অবাস্তব বিবেচনা করে ইংরাজ জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতিকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচারে নেমেছিলেন। আধুনিকীকরণের পথপরিক্রমায় 'পাশপোর্ট' বা অনুমতিপত্র লাভের জন্য মেকলে এশিয়াবাসীদের ইংরাজদের মত পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে, খাবার-দাবার খেতে, কথাবার্তা বলতে এবং আচার-আচরণে অভ্যস্ত হতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বেন্টিঙ্ক ও মেকলে **সাহিত্যধর্মী** (বিজ্ঞানধর্মী নয়) শিক্ষানীতির মাধ্যমে ব্রিটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতির পদচিহ্ন ধরে ভারতীয় জনজীবনকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার অমরাবতীতে। ভারতকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার পরিকল্পনাও তাঁদের ছিল। কৌশলগত কারণে ও সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁরা তাঁদের শিক্ষানীতিতে ধর্মান্তরের কথা সরাসরি বলেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন, ইংরাজী সাহিত্যপাঠের মধ্য দিয়ে ভারতবাসীর হৃদয়ে মানবতাবাদী গুণগুলির স্ফুরণ ঘটবে এবং তখন তাঁদের হৃদয়মন খ্রীস্টের অমৃতময় বাণীর জন্য সতৃষ্ণ হয়ে উঠবে। ইউরোপীয় **রেনেসাঁ**,

শিক্ষাদীক্ষার বিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের নিবিড়-জটিল ইতিবাচক সম্পর্কটি মেকলে ও বেন্টিঙ্ককে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোয় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতে আলোকউদ্ভাস সৃষ্টির যে উচ্চাশা মেকলের শিক্ষাসংক্রান্ত বয়ানে (১৮৩৩) প্রতিবিম্বিত হয়েছিল তা আসলে ভিক্টোরীয় যুগের বুদ্ধিজীবীর গালভরা আলঙ্কারিক বুলিতে সাম্রাজ্যবাদী আর্থনীতিক প্রয়োজনের তাগিদ ও ভারতীয়দের ব্রিটিশ-নির্দেশিত পথে মঙ্গলবিধানের আশাবাদের কায়ারূপ ছিল মাত্র।

বিজ্ঞানচর্চা, গণশিক্ষা, ধর্মসংস্কৃতি : রামমোহনের বক্তব্য

রামমোহন রায় প্রাচ্যবাদী বা প্রতীচ্যবাদী শিক্ষনীতির কোনটিকেই পুরোপুরি সমর্থন করেননি।

ভারতের 'পশ্চাৎপদ জনমনের সঙ্গে মানবমনের সংযোগ সাধনকল্পে' তিনি পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার অবাধ সুযোগ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্ট'কে লিখিত একটি পত্রে তিনি বেকনের শিক্ষাদর্শ ভারতে রূপায়ণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন : 'যদি প্রকৃত জ্ঞানের আলো থেকে ব্রিটিশ জাতিকে বঞ্চিত রাখা উদ্দেশ্য হত, তাহলে 'স্কুলমেন'-দের অজ্ঞানতা বজায় রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থাকে হঠিয়ে দিতে বেকনের দর্শনকে অনুমতি দেওয়া হত না। যদি ব্রিটিশ আইনসভার নীতি হত ভারতবাসীকে অজ্ঞানতার তিমিরে রাখা, তবে অনুরূপ সর্বোত্তম ব্যবস্থা হত সংস্কৃত শিক্ষা। যেহেতু দেশীয় জনগণের উন্নতিবিধান সরকারের উদ্দেশ্য, সেজন্য সরকার অঙ্ক, প্রকৃতি-বিদ্যাসংক্রান্ত দর্শন, রসায়ন, শারীরসংস্থানবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান নিয়ে আরও উদার ও আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলবে (আশা করা যায়)।'[16]

স্পষ্ট বোঝা যায়, রামমোহন **জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার কাম্য** মনে করেছিলেন। তাঁর ইঙ্গ-ভারত বিদ্যার মহা-পাঠশালায় এই কারণে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও উপদলগত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে থাকার ঔদার্য একই কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, রামমোহন বিলক্ষণ জানতেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া শিক্ষার গণভিত্তি রচিত হতে পারে না। আবার ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সংস্কৃত ভাষার

গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি উভয় ভাষার ব্যবহারেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বাংলা ভাষাকে তিনি গ্র্যানাইট ভিত্তির উপর সংস্থাপিক করেছিলেন। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, সাধারণ মানুষের কথ্য বাংলাকে কোনরূপ আমল না দিয়ে শুধুমাত্র সাধুভাষার উপর নির্ভর করে তিনি জনশিক্ষার ব্যাপারে শ্লথ গতি এনে দিয়েছিলেন। মার্টিন লুথারের জার্মান কথ্য ভাষার প্রতি প্রীতির মত কোন অনুরাগ কথ্য বাংলার প্রতি রামমোহনের ছিল না।[17]

অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও রামমোহন অবাধ অধিকার নীতির পূর্ণ সমর্থক ছিলেন না। তিনি মনে করতেন যে, 'দেশের নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার বিকাশ এবং উন্মেষের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা কার্যকর।'[18]

বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতির বিজয়বৈজয়ন্তী

রামমোহনের শিক্ষানীতি সংক্রান্ত বক্তব্য, হিতবাদী কিম্বা প্রাচ্যবাদী অভিমত কোনটিই ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। মেকলে-বেন্টিঙ্কের ইংরাজী সাহিত্যনির্ভর শিক্ষানীতি ১৮৩৫ সাল থেকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার মৌল নীতি হিসাবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে।

কিন্তু স্মরণ করা কর্তব্য যে, ১৮৩৫ সালে গৃহীত শিক্ষানীতি মেকলের ভিক্টোরীয় রীতির অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাগাড়ম্বরপূর্ণ ইংরাজীর দৌলতে প্রাচ্যবাদীদের বক্তব্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেনি, করেছিল ভারতের ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক পরিবেশের দৌলতে। উচ্চশিক্ষার বাহন হিসাবে ইংরাজী ভাষার বিজয় প্রধানত দুটি কারণে সম্ভব হয়: ১. শাসক জাতির ভাষাকে শাসিত জাতি আর্থনীতিক স্বার্থের কারণে গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করে; ২. উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সমকালীন ইউরোপের সমাজ-প্রগতির আদর্শ ভারতে রূপায়িত করার তাগিদে ইংরাজী ভাষাকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সুবিধাজনক মনে করেন।

ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিক থেকেই 'বাবু' সম্প্রদায়ের ব্যবসাগত বা চাকুরিগত স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে

জড়িত ছিল। বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি প্রচলনের বহু আগে ভারতের কয়েকটি বন্দরনগরে ইংরাজী স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৪-১৫ সালের মধ্যে চুঁচুড়া ও আশপাশ অঞ্চলে রবার্ট মে সতেরটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন। 'কোলকাতা বুক সোসাইটি', 'কোলকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বহু অনুরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ ও বিশপ্‌স কলেজ যথাক্রমে ১৮১৮ ও ১৮১৯ সালে স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন ইংরাজী তথা খ্রীস্টীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ড্রমণ্ড, শেরবোর্ন মার্টিন বাউলে, আরাটুন পিটার্স প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ইঙ্গ-ভারতীয় বিদ্যালয়গুলি ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জয়নারায়ণ ঘোষাল বারাণসীতে ঐ ধরনের একটি শিক্ষায়তন গড়ে তুলেছিলেন। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায় ইংরাজী বিদ্যায়তন স্থাপন ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের বহু ধরনের প্রয়াসের সাথে যুক্ত ছিলেন। বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি প্রবর্তনের অনেক আগে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে) বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ ও তাগিদ সৃষ্টি হয়েছিল। বোম্বে ও মাদ্রাজে কম-বেশী অনুরূপ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমী শিক্ষার বিকাশে ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটি—১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি স্থাপিত হিন্দু কলেজ—ঔপনিবেশিক শাসনের ছত্রছায়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য বা জমির মালিকানায় লাভবান বিত্তশালী 'বাবু' সম্প্রদায়ের অগ্রণী সদস্যদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই ঐ শিক্ষায়তন ইঙ্গ-ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ঘোষিত আদর্শের দিকে না গিয়ে ইংরাজী শিক্ষা ও পশ্চিমীকরণের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।[19]

মেকলে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করার আগেই ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে শক্তি ভারতে জোরদার হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশের তৈরী ঔপনিবেশিক ভারতের বাজারে অংশগ্রহণ করে লাভবান বা ভূমিস্বত্ব থেকে লব্ধ আয়ে বিত্তবান, শহুরে ধনী ব্যক্তিরা শাসক জাতির ভাষায় শিক্ষালাভ করা জরুরী মনে করেছিলেন। তাছাড়া, ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদারনৈতিক চিন্তাধারা, সামাজিক গুরুত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির হাতছানিতে তাঁরা আসক্ত হয়ে

নিজেদের অনুরূপভাবে গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষা ঐ গড়ার কাজে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হয়েছিল।

মেকলে বুঝেছিলেন যে, ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে রক্ষণশীল ও উদারনীতিভক্ত হিন্দুদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। তিনি বলেছিলেন: 'দেশীয় সমাজকে একা ছেড়ে দিলে আমাদের কোন অসুবিধার (ইংরাজী প্রবর্তনের ব্যাপারে) সম্মুখীন হতে হবে না; যা কিছু ওজর আপত্তি আসবে কৃত্রিম উপায়ে আমাদেরই তৈরী করা ও লালনপালনে শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রাচ্যবাদী স্বার্থের তরফ থেকে।'

বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি বিজ্ঞানধর্মী শিক্ষার পরিবর্তে সাহিত্যধর্মী ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত করে শাসিত জাতির চিন্তা ও মননের জগতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ছাড়পত্র দেয়। ঐ নীতি মাতৃভাষার মাধ্যমে গণভিত্তিক শিক্ষার পরিবর্তে বিত্তশালী দেশীয় ভদ্রলোকদের স্বার্থের অনুকূল ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলন করে। আশা প্রকাশ করা হয়, নব্য শিক্ষিত, ইংরাজ ভাবধারায় প্রভাবিত ভারতীয়গণ স্বদেশবাসী ও ব্রিটিশ জনসাধারণের মধ্যে দৌত্যের কাজে ব্যাপৃত থাকবে। রামমোহনের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানভিত্তিক, ইংরাজী ভাষা-মাধ্যম শিক্ষানীতি বেন্টিঙ্ক-মেকলের 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' অনুসারী শিক্ষাব্যবস্থায় কোনরূপ স্থানলাভ করেনি।

নিম্নতন বা প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাদানে লিপ্ত গ্রামাঞ্চলের দেশীয় স্কুলগুলি সরকারী উৎসাহ ও অর্থসাহায্য না পেয়ে বিপন্ন হয়ে পড়তে থাকে। যুগের প্রয়োজনের সাথে সম্পর্ক বর্জিত, প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারী এই শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণে কোনরূপ সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলিতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত পশ্চিমী শিক্ষার জ্ঞানপ্রবাহ ধীরে ধীরে অজস্র ধারায় বিভক্ত হয়ে গ্রাম-ভারতকে এই কারণে সিঞ্চিত করে তুলতে পারেনি। ঔপনিবেশিক স্বার্থের পরিমণ্ডলে গৃহীত পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ঘোষিত আদর্শ ভারতের গ্রামগুলিতে রূপায়িত করার সাগ্রহ প্রয়াসের অনুপস্থিতিতে বন্ধ্যা হয়ে পড়েছিল।

বোম্বেতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আদর্শ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কলেজ স্তরে অবশ্য একমাত্র ইংরাজীকেই শিক্ষা-দানের বাহন করে তোলা হয়েছিল। বোর্ড অফ এডুকেশনের ভারতীয় অন্যতম সদস্য জগন্নাথ শঙ্করশেঠ লিখিত বক্তব্যে বলেছিলেন যে, 'পশ্চিম

ভারতের জনগণের কাছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান পৌঁছে দিতে ইংরাজীর তুলনায় মাতৃভাষাগুলির সুবিধাগুলি শ্রেষ্ঠতর।… …আমি ইংরাজী অধ্যয়নের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করতে চাই না একটুকুও, কিন্তু আমি মনে করি বিপুল সংখ্যক জনগণের নাগালের বাইরে (ঐ শিক্ষা)।'[৪০]

চার্লস উডের প্রতিবেদন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা

ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে ১৮৫৪ সালের উড ও ব্যারিং রচিত প্রতিবেদন প্রথম পর্যায়ের সরকারী কার্যক্রমের রূপরেখাটিকে সম্পূর্ণ করে। বেন্টিঙ্ক-মেকলের শিক্ষানীতি এবং উডের শিক্ষানীতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধ্যানধারণার শিক্ষাসংক্রান্ত স্বরূপটিকে স্পষ্ট করে তুলেছিল।

১৮৫৪ সালের ৯ই জুলাই কোম্পানির পরিচালকদের স্বাক্ষরিত উড ও ব্যারিং রচিত রয়ান (উডের প্রতিবেদন নামে পরিচিত) দীর্ঘকাল ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দিকনির্ণয় করে যুগপৎ প্রশংসা ও অপ্রশংসার বিষয় হয়ে উঠেছিল।

উডের প্রতিবেদন ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ম্যাগ্‌না কার্টা এবং 'চিন্তা ও মননের দলিল' হিসাবে বহুল পরিচিতি লাভ করে। ঐ প্রতিবেদন রচনার আশি বছর বাদে স্যর এস. পি. হারটগ দলিলটিকে 'শিক্ষার প্রশাসনিক ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞজনোচিত ও গণতান্ত্রিক দলিলগুলির অন্যতম' বলে অভিহিত করেছিলেন।[৪১]

বেন্টিঙ্ক-মেকলের সময় থেকে ডাফ, মার্শম্যান, ট্রেভেলিয়ান ও ক্যামেরন পর্যন্ত অনেকে ইংরাজীর মাধ্যমে একমাত্র উচ্চশিক্ষা সম্ভব বলে মনে করেছিলেন। এই শিক্ষাকে তাঁরা 'মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীগুলির' জন্য নির্দিষ্ট করতে চেয়েছিলেন, আর সাধারণ বা মাতৃভাষাগুলির মাধ্যমে নিম্নমানের শিক্ষাকে তাঁরা 'বিশাল জনতার' জন্য ব্যবহার করার পক্ষপাতী ছিলেন। 'দুই শ্রেণীর শিক্ষায়তনের ভাষাভিত্তিক বৈষম্যের তত্ত্বটি' উড বজায় রাখতে অনাগ্রহী ছিলেন। মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ইংরাজী ও আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যম উভয়ই গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি আপাতত ইংরাজী বজায় রেখে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশের জন্য উৎসাহ ও সাহায্যদানের নীতি গ্রহণের সুপারিশ করেছিলেন।

কলেজ পর্যায়ে আপাতত ইংরাজীতে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে তিনি মনে করেছিলেন। ভারতীয় ভাষাগুলির মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষাদান ব্যবস্থার ভাবী রূপরেখা রচনা করে উড ঔপনিবেশিক শাসক ও ভারতীয় জনতার মধ্যবর্তী পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাখ্যাকার একটি ভারতীয় 'শ্রেণী' সৃষ্টির তত্ত্বটির বিরোধিতা করেছিলেন বলে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২২]

উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষাতেও সম্ভব করে তোলার পরিকল্পনা উড ভারতীয় আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির দাবির তাগিদেই ভাবনাচিন্তার মধ্যে এনেছিলেন। তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত নীতির মূলকথা ছিল, ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে অঙ্গাঙ্গী করে তোলা। পশ্চিমী জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত, মুষ্টিমেয় ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের মাধ্যমে ভারতীয় জনসমাজকে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত করে তোলা অসম্ভব বলে তাঁর মনে হয়েছিল। ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পে নূতন কর্মোদ্যোগ আনয়নে তিনি মাতৃভাষা ও ইংরাজী উভয় ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ভারতে উন্নতমানের বিচারক, ইঞ্জিনীয়ার, পুলিশ কর্মচারী, কেরানী, গ্রামীণ হিসাবরক্ষক, জরীপের কাজে পারদর্শী ব্যক্তি, রেলওয়ে কর্মী প্রভৃতি পর্যাপ্ত সংখ্যায় সহজলভ্য ছিল না বলে উড ভারতীয় ভাষাগুলির সাহায্যে শিক্ষিত লোকজন ভারতীয় অর্থনীতি ও প্রশাসনের পক্ষে অচিরে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে বিবেচনা করেছিলেন। উডের প্রতিবেদনের চার নম্বর অনুচ্ছেদে 'ভারতের দেশীয় জনসাধারণকে শ্রম ও মূলধন ব্যবহারের আশ্চর্যজনক ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা', 'স্বদেশের বিপুল ধনসম্পদ বৃদ্ধিতে' উৎসাহিত করা এবং 'ধনসম্পত্তি ও বাণিজ্যের সুযোগসুবিধায়' তাঁদের অংশীদার করে তোলার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছিল।[২৪]

উড রচিত শিক্ষানীতির প্রধানতম দুর্বলতা ছিল এই, তিনি মধ্য-ভিক্টোরিয়ান যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগ কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় ক্রিয়াশীল না থাকলে উড সরকারী অর্থসাহায্য দানের বিরোধী ছিলেন। অথচ সমকালীন ভারতে সরকারী অর্থসাহায্য ছাড়া শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ অলীক স্বপ্নে পর্যবসিত হতে বাধ্য ছিল। ভারতীয়দের আর্থিক দুরবস্থা তাঁদের আত্মশক্তি উন্নয়নের

প্রতিকূল ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ দমনে প্রভূত অর্থব্যয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষানীতি সরকারী অর্থসাহায্যের পরিমাণকে এতই কৃপণ দানে রূপান্তরিত করে যে, উডের নীতি ঈপ্সিত ফললাভে বঞ্চিত হয়েছিল।

উডের শিক্ষানীতির উদারনৈতিক বহিরঙ্গের অন্তরালে **সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল।** তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি সম্প্রসারিত হলে 'আমাদের কারখানা-মালিক' ও 'ব্রিটিশ শ্রমিকদের তৈরী জিনিসপত্রের জন্য প্রায় অফুরন্ত বাজার সৃষ্টি করবে।'[21] তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী (বিশেষ করে বাঙালী) 'বিপথগামী, বিরোধী ও বিক্ষুব্ধ' হয়ে উঠতে পারে। এরূপ সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার অন্যতম উপায় হিসাবে তিনি কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে জন্মাবধি পঙ্গু করে রাখার জন্য সরকারী অর্থসাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখার কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিল।

সর্বশেষে উল্লেখ্য, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নীতি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ মনেপ্রাণে কখনো গ্রহণ করেনি এবং ঐগুলির উন্নয়ন বা বিস্তারে কোনরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। বেন্টিঙ্ক-মেকলে শিক্ষানীতি ইউরোপীয় রেনেসাঁর হাতছানি ভুল বুঝে ভারতীয় জনগণকে পশ্চিমীকরণের ভ্রান্ত পথনির্দেশ দিয়েছিল; উডের শিক্ষানীতি ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি ও প্রশাসনের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের শুভ পরিণয় ঘটাতে চেয়েছিল। ভিক্টোরীয় যুগের প্রথম ও মধ্যভাগের এই দুই শিক্ষানীতি ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রেরণাকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকলাঙ্গ করে তোলে।

সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে বোম্বে, কোলকাতা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল; পরবর্তী কুড়ি বৎসর শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। বিগত শতাব্দীর সত্তর-আশির দশক থেকে খ্রীস্টান মিশনারি, প্রগতিশীল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও সরকারী শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস তুলনামূলকভাবে দ্রুতগতি লাভ করে। ভারতীয়দের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্য

নিয়ে তিলক ও আগরকর সত্তরের দশকে বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে 'ডেকান এডুকেশন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত ছিল এমন নয়, এই সোসাইটির কর্মপরিচালনায় জাতীয় প্রগতি ও স্বাধীনতার পূজারী বহু ভারতীয় নেতা শিক্ষানবীশ থেকে সংগ্রামী ভাবী দিনগুলির রসদ সংগ্রহ করেছিলেন। গোখেল ও তিলকের অংশগ্রহণে এই প্রতিষ্ঠানটি ধন্য হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বিজাপুরকর তেলগাঁওতে কারিগরী শিক্ষার জন্য 'রাষ্ট্রীয় স্কুল' স্থাপন করেন। ভারতীয় প্রয়াসে গঠিত শিল্পগুলির কারিগরী নৈপুণ্যের জন্য বিদেশীদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এই স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই স্কুলটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা বা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনের ভারতীয় পরবর্তী প্রয়াসগুলির জনক ছিল বলা যায়। বিদ্যাপীঠ বা ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনার পূর্বসূরী হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্কুলের নাম উল্লেখ করা যায়।

১৮৮০ থেকে ১৯০২ সালের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রসংখ্যা সব কিছু ক্রমবর্ধমান গতি বজায় রাখে। মাতৃভাষা-নির্ভর দেশীয় স্কুলগুলির উন্নতি কিন্তু রুদ্ধ হয়ে যায়। সরকারী অর্থসাহায্য বন্ধ হলে এবং সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এরূপ স্কুলগুলির শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক মনোভাব গ্রহণ করলে দেশীয় শিক্ষার ধারাটি অবলুপ্ত হতে থাকে।

পশ্চিমী শিক্ষার ফলশ্রুতি : কার্জন ও জঙ্গী জাতীয়তাবাদীদের অভিমত

বিগত শতাব্দীর শেষদিকে জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন। তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরাজী শিক্ষাকে ভারতীয় জাতীয়তাবিরোধী ও মূল্যবোধগুলির পরিপন্থী বলে বর্ণনা করেছিলেন।

ভিন্নতর কারণে হলেও ভারতে ইংরাজী শিক্ষার কুফল সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা লর্ড কার্জন ১৯০১ সালের সিমলা সম্মেলনে তাঁর ধারণা বিবৃত করেন। তাঁর মতে ইংরাজী শিক্ষা ভারতে

একদল উচ্চাভিলাষী এবং পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণপ্রিয়, শক্তিশালী একটি গোষ্ঠী তৈরীতে নিয়োজিত ছিল। আশ্চর্য মনে হলেও সত্য, মন্দির-মসজিদ সংরক্ষক, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কার্জন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রাচ্যবাদী সমর্থকের বাহ্য প্রকাশেও আবির্ভূত হয়েছিলেন।

লর্ড কার্জনের ১৯০৪ সালের 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সরকার-মনোনীত 'ফেলো'-দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কলেজগুলির অনুমোদন, অনুমোদন প্রত্যাহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাহ্রাস ঘটিয়ে সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটান হয়েছিল। এক কথায়, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী বিভাগের অনুরূপ অধস্তন মর্যাদায় হীনমন্য করে তোলার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী অনুদান নীতি ১৯০৪ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে এমনভাবে সংশোধিত হয় যে, শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে হীনবল হয়ে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার গোখেল আনীত প্রস্তাব (প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ম্যাগ্‌না কার্টা নামে পরিচিত) গভর্নর জেনারেলের আইন পরিষদে এই সময় বাতিল হয়ে যায়। শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষের সপক্ষে বাগাড়ম্বর বিস্তার করে লর্ড কার্জন আসলে শিক্ষা সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

রুডিয়ার্ড কীপলিঙ্, অ্যালফ্রেড লায়াল, স্যর মনিয়র উইলিয়মস, ডেভিস রীস্ ও ফরাসী পুরাতত্ত্ববিদ লি বঁ-র মতামতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। লায়ালের মতে ইংরাজী শিক্ষা ভারতীয়দের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তিকে দুর্বল করেছিল, মনিয়র উইলিয়মসের মতে ঐ শিক্ষা ভুঁইফোড়, স্বদেশী ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের সমান অধিকার ভোগের কল্পনায় আচ্ছন্ন একদল মানুষ তৈরীতে ব্যস্ত ছিল, লি বঁ-র মতে ঐ শিক্ষা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য করে তুলেছিল এবং ডেভিস রীসের ধারণায় ইংরাজী-মাধ্যম স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা একদল বিক্ষোভকারী ও সমাজতন্ত্রের গোলক-ধাঁধায় আবদ্ধ মানুষ সৃষ্টিতে ব্যাপৃত ছিল। কার্জনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী-কালের এরূপ মতামতের সাথে কার্জনের মতামতের বিশেষ পার্থক্য যেমন ছিল না, জঙ্গী জাতীয়তাবাদী অভিমতেরও খুব একটা বৈসাদৃশ্য ছিল না।[25]

দ্বৈত শাসনের যুগ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় শিক্ষা

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে শিক্ষার বিষয়টি প্রাদেশিক স্তরে 'হস্তান্তরিত' বলে বিবেচিত হয়। ভারতীয় মন্ত্রীদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-বিস্তারের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং ঐকান্তিকতার সাথে রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে। আবশ্যিক শিক্ষার আইন বহু প্রদেশে পাশ হয়; ১৯২৭ পর্যন্ত ঐ আইনগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বাধার সম্মুখীন হয়নি। কিন্তু ১৯২৭ সালের পরবর্তী সময়ে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে অধোগমন লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক মন্দার ফলে অর্থাভাব ঘটলে প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত নানাবিধ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হতে থাকে। হার্টগ কমিটির একটি সুপারিশ প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐ কমিটি শিক্ষাবিস্তারের পরিবর্তে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার সংহতি সাধনের পরামর্শ দেয়।

১৯২১-২২ থেকে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৫৫,০১৭ থেকে ১,৯২,২৪৪, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭,৫৩০ থেকে ১৩,০৫৬, কলাশিক্ষার কলেজগুলির সংখ্যা ১৬৫ থেকে ২৭১, বৃত্তিশিক্ষার কলেজগুলির সংখ্যা ৬৪ থেকে ৭৫, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির সংখ্যা ১০ থেকে ১৫, বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩,৩৪৪ থেকে ৫,৬৪৭ এবং অনমুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৬,৩২২ থেকে ১৬,৬৪০-এ পৌছয়।[২৬]

এরূপ অগ্রগতির কারণ ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সমকালীন ভারতে তীব্রতর হয়েছিল, শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় মন্ত্রীদের জাতীয়তা-বাদী দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষাকে জনসাধারণের দুয়ারে নিয়ে যেতে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতৃবৃন্দের একাংশ ও মনীষী বা শিক্ষাবিদ্‌দের কেউ কেউ এই সময়ে সুষ্ঠু শিক্ষানীতির সন্ধানে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষায় লিপ্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী, ধুন্দুকেশব কার্ভের এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, তিলকের মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এরূপ কাজে নিয়োজিত

প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিপুল সংখ্যক ভারতীয় ছাত্র আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারী ব্রিটিশ সওদাগরী অফিসগুলিতে চাকুরিপ্রার্থী হয়ে নিরাশ হতেন।

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ঐ আইনের বিরোধিতা করে; শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঐ আইনের প্রদেশসংক্রান্ত অংশগুলি কার্যকর করতে সম্মত হয়। ১৯৩৭ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ মনযোগী হয়। কোন কোন কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশ গান্ধীবাদী আদর্শের ভিত্তিতে রচিত 'বিদ্যামন্দির শিক্ষা পরিকল্পনা' রূপায়ণে অগ্রসর হলে কোন কোন অ-হিন্দু সম্প্রদায় ও ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় শিক্ষার ব্যাপ্তি বা উৎকর্ষ কোন দিকেই লক্ষ্য দেওয়া ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুদ্ধপ্রয়াস পরিচালনা ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কে ঐ কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধ ঘটলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রদেশগুলির শাসনভার পরিত্যাগ করে। কংগ্রেস মুসলিম লীগ সম্পর্ক, বিশ্বযুদ্ধ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নানা কৌশল এবং ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের গতিপথ ইত্যাদি প্রাক-স্বাধীনতা বৎসরগুলিতে শিক্ষার বিষয়টিকে গৌণ গুরুত্বের বিষয় করে তোলে।

মুসলমান সম্প্রদায় ও পশ্চিমী শিক্ষা: হাতেখড়ি

ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় যুগোপযোগী শিক্ষা ও সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার হাতেখড়ি লাভ করে স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খানের ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত আলীগড় অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে। ১৮৯০ সালে ঐ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষিত ইসলাম ও পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অচিরেই সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষিত মুসলমানদের মনোভাব গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে 'নব-

জাগরণের' সূচনা করে। এই নবজাগরণ বিলম্বিত হলেও বিশেষ শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। পাঁচ-ছয়টি দশক করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি এমন একটি আন্দোলনের পুরোধা হয়ে দাঁড়ায় যা ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আশ্চর্যের কিছু নেই, সমকালীন মুসলমান নেতৃবৃন্দের অনেকেই এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যুক্ত ছিলেন বা তাদের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, আলীগড় আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুটি ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন-চারটি দশক ধরে মুসলমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক সত্তার সংজ্ঞা নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল। এই আন্দোলন ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তন করেছিল। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে সারা ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজ সংস্কারের তাগিদ সৃষ্টিতে এই আন্দোলন বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বহু বিবাহের অভিশাপ ও বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ প্রথা ও অনুশাসনের বেড়াজাল ছিন্ন করতে এই আন্দোলন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধেও এই আন্দোলন সোচ্চার হয়েছিল।

'আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন'

আলীগড় আন্দোলনের ঢেউ আলীগড়ের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বোম্বে, পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়ে তরঙ্গাভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অন্ধ অসন্তোষ, পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনীহা এবং কালের যাত্রায় রুদ্ধগতি ইসলামী ধর্মসংস্কৃতির পিছুটানে হিন্দুদের তুলনায় পশ্চাৎপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানদের জন্য পশ্চিমী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, ধর্মীয় শিক্ষার নয়।[৪৭] স্বভাবতই রক্ষণশীল উলেমা এই শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকে। এমন কি স্যর সৈয়দ আহ্মদের অনুরাগীদের মধ্যেও কেউ কেউ আলীগড় শিক্ষানীতির বিরোধী হয়ে ওঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে একথা অনস্বীকার্য যে, প্রথম কয়েকটি দশক জুড়ে আলীগড় শিক্ষানীতি বিশেষ কোন ধর্মীয় শিক্ষার কোটরে আশ্রয় না নিয়ে আধুনিক পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদার নভোমণ্ডলে পক্ষবিস্তারে সচেষ্ট ছিল। ডব্লিউ. এইচ্.

শ্রীম্যান মন্তব্য করেছিলেন যে, 'এই শিক্ষানীতির ফলে মুসলমান যুবক সাত বৎসর পড়াশুনার পর যে-মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধেন তা জ্ঞানের তিনটি বিভাগের নানা বিষয় নিয়ে উত্তমরূপে পূর্ণ হয়ে সদ্য অক্সফোর্ড থেকে পাশ করা ছাত্রের মাথারই অনুরূপ হয়ে ওঠে। তিনি অনর্গল সক্রেটিস ও অ্যারিস্টট্‌ল, প্লেটো ও হিপ্পোক্রেটিস এবং গ্যালেন ও অ্যাভিকেনা সম্পর্কে কথা বলতে পারেন।'[২৪]

আলীগড় কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের শিক্ষাগত স্বার্থ চরিতার্থ করতে শুধুমাত্র ব্যাপৃত ছিল এমন নয়, তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতেও নিযুক্ত ছিল। এরূপ প্রয়াসের সাথে সাথে ক্রমে ক্রমে সর্বভারতীয়তার বিরোধী সঙ্কীর্ণ, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ রক্ষার আবেগ ও তাগিদও সংযুক্ত হয়ে পড়ে। ঐ কলেজের ব্রিটিশ অধ্যক্ষদের মধ্যে কেউ কেউ সরাসরি হিন্দুবিরোধী কার্যক্রম অনুসরণে মুসলমান সম্প্রদায়কে প্ররোচনা দিতে তৎপর ছিলেন। ১৯০৬ সালের পয়লা অক্টোবর যে মুসলমান প্রতিনিধিদল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিল তা আলীগড়ের ব্রিটিশ অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড সাহেবের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আদিযুগে লর্ড ডাফ্‌রিন ও অ্যালান অক্টেভিয়াস হিউম ভারতীয় অসন্তোষকে শৃঙ্খলবদ্ধ করে আইনানুগ নিরাপদ বিরোধিতা সৃষ্টির যে দ্বান্দ্বিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তারই নমুনা অনুসরণ করে দ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির অভিপ্রায়ে আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কতিপয় প্রভাবশালী ইংরাজ ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দুর রাজনৈতিক-আর্থনীতিক অগ্রগতির অসম হারের মূলধন কাজে লাগিয়ে তথাকথিত স্বতন্ত্র মুসলমান স্বার্থের দরদী হিসাবে আবির্ভূত হন। আলীগড় কলেজের মুসলমান কর্তাব্যক্তিদের মধ্যেও অনেকে মুসলমান স্বার্থকে হিন্দু স্বার্থ থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে থাকেন। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের বিশ্বস্ত অনুগামী আলীগড় কলেজের সেক্রেটারি নবাব ভিকার-উল্‌-মুল্‌ক বলেছিলেন, 'আমরা সংখ্যাগত দিক থেকে অন্য সম্প্রদায়টির এক-পঞ্চমাংশ। যদি কোন সময়, ব্রিটিশ সরকারের অস্তিত্ব ভারতে না থাকে, তবে হিন্দুদের প্রজা হিসাবে আমাদের জীবন যাপন করতে হবে। আমাদের জীবন, সম্পত্তি, আত্মসম্মান, ধর্ম সব কিছুই বিপন্ন হয়ে উঠবে।'[২৫]

পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাথে সাথে সর্বভারতীয় জাতীয়তবাদের পরিপন্থী একটি সাম্প্রদায়িক মনোভাব আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয়

সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সাথে কলেবর বৃদ্ধি করে। ত্রিশের দশক ও চল্লিশের দশকে মুসলিম লীগ নির্বাচনের সময় নিজ আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কাজে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজকে বিশেষভাবে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। কংগ্রেসী প্রাদেশিক সরকারগুলি সম্পর্কে বিরূপ প্রচারে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ ত্রিশের দশকের শেষার্ধে আলীগড়ের ছাত্রদের সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে বড়লাটের জাতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থায় যোগদান করে ব্রিটিশ যুদ্ধপ্রয়াসে সহায়তা করলে পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট দলের বিরুদ্ধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করে। ১৯৪৫-৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনগুলিতে আলীগড় ছাত্রসমাজের ভূমিকা আরও বেশী জোরদার হয়ে ওঠে। জামিল-উদ্দীন আহ্‌মদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার মুসলমান ছাত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষাশিবিরে তালিম নিয়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে মুসলিম লীগের রাজনীতি প্রচারে ছড়িয়ে পড়েছিল।[30] ছাত্রনেতাদের সাথে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অব্যাহত ছিল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া

গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির দিনগুলিতে ব্রিটিশ সাহায্যপুষ্ট আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য ছাত্রসমাজের কাছে আবেদন জানালে ১৯২০ সালে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসর থেকে স্বাধীনতা লাভের বৎসর পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি গান্ধীর শিক্ষানীতি ও ভারতীয় জাতীয়তার প্রতি মুসলমান আনুগত্যের মূর্ত প্রকাশে ধন্য হয়।

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে আগ্রহী মুসলমানদের পরিচালনায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া গান্ধী ও কংগ্রেসের শিক্ষানীতি রূপায়ণে নিয়োজিত থাকে। ১৯২৪ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বৎসরগুলিতে বহু মুসলমান তাঁদের আনুগত্য প্রত্যাহার করেন, অর্থ-সাহায্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু, কিছু সংখ্যক মুসলমান তাঁদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে আজীবন কর্মসাধনায় লিপ্ত থাকেন। স্বধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন বঞ্চিত হয়েও তাঁরা অনলস সাধনায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতির প্রভাবমুক্ত থেকে স্বদেশী, স্বাধীন একটি শিক্ষানীতি রূপায়ণে

ব্যাপৃত থাকেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষদুষ্ট দিনগুলিতেও তাঁরা কর্তব্যচ্যুত হননি।

জামিয়া মিলিয়ার অধ্যক্ষপদ গ্রহণে মহম্মদ ইকবাল অস্বীকৃত হলে মোহাম্মদ আলী ঐ পদে বৃত হন। গান্ধীবাদী শিক্ষাদর্শ জামিয়া মিলিয়ার পাঠসূচীতে তিনি সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়। গান্ধী ও আলীর দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য ছিল। গান্ধীর কর্মজীবন, নৈতিক জীবন ও রাজনৈতিক জীবন—সব কিছু অহিংসা ও সত্যের প্রতি আগ্রহে শুভ্র, দৃপ্ত প্রকাশে ধন্য হয়ে মহাজীবনের একটি বৃহৎ বৃত্ত রচনায় ক্রিয়াশীল ছিল। আর মোহাম্মদ আলী আজীবন ইসলামীয় ধর্মসংস্কৃতির অন্তর্বৃত্তে স্থায়ী আবাস গড়ে তুলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বহির্বৃত্তে যাতায়াত করেছিলেন মাত্র।[৭১] শিবলী নুমানির কোরাণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা, কোরাণ, ইসলামীয় ইতিহাস, ইকবালের কাব্যরচনা তিনি জামিয়া মিলিয়ার পাঠসূচীতে অবশ্যপাঠ্য করেছিলেন। 'ধর্মবিশ্বাসের যুক্তরাষ্ট্র' রচনা করা তাঁর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলেও তিনি ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন ধর্মে চূড়ান্ত সত্য নিহিত আছে বলে মনে করতেন না।

অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের ব্যর্থতার দুয়ারে মাথা কুটে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যখন বিভেদ, বিরোধ ও আত্ম-সমীক্ষায় ক্লান্ত, তখন থেকে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় বলা চলে। এই সময় এই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন হাকিম আজমল খান ও ডাঃ আনসারি। গান্ধী ভারতীয় সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে অহিংসা নীতিতে অবিচল যোদ্ধা তৈরী করার কাজে এই প্রতিষ্ঠানটির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দেন। তিনি তাঁর এক পুত্রকে এই প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠনের জন্য প্রেরণ করেন। জামিয়া মিলিয়া দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। ডাঃ আনসারির আবেদনে সাড়া দিয়ে জার্মানীতে গবেষণারত তিনজন কৃতী মুসলমান (জাকির হোসেন, মোহাম্মদ মুজিব ও এস. আবিদ হোসেন) এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির কার্যপরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। প্রভূত আত্মত্যাগ স্বীকারে ও ইস্পাতকঠিন সঙ্কল্পে শুদ্ধ হয়ে তাঁরা গান্ধীর গঠনমূলক কাজকর্মের পরিকল্পনা রূপায়ণে অগ্রসর হন। জাতীয় শিক্ষার বিস্তারে আজমল খান, আনসারি, জাকির হোসেন, মুজিব ও আবিদ হোসেনের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কিন্তু, গান্ধী অনুসারী হয়েও তাঁরা মুসলমান সত্তা বিসর্জন দেননি। গান্ধীকে তাঁরা অনাগত স্বাধীন ভারতের

পথপ্রদর্শক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত হননি, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ সম্পর্কে ইকবাল-কল্পিত গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নে তাঁরা মোহিত হয়েছিলেন। তাঁরা অহিংসাকে সর্বাবস্থায় নিরঙ্কুশভাবে প্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে নিরামিষ আহার গ্রহণ তাঁরা অবশ্যই অনুকরণযোগ্য মনে করেননি। গান্ধীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের মনঃপুত হয়নি।[৪২]

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে লিপ্ত থাকা ছাড়াও একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলে। 'মক্তব-ই-জামিয়া' প্রধানত অনুবাদের কাজে নিযুক্ত থাকে। দর্শন ও সাহিত্যের অধ্যাপক এস. আবিদ হোসেন ইংরাজী ও জার্মান গ্রন্থের অনুবাদে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ডি. বোয়্যার রচিত 'হিস্ট্রি অফ ফিলজফি ইন ইসলাম', কান্টের 'ক্রিটিক্ অফ পিওর রিজ্‌ন', 'সিলেক্টেড্ ডায়লগ্‌স অফ প্লেটো', গ্যেটের 'ফাউস্ট' ও 'উইলহেল্‌ম মেইস্‌স্টার', জর্জ বার্নাড শ-র 'সেন্ট্ জোয়ান', স্প্র্যাংগারের 'সাইকোলজি অফ ইয়ুথ' এবং জওহরলাল নেহ্‌রুর 'গ্লিমসেস্ অফ ওয়ার্লড হিস্ট্রি' ও 'ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া'র অনুবাদ 'মক্তব-ই-জামিয়া' প্রকাশ করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে; সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়। জামিয়া মিলিয়া পরিস্থিতি বিবেচনা করে ক্রমেই প্রাথমিক শিক্ষার উপর অধিকতর দৃষ্টি দিতে থাকে। জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নূতনতর শিক্ষাদান পদ্ধতি ডঃ জাকির হোসেন গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। পরিকল্পনা রূপায়ণ ও শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের আদর্শে তিনি প্রাথমিক শিক্ষার রূপরেখা রচনা করেন।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত রেখে রাজনীতি থেকে দূরে অবস্থান করে। অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে এই দিকে এই প্রতিষ্ঠান নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। মহম্মদ ইকবাল, ফতিমা জিন্নাহ্, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, জওহরলাল নেহ্‌রু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছিলেন। আইন অমান্য, লবণ

সত্যাগ্রহ, হরিজন উন্নয়ন, সুতো কাটা, খাদিবস্ত্র বিক্রয় ইত্যাদি কাজে উৎসাহ প্রদর্শন না করেও এই প্রতিষ্ঠান গান্ধীবাদী চরিত্র বজায় রেখেছিল।

জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার শিক্ষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সীমিত সংখ্যক কৃতী মুসলমানের উদার, আদর্শনিষ্ঠ, ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ত্রিশ-চল্লিশের দশকের ভারতে বিষজর্জর সাম্প্রদায়িক মরুভূমিতে মরুদ্যানের স্বল্পপরিসর শান্ত স্নিগ্ধতার আবেশ আনে। এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বা শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নির্ধারণে সুস্থ ধারার প্রবর্তনে গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইংরাজী শিক্ষার আলোকবর্তিকা

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ ফলাফলের দিক থেকে ভারতে সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ধনতন্ত্রের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীতে বাণিজ্যিক মূলধন যখন ব্রিটেনে গড়ে উঠেছিল, চিন্তা ও মননের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখন সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি জানবার ও বুঝবার জন্য বিপুল প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই প্রয়াস সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান গতিতে অব্যাহত থেকে বিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়। বাস্তববাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ বেকন, জীববিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন, সমাজতত্ত্ববিদ স্পেন্সার, দার্শনিক লক্, দার্শনিক নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা উইলিয়ম গড্উইন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পূজারী জন স্টুয়ার্ট মিল্, আধুনিক ধনবিজ্ঞানের স্থপতি অ্যাডাম স্মিথ, পদার্থবিদ ও দার্শনিক নিউটন, সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অনলস যোদ্ধা কার্লাইল ও রাসকিন, শ্রমিকের ভূমিকা সচেতন অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো, আধুনিক যুগের প্রথিতযশা ঐতিহাসিক গিবন এবং বাক্‌ল, প্রথম শ্রেণীর সমাজতত্ত্ববিদ হব্‌হাউস, রীভার্স, গর্ডন চাইল্ড, দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ ব্রার্ট্র্যাণ্ড রাসেল, রাষ্ট্রবুদ্ধি ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ডিসরেলী ও গ্ল্যাড্‌স্টোন, বিবর্তনবাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও প্রাকৃতিক পদ্ধতির অপরূপ ব্যাখ্যাকার এইচ্. জি. ওয়েলস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অঙ্কুশ চালনায় সিদ্ধহস্ত নাট্যকার ও লেখক বার্নার্ড শ, জীববিজ্ঞানী অল্‌ডাস ও জুলিয়ান হাক্সলী এবং জে. বি. এস. হ্যালডেন প্রমুখ মনীষীদের বিচিত্র ও সর্বত্রগামী চিন্তা ও মনন আধুনিক বিশ্বসংস্কৃতির রূপরেখা রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়।

এই সংস্কৃতি যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, প্রকৃতি ও সমাজ বিষয়ক কৌতুহল, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি স্তম্ভগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের সুধারস ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তার বিশুষ্ক ভাবমন্দাকিনীতে নবপ্রাণের জোয়ার আনে। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতার দাবিতে জনমত গঠনে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সমাজদর্শন বিশেষভাবে সহায়ক হয়। অন্যদিকে ঐ শ্রেণীর যুক্তিবাদী জীবনদর্শন ভারতীয় সমাজের কুসংস্কার, নিয়তিবাদ, পরলোক বিশ্বাস ইত্যাদিকে আঘাতের পর আঘাত হেনে দুর্বল করে দেয়। বর্ণব্যবস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় জীবনদর্শনের স্বৈরতন্ত্রী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ সত্ত্বেও ইংরাজী শিক্ষা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সামনে গণতান্ত্রিক একটি উদ্দেশ্য উপস্থাপিত করে। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র, গণসমর্থনপুষ্ট প্রশাসন, ব্যাপক ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদান, কমিটি-কমিশন ইত্যাদিতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ, বাক্ স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি নানা দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ভারতীয়দের শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাহিত্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়েছিল এমন নয়। ইংরাজী অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁদের সমগ্র পশ্চিমী দর্শনের নানা ধারা-উপধারার পরিচয় লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে। ডেমোক্রিটাস, হেরাক্লিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, স্পিনোজা, দেঁকার্ত, লিব্‌নিজ, কাণ্ট, কোঁৎ, নীৎসে, ফয়ার-ব্যাখ্, হেগেল, বেনেদেত্তো ক্রোসে, অসওয়াল্ড স্পেঙ্গলার, কার্ল মার্কস, এঙ্গেল্‌স, লেনিন, প্রমুখ ব্যক্তিদের দার্শনিক তত্ত্বগুলি ভারতীয় চিন্তার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে। প্রাচীন গ্রীস, রেনেসাঁ যুগের ইতালী, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স ও উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ও রুশীয় সমাজদর্শনের প্রভাব শিক্ষিত ভারতীয় মননে অনুভূত হয়। প্লেটো, অ্যারিস্টটল, মেকিয়াভেলি, দিদেরো, হলব্যাখ্, হেলভেসিয়াস্, ভলটেয়ার, কোঁৎ, সেন্ট সাইমন, মার্কস, এঙ্গেল্‌স, বাকুনিন, প্রুধোঁ, ক্রপোট্‌কিন প্রভৃতি মনীষীদের সমাজসংস্কার বা সমাজ-বিপ্লবের ধ্যানধারণা ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয়রা বিপুল আগ্রহে অনুশীলন

করেন। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদের লেখা তো বটেই, অ-ব্রিটিশ আইনস্টাইন, ডিরাক্, শ্রোডিঙ্গার, হেসেনবার্গ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের রচনাও তাঁরা অনুধাবন করেন। ইংরাজী অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারে তাঁরা প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করেছিলেন। টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডসটোয়েভ্স্কি, পুশ্কিন, গোগোল, শেখভ্, গোর্কি, এমিল জোলা, বালজ্যাক, ফ্লবার্ট, মপাসাঁ, আনাতোল ফ্রাঁস, ভিক্টর হুগো, মলিয়্যেঁ, ড্যুমা, প্রাউস্ট, হাইনে, গ্যেটে, ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, স্যাণ্ডার্স প্রমুখ সহিত্যিকদের মুক্তচিন্তা ও মানবতাবাদ তাঁদের সৃষ্টিশীল কর্মপ্রয়াসে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রথমে ব্রিটিশ এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, সমাজপ্রগতি ইত্যাদির সাথে পরিচিত হয়ে সার্বজনীন, বিশ্বপ্রেমী একটি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন থেকেও সমাজপ্রগতির বিশ্বজনীন নিয়মকানুনগুলি সম্পর্কে অবহিত হন। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে ইংরাজী ভাষার মাধ্যম বিশেষ কার্যকরী হয়। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করেন যে, ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের সমস্যা শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ দেশের সমস্যা হিসাবে বিবেচ্য নয়, সারা বিশ্বের সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে একসাথে বিচার-বিশ্লেষণের যোগ্যও বটে। তাঁরা ভারতের জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনুরূপ আন্দোলনের সাফল্য-অসাফল্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে ভারতে শুরু করেন। এক কথায়, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাঁদের প্রয়াস বিশ্বজনীন প্রয়াসের সাথে যুক্ত হয়ে নূতন শক্তিতে বলীয়ান ও যুগোপযোগী হয়ে ওঠে। ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন স্বদেশী অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্বের নানা দেশের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে, মতাদর্শগত ব্যাপারে বিভিন্ন উৎসভূমি থেকে শক্তি আহরণ করে ক্রমে ক্রমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ খতম করার সামর্থ অর্জন করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতের রাষ্ট্রীয় ও আর্থনীতিক জীবনে এমন সব মৌল সমস্যা উপস্থাপিত করে যা সমাধানের মত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পদ্ধতি ভারতীয়দের অজ্ঞাত ছিল। ভারতীয় রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোরাণ, গ্রন্থসাহেব, ত্রিপিটক, ইত্যাদি ধর্মদর্শন বা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' ও অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান মনীষীদের রচনায়

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের চরিত্র বিশ্লেষণের উপযোগী আধুনিক দৃষ্টিকোণ অনুপস্থিত। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এরূপ একটি দৃষ্টিকোণ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী অর্থনীতিবিদদের রচনা পাঠের মধ্য দিয়ে লাভ করেন। অ্যাডাম স্মিথ, ডেভিড রিকার্ডো, লিস্ট, মার্কস প্রভৃতিদের মুক্ত অর্থনীতি, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব, অবাধ বাণিজ্য নীতি, সর্বহারাশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ইত্যাদি আর্থনীতিক চিন্তাভাবনা ঐ দৃষ্টিকোণকে আধুনিক অর্থশাস্ত্রের ধারার অনুসারী করে তোলে। ভারতীয় আর্থনীতিক দুরবস্থার প্রধান কারণ হিসাবে তাঁরা যেমন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের 'অ-ব্রিটিশ' অনুদার আর্থনীতিক কর্মপন্থাকে দায়ী করেন, তেমনই আবার সমাধানের উপায় হিসাবে শিল্পায়ন ও আধুনিক কৃষিব্যবস্থার উদ্বোধন দাবি করেন। দাদাভাই নওরোজী ব্রিটিশ অর্থনীতির স্বার্থে ভারতীয় ধনসম্পদের অপব্যবহার সম্পর্কে যে আর্থনীতিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেন তা সমকালীন ব্রিটেনের প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছ, বিশ্লেষণী মাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। মার্কসের 'ডাস্ ক্যাপিটাল' তিনি পড়েছিলেন কিনা, বা তাঁর সাথে তিনি পরিচিত ছিলেন কিনা জানা না গেলেও দাদাভাইর তত্ত্ব যে মার্কসীয় আর্থনীতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির কিছু কিছু গুণে সমৃদ্ধ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।[৪৪] রমেশচন্দ্র দত্তর ভিক্টোরিয়ান যুগে ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থা সম্পর্কিত রচনা নিঃসন্দেহে প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের কাছেও সমাদর লাভের যোগ্য। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমেই রানাডে, দাদাভাই, রমেশচন্দ্র, গোখেল, গ্যাডগিল, কে. টি. সাহ্ প্রমুখ ভারতীয়রা আর্থনীতিক চিন্তাভাবনার আধুনিকতম ধারা-উপধারার সঙ্গে পরিচিত হন। কিছু পরবর্তীকালে অ্যালফ্রেড মার্শাল, জন মেনার্ড কেইন্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের রচনাও অনুরূপ মাধ্যমে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের কাছে পৌঁছয়। শ্লথ গতিতে হলেও **সাম্যবাদী আর্থনীতিক তত্ত্ব** ঐ একই মাধ্যমে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের উষাকালে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীতে বিভক্ত অঞ্চলগুলির বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাব আদান-প্রদানের ভাষা হিসাবে ইংরাজী গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য ভূমিকা পালন করে। দাদাভাই নওরোজী, ফিরোজশাহ্ মেহ্তা, দীনশাহ্ ওয়াচা, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীরা মাতৃভাষায় লিখে বা কথা বলে সরাসরি জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে অপারগ হলেও, ভারতীয় সামাজিক,

আর্থনীতিক, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময় ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করতেন। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনার সাযুজ্য ও ঐক্য স্থাপনে ইংরাজী ভাষা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল। বিভিন্ন সভাসমিতি, সম্মেলন ইত্যাদিতে ইংরাজী ভাষা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ভাব আদান-প্রদানের সহায়ক হয়েছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই বুদ্ধিজীবীরাই জনগণের চেতনার মানোন্নয়নের প্রয়োজন অনুভব করে প্রথমে ইংরাজী এবং ক্রমে ক্রমে মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে নানা তথ্য, সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মাতৃভাষা-গুলির গুণগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক উন্নতি লক্ষ্য করা যায় তার মূলে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসাবে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত ব্যক্তিরাই মাতৃভাষার উন্নয়নে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তেজস্ক্রিয় ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকরশ্মির সংস্পর্শে এসে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার নিশ্চিত আলোকবর্তিকার সন্ধান পেয়ে যান। এই আলোকবর্তিকার আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনের নানা ক্ষেত্রে—বিশেষ করে সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতিতে—তাঁরা তন্দ্রামগ্ন ভারতীয় জনজীবনে নূতন প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। এরূপ চাঞ্চল্য ভারতীয় জনজীবনে 'নবজাগরণের' সূচনা করে। এই জাগরণ প্রভাতসূর্যের আলোর বর্ণচ্ছটায় ঘটেনি, ঘটেছিল বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির চোখ-ধাঁধান আলোর নিশ্চিত স্থায়িত্বের অলীক আশ্বাসে। ভারতীয় জনজীবনের নবজাগরণ তাই সম্পূর্ণ হতে পারেনি, আত্মস্থ হতে পারেনি। ভারতীয় নবজাগরণ অনেকটা ঠিক বিদেশী দেবতা জুপিটারের ললাট বিদীর্ণ করে বেরিয়ে-আসা মিনার্ভা।

এরূপ ভারতীয় নবজাগরণকে অবশ্য ইংরাজী শিক্ষিত সব ভারতীয় বুদ্ধিজীবীই অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে আসেননি। যাঁরা এগিয়ে আসেননি, সমালোচকের বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁদের চোখ ছিল তীক্ষ্ণ। আর, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি যাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে অন্ধ ভক্তের মত তাকিয়েছিলেন তাঁদের চোখ ছিল ভাববিহ্বল, ঘোলাটে। ইংরাজী শিক্ষায়

শিক্ষিত উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণরত ব্রিটিশ ভারতের শ্রেষ্ঠতর সমালোচক ছিল। রানাডে, তিলক, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী প্রমুখ মনীষীরা পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকেও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির গরীয়ান স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন। কেউ কেউ উভয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উদ্ভাবনমূলক সমন্বয়ে প্রয়াসী ছিলেন, আবার কেউ কেউ নবজাগরণ বা রেনেসাঁর ভারতীয় ছক্ বা 'মডেল' রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, **পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব উভয় গোষ্ঠীর উপরেই ক্রিয়াশীল** থেকে ভারতীয় চিন্তা-মননকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক সকল রকমের প্রগতিশীল আন্দোলনে ইংরাজী শিক্ষিত উভয় গোষ্ঠীর নেতারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে দয়ানন্দ ও পরমহংসের উপর ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব প্রায় ছিল না; তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ধর্মক্ষেত্রে নানা মত ও পথের সন্ধানে বিব্রত, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতিতে প্রভাবিত কোলকাতাবাসীর ধরাছোঁয়ার মধ্যে গঙ্গার পারে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস তাঁর কথামৃত বিতরণ করেছিলেন, আর দয়ানন্দ কোলকাতায় খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে তাঁর আর্য ধর্ম ও সমাজের যুক্তিবাদী সমর্থনের দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করতে পেরেছিলেন। বিবেকানন্দ গভীরভাবে পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মের প্রভাব অনুভব করেছিলেন। হেগেলীয় ভাববাদ, হিতবাদী দর্শন ও খ্রীস্টধর্মের চার্চ-সংগঠন ও মানবপ্রেম তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে পশ্চিমী দর্শন ও ধর্ম বিবেকানন্দের বেদান্তপ্রীতির সাথে রাখীবন্ধন ঘটিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ইংরাজী শিক্ষা-ভারতীয় সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে যুগোপযোগী চিন্তাভাবনার উৎসমুখ খুলে দেয়।

সামগ্রিক বিচারে ইংরাজী শিক্ষা ভারতে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে বলা যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারকামী তাগিদ ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এই শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকূল ক্ষেত্রে তা সোনার ফসলের বীজ বপন করেছিল। "বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের স্বার্থে হরেক রকম কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেকে যুক্ত করে; বুর্জোয়া শ্রেণীর অগ্রগমনের প্রাথমিক স্তরে এরকম

অনেক কর্মকাণ্ডই প্রগতিশীল রূপ পরিগ্রহ করে। বিদেশী ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণী ভারতের মাটিতেও অনুরূপ কিছু কিছু কর্মকাণ্ড সম্ভব করে তুলেছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন এরূপ একটি কর্মপ্রয়াসের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য দাবিদার। কেন?

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছিল তা নানা বাধাবিপত্তি এড়িয়ে আগাগোড়া **ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র** বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। তাছাড়া, এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবাসীদের কাছে যুক্তিবাদী ও গণতন্ত্রী চিন্তাভাবনার অমূল্য সম্পদের দুয়ার খুলে দিয়েছিল এই সম্পদ আহরণের সুযোগ ধর্ম, বর্ণ, মতামত নিরপেক্ষভাবে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল সকল ভারতবাসীর কাছে উন্মুক্ত ছিল। প্রাক-ব্রিটিশ ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সাথে ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম মৌল প্রভেদ এখানে বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

আশ্চর্যের কিছু নেই, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদিপর্বের সকল প্রবক্তারাই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছিলেন। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে ইংরাজী শিক্ষালাভ না করলেও রামমোহন রঙ্‌পুরের বছরগুলিতে ইংরাজী ভাষাজ্ঞান রপ্ত করেছিলেন। সৈয়দ আহ্‌মদ ইংরাজী শিক্ষার মর্মবাণী উপলব্ধি করেছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর নায়কেরা সবাই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। নওরোজী, মেহ্‌তা, ওয়াচা, গোখেল, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, সুব্রাহ্মনীয় আয়ার, লাজপৎ রায় প্রমুখ দিক্‌পাল জাতীয়তাবাদী নেতারা ইংরাজী শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে গান্ধী, নেহ্‌রু, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, জিন্নাহ্, মহম্মদ আলী প্রমুখ প্রথম সারির জাতীয়তাবাদী নেতারাও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী যখন বিদেশী ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর সাথে অধস্তন সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক রচনা করে দুর্বল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে ও শক্তি আহরণে ব্যস্ত, তখন ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাই জাতীয়তাবাদী কর্মোদ্যোগের রূপকার হিসাবে আবির্ভূত হন। তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে যত্নবান হলেও জাতীয় স্বার্থকে তাঁদের দাবিসনদের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিলেন।

তাঁরা বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান আত্মস্থ করেছিলেন। তাঁদের কাছে কাভ্যুর, ম্যাড্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, কোস্যুথ,

পার্নেল, মিল, টলস্টয় প্রমুখরা নায়ক ও শিক্ষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভারতীয় বিদ্যায়তনগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাস পঠনপাঠন ইংরাজ শাসনকর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। গণতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশ তখন অনেকটা ঘটে গিয়েছিল। ক্রমশই ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা **জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রী** ও **সমাজতন্ত্রী** হয়ে উঠছিলেন। এই প্রক্রিয়াটিকে শুদ্ধ করে দেবার বিলম্বিত সরকারী প্রয়াস তাই ব্যর্থ হয়। নূতনতর একটি দিকে প্রক্রিয়াটি ধাবিত হয়ে সার্থকতার পথ খুঁজতে থাকে: ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে নিবিড়তর পরিচয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ঐ সংস্কৃতিকে সমালোচকের তীক্ষ্ণ চোখে দেখবার প্রেরণা যোগায়। ইউরোপের চিন্তাধারার ইউরোপীয় সমালোচকদের বক্তব্য অনুধাবন করে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নিজস্ব বক্তব্যের রূপরেখা রচনায় উৎসাহ লাভ করেন। রাস্‌কিন্‌, কার্লাইল, টলস্টয় প্রমুখ পণ্ডিতদের স্বদেশসভ্যতার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির নির্মোহ মূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েকটি দশকে ভারতীয় ইংরাজী-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ তাঁদের কাছে অভিপ্রেত মনে হয়েছিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রবেশ করে ভারতীয়গণ অনুকরণের অসারতা উপলব্ধি করে দেশী ও বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির সমন্বয় এবং কখনো কখনো বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হন। অনুকরণ-সমন্বয়-বিরোধিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিচারবিশ্লেষণে নিয়োজিত হয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধিগত বিচারের ক্ষেত্রে উন্নততর মান অর্জন করেন। এরূপ মানোন্নয়নে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শক্তিমান ও গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তিকে হীনবল করার জন্য বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পঠনপাঠনের স্বাধীনতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে থাকে। ম্যাড্‌সিনির জীবনচরিত পাঠও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। সাম্যবাদী রচনাকে তো ভারতীয়দের কাছে অলভ্য করে তোলার সকল রকম ষড়যন্ত্র করা

হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও সমাজতন্ত্রবাদের উপর লেখা কোন প্রামাণ্য বই তাঁদের কাছে পৌঁছনর সুযোগ ছিল না। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর লেখা থেকে জানা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা নানা জায়গায় বহু খোঁজাখুঁজির পর অবশেষে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে সমাজ-তন্ত্রের উপর লেখা হিণ্ডম্যানের বইখানি মাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।[34] মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিনের লেখা কোন বই তাঁদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। মুক্ত পাঠ ও মুক্ত চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ-নিষেধাজ্ঞার বাঁধন যতই শক্ত করার অপচেষ্টা হয়েছে ততই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তা মুক্তির উপায় খুঁজতে দেশান্তরী হয়েছে। ফ্রান্স, ইটালী, আয়ার্ল্যাণ্ড, রাশিয়া ছাড়াও জাপান, তুরস্ক ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমকালীন ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণের উৎসুক চাঞ্চল্যে ভারতীয় চিন্তা ও মনন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সর্ব-এশীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করেন।

ইংরাজী শিক্ষা ভারতে দ্বৈত ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজনে স্বল্প বেতনের চাকুরিগুলিতে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়োগ একান্ত জরুরী হয়ে পড়লে ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা-গ্রহণের ফতোয়া জারী হয়। দেহ, মন, কর্ম ও সৃজনশীলতার সুস্থ বিকাশে সহায়তা না করে ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। আবার, অন্যদিকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির আলো ভারতের সমাজজীবনের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করে স্বল্প পরিসরে জোৎস্নার মায়াজাল সৃষ্টি করে। ঐ মায়াজালের স্তিমিত আলোয় ভারতীয় চিন্তা ও মনন সালোকসংশ্লেষের সুযোগ লাভ করে। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় প্রকার উদ্দেশ্য সাধন করে ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রশ্নটি ভারতীয় জনমতকে দ্বিধাবিভক্ত করতে আজও ইন্ধন যোগায়।

ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অবাঞ্ছিত ফলাফল

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে সুনিয়ন্ত্রিত

করে আধুনিক জাতিগঠনের কাজে এই ব্যবস্থা ভূমিকা পালনে অসমর্থ হয়েছিল। আধুনিক উৎপাদনব্যবস্থার সাথে গতিশীল ভারসাম্য রচনায় এই ব্যবস্থা অপারগ হয়েছিল।

শিক্ষার গণভিত্তি তৈরী করার ব্যাপারে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কোনরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ছিল না। ১৯১১ সালে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ভারতীয়দের শতকরা হার ছিল ৬, আর ১৯৩১ সালে ৮। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জনসংখ্যার শতকরা ৪·৭ ভাগ মাত্র পাঠরত ছিল; '৪১-'৪২ সালে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠরত বিদ্যার্থীর সংখ্যা ছিল ১৫৭,২৫৪ বা জনসংখ্যার শতকরা ·০৫ ভাগ মাত্র।[35] প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠরত বিদ্যার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম বৎসরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে না করতেই পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হত। এক-পঞ্চমাংশ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপে পৌঁছুতে পারত। তিন থেকে চার বৎসর পর্যন্ত সময়কাল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ছাত্রই কয়েক বৎসর ধরে প্রথম বর্ষের শিক্ষার মান অর্জন করার চেষ্টায় লিপ্ত থেকে অবশেষে পড়ার পাট চুকিয়ে দিয়ে অক্ষরজ্ঞানহীন বিপুল সংখ্যক ভারতীয় জনগণের ভীড়ে হারিয়ে যেত। স্বল্প সময়ব্যাপী শিক্ষার ইতি ঘটলে আবার অক্ষরজ্ঞানহীনতার অন্ধকারে ডুবে যাবার একটি প্রবণতা পরাধীন ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সামান্য আলোকপ্রাপ্ত ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বর্তমান ছিল।

প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অগ্রগতি ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাম্য ছিল না। ১৯৩৪-৩৫ সালে যন্ত্র বা বাস্তুবিদ্যা, কৃষি, বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষার স্নাতক পর্যায়ে সারা ভারতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৬০ জন মাত্র। কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী ভারতীয়দের সংখ্যাল্পতা স্বদেশী উদ্যোগে শিল্পায়নের বাসনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সমকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইয়োয়া রাজ্যের জনসংখ্যা ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগ হলেও ঐ রাজ্যে বাস্তুবিদ্যা, কৃষি ও বাণিজ্যে পাঠরত ছাত্রের সংখ্যা ভারতীয় অনুরূপ সংখ্যার চেয়ে বেশী ছিল। বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতকে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে গড়ে তোলার বিরোধী ছিল এবং এই কারণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরী শিক্ষায় উৎসাহ না দিয়ে সাহিত্যধর্মী শিক্ষার সীমিত ক্ষেত্রে সীমিত সংখ্যক

ভারতীয়কে প্রবেশের অধিকার দিয়ে স্বল্প বেতনে ইংরাজী-শিক্ষিত কেরানী তৈরী করতে সচেষ্ট ছিল।

বিপিনচন্দ্র পাল সঠিকভাবে ইংরাজী শিক্ষার ঔপনিবেশিক চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। **গণশিক্ষা বিস্তারে শাসনকর্তৃপক্ষের অনীহা** স্পষ্টতই প্রমাণ করেছিল যে, ভারতের সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর কোন উদ্দেশ্য তাদের ছিল না। শ্রীযুক্ত পাল মন্তব্য করেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ড থেকে প্রতিটি কারণিক ও সরকারী কর্মচারী আমদানি না করে ভারতের মাটিতেই অধস্তন রাজকর্মচারীদের একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে প্রশাসনিক ব্যয়সংক্ষেপ ঘটানোর বাসনার ফলশ্রুতিতেই ইংরাজী ভাষার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। ঐ ভাষার মাধ্যমে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদের মগজে ইংল্যাণ্ডের গৌরব আর বিজয়বৈজয়ন্তীর আড়ম্বরপূর্ণ গল্পকথা ঢুকিয়ে দিয়ে বিদেশী আমলাতন্ত্রের সেবক যোগ্য ভারতীয় অধস্তন রাজকর্মচারী সৃষ্টি করাই ছিল ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য। শিক্ষাব্যবস্থা সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যের ক্রীড়নক হয়ে সীমিত পরিসরে ঘুরপাক খেয়ে অন্য কোন বৃহৎ উদ্দেশ্যের দিক-নিশানা হারিয়ে ফেলেছিল। উদ্দেশ্যমূলক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ইংরাজী বাক্যগঠনের নিয়মকানুন, সেক্সপীয়ারের ছন্দরীতি, ইংল্যাণ্ডের রাজা-রানীদের শাসনকালের সালতামামি ইত্যাদির উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে ভারতীয় যুবচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। 'ব্রিটিশ সরকার ভারতে একেবারে গোড়া থেকেই জনশিক্ষার ধরন ও গতি নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট ছিল এবং এদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে সর্বদাই প্রভাবিত হয়েছিল।'

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় জনজীবনের সাথে সম্পর্ক হারিয়ে অসার ও নিঃস্পন্দ হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলির সাথে সম্যক পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কোন দায়দায়িত্ব এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা ও আর্থনীতিক স্থবিরতার স্বরূপ বিশ্লেষণে এই ব্যবস্থা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের কোনরূপ উৎসাহ যোগাতে অক্ষম ছিল। রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা। অনুরূপভাবে ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনের পশ্চাৎপদতা দূর করে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল

পশ্চাৎপদতার কারণ নির্ণয়ে সঠিকভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করা। উত্তর নয়, সঠিকভাবে মৌল প্রশ্ন উত্থাপন—গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যটি ঔপনিবেশিক ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল।

ব্রিটিশ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বহমান ধারার পরিচয় বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হয়েছিল। আঁধারে মলিন ভারতীয় জনজীবনে আলোকবর্তিকা নিয়ে বিজয়ী ব্রিটিশের ভারত আগমন শত সহস্র দুন্দুভির নিনাদে প্রচারের আয়োজন এই ব্যবস্থায় ষোলকলায় পূর্ণ ছিল; ভারতের জাতীয় গৌরব ও আত্মসম্মান দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিল। এহেন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাটি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে ভারতীয় চিন্তা ও মননের স্বচ্ছন্দ বিকাশে দুরতিক্রম্য বাধার বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় শিক্ষক ইংরাজী বই পড়ে মনে মনে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে বুঝে নিতেন; বিদ্যালয় কক্ষে শিক্ষার্থীদের সামনে ইংরাজীতে বলতেন। শিক্ষার্থী ইংরাজী শুনে মাতৃভাষায় তর্জমা করে মর্মার্থ বুঝে নিতেন। পরীক্ষায় উত্তর লেখার সময় আবার ইংরাজীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। পরীক্ষক ইংরাজী উত্তর মাতৃভাষায় মনে মনে রূপান্তরিত করে যাচাই করতেন। বিদেশী ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় লিপ্ত হয়ে ভারতীয়-দের অনুবাদের ঝামেলা বারবার পোয়াতে গিয়ে অযথা প্রাণান্তকর প্রয়াসের শিকার হতে হত। শিক্ষার আনন্দময়তা, বিষয়বস্তুর দুর্বার আকর্ষণ, অনুশীলনের স্বাচ্ছন্দ্য উবে গিয়ে **অসার, অ-ভারতীয়, আত্মমর্যাদার সংস্রববিহীন** ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকার একটি নিশ্চিত ব্যবস্থা করার তাগিদ ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মজ্জায় সংক্রামিত হয়ে গিয়েছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইংরাজী-মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, দরিদ্র, নিরক্ষর ভারতীয় জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী সৃষ্টি করার অপকৌশলে ঐ ব্যবস্থা নিয়োজিত ছিল। ১৮৩৫ সালে সরকারীভাবে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার নীতি গৃহীত হবার পর থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়রা পশ্চিমীকরণের শিক্ষাকে আধুনিকীকরণের অগ্রদূত ভেবে **ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন** হয়ে পড়েছিলেন। গণতন্ত্র ও সমাজপ্রগতির পশ্চিমী ধ্যানধারণায় ভাবিত হলেও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সঞ্জীবনী সুধারস থেকে

বঞ্চিত হয়ে তাঁদের অনেকেই পশ্চিমী পোশাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহার, আচার-আচরণ, ধ্যানধারণা, বচন-বুলিতে মোহাচ্ছন্ন আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। ভারতীয় ধর্মকে লৌকিক কুসংস্কার ও মূঢ়তার সমার্থক ভেবে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টির দোহাই দিয়ে তথাকথিত পশ্চিমী সত্যদৃষ্টি লাভ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্রুতগামী আলোকরশ্মির রোশনাই তাঁদের দুর্বল চোখের স্নায়ুতন্ত্রকে বিবশ করে দিয়েছিল। ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বরূপ তাঁরা বিবশ চোখের অস্পষ্ট দৃষ্টিতে নির্ণয় করে উঠতে পারেননি। পরাধীন ভারতে জীবিকার ক্ষেত্রে তাঁদের উন্নতির সুযোগ সাহেবদের তুলনায় ছিল একেবারে অকিঞ্চিৎকর। সাহেবদের দরবারে তাঁদের মান-মর্যাদা লাভ স্বাভাবিক কারণেই সহজলভ্য ছিল না। তাঁরা কখনই বিজয়ী ব্রিটিশের সমকক্ষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে উঠতে পারেননি।

আবার, দেশীয় জনগণের আপনজন হয়ে ওঠার পথেও বাধাবিঘ্ন ছিল দুস্তর। ইংরাজীয়ানার শক্ত প্রাচীর তাঁদের স্বদেশীয় জনগণ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছিল। অন্যদিকে আবার জমিজমার মালিকানা, চাকুরিসূত্রে লব্ধ আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চবর্ণসঞ্জাত বংশকৌলিন্য তাঁদের স্বদেশীয় সমাজের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এভাবে সমাজপরিবর্তনের মুখ্য দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে আর্থ-সামাজিক কারণে চেপে বসলেও স্বদেশীয় সমাজের আশাআকাঙ্খা ও দাবিদাওয়ার সাথে তাঁরা একাত্ম হতে পারেননি। নিজেদের স্বার্থের সাথে সাযুজ্য রচনা করে তাঁরা যথাসম্ভব স্বদেশীয় সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেও ঐ সমাজের সাথে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারেননি। বিদেশী সমাজও তাঁদের আপনজন হিসাবে বুকে টেনে নেয়নি। নিজের ঘরে পরবাসী, আর পরের ঘরে বিদেশী থেকেই তাঁদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসতে হয়েছে। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জী, পি. আনন্দ চারলু, মনোমোহন ঘোষ, দীনশা ওয়াচা, ফিরোজশাহ্ মেহ্‌তা প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে এরূপ একটি সিদ্ধান্তের দুয়ারে হাজির হওয়া অসম্ভব নয়।

বন্ধুবান্ধব সহ বইয়ের ব্যাগ কাঁধে নিয়ে হৈ চৈ করে বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসার পথে কামানের মুখে বাঁধা দুজন ১৮৫৭-র বিদ্রোহী সিপাহীর অন্তিম অবস্থার বর্ণনা দীন্‌শা ওয়াচা এমনভাবে দিয়েছেন যাতে মনে হয়

তিনি ভারতীয় বিদ্রোহী সিপাহীদের স্বদেশবাসী হিসাবে ভাবতে অভ্যস্ত ছিলেন না : 'চারিদিকে রোমাঞ্চকর উত্তেজনা ; যতক্ষণ-না আদেশসূচক নির্ধারিত শব্দটি উচ্চারিত হয়ে কামান দাগিয়ে পিছমোড়া করে হাত বাঁধা অপরাধীদের উড়িয়ে দেওয়া হল, ততক্ষণ আমাদের নাড়ী দ্রুত থেকে দ্রুততর তালে স্পন্দিত হয়েছে। পোড়া মাংসের গন্ধ অপ্রিয় গন্ধ ছড়ালেও আমরা অনায়াসে তা নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে পেরেছিলাম। তারপর সব শেষ হয়েছিল।'[36] অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী হুগলী জেলার হরিপাল তথা বঙ্গদেশের 'গ্রামীণ জনসাধারণের নিম্নশ্রেণীর লোকজন' সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা দরিদ্র, নিরন্ন, অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন স্বদেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন মমত্বের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। হয়ত সমকালীন লণ্ডনের ধনী ব্যক্তি বস্তিবাসী বা গ্রামীণ লোকজন থেকে মাত্রাগত বিচারে কম হলেও প্রায় একই রকম স্বাতন্ত্র্যে নিজেকে পৃথক করে তুলতেন। কিন্তু ওয়াচা-ব্যানার্জীরা অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র ভারতবাসীদের থেকে নিজেদের যে **স্বতন্ত্র গোষ্ঠীভুক্ত** করে তুলেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা জনগণের মাথার উপর দিয়ে নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে কথা-বার্তা বলতেন। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা খড়ির গণ্ডী টেনে তাঁদের দেশবাসীদের বিপুল অংশ থেকে আলাদা করে দিয়েছিল।

সীমিত হলেও ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষার যতটুকু বিস্তার ভারতে ঘটেছিল তার প্রায় সবটাই ছিল কোলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রভৃতি বন্দরনগর-কেন্দ্রিক। শহরে ইংরাজী শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায় মোট জনসংখ্যার অনুপাত হিসাবে তো বটেই, মধ্যবিত্তশ্রেণীর অংশ হিসাবেও বটে, অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক লোকজন নিয়ে গড়ে উঠেছিল। ভারতের মধ্যবিত্তশ্রেণী, হিন্দু বা মুসলমান যা-ই হোক না কেন, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির স্পর্শলাভে বঞ্চিত থেকে সনাতনী চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রায় নিষ্ঠাভরে অভ্যস্ত থেকেছে। অবশ্য এরূপ চিন্তাভাবনা ও জীবনযাত্রার গতিশীলতা ও প্রাণস্পন্দন ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার অনেক আগেই স্তিমিত হয়ে এসেছিল। সনাতনী জীবন-দৃষ্টির বহিরঙ্গের খোলসটিই শুধুমাত্র পড়েছিল, অন্তঃসার গিয়েছিল শুকিয়ে। ফলে, সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপুল অংশের চোখে ঠুলির মত লেগে থেকে যুক্তিবাদী, বৈজ্ঞানিক, যুগোপযোগী জীবনদর্শন প্রত্যক্ষ করার পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজী শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের ক্ষে এই বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে যুক্তিবাদের আওতায় নিয়ে

যাওয়া ছিল অসম্ভব। যুক্তিবাদী জীবনদর্শনের খোঁজে তাঁদের চিন্তাভাবনা ব্যাপ্ত পরিসরে উধাও হয়ে শেষ পর্যন্ত সহযাত্রীর অভাব বোধ করে ক্লান্তির প্রহর গুণেছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অপরাপর অংশ এরূপ চিন্তাভাবনার শরিক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ইংরাজী-শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের সদস্যরা ব্রিটিশ ভারতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ হয়েও রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক জীবনে প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন দীর্ঘকাল। নীরদ চৌধুরী তাঁর 'দি ইনটেলেক্চুয়াল ইন ইণ্ডিয়া' বইতে মন্তব্য করেছেন যে, ইংরাজী শিক্ষিত, যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি মোহাচ্ছন্ন ও ভারতের সমাজ পরিবর্তনে উদ্‌গ্রীব **মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা আজকের ভারতেও জনসংখ্যার অনুপাতে নগণ্য** হয়েও অনেকখানি প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছেন।

পরিমাণগত বা সংখ্যাগত দিক থেকে ইংরাজীর মাধ্যমে পরিচালিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্য একটি সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, মুসলমান জনসমাজকে তা দীর্ঘকাল আকৃষ্ট করতে পারেনি। মুসলমানেরা তাঁদের সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হয়ে আল্লাহ্ নির্দেশিত ইস্‌লামী জীবনযাত্রায় সত্যসন্ধ থাকতে চেয়েছিলেন। মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান পদ্ধতি বজায় রেখে ও ইস্‌লামী রীতির উলেমা পণ্ডিতদের নেতৃত্বাধীনে পঠনপাঠন চালিয়ে পশ্চিমীকরণের বন্যায় তাঁরা গা ভাসান থেকে প্রায় এক শতাব্দী বিরত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষদিকে নবাবী আমল থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত, শিক্ষিত, ধনী মুসলমান পরিবারগুলির নেতৃত্বে যখন সংযুক্ত প্রদেশে মুসলিম 'নবজাগরণের' সূত্রপাত ঘটেছিল তখনও সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে ঐ জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়নি। পশ্চিমী যুক্তিবাদের নিরিখে ইসলামের শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলার প্রয়াসে সংযুক্ত প্রদেশেই মুসলমানগণ প্রথম ইংরাজী শিক্ষার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ক্রমে ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার আগ্রহ সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপ্ত হতে সুরু করে। ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দুদের তুলনায় অনেক পরে মুসলমানগণ আগ্রহী হওয়ায় পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির দান, সরকারী চাকুরি, জীবিকা অর্জনের অন্য সুযোগসুবিধা এবং স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিত্থালয়ের 'ডিগ্রী' বা 'সার্টিফিকেট' লাভে বঞ্চিত ছিলেন। স্বভাবতই, ইংরাজী শিক্ষার বিলম্বিত

প্রয়াসের মাশুল হিসাবে তাঁদের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্লেশ স্বীকার করতে হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের অসম অগ্রগতি উভয় সমাজের মধ্যে **বিচ্ছেদমূলক সম্পর্ক** গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে সংখ্যাগত অপর একটি সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় ভারতীয় নারীকে ঐকান্তিক প্রয়াসে যুক্ত করার সরকারী চেষ্টা বিশেষ পরিলক্ষিত হয়নি। হিন্দু, মুসলমান পরিবারগুলিতে পশ্চিমী যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ ও কর্মোদ্যোগে পুরুষেরা কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যতিক্রমের কিছু উদাহরণ সত্ত্বেও বলা যায় যে, নারীরা তখনও গৃহকোণে আবদ্ধ হয়ে প্রাক-আধুনিক চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের সেবাদাসী থেকেছিলেন। ভারতের নারীজনসংখ্যার শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের গতিপথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। গান্ধী তাঁর সর্বভারতীয় আন্দোলনগুলিতে ভারতীয় নারী সমাজকে সর্বপ্রথম সংগঠিতভাবে সমাবিষ্ট করতে পেরেছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীসমাজের অগ্রগতিতে লক্ষণীয় গতিবেগ তারপর থেকেই সঞ্চারিত হয়।

গুণগত দিক থেকেও ভারতে প্রবর্তিত ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা নানা ত্রুটিতে ভরপুর ছিল। ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ ও আদর্শের প্রেরণায় শিক্ষাগ্রহণে অনুপ্রাণিত না হয়ে ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষার্থীরা জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস ইত্যাদির হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে ইংরাজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সরকারী চাকুরি, ডাক্তার, বাস্তুবিদ, উকিল, শিক্ষক এবং এরূপ অন্যান্য পেশায় প্রবেশ করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনে তাঁদের পক্ষে ইংরাজী শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। **ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের সাথে এই শিক্ষার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ।** ভারতের বুদ্ধিজীবীদের সবাই যে জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার চৌকাঠ অতিক্রম করেছিলেন এমন নয়। তাঁদের কেউ কেউ দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠে উৎসাহিত হয়েছিলেন জ্ঞানলাভের তাগিদে ও হৃদয়বৃত্তির আনন্দঘন অনুশীলনের আবেগে। আবার কেউ কেউ কেতাদুরস্ত হয়ে কৃত্রিম পাণ্ডিত্যের পসরা সাজিয়ে সমাজের কাছ থেকে যোগ্যতার চেয়ে বেশী মূল্যলাভে আগ্রহী

ছিলেন। কথিত আছে, পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমব্যয়ে বিমুখ, অথচ পণ্ডিতি ফলাতে উৎসুক জনৈক ব্যক্তিকে 'দি অরিজিন অফ স্পিসিস' বইখানি পড়তে দিতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করেছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই পণ্ডিতি ফলাতে আগ্রহী বুদ্ধিজীবীদের হদিশ মেলে, কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় হল এই, ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে সুসমঞ্জস, যুক্তিবাদী একটি জীবনদর্শন রচনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন।

খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্নে, ভাগ্যগণনা, তুকতাক ও যাদুতে বিশ্বাসের বেলায় এবং শান্তিযজ্ঞ, কবচ-মাদুলি-মানৎ ইত্যাদির মাধ্যমে অশুভ শক্তি প্রতিরোধের বাসনার ক্ষেত্রে বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী রক্ষণশীল মনোভাব প্রদর্শনে লজ্জিত বোধ করেন না। গবেষণার প্রথম নিবন্ধটি প্রকাশ করার পর সারা জীবন আর কোন গবেষণামূলক কাজকর্মের মধ্যে না গিয়েও বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছ থেকে জ্ঞানীগুণীর প্রাপ্য মর্যাদা লাভ করে থাকেন। ইংরাজী শিক্ষা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের চিন্তা ও মননের প্রাথমিক স্তরের উপর কিছুটা প্রভাব ফেললেও মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেনি। রেনেসাঁ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকউদ্ভাসের কয়েকটি পশ্চিমী শতাব্দীর অভিজ্ঞতার পথপরিক্রমা সেরে নূতন অগ্রগতির জয়যাত্রা শুরু করার সুযোগ না পেয়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের পথ চলা যুক্তিবাদের সঠিক নিশানা না পেয়ে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট, কখনো শ্লথগতি হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় সমাজে ইংরাজী শিক্ষার যে রূপটি প্রবর্তিত হয়েছিল তা ভারতীয় চিন্তা ও মননের যুক্তিবাদী বিকাশে পূর্ণ সাফল্যের মালা কণ্ঠে দুলিয়ে ধন্য হতে পারেনি। পরিহাসের সুরে বলা যায় যে, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় ছাত্রজীবনে অতি আধুনিক, মধ্যবয়সে জাগতিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত এবং বার্ধক্যে ঈশ্বরের সাধনায় ভক্তিযোগের প্রাবল্যে আত্মহারা! পশ্চিমী যুক্তিবাদকে জীবনবেদ করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নায়কত্ব করেও পরবর্তী সময়ে আজীবন সাগরপারে, পাহাড়ে বা তীর্থস্থানে ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়তার সাধনায় লিপ্ত হওয়া ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের অনেকের কাছে বেমানান মনে হয় না। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ধর্মীয় গুরুর অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাসী হতে পারেন না এমন নয়। প্রবাদ আছে যে, রাশিয়ান কোন ব্যক্তির চামড়া একটু ছাড়ালেই তাতার মূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে;

অনুরূপভাবে বলা যায়, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর চামড়া একটু ছাড়ালেই **গোঁড়া হিন্দু বা মুসলমানের স্বরূপ** বেরিয়ে পড়ে ![৪৭]

পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজে অনুপ্রবেশ করে প্রগতিমূলক নানা কর্মকাণ্ড সম্ভব করে তুললেও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সমুন্নত, সুসমঞ্জস বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও অচঞ্চল, সর্বত্রগামী যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, গান্ধীপূর্ব ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর একাংশ জাতীয়তাবাদী ভাববিনিময়ের সুযোগ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই লাভ করেছিলেন। ইংরাজী-শিক্ষিত অভিজাত এই গোষ্ঠী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে শক্তিবৃদ্ধি করতে পেরেছিল। ভাব বিনিময়ের ভাষা হিসাবে স্বাধীন ভারতে আজও ইংরাজীর বিকল্প কোন ভাষা ব্যবহারে প্রচুর অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ইংরাজী ভাষার মণিহার 'পরতে গেলেও লাগে, ছিঁড়তে গেলেও বাজে'। অথচ এই ভাষা ভারতীয় জনগণকে ইংরাজী জানা বা না জানার ভিত্তিতে **সুবিধাপ্রাপ্ত** ও **সুবিধাবঞ্চিত** দু'টি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে চলেছে।

ঔপনিবেশিক বা নয়া ঔপনিবেশিক, জাতীয়তাবাদী বা নয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা ও রচনায় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও বিকাশে ইংরাজী শিক্ষার গুরুত্ব অতিরিক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলশ্রুতিতে উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রভূত উন্নতির সূত্রে ভারতের সামাজিক অর্থনীতিতে উদ্ভূত বিপুল পরিবর্তনের আনুকূল্যে ভারতীয় **জাতীয়তাবাদ প্রসারের সুযোগ লাভ** করে। ইংরাজী শিক্ষা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম দিকে ঐরূপ প্রসারে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু **ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পিতৃত্বের স্বীকৃতি ইংরাজী ভাষার প্রাপ্য নয়।** ইংরাজী ভাষা ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সহায়ক ছিল এবং ঐ ভাষা তাঁদের পশ্চিমী চিন্তানায়কদের মুক্তিকামী সমকালীন রাজনৈতিক তত্ত্বগুলির সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ইংরাজী ভাষা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিল বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অবিচার ও অত্যাচারে লাঞ্ছিত দরিদ্র, অশিক্ষিত, নিরন্ন ভারতবাসীর ক্রোধ

ও প্রতিবাদের সূতিকাগৃহে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মলগ্ন সূচিত হয়েছিল। এই নবজাতক ব্রিটেন ও ভারতের স্বার্থদ্বন্দ্বের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী-শিক্ষিত 'বাবু' সম্প্রদায়ের লোকজন ঐ সাবালককে কখনো নেতৃত্ব দিয়েছে, কখনো তার সহগামী হয়েছে, আবার কখনো শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে পশ্চাতে টেনে তার অগ্রগমন রোধ করেছে।

ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ভারতবাসী লাভ করেছে অনেক কিছু, হারিয়েছে প্রচুর।

৯ ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি

'অচলায়তন' ভারতের অনৈতিহাসিকতা

বিভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বহু ঐতিহাসিকের রচনাতেই এরূপ একটি ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায় যে, মধ্যযুগীয় ভারতের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন অজ্ঞতায়, মূঢ়তায় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-আচরণে পঙ্কিল হয়ে পড়েছিল। এরূপ অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের দু'তিনটি দশক পর্যন্তও বর্তমান ছিল বলে তাঁরা মনে করেছেন। বলা হয়ে থাকে যে, ব্রিটিশপূর্ব ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তিবাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এরূপ অভিমত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মেনে নিয়েছিলেন। রামমোহন-পূর্ববর্তী ভারতের সামাজিক অবস্থাকে তিনি 'অচলায়তন' আখ্যা দিয়েছিলেন।[1]

ব্রিটিশ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকের রচনাতেই এরূপ একটি তত্ত্ব প্রমাণের উৎসাহ দেখা যায় যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা চালু করে ভারতের পঙ্কিল, রুদ্ধগতি সমাজজীবনে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। এমন কি, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ধর্মগুলিতে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় তাকেও অনেকে খ্রীস্টধর্মের প্রভাবের ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রবর্তিত হলে এবং আদালত ও সরকারী কাজে পারসীর পরিবর্তে ইংরাজীর ব্যবহার শুরু হলে ক্রমে ক্রমে ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁদের আরবী, পারসী ও সংস্কৃতের উত্তরাধিকার ভুলতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তা ও মননের উপর 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' সচেতন সরকারী প্রয়াসে কায়েম হতে থাকে। ভারতের সংস্কৃত ও আরবী-পারসী ভাষায় বিধৃত অতীত ঐতিহ্য জানা-বোঝার উপায় ইংরাজী ভাষা প্রবর্তনের ফলে কালক্রমে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয়দের পক্ষে অদূরবর্তী অতীতের প্রকৃত ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসও অনুধাবন করা

অসম্ভব হয়ে ওঠে। কণ্ঠরুদ্ধ অতীত কথা কওয়া বন্ধ করলে, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সিংহভাগ কৃতিত্ব ব্রিটেন তথা ইউরোপের কৃতিত্বের খাতায় জমা করার একটি প্রয়াস ঐতিহাসিকদের রচনায় লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে। উক্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ছিলেন না এমন নয়। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলার ইতিহাস' পুস্তকে পলাশী যুদ্ধের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছিলেন যে, পৃথিবীর অন্যত্র দেখা যায়নি এমন একটি 'গৌরবোজ্জ্বল প্রভাতের আদিপর্ব' সূচনা করেছিল এই যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে নাকি এমন 'সত্যিকারের' ব্যাপকতর, গভীরতর এবং এত বেশী বৈপ্লবিক রেনেসাঁ বা 'পুনর্জাগরণ' সংঘটিত হয়েছিল যা কনস্টান্টিনোপ্‌লের পতনের পর ইউরোপেও প্রত্যক্ষ করা যায়নি।[2] অর্থাৎ, তাঁর মতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা মোগল-পরবর্তী ভারতের সামাজিক, আর্থনীতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা ও মননের মন্দাকিনী ধারার প্রভাব এনে জরাজীর্ণ, প্রাচীন, স্থূল, ক্ষয়িষ্ণু সব কিছুকে ধুয়ে মুছে দূর করে দেয়।

সাম্প্রতিক কালে ভারতের কতিপয় ঐতিহাসিক উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ, দলিল ও তথ্য দিয়ে এরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে ইস্‌লামী সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাটি একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। এঁদেরও আগে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল তাঁর 'সার্বজনীন পুরুষ রামমোহন' নিবন্ধে রামমোহনের উপর ইসলামের যুক্তিবাদী প্রভাব বিশ্লেষণ করেছিলেন: রামমোহনের 'তুহ্‌ফা-তুল-মুয়াহ্‌হিদীন' (১৮০৩-৪) অষ্টম শতাব্দীর 'মুত্‌ভাজলী' ও দ্বাদশ শতাব্দীর 'মুহ্‌য়াদ্দিন' গোষ্ঠীর যুক্তিবাদী ইস্‌লামী একেশ্বরবাদে প্রভাবিত।[3] সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে বসবাসকারী ইরানী মহ্‌সীন ফানির 'দাবিস্থান-ই-মাজহিব' থেকে রামমোহন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের দীক্ষা পেয়েছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্য পতনের যুগে ভারতের চিন্তাভাবনার জগতে অচলায়তন গড়ে উঠেছিল এমন অনড় সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। ইস্‌লামী চিন্তা ও ধর্মতত্ত্বে তখন পরিবর্তনের নূতন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল। শাহ্‌ ওয়ালিউল্লা বেশ কিছুকাল এই পরিবর্তন আনয়নে ব্রতী ছিলেন। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের 'ন্যায়শাস্ত্র'

আরবীতে পঠনপাঠনের সুযোগ ছিল বলেই রামমোহন তা সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

হিন্দুরীতির বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চার ধারাটিও মোগল যুগের অবসানে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায়নি। অদ্বৈত বেদান্ত অনুশীলনের কেন্দ্র হিসাবে বারাণসী এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে 'বাংলাদেশের অক্সফোর্ড' নদীয়া নিজস্ব সুনাম অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিল। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতির প্রতিবাদে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের বেশ কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় জন্মলাভ করেছিল। অযোধ্যার সহজানন্দ স্বামীর স্বামীনারায়ণ গোষ্ঠী, আলোয়ারের দেহ্রার চরণদাসের চরণদাসী সম্প্রদায়, নদীয়ার আউলচাঁদের কর্তাভজা সম্প্রদায়, রূপরাম কবিরাজের স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়, পল্টুদাসের পল্টুদাসী সম্প্রদায়, মুন্নাদাসের অপপন্থী গোষ্ঠী এবং বলরাম হরির বলরামী গোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কয়েকটি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিল। এসকল গোষ্ঠীগুলির নেতৃবৃন্দ ও হিন্দু-মুসলমান বহু ধর্মপ্রচারক সম্প্রীতি ও সহনশীলতাকে মর্মবাণী করে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও বাধানিষেধের দুর্গের উপর আক্রমণ রচনা করেছিলেন। ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতিনীতির বিরুদ্ধে এঁদের প্রতিবাদ ও সমালোচনার সাথে বিশ্বচিন্তা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ থেকে উদ্ভূত ভারতে অনুপ্রবেশকারী নূতন শক্তিগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে রামমোহন যুগোপযোগী নূতন ধর্মচিন্তার রূপরেখা চিত্রিত করতে পেরেছিলেন।

ডঃ সালাউদ্দিন আহ্‌মদ সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটিশপূর্ব মুসলমান-শাসিত ভারতে ইসলাম ধর্ম ভারতীয় চরিত্রে বিশিষ্ট হয়ে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে স্থায়ী ছাপ ফেলতে থাকে। বিভেদের কণ্টক ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে অনেক গজিয়েছে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি গোলাপের সৌরভ বিস্তার করেনি এমন নয়।

ব্রিটিশপূর্ব ভারতে নারীর লাঞ্ছিত, শোষিত ও অবহেলিত অবস্থার তত্ত্বটিও সর্বাংশে সত্য নয়।

ম্যালকম তাঁর 'নোট্‌স অফ ইন্‌সট্রাকসন' (১৮২১)-এ লিখেছেন, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক ভারতবাসী নৈতিকতা ও নানা সদ্‌গুণে অবিচলিত থাকতে পেরেছেন। রামমোহন রায় স্বয়ং অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,

ভারতের 'শহরাঞ্চল ও বৃহদায়তন শহরের বসবাসকারী চাষী বা গ্রামবাসী পৃথিবীর যে-কোন দেশের জনসাধারণের ন্যায় সমান নিরীহ, ধীরস্থির ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন।'[4]

পূর্ব গবাক্ষ ও পশ্চিমী বায়ুপ্রবাহ

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, ধর্মসংস্কার ও রেনেসাঁ-পরবর্তী ইউরোপের জনসাধারণের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মান ভারতীয় জনসাধারণের অনুরূপ মানকে অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করেছিল। এমন কি, খ্রীস্টধর্ম নূতন ব্যাখ্যায় পরিশীলিত হয়ে ইহজগতের কর্মসাধনাকে ঈশ্বর অনুধ্যানের মাধ্যম বলে প্রচার করেছিল। ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগ ধর্মীয় আশীর্বাদপুত হয়ে গতিবেগ লাভ করেছিল। আবার, ধনতন্ত্র খ্রীস্টধর্মের যুগোপযোগী সংস্কারে সহায়তা করেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে ক্রমশই ধর্মীয় ব্যূহ ভেদ করে ব্যাপ্ত পরিসরে বিচরণের অবাধ সুযোগ লাভ করেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঠিকই বলেছেন, 'বিগত দু' শতাব্দী ধরে বহির্বিশ্ব যখন ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে দ্রুত প্রগতি অর্জন করছিল ভারত তখন কার্যত ছ'শ বছর আগে যেখানে ছিল সেখানেই স্থবির হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'[5] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে পাকাপাকিভাবে কায়েম হলে প্রশাসনিক দিক থেকে সংবদ্ধ ভারতে আর্থনীতিক রূপান্তরের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবুদ্ধি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দমকা বাতাস পশ্চিম গবাক্ষ দিয়ে আনাগোনা শুরু করে। ক্রমে ক্রমে খ্রীস্টধর্ম, হিতবাদী দর্শন ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ঐ বায়ুপ্রবাহকে দুর্বার করে তোলে। কিন্তু ঐ বায়ুপ্রবাহ একমাত্র শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল থেকে স্থবির ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে সঞ্জীবনের বার্তা বহন করে এনেছিল এমন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের জটিল সমাজ-পরিবর্তন প্রক্রিয়ার অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যার নামান্তর মাত্র। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে যে-পদ্ধতিতে সমাজ-পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল তা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমন্বয়ে-সংঘাতে বিচিত্র ও জটিল ছিল। **শুধুমাত্র পশ্চিমী ভাবধারার সোনার কাঠির স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে 'নবজাগরণ' ঘটেনি,** হিন্দু-ইসলামীয় সমাজ-সংস্কৃতির স্পর্শমণিও জাগ্রত চেতনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। পশ্চিম গবাক্ষ দিয়ে মুক্ত বায়ুপ্রবাহের

সাথে মিশে অন্দরমহলের জানালাগুলির মন্দগতি সমীরণ কখনো সখ্য, কখনো সাযুজ্য, কখনো ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করেছিল।

ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে রামমোহনের অবদান

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে যূথবদ্ধ হয়ে প্রায় একই সময় থেকে পরিচালিত হতে থাকে। গান্ধীপূর্ব ভারতে সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীই রামমোহন নির্দেশিত পথে সংস্কার আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন।[৫] লক্ষ্য ও কৌশল কালের যাত্রায় ভিন্নতর হয়েছিল, কিন্তু কতগুলি আদর্শগত বৈশিষ্ট্য আগাগোড়া বজায় থেকেছিল :

১. ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে **মানবতাবাদের প্রতি প্রবল একটি আকর্ষণ** লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ব্যক্তিমানুষের সম্মান রামমোহন চোখের মণির মত রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তিনি ব্যক্তির মানমর্যাদা রক্ষার দাবিকে বেন্থামী হিতবাদের রীতিতে 'স্বাচ্ছন্দ্য', 'সুখ' ইত্যাদি নানা আভরণে সজ্জিত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এই সজ্জার ভারতীয়করণ ঘটিয়ে তুলতে তৎপর হয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তির মানমর্যাদা রক্ষাকে তাঁরাও পবিত্র কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলেন।

২. সংস্কার আন্দোলনে **যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহ** লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতামতের প্রতিধ্বনি করে রামমোহন ঘোষণা করেছিলেন যে, যুক্তিবাদ ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নূতন সংস্কৃতির জন্মলগ্ন সূচিত করবে। যুক্তিবাদের প্রতি বিশ্বাস পরবর্তী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই পশ্চিমী যুক্তিবাদকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এমন নয়।

৩. চার্লস এইচ. হেইমসাথের মত অনুসরণে বলা যায়, রক্তাক্ত বিপ্লবের বহ্নিশিখা না জ্বালিয়ে **সমাজের অভ্যন্তর থেকেই সংস্কারের প্রদীপশিখাকে প্রজ্জ্বলিত করাকে** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কাম্য মনে করেছিলেন।

৪. **উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রতি আবেগমথিত অনুরাগ** রামমোহন থেকে শুরু করে গান্ধীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর মধ্যেই কম-বেশী বর্তমান ছিল।

৫. রামমোহন প্রদর্শিত পথে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন পরি-

চালনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জাতীয়তার যুগোপযোগী প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন থেকে প্রাণশক্তি অর্জন করে, আবার জাগ্রত জাতীয়তাবাদ ঐ আন্দোলনকে নূতন বিষয়বস্তুতে ও প্রবলতর গতিবেগে সমৃদ্ধ করে।

রামমোহন ও গান্ধী : সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা দুই পুরুষ

রামমোহন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী সংস্কারকবৃন্দ ধর্ম, সমাজ ও জীবনদর্শনের প্রগতিশীল রূপান্তর ঘটিয়ে ভারতে যুগোপযোগী রাজনৈতিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক আধুনিকীকরণের পথটি অর্গলমুক্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁরা সংস্কারাচ্ছন্ন আপামর জনসাধারণ থেকে নিজেদের চিন্তাভাবনা, আহার-বিহার, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিশিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তাঁরা জনজীবনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বদেশের অগ্রগতির ধীর গতিতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের নিয়ে গোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। **গোষ্ঠীগত সমর্থন** নিয়ে তাঁরা সমাজের কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে অনলস সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। দেশীয় সমাজের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রক্ষায় ব্যর্থ হলেও তাঁরা নিঃসন্দেহে প্রভাবশালী অভিজাত গোষ্ঠী পরিচালিত কর্মোদ্যোগের মাধ্যমে ভারতের আধুনিক সংস্কৃতির প্রথম দূত হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

কিন্তু গোষ্ঠীগত আন্দোলন সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডলে সাফল্যের সুবাস ছড়িয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলে জাতীয় জীবনের ব্যাপ্ত পরিমণ্ডলে বিস্তারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। গান্ধীর আবির্ভাবের পর থেকে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনে গণভিত্তি রচনার বহু বিলম্বিত, কার্যকরী প্রয়াস সুরু হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম ও নৈতিক দিক থেকে বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের সঙ্কল্প বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে গান্ধী নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। পরিবার, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে টেনে এনে তিনি ভারতীয় জনগণকে বৃহত্তর জাতীয় সমাজের অংশীদার করে তুলতে ব্রতী হয়েছিলেন। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের আধুনিকীকরণ ঘটাতে ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্মের সাথে যুগোপযোগী চিন্তা, মনন ও কর্মধারার সাযুজ্য রচনা করার সার্থক কৌশল গ্রহণ করে তিনি **পরম্পরাগত আধুনিকতার ভগীরথ**

হিসাবে কর্তব্যরত ছিলেন। মদ্যপান নিবারণ, গোসম্পদ রক্ষা, যন্ত্রসভ্যতার বিরোধিতা, খদ্দর প্রবর্তন, কর্মভিত্তিক বর্ণপ্রথার সমর্থন ইত্যাদি গান্ধী-উদ্ভাবিত কার্যক্রম পশ্চিমী অর্থে নিশ্চয়ই অনাধুনিক, কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তা-বাদের প্রেক্ষাপটে এগুলি যুক্তিনির্ভর আবেদনের ভিত্তিতে সামাজিক গণচেতনা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। এই কার্যক্রমের ভিত্তিতে গান্ধী ভারতীয় জাতীয়তা-বাদকে সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত বিভেদ-দ্বন্দ্বের দুরতিক্রম্য বাধা অতিক্রমণে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন ; আর ঐ ভিত্তিতে রাজনীতিক্ষেত্রে গ্রামীণ বাগ্-ধারা সংস্থাপন করে গ্রামনির্ভর ভারতে নূতন আবেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঐ আবেগ ভারতীয় হৃদয়ে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের যুক্তধারার বন্যা বইয়ে দেয়।

ব্রাহ্মসমাজ

ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত ধর্মীয়-সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ বিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি যেরূপভাবেই করা হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ঐরূপ বিপুল তাৎপর্যে ভরপুর কর্মপ্রয়াসের সমকক্ষ অন্য কোন নজীর নেই। ব্রাহ্ম আন্দোলন ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের হিন্দুধর্ম বিরোধী অপপ্রচার ও সমকালীন হিন্দুধর্মের অধঃ-পতনের লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে প্রথম আধুনিক প্রতিবাদ। সংগঠন রচনা ও বিকাশের ক্ষেত্রেও এই সমাজ প্রকৃত পথিকৃতের ভূমিকার দাবিদার। খ্রীস্টধর্মের মানবিকতা ও হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্যপূর্ণ দর্শনের মাঝখানে ব্রাহ্মধর্ম ঘড়ির কাঁটার মত আন্দোলিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কালোত্তীর্ণ হিন্দুধর্মের মধ্যেই আত্মস্থ হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিবাদ আন্দোলন হিসাবে ব্রাহ্মধর্মের গুরুত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কীর্তিকলাপে এই ধর্মের অনুগামীদের অবদান অবিস্মরণীয় গুরুত্বে বিধৃত হয়েছে। আধুনিক চিন্তা ও মননের অগ্রদূত হিসাবে ব্রাহ্ম সমাজ ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আধুনিকীকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যার সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে তাঁদের কর্মকাণ্ডের তাৎপর্য ভারতীয় জনজীবনে অনুভূত হয়েছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম থেকে ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জনগণের দাবিদাওয়ার মুখপাত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ

করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল। পূর্বসুরীদের মত তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্মের ব্রাহ্মদের সামাজিক শোষণ, অবিচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল থাকতে হয়নি; ধর্মীয় উদারনৈতিকতার পরিবেশে আরামপ্রদ, স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করে 'তাঁদের অনেকেই' সংগ্রামী জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন।[7] আধুনিক, শিক্ষিত ভারতীয় ব্যক্তিমানুষের চিন্তা ও মননে গভীর স্মারকচিহ্ন এঁকে দিয়ে ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্তি ও গভীরতা হারিয়ে ফেলে। জনগণের উপর প্রভাব হ্রাস পায়।

১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ধর্মচিন্তার সাথে রাজনৈতিক চিন্তার গভীর সংযোগ লক্ষ্য করেন। ধর্ম ও রাজনীতিকে রামমোহন আলাদা মহলের বাসিন্দা মনে করতেন না। বরং ধর্মের উদার, মহৎ আদর্শের দ্বারা রাজনৈতিক জীবনাদর্শকে শুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তিনি। ভারতের রাজনৈতিক অনগ্রসরতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন:

'আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি যে, ধর্মের বর্তমান যে-ব্যবস্থাকে হিন্দুরা অনুসরণ করে থাকে তা তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থবৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক নয়। জাতিভেদ তাঁদের অসংখ্য বিভাগে বিভক্ত করে রাজনৈতিক অনুভূতি থেকে বঞ্চিত করেছে। বহু ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধিকরণের বিধি-বিধান দুরূহ কোন কর্মপ্রয়াস গ্রহণের পক্ষে তাঁদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করে তুলেছে। আমার ধারণা, অন্তত পক্ষে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য তাঁদের ধর্মের পরিবর্তন কিছুটা প্রয়োজন।'[8]

ধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের সব রচনা যে পরিণত বৈজ্ঞানিক চিন্তায় উদ্ভাসিত এমন নয়। কিন্তু তাঁর ধর্মসংক্রান্ত সকল রচনা পাঠে এরূপ প্রতীতি জন্মে যে, তিনি ধর্মীয় ঐক্যের ছত্রছায়ায় ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক মনোন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে তিনিই প্রথম 'উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি কাউকে বর্জন করেননি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন।'[9] কবীর, দাদু, নানক প্রদর্শিত পথে সত্যসাধনার আলোকবর্তিকা ও ধর্মসমন্বয়ের বাণী বহন করে তিনি ব্রিটিশ ভারতে মহাজাতীয়তার ভাবধারাটিকে দ্যুতিময় করে তুলেছিলেন।

১৮৩৩ সালে রবার্ট ডেল্‌কে লেখা রামমোহনের চিঠি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খ্রীস্টধর্মকে তিনি ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক অগ্রগতির অনুকূল মনে করতেন। ষোল বছর আগে ডিগ্‌বীকে লেখা চিঠিতে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন, '…অন্য যে-কোন ধর্মের তুলনায় খ্রীস্টীয় তত্ত্ব নৈতিকতার নীতিগুলি বিকাশের পক্ষে বেশী অনুকূল এবং যুক্তিবাদী মানুষের অনুশীলনের পক্ষে উপযুক্ত।'[10] বলা বাহুল্য খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে রামমোহনের উচ্চ ধারণা তাঁর ধর্মীয় মতামতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু রামমোহনের গোঁড়া একেশ্বরবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ইসলাম ধর্ম থেকে লব্ধ, খ্রীস্টধর্ম থেকে নয়। কথিত আছে, ইংরাজী ভাষা ও খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের আগে তিনি তেষট্টিটি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছিলেন। ইসলামের মূল তত্ত্বগুলি থেকেই তাঁর অন্তরে একেশ্বরবাদ সম্পর্কে আকর্ষণ ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হয়। মুসলমান ইউনিটারিয়ান চিন্তার প্রভাব ব্রহ্মসভার একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত ধারণাটির উৎসমূলে অন্যতম শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। সুফীদের গ্রন্থ—বিশেষ করে হাফেজ, মৌলানা রুমি, শামী, তাব্রিজ প্রভৃতিদের লেখা—রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল। পরিণত বয়সে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে পরিচিতির পর তিনি ঐ ধর্মের এমন এমন দিকগুলি বর্জন করেন যেগুলি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সর্বতোভাবে বর্জনীয় (যেমন খ্রীস্টের ঈশ্বরত্ব ও ত্রিত্ববাদ)।

ভারতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আধুনিক অনুশীলন রামমোহন শুরু করেন। 'তিনি ইসলাম, খ্রীস্টধর্ম ও আধুনিক যুক্তিবাদ বা মানবতাবাদের ব্যাখ্যা ও সেগুলির মহৎ উপাদানগুলি আত্মিকরণে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং ঐগুলিকে নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন উপনিষদীয় দর্শনের তত্ত্বের অঙ্গীভূত করে একটি ধর্মাদর্শ গড়ে তোলেন।' এ. এল. ব্যাশ্যাম মনে করেন, রামমোহনের ব্রহ্মসভার ঈশ্বরের স্বরূপ এই কারণে অ-ভারতীয় হয়ে পড়েছিল।[11]

ব্রিটিশ ভারতে ধর্মতত্ত্বের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রবর্তন করেন রামমোহন। পশ্চিমী দুনিয়ায় এ ধরনের বিশ্লেষণ রামমোহনের জীবদ্দশায় নবযুগের সূচনা করেনি। ফয়ারব্যাখ, এঙ্গেলস, ফুস্‌টেল দ্য কুঁলাজ, ই. বি. টেলর, ম্যাক্স ম্যুলার, উইলিয়ম জেম্‌স, রবার্টস স্মিথ, হার্বার্ট স্পেন্সার, স্যর জেম্‌স জি. ফ্রেজার, অ্যাণ্ড্‌ ল্যাঙ্, আর্নেস্ট রেঁনান, সিগম্যাণ্ড ফ্রয়েড, এমিল ডুর্কহেম

এবং ম্যাক্স ওয়েবার ঐ নবযুগের পথিকৃৎ ও রূপকার ; রামমোহন এরূপ নবযুগ সূচনার সম্ভাবনার প্রথম, সচেতন প্রত্যয়ী।

রামমোহন রায় হিন্দু সমাজের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে (সতীদাহ, শিশু-হত্যা, নরনারীর অসম সামাজিক অধিকার, বিধবাদের বিবাহে অনধিকার ইত্যাদি) সংগ্রামরত ছিলেন। যুক্তির নিরিখে তিনি বর্ণপ্রথা অগ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। তিনি কৃষক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট উচ্চতম ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ জানিয়েছিলেন। ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের কাছে ভারতীয় অভিযোগ পেশ করার রাজনৈতিক কৌশলের তিনিই প্রকৃত উদ্ভাবক।[19] ঔপনিবেশিক শাসনের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার জন্য আবেদন-নিবেদন ও প্রতিবাদের নীতি তিনি সমকালীন ভারতে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বীরের মত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনকে সর্বকালের জন্য ভারতের পক্ষে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদপুত' মনে করেননি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমুন্নত, আধুনিক এবং স্বাধীন ভারতের একটি কাল্পনিক চিত্র তাঁকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

রামমোহনের মৃত্যুর পরে এক দশক ধরে (১৮৩৩-১৮৪৩) ব্রহ্মসভার ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মপ্রয়াসের তৎপরতা তুলনামূলকভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ১৮৪৩ সালের একুশে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অন্যান্য কুড়ি জন ব্যক্তি ব্রহ্মসভার আদর্শগুলি ঐকান্তিকভাবে গ্রহণের শপথ গ্রহণ করে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মসভা ও যুক্তিবাদী চেতনার সার্থক রূপকার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা এই সমাজের সাথে আইনানুগভাবে একাত্ম হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের ধর্মবিশ্বাসের একটি দলিল রচনা করেন ; তাতে লেখা ছিল : সুমহান সর্বগুণান্বিত ঈশ্বর ব্যক্তির বিশ্বাসে মূর্ত, তিনি ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সর্বগুণের বিকাশে পরিস্ফুট হন না, ব্যক্তির প্রার্থনা ভগবান উৎকর্ণ হয়ে শোনেন ও প্রতিদান দেন, আধ্যাত্মিক উপায়ে তাঁর উপাসনা করতে হবে, পাপ থেকে মুক্তি ও জীবের পরিত্রাণ অনুশোচনা ও সৎকর্মের মাধ্যমে লব্ধ, কোন পুস্তক অভ্রান্ত নয়,—ভগবান সম্পর্কিত জ্ঞান প্রকৃতি ও অন্তর্দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে লাভ করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের ভূমিকা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রামমোহনের প্রবর্তিত, মন্দগতি ব্রাহ্ম আন্দোলনে নূতন গতিময়তা সৃষ্টি করেন। চল্লিশ থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত

উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় চিন্তা, মনন ও কর্মজগৎ দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত ছিল না।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনে নানারূপ পরিবর্তন সাধন করেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সদস্য সংখ্যা ১৮৪৫-৫৬ সালে ১৪৫ থেকে ৫০০-তে পৌঁছয়। কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক ব্যক্তি ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাবাধীন হতে থাকেন। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের ক্রমবর্ধমান হিন্দু-ধর্মবিরোধী প্রচার ও পশ্চিমীকরণের বিভিন্ন শক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম ভারতীয় একটি সত্তার বিকাশে দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত আন্দোলন বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করলেও (ব্রাহ্ম সনদ থেকে তিনি শঙ্করের বৈদান্তিক ব্যাখ্যা অপসারণ করেন) উপনিষদের বিশেষ বিশেষ অংশগুলিতে ব্রাহ্মসমাজের নীতি ও কর্মপ্রয়াসের ধর্মীয়-আদর্শগত বনিয়াদ রচনা করে ব্রাহ্ম ধর্মকে ভারতীয় চরিত্রানুগ করে তোলেন।

১৮৫০ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মধর্মের শিক্ষাসমূহ যূথবদ্ধ করে 'ব্রাহ্মধর্ম' শীর্ষক পুস্তক রচনা করেন; ব্রাহ্ম নৈতিকতা ও ধর্মতত্ত্বের আকরগ্রন্থ হিসাবে ঐ পুস্তক সমাদৃত হয়। ধর্মীয় আদর্শের দিক থেকে পুস্তকটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে উপনিষদ-নির্ভর। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কোন উদ্ধৃতি ঐ পুস্তকে স্থানলাভ করেনি। খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে সরাসরি কোন মন্তব্য ঐ পুস্তকে নেই। পুস্তকটির সমগ্র ভূমিকা জুড়ে সার্বজনীন একটি ধর্মাদর্শ পরিব্যাপ্ত; ঐ ভূমিকায় ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী সকল দেশের সকলের ভগবান সম্পর্কিত শিক্ষা প্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। নৈতিকতা সংক্রান্ত অধ্যায়ে 'পিউরিটান' নৈতিকতার লক্ষণ দেখা যায়। জন ক্যালভিনের প্রভাব এই অধ্যায়ে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়; আবার একথাও বলা যায়, আধুনিক হিন্দুর ভূমিকা পালন করে তিনি মনুর অনুশাসনগুলিকে সমকালীন যুগের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করেছিলেন। স্বামী, স্ত্রী, পুত্রকন্যার পারস্পরিক সম্পর্ক ও কর্তব্য তিনি পারিবারিক কল্যাণের ঐক্যতান সৃষ্টির প্রয়োজনে নির্ধারণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সামাজিক কল্যাণ, দেবেন্দ্রনাথের মতে, ঐকান্তিকতা, ভক্তি, পবিত্রতা, ক্ষমা ও সৌজন্য প্রভৃতি গুণের ফলশ্রুতি হিসাবে আবির্ভূত হয়। এরূপ মনোভাবের পশ্চাতে বিদগ্ধ পাঠক কনফুসিয়াসের প্রভাব অনুভব করতে পারেন। মনুর অনুশাসন সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয়: 'জ্ঞান অর্জন কর, ধর্ম ও পরিশ্রম করার অভ্যাস

জীবনের প্রথম থেকেই শুরু কর' ; 'জীবনের অনিত্যতা বিস্মৃত হয়ে জাগতিক বিষয়-আশয়ে সমৃদ্ধ হয়ো না ।'[14] 'পিউরিটান' নৈতিকতার এরূপ ব্যাখ্যা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম মতবাদের ভিত্তি রচনার সহায়ক হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে ব্রাহ্ম জীবনাদর্শ গ্রহণ করলেও ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্মের উপর নিজস্ব ধ্যানধারণার প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন। হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্যানুসারী ব্রাহ্মধর্মের পরিবর্তে তিনি সার্বজনীন ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রাহ্মধর্মের রূপরেখা রচনা করেছিলেন। বিশেষ করে খ্রীস্টধর্মের ইউনিটারিয়ান গোষ্ঠীর ধর্মীয় মনোভাব তাঁকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন তাঁর ধর্মবিশ্বাস ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইউনিটারিয়ানদের সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে তিনি খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে ধর্মসংক্রান্ত তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু খ্রীস্টধর্ম এবং যিশুর জীবন ও বাণী তাঁর হৃদয়-মনে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। বস্তুতপক্ষে ঐ সময়কালীন কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম প্রেমের ধর্ম হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করে। 'ভগবানকে পিতার মত ও মানুষকে ভ্রাতার মত বিশ্বাস'—এই মর্মবাণী তাঁর ধর্মের মূলকথা হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকায় যিশুকে প্রতিষ্ঠিত করেননি। ১৮৬৩ সালের একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন, খ্রীস্টধর্ম বিশ্বকে ব্রাহ্ম ধর্মবিশ্বাস গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করেছিল, কিন্তু ঐ ধর্মকে তিনি ব্রাহ্মধর্মের জনক বলে চিহ্নিত করেননি।

যীশু খ্রীস্টকে তিনি ইউরোপীয় স্বরূপে কল্পনা করেননি, করেছেন শান্ত, ধীর, স্থির, সমাহিত রূপে, এশীয় স্বরূপে, ধারণাগত দিক থেকে রচিত যিশুর একটি বিমূর্ত রূপ তিনি ভারতের ধর্মীয় জনজীবনে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। 'যীশু খ্রীস্ট : ইউরোপ এবং এশিয়া', 'গ্রেট্ মেন্', 'রিজেনারেটিঙ্ ফেইথ্', 'দি ফিউচার চার্চ', 'দি কিংডম্ অফ হেভেন' ইত্যাদি নিবন্ধ কেশবচন্দ্রের খ্রীস্টধর্মের মর্মবাণীর প্রতি মমত্ব-বোধের দ্যোতক।

খ্রীস্টধর্মের 'সর্বোত্তম দিকগুলি' ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-ধর্মকে বর্ণপ্রথার সাথে সকল প্রকার সংস্রবরহিত, সকল সম্প্রদায়ের মানুষের

কাছে উন্মুক্ত, উদার, সার্বজনীন, ধর্মের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রসার ঘটান। তিনি ক্রমশ তাঁর ধর্মমতের সাথে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সেতুবন্ধন রচনা করেন। এমন কি সাশ্রুনয়নে তিনি রামকৃষ্ণের সরল, অনাড়ম্বর, প্রেমময় পরিমণ্ডলে আনন্দসুধা পান করেন। হিন্দু দেবদেবীকে তিনি পরমেশ্বরের খণ্ডপ্রকাশ বলে অভিহিত করতে থাকেন।[14]

১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের সংগঠিত বিশাল ধর্মীয় শোভাযাত্রায় পতাকা, বাদ্যযন্ত্র, কীর্তন ইত্যাদি বৈষ্ণব ধর্মীয় রীতিপদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল। বোম্বাই ও সিন্ধু থেকেও ধর্মার্থী এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পাঁচ হাজার ব্যক্তি কীর্তনরত অবস্থায় কেশবচন্দ্রের চরণযুগলে প্রণত হয়ে আত্মহারা হন। কেশবচন্দ্র গুরুবাদের প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন।

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের যুবক মহারাজার সাথে নিজের নাবালিকা কন্যার বিবাহ স্থির করলে কেশবচন্দ্রের বহু অনুগামী বীতশ্রদ্ধ হয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্রের অনুগামীদের সমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করে। আর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্ম গোষ্ঠী আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে।

ব্রাহ্মধর্মীয় আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-খ্রীস্টান ধর্মমতের সংঘাত-পূর্ণ পরিস্থিতিতে অস্থির, চঞ্চল পদচারণা করে গন্তব্যস্থলের সঠিক নিশানা আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়ে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের নবোদ্দীপ্ত শাখার সাথে একাত্ম হয়ে শেষ পর্যন্ত স্থিতি লাভ করে। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই আন্দোলন ভারতীয় চিন্তা ও মনন এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে অগ্রগতির সূচক চিহ্নগুলি একের পর এক অবলীলায় অতিক্রম করে। ডেভিড কফ্ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আধুনিক **'ভারতীয় মন'** সৃষ্টির অন্যতম প্রধান রূপকার হিসাবে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা অনন্যসাধারণ।[15] ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির উষাকালে ব্রাহ্মসমাজের কর্মকাণ্ড স্বদেশপ্রেমের বিচিত্র ধারাগুলিকে পুষ্ট ও গতিময় করে তুলেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী কালের ব্রাহ্মরা সকলে ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে মঙ্গলকর বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ক্রমশ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠলে ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠ ধ্বনিত করতে তাঁরা কালবিলম্ব করেননি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল সকল প্রকার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব দীর্ঘকাল বজায় ছিল।

চিন্তা ও কর্মের জগতে **যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত ভূমিকা** পালনে ব্রাহ্মসমাজ ভারতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্কটিকে সৃজনশীল নিবিড়তায় বিধৃত করে তুলতে ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অগ্রণী ভূমিকা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে অন্য কোন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় পালন করতে পারেনি।

আর্য সমাজ

১৮৭৫ সালে বোম্বে শহরে দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজ কালক্রমে বিশাল সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়ে সারা ভারতে ও বহির্বিশ্বে ভারতীয় সামাজিক-ধর্মীয় আন্দোলনের নূতন চেতনা প্রচার ও প্রসারে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তর ও মধ্য ভারতে এই আন্দোলন বিশেষ-ভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে; বিদেশে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যেও এই আন্দোলন প্রভাব বিস্তারে সাফল্য লাভ করে। আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলগুলিতে আর্য সমাজ সংগঠন রচনা করে। আর্য সমাজীরা 'আর্য জগৎ' সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।[16]

'ক্ষুদ্র ঐতিহ্যের স্বরূপে বিধৃত' হিন্দুধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যকেই দয়ানন্দ বরবাদ করেছিলেন: যেমন, মূর্তিপূজা, ঈশ্বরের বহুত্বে বিশ্বাস, পুরাণের সভ্যতা, পুরোহিততন্ত্রের সুযোগসুবিধা, দেবদেবীর আবির্ভাব এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান। দয়ানন্দ একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন; যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানধর্মী ধর্মাদর্শ তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তিনি বেদ অভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেছিলেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল প্রকার জ্ঞানের আধার হিসাবে তিনি বেদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বেদের সত্য জানতে হলে সঠিকভাবে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। পানিনি ও পাতঞ্জলির ব্যাকরণ ও ভাষ্য অনুধাবন না করলে বেদ বোধগম্য নয় বলে দয়ানন্দ মনে করেছিলেন।

পুরাকালের মুনি-ঋষিদের অনুপ্রাণিত ধর্ম ও দর্শনচিন্তা বেদে স্থান লাভ

করে বৈদিক ধর্মকে পরমতম সত্যের আকর গ্রন্থের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে বলে দয়ানন্দ অভিমত প্রকাশ করেন। অন্য সকল ধর্মগ্রন্থকে এই কারণে বেদের সত্যের কষ্টিপাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। বেদের শিক্ষা বা সত্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়কে তিনি ভ্রান্ত বলে আখ্যা দিতেন। যামিনী থেকে যাজ্ঞবল্ক্য পর্যন্ত সকল ঋষিদের বক্তব্যকেই তিনি সঠিক বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বাস্তুবিদ্যা, রসায়ন, সামরিক-অসামরিক সকল বিজ্ঞানের সকল তথ্যই বেদের শিক্ষার অন্তর্গত বলে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।[17] ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত 'সত্যার্থ প্রকাশ' পুস্তিকায় তিনি নিজের বিশ্বাস ও অন্যান্য ধর্মের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন।

অধঃপতিত হিন্দুধর্মের গৌরবময় পুনরভ্যুত্থানের জন্য তিনি সত্যদৃষ্টি, আত্মিক সত্য এবং সৎ কর্মের উদ্বোধন কামনা করেছিলেন। এরূপ আদর্শ পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের জন্য তিনি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে দায়ী না করে হিন্দু-মুসলমানদের দায়ী করেছিলেন। ভ্রাতৃবিরোধ যেমন তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ বা হস্তক্ষেপ অনিবার্য করে তোলে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তেমন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে ভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর রীতিপ্রকরণ অনুসরণ করে দয়ানন্দ ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ করেন। আত্মিক উন্নতিকে ভারতবাসীর সার্বিক ঐক্য ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির হাতিয়ার বলে দয়ানন্দ বিবেচনা করেছিলেন।

দয়ানন্দের আর্য সমাজ বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তনের আওয়াজ তুলে বিপুল সংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি, গৌরববোধ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন সংহত করে আর্য সমাজ মুক্তচিন্তার বিকাশে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে, আর্য সমাজ বৈদিক হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বের জঙ্গী প্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়ে ওঠে। সর্বভারতীয় জাতীয় চেতনা সঞ্চারে এই সমাজ হিন্দু সম্প্রদায়ের সীমিত গণ্ডীতে অবশ্য প্রবল গতিবেগ অর্জন করে।

আর্য সমাজ জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণপ্রথার বিরোধী ছিল, কিন্তু অর্জিত কৃতিত্বের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সমর্থন করেছিল। বেদ-নির্দেশিত বর্ণব্যবস্থা

অভ্রান্ত হতে বাধ্য এরূপ একটি প্রত্যয়ে আর্য সমাজ ঐ ব্যবস্থার আদর্শগত বিরোধিতা করেনি, কিন্তু সমকালীন যুগের প্রয়োজনে ঐ ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিল। অনুরূপভাবে সামাজিক ও শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নারীপুরুষের সমানাধিকার দাবি করে আর্য সমাজ আধুনিকতার অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করলেও, বেদ সহশিক্ষার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করায় ঐরূপ শিক্ষাব্যবস্থা আর্য সমাজ বর্জন করার পক্ষপাতী হয়ে ওঠে। সমগ্র দেশে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্য সমাজ পৃথক পৃথক স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৬ সালে দয়ানন্দ ইঙ্গ-বৈদিক কলেজ স্থাপিত হয়। মুন্সিরামের নেতৃত্বে রক্ষণশীল আর্য সমাজীরা হরিদ্বারে গুরুকুল প্রতিষ্ঠা করে ভিন্নতর পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী আর্য সমাজীরা পশ্চিমী জ্ঞান বা শিক্ষাপদ্ধতির উত্তম দিকগুলি গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেননি। আবার বেদ-নির্দেশিত শিক্ষার আদর্শের প্রতিও তাঁরা অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। রক্ষণশীল আর্য সমাজীরা শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই বেদের নির্দেশ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।[18]

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে স্থান দিতে আর্য সমাজ প্রয়াসী হয়েছিল। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পূর্বতন ধর্মে দীক্ষিত করাও আর্য সমাজের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সর্বোপরি, স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করে আর্য সমাজ স্বদেশপ্রেমী চিন্তার বিকাশে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভাবী ভারতের স্বপ্নরঙীন মহান স্বরূপের দয়ানন্দ-কল্পিত ধারণাটিকে তাঁর অনুগামীরা একটি আদর্শ ও আন্দোলনে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই আদর্শ ও আন্দোলনের আকর্ষণী শক্তি এমনই সুতীব্র হয়ে উঠেছিল যে, বহু ভারতীয় তাঁদের জীবন ও ধনসম্পদ হেলায় তুচ্ছ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে নিয়োজিত করেছিলেন। দয়ানন্দের আদর্শের মধ্যে তাঁরা অতীত ও বর্তমান অবস্থার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন এবং আগামী দিনে প্রাচীন ঐতিহ্যের গরিমায় সমুন্নত ভারতের আবির্ভাবের একটি প্রতিশ্রুতি ও ঈপ্সিত ভারত গঠনের একটি পদ্ধতির সন্ধান পান।

শিক্ষা, ধর্মপ্রচার, সাম্প্রদায়িক সুরক্ষা, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজসেবামূলক নানবিধ কাজে আর্য সমাজের ক্রিয়াকলাপ পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। আর্য সমাজ নদীর প্রবাহমান ধারার জলরাশি ও গতিবেগ অর্জনের মত নূতন সদস্য ও শক্তি

লাভ করে ভারতের ভিতরে-বাইরে দৃপ্ত স্বাজাত্যাভিমানের প্লাবন সৃষ্টি করে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতে আর্য সমাজ জাতীয়তাবাদের বিস্তার ও প্রাবল্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

আশ্চর্যের কিছু নেই, আর্য সমাজের উপর রাজনৈতিক দমন-পীড়নের খড়্গ আঘাত হানে বারে বারে। 'দি টাইমস্' কাগজের প্রতিনিধি হয়ে স্যর ভ্যালেণ্টাইন কিরল ১৯০৭ সালের পর থেকে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ অনুসন্ধান করতে এসে আর্য সমাজকে ইংল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিঘ্নস্বরূপ বলে চিহ্নিত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশক থেকে ৯০-র দশক পর্যন্ত আর্য সমাজ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি প্রগাঢ় সখ্য ও তীব্র বিরোধিতার নীতির মধ্য দিয়ে নিজস্ব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলে; অবশ্য বিরোধিতা বা সখ্য সর্বদাই আর্য সমাজের আদর্শের সাথে কংগ্রেস মতাদর্শের সাযুজ্যের উপর নির্ভরশীল থাকে। ১৯০০ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে আর্য সমাজীরা যোগদান করেন, কিন্তু ঐ সালের পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁরা রাজনীতি, বিশেষ করে কংগ্রেস রাজনীতি থেকে, নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন।[19] ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে আয়োজিত আন্দোলন ও পাঞ্জাবের ১৯০৭ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় আর্য সমাজীরা কংগ্রেসের অনুগামী হন। লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রগতিশীল আর্য সমাজীরা ব্রিটিশ সরকার বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সময় থেকে সরকারী সন্দেহ ও রোষ আর্য সমাজের উপর দমন-পীড়ন পন্থার জনক হয়ে ওঠে। দয়ানন্দের নামাঙ্কিত স্কুলগুলির উপরেও সরকারী রোষ বর্ষিত হতে থাকে। লালা হন্‌স রাজ প্রমুখ আর্য সমাজীদের মধ্যে এই সময় আর্য সমাজ ও বিদ্যালয়গুলির স্বার্থ প্রধানত রক্ষা করার জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থাপনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ১৯০৯-১০ সালে পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য পাতিয়ালা বহু সংখ্যক আর্য সমাজীকে কারারুদ্ধ করে এবং আর্য সংগঠনগুলিকে বন্ধ করে দেয়। এই ঘটনার পর ক্রমে ক্রমে সরকারী নিষ্পেষণ ও সমাজীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হ্রাস পেতে থাকে। প্রগতিশীল আর্য সমাজীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানে বিশ্বাসী জঙ্গী আর্যদের ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের প্রতি সরকার সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে থাকে। নেতৃস্থানীয় আর্য সমাজীদের

অনেকে জীবনের প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির অনুগামী হলেও পরবর্তীকালে পাঞ্জাব হিন্দু কনফারেন্স ও হিন্দু মহাসভার প্রকাশ্য হিন্দু রাজনীতির সক্রিয় সমর্থক হয়ে ওঠেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে আর্য সমাজের সাংগঠনিক বিপর্যয়ের উদ্ভব হয়। লাহোরে প্রতিষ্ঠিত দয়ানন্দ ইঙ্গ-বেদান্ত কলেজ শুধু হাতছাড়া হয় এমন নয়; পাঞ্জাব বিভক্ত হওয়ার ফলে আর্য সমাজীদের অনেকে উদ্বাস্তু হয়ে পড়েন। তবুও আর্য সমাজ শক্তিশালী ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠন হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯১১ সালে ভারতে বসবাসকারী আর্য সমাজীদের সংখ্যা ছিল ২৪৩,০০০; ১৯২১ সালে ৪৬৭,৫৭৮ এবং ১৯৩১ সালে ৯৯০,২২৩। ১৯৪১ সালের পরবর্তী আদমসুমারিগুলিতে আর্য সমাজীদের সংখ্যা পৃথক-ভাবে প্রদর্শনের রীতি পরিত্যক্ত হয়।[৪০] ১৯৪১ সালের আর্য নির্দেশিকায় প্রাদেশিক সভাগুলির সাথে যুক্ত আর্য সমাজগুলির সংখ্যা দু'হাজার বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত ও বহির্বিশ্বে আর্য সমাজীদের সংখ্যা ১৫ থেকে ২০ লক্ষের কাছাকাছি ছিল বলে অনুমান করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এরূপ ভাবার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

ভারতীয় জতীয়তাবাদের উষাকালে আর্য সমাজের আদর্শ ও আন্দোলন ভারতীয় চিন্তাভাবনা ও কর্মে উদ্দীপনার জোয়ার আনে। কিন্তু বেদের বাণীকে একমাত্র অভ্রান্ত ঘোষণা করে আর্য সমাজের ধর্মাদর্শ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মবিশ্বাসকে হেয় জ্ঞান করতে পরোক্ষ শিক্ষা দেয়। হিন্দু-মুসলমানের আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিরোধজর্জর দিনগুলিতে এরূপ শিক্ষা সাম্প্রদায়িকতার বাহক হয়ে ওঠে। বেদের শিক্ষাকে প্রশ্নাতীত সত্যের মর্যাদা দিয়ে আর্য সমাজ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা বিকাশের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে কর্মরত থাকে।

হিন্দুধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন লৌকিক রীতিনীতি, পুরোহিততন্ত্র, পৌত্তলিকতা, গোষ্ঠী-বিরোধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে আর্য সমাজ ভারতীয় ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সম্ভাবনায় উজ্জ্বল দিনগুলিতে আর্য সমাজের বেদ-নির্ভর হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি সম্বলিত ধ্বজা সংগ্রামী ভারতীয়দের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ঐ পতাকা মুসলমান ও খ্রীস্টানদের সন্দেহপরায়ণ করে তোলে,

আর ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ভারতীয়দের ক্ষুণ্ণ করে। ধর্মপ্রাণ বা ধর্মান্ধ হিন্দুদের আকর্ষণে সক্ষম হলেও আর্য সমাজ হিন্দু জনসাধারণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। মুসলমান সমাজ স্বভাবতই আর্য সমাজের আন্দোলনকে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বীজগুলিতে আর্য সমাজ জলসিঞ্চন করে।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন

ভারতীয় জনগণের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ পরমহংস অনুপ্রাণিত আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শন করে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধিতা করে এই আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থান বা 'নবজাগরণ' সূচনা করে। রামকৃষ্ণ ইহজগতের সমস্যা নিয়ে নিজেকে বিশেষ ব্যাপৃত রাখেননি; গ্রামীণ গল্পকথা, রূপক, উদাহরণ ইত্যাদি ব্যবহারে জটিল ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় সিদ্ধহস্ত, পরধর্ম সহিষ্ণু, বিভিন্ন ধর্মের রীতিপদ্ধতিতে ঈশ্বরের সাধনায় নিমগ্ন, দ্বৈত ও অদ্বৈত সত্তার অভিন্নতায় প্রত্যয়ী, মাতৃমূর্তির কালী স্বরূপের সাধক, ভাবপাগল রামকৃষ্ণ দিগন্তপ্রসারী, বিচিত্র একটি 'বিপ্লবের' সূচনা করেন। এই বিপ্লবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাজনৈতিক জীবনেও অনুভূত হয়। 'দক্ষিণেশ্বর বিপ্লবের' প্রধান কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী এই বিপ্লবের বার্তা ভারত ও বহির্বিশ্বে প্রচারে সর্বপ্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলনের স্বরূপ বর্ণনায় গবেষকগণ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করেন। এই আন্দোলনকে অদ্বৈতবাদী, সন্ন্যাস ও মঠ অনুসারী জীবনের সমর্থক, সার্বজনীন, সহিষ্ণু, উদার, গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতার বিরোধী, মানবিক, প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়। ১৮৮০ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই আন্দোলন ছয়টি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে: ১৮৮০ থেকে ১৮৮৬, ১৮৮৬ থেকে ১৯০২, ১৯০২ থেকে ১৯২২, ১৯২৬ থেকে ১৯৪৭, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে সত্তরের দশকের প্রায় শেষাশেষি পর্যন্ত, এবং তারপর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রমুখ সাধকবৃন্দ আন্দোলনের গতিপথে নিজেদের চরণচিহ্ন গভীর রেখায় এঁকেছেন।

রামকৃষ্ণ আন্দোলন বেদান্তের অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিল : নিত্য-অনিত্য, ব্যক্তিগত ঈশ্বর ও সর্বত্র বিরাজিত ঈশ্বর, জীবনের বহু বিচিত্র প্রকাশ, মানব সমাজের বহুবিধ স্বরূপের উপস্থিতি, জীবাত্মা-পরমাত্মা—সর্বক্ষেত্রেই আপাত বৈপরীত্যের মায়াময় কুয়াশার পশ্চাতে অদ্বৈত সত্যের আবিষ্কারে এই আন্দোলন বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।[৫1]

প্রকৃত আধ্যাত্ম জীবন সকল প্রকার বন্ধনমুক্তি ছাড়া অর্জন করা যায় না বলে প্রচার করে এই আন্দোলন সন্ন্যাস বা বন্ধনমুক্ত জীবনের আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। মঠ বা আশ্রমের জীবনকে শ্রেয়স্তর বলে বিবেচনা করা হয়েছিল।

সনাতন ধর্মের প্রচারে ব্যাপৃত হলেও রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সনাতন ধর্মকে স্বতন্ত্র একটি ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী না হয়ে এই আন্দোলন বিশ্বের সকল ধর্মের ভিত্তি সনাতন ধর্মের নীতিগুলির উপর নির্ভরশীল বলে প্রচার করেছিল।

এই আন্দোলন সকল ধর্মকেই সত্য বলে মর্যাদা দিয়েছিল। প্রত্যেকটি ধর্মই ঈশ্বরলাভের স্বতন্ত্র একটি পথ ; 'যত মত তত পথ'। রামকৃষ্ণের বেদান্ত ব্যাখ্যায় খ্রীস্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ প্রভৃতি সকল ধর্ম ঈশ্বরের দুয়ারে উপনীত হবার এক-একটি সোপান মাত্র।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন হিন্দুধর্মের কোন একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর আন্দোলন ছিল না। জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ ও কর্মমার্গ যেমন সাধনার ক্ষেত্রে পরমতম সত্যকে লাভ করার বিভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুলিও তেমন ঐ সত্যের ভিন্ন ভিন্ন আধার। আবার, একই ধর্মমতের গোষ্ঠীগুলির মধ্যেও পক্ষপাত প্রদর্শন না করে রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন গোষ্ঠী-সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিরাজ করেছিল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মতামতকে সত্য বলে অভিহিত করা হয়েছিল। আধ্যাত্মিক সাধনার সকল পথই বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সুমহান ঐক্য রচনায় ব্রতী বলে বিশ্বাস করা হয়েছিল।

সারা বিশ্বের ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার সমাধান সনাতন ধর্মের নীতিগুলি অনুসরণের মাধ্যমে সম্ভব এরূপ ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন কর্মযজ্ঞের সূচনা করে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে এই আন্দোলন সমাজ উন্নয়নের নানাবিধ কর্মে অংশগ্রহণ করে। মানবতাবাদের

শুভ্র চৈতন্যে বলীয়ান হয়ে সন্ন্যাসী কর্মীরা জীবসেবাকে ঈশ্বরের সেবা মনে করে দরিদ্র, বিপন্ন মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

শিক্ষা মানবপ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য বিবেচনা করে এই আন্দোলন শিক্ষাবিস্তারের আদর্শ গ্রহণ করে। গণচৈতন্যের বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব করে আধ্যাত্ম চিন্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী করা এই আন্দোলন অত্যাবশ্যক মনে করে।

বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও আধ্যাত্ম চিন্তার মধ্যে বিরোধহীন একটি সম্পর্ক এই আন্দোলনের নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে: পশ্চিমী বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্মের চিরন্তন নীতিগুলি অজ্ঞানতার আঁধার থেকে মানুষকে আলোকের ঝর্ণাধারার উদার প্রকাশের সামনে নিয়ে যাবার উপযুক্ত যুগলবন্দী ঐক্যতানের স্রষ্টা মনে করা হয়। উভয়েই মানুষের চিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে জ্যোতির্ময় জীবনের দিকনির্দেশ করে।

রামকৃষ্ণ মিশন আন্দোলন বিভিন্ন পর্যায়ে উপরোক্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকগুলির উপর অসম গুরুত্ব আরোপ করে; কিন্তু সকল দিকগুলি যে একই উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী এরূপ একটি বিশ্বাস আগাগোড়াই এই আন্দোলনের যাত্রাপথে দিকনির্ণায়ক যন্ত্র হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকে। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, নীতি ও সংগঠন স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ অনুসারী শিক্ষায় রূপ পরিগ্রহ করে। কাজেই এই আন্দোলনের স্বরূপ অনুধাবনে বিবেকানন্দের ভূমিকা বিশ্লেষণ অপরিহার্য।

'মানুষ তৈরীর দর্শন': 'অভয়' মন্ত্রের জাতীয় দীক্ষাগুরু বিবেকানন্দ

সন্ন্যাসী জীবনের কঠোর কৃচ্ছতা পালন করে, গেরুয়া বসন-ভূষণ-শিরস্ত্রাণ শোভিত তরুণ তাপস বিবেকানন্দ ইহলোক-পরলোক নির্বিশেষে মানবকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে রামকৃষ্ণের শিক্ষাকে নূতন ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে ব্যবহার করেছিলেন। পরমতম সত্তার আধ্যাত্মিক দুই মেরুপ্রান্তে তাঁর বলিষ্ঠ মন ধাবিত হয়েছে বারে বারে—নিত্য স্বরূপ ও লীলাময় রূপের নিবিড়-জটিল সম্পর্ক আধ্যাত্ম সাধনার পথে তাঁকে সতত চঞ্চল ও কর্মমুখর করে রেখেছিল। ব্যক্তির মুক্তির আদর্শের চেয়েও জাগতিক মঙ্গল সাধনের কর্মাদর্শ তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল অনেক বেশী। তিনি বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছর এই মহীয়সী ভারতমাতাই হোক আমাদের প্রধান উপাস্যা, অন্য সব অলীক

ভগবান আপাতত আমাদের মন থেকে মুছে যাক। আমাদের জাতিই হোক একমাত্র জাগ্রত পরমেশ্বর··· ।[২২]

দেশমাতৃকার বঙ্কিমী কাব্যিক প্রতীককে দরিদ্র, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত কোটি কোটি ভারতবাসীর করুণ, ক্লিষ্ট মূর্তিতে রূপায়িত দেখেছিলেন বিবেকানন্দ। প্রকৃতির দানে গরীয়সী সুজলাং, সুফলাং, শস্যশ্যামলাং ভারতমাতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঘর্মাক্ত, অপরিচ্ছন্ন, বুভুক্ষু ভারতীয় জনতার মাতৃমূর্তিতে। বঙ্কিমী কাব্যিক ভারতমাতা বিবেকানন্দের সমাজ-সচেতন চিন্তায় দরিদ্র, নিপীড়িত, অজ্ঞ ভারতীয় জনতার বাস্তবানুগ মাতৃমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ভারতীয় জনতার চক্ষুরুন্মীলন ভারতের পুনর্জাগরণের পক্ষে বিবেকানন্দ অপরিহার্য মনে করেছিলেন। এই জনতাকে তিনি ঘুমন্ত 'লেভায়াথান' বা বিশাল, বিপুল শক্তিধর সামুদ্রিক জীবের সাথে তুলনা করেছিলেন।

গণচেতনা জাগরণে কর্মরত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাফল্য কামনা করেও বিবেকানন্দ ঐ সংগঠনের অক্ষমতাকে সমালোচনাবিদ্ধ করতে দ্বিধা করেননি। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় জনগণকে শিক্ষায়, খাদ্যে, কল্যাণে সমাদৃত করা না গেলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যর্থতার দুয়ারে মাথা কুটতে বাধ্য। জীবের প্রতি সপ্রেম ব্যবহারকে তিনি ঈশ্বর সাধনার সোপান মনে করতেন। শৈশবের দোলনা, যৌবনের লীলাভূমি ও বার্ধক্যের তপোবন ভারতভূমির প্রতি আকর্ষণ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত ও নিরন্ন জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা নিজের ধমনীর রক্তপ্রবাহে এত তীব্রতায় তাঁর আগে অন্য কোন ভারতবাসী অনুভব করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে।

রামকৃষ্ণের মত বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্মকে ঈশ্বরের সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করেননি। তিনি ধর্মমত নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে বেদান্তের শিক্ষা অনুধাবন করতে উপদেশ দিতেন। নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী জীবনযাপন করে বেদান্তের শিক্ষা আত্মিকরণে তিনি বিশ্ববাসীকে প্রেরণা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্মের বিমূর্ত রূপের উপাসক হয়েও পরমতম সত্তার মূর্ত রূপের কল্পনাকে অবজ্ঞা করেননি। মূর্ত রূপগুলির খণ্ড-প্রকাশের সোপান বেয়ে অদ্বৈত ব্রহ্মের দুয়ারে হাজির হওয়া যায় বলে তিনি রামকৃষ্ণ-অনুসারী ব্যাখ্যা দিতেন। জীবের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ এবং

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মহামিলন ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বের নূতন ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি অমৃতের পুত্র মানুষকে মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ করেন। নব্য বেদান্তবাদী বিবেকানন্দের ধর্মীয় মতামত উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের কয়েকটি দশকে হিন্দু সমাজকে নানা শাখা-উপশাখার অনৈক্য ঘুচিয়ে দৃঢ়তর নূতন ঐক্যবন্ধনে সংবদ্ধ করে দিয়েছিল। অথচ ভারতের অন্যান্য ধর্মীয় সমাজের মহৎ জীবনাদর্শের প্রতি তাঁর অবিমিশ্র শ্রদ্ধা বজায় ছিল। বুদ্ধ, খ্রীস্ট, মোহাম্মদের প্রতি তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন। মৌলভী বা খ্রীস্টান মিশনারিদের সঙ্গে সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি কখনও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েননি। সিস্টার নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায়, তিনি একবার বলেছিলেন: 'আমি যদি নাজারেথের যিশুর যুগে প্যালেস্টাইনে বাস করতাম তবে অশ্রুজলে না ধুয়ে হৃদয়ের শোণিতধারায় আমি তাঁর পদযুগলকে পরিষ্কার করে দিতাম।'[২৪] মিস্ ম্যাক্‌লিয়ড লিখেছেন যে, বিদগ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 'নাজারেথের যিশু' ও 'বিশ্বে যিশুর দৌত্য' প্রভৃতি বক্তৃতার মত এত সরল ও আবেগপূর্ণ ভাষণ তিনি কোন খ্রীস্টান মিশনারির কাছ থেকেও শোনেননি; তিনি আরও লিখেছেন যে, যিশুর উপর বক্তৃতা করার সময় একটি জ্যোতির্বলয় যেন বিবেকানন্দকে ঘিরে থাকত। সকল ধর্মের শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধ থেকে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও বিশ্বের প্রতিটি মানুষের আত্মিক মুক্তির তত্ত্ব প্রচার করে বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে সার্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

নব্য বেদান্তবাদ প্রচার গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বিবেকানন্দের ধর্মমতের প্রধানতম ফলপ্রসূ দিকটি ছিল মনুষ্যত্বের পূর্ণতম বিকাশের জীবনদর্শন প্রচার। আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে সুসংগঠিত ভারতের পুণ্যভূমিতে সুস্থ, সবল, সমুন্নত ও অভয় মন্ত্রে দীক্ষিত একটি মহাজাতি গঠনের কর্মসূচী তিনি রচনা করেছিলেন। ধর্মে, কর্মে, চিন্তায় মহান একটি মহাজাতি গঠনের কাজে তিনি নিজের স্বল্পকাল স্থায়ী মহাজীবন ও বিপুল কর্মোদ্যোগ নিয়োজিত করেছিলেন এবং বাগ্মিতার শব্দকোষ থেকে সুনির্বাচিত শব্দগুলিতে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করে তিনি যে মহতী স্বদেশপ্রেমের স্রোতস্বিনীর উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন তাতে কুসংস্কার ও কুশিক্ষার ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে ভেসে গিয়েছিল বহুদূর। ভারতের জনগণকে অনুপ্রাণিত করে "আমি তাঁদের মধ্যে জীবন এনে দিতে চাই এবং এই কাজে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি বৈদিক

মন্ত্রের অভ্রান্ত শক্তিতে তাঁদের উদ্দীপ্ত করতে চাই; 'উত্তিষ্ঠৎ, জাগ্রৎ' এই অভয় বাণী ঘোষণা করবার জন্য আমি জন্মেছি।"[২৪]

শুধুমাত্র সন্ন্যাসী বা ভারতীয়দের ক্ষেত্রে নয়, গভীরতর অর্থে সকল বিশ্ববাসীর জন্য বিবেকানন্দ যে বাণী প্রচার করেছিলেন তা **'মানুষ তৈরীর' নূতন ভাবনা-চিন্তায় উদ্ভাসিত** ছিল। বজ্রের মত কঠোর, ব্রহ্মচর্যের কৃচ্ছসাধনে অভ্যস্ত, নিঃস্বার্থ, মহৎ, হৃদয়বান, নিঃশঙ্ক সার্বজনীন মানুষ তৈরীর সাধনায় তিনি আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন। জওহরলাল নেহ্‌রু বিবেকানন্দের অবদান হিসাবে ভয়লেশহীনতার দীক্ষামন্ত্রকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। রোমা রঁল্যা মন্তব্য করেছেন যে, বিবেকানন্দের **জগৎদৃষ্টি, কর্মযোগ ও অভয়মন্ত্র** ভারতীয় জনগণের ধমনীর রক্তে জলন্ত 'অ্যালকোহলের' মত বিস্তার লাভ করে স্বদেশপ্রেমের উষ্ণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছিল।[২৫] ভারতের, বিশেষ করে বাংলার, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিগুলির সদস্যদের বিবেকানন্দের শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার কর্মযোগ সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বা 'কলম্বো থেকে আলমোড়া' জাতীয় রচনা অবশ্যপাঠ্য ছিল। বিবেকানন্দের সমকালীন যুগ থেকে সুভাষচন্দ্রের যুগ পর্যন্ত **স্বদেশপ্রেমী এমন কোন ভারতীয় নেই যিনি বিবেকানন্দের কাছ থেকে স্বদেশপ্রেমের কিছু না কিছু পাঠ** গ্রহণ করেছেন।

বিবেকানন্দ গীতা, বেদান্ত ও উপনিষদকে শক্তির আধার হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি বেদান্তের মায়াবাদকে সাহস ও শক্তির তত্ত্ব হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। মায়াময় জগতে নিজের কর্তব্যকর্ম পালনে অনীহাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে তিনি উৎসাহ দিতেন এবং ধর্ম পালনের জন্য প্রয়োজনবোধে শত্রুনিধনে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণের বিধান দিতেন। শোষণ ও অপশাসনে নিপীড়িত হীনবীর্য জাতির দুর্দশা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি গর্জন করে উঠেছিলেন, 'আজকের ভারতে যা প্রয়োজন তা হল একটি বোমা!'[২৬]

বিবেকানন্দের প্রতীতি জন্মেছিল যে, জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। পশ্চিমী দুনিয়া দ্বিতীয়বার পরিভ্রমণ শেষে বোম্বাই পৌঁছে জনৈক মাদ্রাজী অধ্যাপককে তিনি বলেন যে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভ না করলে বিশ্ববাসী ভারতের ধর্মসংস্কৃতিকে কখনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে সক্ষম হবে না।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান আন্দোলন

মাদাম এইচ. পি. ব্লাভাট্স্কি ও তাঁর স্বামী কর্নেল এইচ. এস. ওল্‌কট ১৮৭৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'প্রাচ্য দেশীয় গূঢ় ধর্মীয় দর্শনগুলি অনুধাবনে সহায়তা করার জন্য' একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ দম্পতি ভারতে আগমন করে ১৮৮৬ সালে মাদ্রাজের সন্নিকটে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটানোর জন্য একটি সমিতি স্থাপন করেন।

ভারতে দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রসার প্রধানত মিসেস অ্যানি বেসান্তের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক চিন্তাভাবনার মূলধনে সম্ভব হয়েছিল।

'থিওসফিক্' বা দিব্যজ্ঞান আন্দোলনকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করা চলে। এই আন্দোলনের লক্ষণীয় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশাগত ব্যক্তিবর্গ এই আন্দোলন সূচনা ও প্রচারের কাজে প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলন ভারতে হিন্দুধর্মের সব কিছুকেই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিল এবং স্পষ্টতই ঐ ধর্মের পুনরুত্থানে আগ্রহী ছিল। হিন্দু পুনরুত্থান ও প্রাচীন হিন্দু আদর্শ এবং প্রতিষ্ঠানগুলি পুনর্প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব বলে ভারতীয় দিব্যজ্ঞান সমিতি প্রচার করেছিল। মিসেস বেসান্ত লিখেছিলেন, 'প্রাচীন ধর্মগুলির পুনরুত্থান, শক্তি অর্জন ও উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করাই ভারতীয় কর্তব্যকর্মের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। এরূপ (প্রতীতি) নূতন আত্মমর্যাদা, অতীতের জন্য গর্ববোধ এবং ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবে এসেছে স্বদেশপ্রেমী জীবনের এক মহান তরঙ্গ এবং জাতিপুনর্গঠনের সূচনা।'

দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রগতিশীল একটি তাৎপর্য ছিল এই, জাতি, বর্ণ, বিশ্বাস, ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে এই আন্দোলন নিযুক্ত ছিল। সকল ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণে এই আন্দোলন উৎসাহ যুগিয়েছিল। অবশ্য এই আন্দোলন প্রচীন হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক ধর্ম বলে বিবেচনা করেছিল।

এই আন্দোলন হিন্দুধর্মের প্রাচীন বিশ্বাসসমূহ ও গূঢ় অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। পূর্বজন্ম, পরজন্ম, আত্মার অবিনশ্বরতা, সাধু-সন্ত-মহাত্মাদের জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে এই আন্দোলনের গভীর বিশ্বাস ছিল। বিচিত্র নানা ধরনের বিশ্বাসের জালে

জড়িয়ে পড়লেও এই আন্দোলন শিক্ষাবিস্তার ও নারীমুক্তির প্রয়াসে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল।

দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রধানতম অবদান হিসাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের তীব্রতা বৃদ্ধির উল্লেখ করা যায়। ফিকটে, হেগেল, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের মত অ্যানি বেসান্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারায় বিধৌত জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি মনে করতেন, পরমতম সত্তার আত্মপ্রকাশে জাতীয়তাবাদ জন্মলাভ করে। জাতি ঐ সত্তার জাগতিক প্রকাশের স্বরূপে ধন্য। জাতীয় ধর্ম জাতির সংহতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকার বা ভূখণ্ডবিচ্যুত জাতিও ধর্মীয় প্রভাবে সংঘবদ্ধতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়। বেসান্ত ইহুদী জাতির উদাহরণ দিয়ে এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

বেসান্ত ভারতের গৌরবদীপ্ত ভাবী রূপের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আগামী দিনে ভারত বিশ্বত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ইঙ্গ-ভারতীয় রাষ্ট্রমণ্ডল ও বিশ্বরাষ্ট্রমণ্ডল গঠনে ভারত ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে তিনি প্রত্যয় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য, এশিয়া এবং ইউরোপ দৃপ্ত পদক্ষেপে জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়ে বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানে প্রবৃত্ত হবে। ব্যক্তি,সমাজ, জাতি এবং বিশ্বমানবতা সম্পর্কে জৈবনিক মতবাদের বনিয়াদের উপর তাঁর বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ সংস্থাপিত হয়েছিল। তিনি তাঁর ভগবৎ স্বরূপের প্রকাশ তত্ত্বের সাথে ব্লান্টস্‌লি ও হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবনিক মতবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন।[27] তিনি ব্যক্তিজীবনের বিকাশের সাথে জাতি ও বিশ্বজাতীয়তার বিকাশের সাদৃশ্য ও সাযুজ্য রচনা করেছিলেন। জৈব বিকাশের ধরন অনুযায়ী তিনি ব্যক্তিমানুষ ও বিশ্বমানবতার মাঝে সেতুবন্ধন রচনার নিম্নোক্ত পর্যায়গুলি উল্লেখ করেছেন :

১. কোষজীবনের আবির্ভাব
২. সংঘবদ্ধ কোষগুলির কলা সৃষ্টি
৩. কলাগুলির সমন্বয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি
৪. অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির সংস্থাপনে মানবদেহ সৃষ্টি
৫. ব্যক্তিমানুষের সমবায়ে সম্প্রদায়গত জীবনের আবির্ভাব
৬. সম্প্রদায়গুলির সংহতিতে জাতির উদ্ভব
৭. জাতিগুলির সম্মিলনে বিশ্বমানবতার সৌধ রচনা

বিশ্বমানবতার আদর্শটির লক্ষ্যপথে পৌঁছানর সকল পর্যায়েই করুণাময় ঈশ্বরের প্রকাশ ঘটে বলে বেসান্ত অনুভব করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোকবর্তিকা এই লক্ষ্যপথকে আলোকিত করে বিশ্ববাসীকে পথপ্রদর্শন করবে বলে তাঁর গভীর প্রত্যয় জন্মেছিল। ১৯১৭ সালে কোলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর ভাষণে তিনি এরূপ প্রত্যয় ঘোষণা করেন, '...জাতিগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ক্রুশবিদ্ধ ভারত এখন নবজীবনের প্রাতে মৃত্যুঞ্জয়ী, গৌরবোজ্জ্বল, চিরনূতন স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে। শীঘ্রই তাকে গৌরবোন্নত, স্বাবলম্বী, শক্তিশালী ও মুক্ত, এশিয়ার দ্যুতিময় প্রভা, আলোকবর্তিকা ও বিশ্বের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যাবে।'[২৪]

নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ দিব্যজ্ঞান আন্দোলনের প্রভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মমত্ববোধে জাগ্রত ও গর্বোন্নত হয়ে পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রতি অযথা হীনমন্যতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সাবালকত্বের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু, দিব্যজ্ঞান আন্দোলন সমকালীন ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্যকরূপে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে, হিন্দুধর্মের সব কিছুকে গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে আধুনিক যুগোপযোগী ভারত গঠনের ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রগতিশীল, যুগোপযোগী বেগবতী ধারাটির সাথে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির রুদ্ধ ধারাটির সংযোগ সাধনে প্রয়াসী না হয়ে ঐ আন্দোলন নিজস্ব গতিকে ক্রমশ শ্লথ করে তোলে। প্রচলিত হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা ও স্থবিরতার রজ্জুকে ছিন্ন না করে, সপ্রেম সহানুভূতিতে তাকেই কণ্ঠহার করতে গিয়ে ঐ আন্দোলন ফাঁসবদ্ধ হয়ে মুক্তচিন্তার পশ্চিমী বাতাস গ্রহণে অক্ষম হয়। স্বভাবতই ঐ আন্দোলন দু'-তিন দশকের মধ্যেই প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে বিদেশী ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতে প্রতিবন্ধী ধনতন্ত্রের জন্ম হয়েছিল। ঐ ধনতন্ত্রের সীমিত সুযোগ গ্রহণ করে সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাবার ব্যাপারে প্রচলিত হিন্দুধর্মের যুগোপযোগী সংস্কার একান্ত প্রয়োজন ছিল। উদারনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক কর্মোদ্যোগের অনুকূল

পরিবেশ রচনা করা সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের পক্ষে অপরিহার্য ছিল। দিব্যজ্ঞান আন্দোলন ঐরূপ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়নি।

স্বদেশ, স্বধর্ম, স্বজাতি ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করতে এই আন্দোলন অবশ্য নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিবেশে ভূমিকা পালন করেছিল। জওহরলাল থেকে শুরু করে বহু ভারতীয় বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনের সংস্পর্শে এসেছিলেন। মাদ্রাজ অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনে এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রথম সারির বহু সংখ্যক নেতাদের হাতেখড়ি সম্পন্ন করেছিল বলা যায়।

প্রার্থনা সমাজ

এই সমাজ ১৮৬৭ সালে বোম্বে শহরে প্রতিষ্ঠা করেন মহাগোবিন্দ রানাডে। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের প্রভাব এই সমাজের উদ্ভব ও কার্যকলাপের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। জাতীয় চেতনার উষাকালে এই সমাজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। স্বয়ং রানাডে ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ১৮৮৮ সালে অনুষ্ঠিত সামাজিক সম্মেলনের প্রথম সারির নেতা ছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের সাথে প্রার্থনা সমাজের ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান একটি পার্থক্য ছিল এই, ক্রমে ক্রমে প্রথমোক্ত সমাজ হিন্দুধর্মের ব্যাপ্ত গণ্ডীকেও অতিক্রম করে আইনানুগ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তোলে, কিন্তু দ্বিতীয় সমাজটি বরাবর হিন্দু সমাজের আঙিনায় অবস্থান করে সংস্কারকামী একটি গোষ্ঠী হিসাবে নিজস্ব হিন্দু চরিত্র বজায় রাখে।[২৭]

ভারতীয় ইসলামের যুগোপযোগী সংস্কার

ভারতীয় ইসলামের যুগোপযোগী সংস্কারে তিনজন মুসলমান দার্শনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—শাহ্ ওয়ালিউল্লা (১৭০৩-১৭৬২), স্যর সৈয়দ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এবং স্যর মহম্মদ ইক্‌বাল (১৮৭৩-১৯৩৮)।

শাহ্ ওয়ালিউল্লা

শাহ্ ওয়ালিউল্লার জীবদ্দশায় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হলে

ধর্মীয়, সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজতে হবে আদি-যুগের সামন্ততন্ত্র ও ইসলামের অনুসরণে। তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণা সনাতনী পথে ঋজুতা অর্জন করতে চাইলেও পারিপার্শ্বিক বস্তুগত প্রভাব তিনি এড়াতে পারেননি। ইসলামের সংস্কার তিনি মান্ধাতার আমলে প্রত্যাবর্তনের আওয়াজ তুলে সম্ভব করে তুলতে চাইলেও, অসচেতনভাবে তা করেছেন বুর্জোয়া পন্থার অলঙ্ঘনীয় প্রেরণায়। এল. আর. গর্ডন-পোলনস্কায়া তাঁর ইস্‌লামীয় চিন্তাকে 'অন্তর্বর্তী প্রকৃতির' বলে চিহ্নিত করেছেন, কেননা তাঁর চিন্তায় প্রাচীনের প্রতি মমত্বের সাথে নবীনের প্রতি আকর্ষণ জড়িয়ে আছে।[৪০] ওয়ালিউল্লা লিখেছিলেন: ধর্মীয় নীতিগুলির বিষয়বস্তু ও তাদের প্রকাশভঙ্গীর পার্থক্য আছে; বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয়, কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নিয়ত পরিবর্তনশীল। তিনি গোঁড়াপন্থী তাত্ত্বিকদের যুক্তি খণ্ডন করে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, দশম শতাব্দীর ব্যাখ্যায় ইসলামের মর্মবাণীকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুধাবন করার প্রয়াস ইসলামের সমকালীন অবক্ষয়ের কারণ। ইকবাল ঠিকই বলেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ওয়ালিউল্লা সর্বপ্রথম নিজের মধ্যে নূতন সত্তার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন।

প্রাচীন-নবীনের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণশীল ওয়ালিউল্লার চিন্তাভাবনা অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করলেও আগামী দিনে তা ইসলামের ব্যাখ্যায় দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর জনক হয়ে উঠেছিল। একদল ইস্‌লামীয় তাত্ত্বিক সামন্তযুগীয় সম্পর্ক বজায় রেখে স্থিতাবস্থা কায়েম রাখতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরা ইসলামের শুদ্ধিকরণের দাবিতে প্রথম চার খলিফার আমলের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সোচ্চারে প্রচার করতে থাকেন। অপর একদল ধনতান্ত্রিক যুগে ইসলামের বিষয়বস্তু অপরিবর্তনীয় রেখে তাকে নূতনতর ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ করে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নবজাগরণ সম্ভব করে তুলতে সক্রিয় থাকেন।

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান

ইসলামকে সামাজিক, আর্থনীতিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিপুল পরিবর্তনের সাথে নূতন মূল্যায়নে বিধৃত করতে সফল হয়েছিলেন সৈয়দ আহ্‌মদ খান। ইসলামের নীতিগুলিকে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ

করেন। সৈয়দ আহ্‌মদ সামন্ত অভিজাত পরিবারে লালিত-পালিত হলেও তাঁর ধর্মীয় ব্যাখ্যা সামন্তযুগীয় ধর্মাদর্শের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করেছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পড়ন্ত ক্ষুদে জমিদার ও বিকাশোন্মুখ মুসলমান ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করেছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় মুসলমান যিনি স্বজনদের দুরবস্থা সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন ; সামাজিক দিক থেকে মোগল-পরবর্তী যুগে মুসলমানেরা দৃঢ় সংবদ্ধ সম্প্রদায়ের মর্যাদা হারিয়েছিল—একদিকে জমিমালিক স্বল্পসংখ্যক অভিজাত জমিদার, অপর দিকে দরিদ্র, নিরন্ন, পূর্বর্তন 'অস্পৃশ্য' চাষী জনসাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়কে অসমান প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে ফেলেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর ক্ষমতা খর্ব করে। ওয়াহ্‌বী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা ঔপনিবেশিক শাসননীতিকে স্পষ্টতই মুসলমান স্বার্থের পরিপন্থী করে তোলে। ঔপনিবেশিক ভারতে সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ও সম্মান পুনরুদ্ধারের একটি কার্যক্রম রচনা করেন : প্রথমত, **ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা** ও দ্বিতীয়ত, **সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নের ব্যবস্থা**। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটি ভারতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। আর, সাংস্কৃতিক-শিক্ষাগত কর্মপদ্ধতিটি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল এবং ঔপনিবেশিক ভারতে ধনিকশ্রেণীর মধ্যে মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ভাবী সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৪১]

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ মোগল যুগের অবসানে গোঁড়াপন্থী ইসলামী ধর্মীয় নেতাদের ব্রিটিশ সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভাষার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব সত্ত্বেও মুসলমান সমাজকে ইংরাজী ভাষা ও পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখতে উৎসাহী করে তুলেছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের বিরাগ ও বৈরী মনোভাব সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সদস্যদের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি শাসন-কর্তৃপক্ষকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মুসলমানেরা সিপাহী বিদ্রোহে ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ করেননি। আবার, মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, কেননা, ব্রিটিশেরা ভারতে শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম। মুসলমানেরা ব্রিটিশ ভারতের নাগরিক হিসাবে ব্রিটিশ রাজাকে

মানতে বাধ্য, তুরস্কের শাসক সুলতান আবদুল হামিদ সুলতান হলেও মুসলমান জগতের ধর্মীয় গুরু বা খলিফা নন। কাজেই তাঁর মতে তুরস্কের সুলতানের ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য লাভের অধিকার নেই। এ সকল উক্তির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হৃদয়মন জয় করে মুসলমান-বিরোধী মনোভাব ও কর্মপন্থার অবসান ঘটান।

স্যার সৈয়দ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইসলাম খ্রীস্টধর্ম ও খ্রীস্টানদের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। উভয় ধর্মের পার্থক্য সামান্য—ইউনিটারিয়ান ও গোঁড়াপন্থী খ্রীস্টানদের স্বল্প পরিসরে সীমিত তারতম্যের চেয়ে বেশী কিছু নয়। ঐতিহাসিক ধর্মযুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন যে, খ্রীস্টান-মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ আসলে ধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না, ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংঘাত। তিনি কূটনৈতিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যুক্তিজাল বিস্তার করে ব্রিটিশ ও মুসলমানদের মধ্যে বৈরিতার ক্ষেত্রটিকে যথাসম্ভব সঙ্কীর্ণ করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে তিনি বোঝাতে সক্রিয় ছিলেন যে, ইসলাম খ্রীস্টান তথা ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দেয় না।

স্যর সৈয়দ মুসলমানদের ইংরাজী ভাষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখতে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন শুধুমাত্র জাগতিক স্বার্থে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমী আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও। কেবলমাত্র কেরানী, অফিসার, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কাজে মুসলমানদের অংশগ্রহণের জন্য ইংরাজী শিক্ষার পক্ষে তিনি ওকালতি করেননি; করেছিলেন চরিত্রগঠন ও সামাজিক নৈতিকতার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। তিনি ইংরাজী শিক্ষার বৈষয়িক দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি; ঐ শিক্ষার জীবনদর্শন তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৩২] ১৮৭৫ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ ইসলামের ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনে নিয়োজিত হয়নি। যুগোপযোগী শিক্ষার একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবেই এই কলেজটি প্রথম যুগে কর্তব্যরত ছিল।

স্যর সৈয়দ হিন্দুবিদ্বেষী না হলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার দাবি স্বীকৃত হলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানেরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ইচ্ছানুসারে চালিত হতে বাধ্য হবে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান না করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম

মুসলমান সভাপতি বদরুদ্দিন তায়েবজীকে লেখা চিঠিতে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলে যে, কংগ্রেস-পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশে বলপ্রয়োগের ঘটনা বৃদ্ধি পাবে এবং সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরবর্তী দিনগুলিতে যেমন মুসলমানেরা ব্রিটিশ ক্রোধের শিকার হয়েছিল, এবারেও মুসলমানদের অনুরূপ শিকার হতে হবে।[33] রাজনীতি পরিহারের রাজনীতি সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমানদের পক্ষে সঠিক বলে অনুভব করেছিলেন।

সৈয়দ আহ্‌মদ একটি সংবদ্ধ জাতির পক্ষে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা কাম্য মনে করেছিলেন। ভারতে তেমন একটি জাতি নেই বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ; তাছাড়া, তাঁর মতে ভারত একটি দেশ নয়, মহাদেশ। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের সর্বনাশ ঘটবে। ১৮৮৩ সালে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, 'বৃহৎ সম্প্রদায়টি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়টির স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূল আচরণে লিপ্ত হবে।'[34]

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের দেশজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারী জীবনযাত্রা সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম হিসাবে তিনি উদীয়মান বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মত ধর্মের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। আদি ইসলামে সঠিক কোন মান নির্ণীত হয়নি এমন সব রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে তিনি যুগোপযোগী ব্যাখ্যা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন ; ধর্মীয় ব্যাপারে পয়গম্বরের সকল নির্দেশ নির্বিচারে মান্য করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য বলে তিনি অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। জাগতিক ব্যাপারে কোরাণের অস্পষ্ট নির্দেশগুলিকে মানতে হবে এমন কথা তিনি প্রচার করেননি। সুদের ব্যবসার মাধ্যমে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে তিনি অধার্মিক আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু ধনতন্ত্রের পক্ষে অত্যাবশ্যক সুদ দান-গ্রহণকে তিনি সমর্থন করেছিলেন।

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থন করেও তিনি ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পথিকৃৎ হতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এরূপ অসংলগ্ন, স্ববিরোধী চিন্তার উৎস অবশ্য ভারতীয় মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিহিত ছিল।[35] হিন্দু ধনিকশ্রেণীর তুলনায় মুসলমান ধনিকশ্রেণীর আপেক্ষিক দুর্বলতা, জমিদারতন্ত্রের সাথে ঐ

শ্রেণীর নিবিড় সংযোগ, ব্রিটিশদের উপর নির্ভরশীলতা এবং নিজেদের সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মীয় একটি সংহত গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জরুরী তাগিদ স্যর সৈয়দের চিন্তাভাবনায় স্ববিরোধী প্রবণতা সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান 'নবজাগরণের' ধ্যানধারণায় যেসব স্ববিরোধী ভাবনা পরবর্তীকালেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের গতিপথে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল সেগুলির উৎস তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বক্তব্যের মধ্যেই ভ্রূণ অবস্থায় বিরাজ করেছিল।

স্যর মহম্মদ ইকবাল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে দুনিয়াজোড়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিস্তার, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নূতন চেতনার উন্মেষ, ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর মুসলমান অংশের আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন এবং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থসংঘাত ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক দর্শনচিন্তায় নূতন দিগন্ত খুলে দেয়। ইসলাম-অনুরাগী ভারতীয় জনতাকে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত করা ও তাঁদের সামাজিক সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের শেষদিকে কবি-দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ইকবালের রচনায় ঐ জরুরী কর্তব্য সাধনের বলিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ইকবালের রচনাবলীতে **ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাবের** পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা যখন বিদেশীর কাছে নতমস্তক হয়েছ তখন তোমরা তোমাদের দেহমন খুইয়েছ।' ঔপনিবেশিকতা বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনগুলিতে ইকবালের চিন্তার সতেজ নবীনতা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মনোজগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়নে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর 'পাপ' বা 'অমঙ্গল' সংক্রান্ত ভাবনার বস্তুগত ভিত্তি বুদ্ধিজীবীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্যেটে ও মিলটনের প্রভাবে তাঁর পাপ-পুণ্য সংক্রান্ত দ্বান্দ্বিক ধ্যানধারণা গড়ে উঠেছিল। তাঁর বিশ্লেষণে ঈশ্বরের উপদেশ অমান্য করার অপরাধে দোষী আদম ও ঈভের স্বর্গ থেকে বিদায়, মানুষের মুক্তচিন্তার প্রথম প্রকাশের দ্যোতক। অমঙ্গলের প্রতীক শয়তান মঙ্গলের পথ সুগম করেছিল অভিমত প্রকাশ করে

তিনি দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় রত ছিলেন। গ্যেটের 'মেফিস্টোফ্লিস'-এর মত ইকবালের 'ইবলিস' শয়তান চিরন্তন শক্তির অংশবিশেষ হিসাবে সর্বদা অমঙ্গল চিন্তায় ভাবিত হলেও কেবলমাত্র মঙ্গলকর ক্রিয়া সম্পাদন ছাড়া আর কিছুই করে না। মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর শয়তানের মত ইকবালের শয়তান ভগবানের চেয়েও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে বলীয়ান, সৃজনশীলতায় দীপ্তিমান।[36] ভগবানকে সম্বোধন করে ইবলিস ইকবালের একটি কবিতায় সংলাপ রচনা করেছে এরূপভাবে :

'তুমি নক্ষত্রখচিত মহাকাশ তৈরী করেছে, আমি দিয়েছি গতিবেগ,
আমি পৃথিবীর সব কিছুর অভ্যন্তরে সুপ্ত প্রাণস্পন্দন।
তুমি দেহে সঞ্চার কর জীবন, আর আমি করি উত্তাপের সঞ্জীবন।
তুমি শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের পথপ্রদর্শক, আর আমি অশান্ত দ্বন্দ্বের !
নশ্বর পৃথিবীর মূর্খ, অপরিণামদর্শী মানুষের দল
তোমার ক্রোড়ে জন্ম নেয়, আর আমাতে পায় পূর্ণবয়স্কতার সম্মান।'

[লেখকের অনুবাদ : ইংরাজী থেকে]

ইকবালের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কিত ধ্যানধারণা ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক, রাজনৈতিক অমঙ্গল নিরূপণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইকবালের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁরা বস্তুগত মাপকাঠিতে ঔপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্রকে সামাজিক অমঙ্গলের প্রধান দুটি কারণ হিসাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[37]

ইকবাল মানুষের অসীম ক্ষমতায় আস্থাবান ছিলেন ; তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ ও ভগবান উভয়ে স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'পায়াম-ই-মাসরিক' রচনায় তিনি মানুষ ও ভগবানের মর্যাদাকে সমতুল্য করে তুলেছিলেন :

'তুমি রজনী করেছ সৃজন, আমি করেছি বাতি
তুমি মৃত্তিকা করেছ সৃজন, আমি করেছি পেয়ালা।
তুমি মরুভূমি, পর্বত আর বনভূমি সৃজন করেছ,
আমি গড়েছি বাগিচা, বাগান আর কুঞ্জ ;
আমিই পাথর ঘষে-মেজে আরশি বানাই,
আর আমিই বিষ নির্মূল করতে বিষের ওষুধ বানাই।'

[লেখকের অনুবাদ : ইংরাজী থেকে]

ইসলামের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বিমুগ্ধ ইকবাল ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, ইসলামের প্রাণশক্তি নিহিত নিয়তিবাদে। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের মত ইকবাল এই নিয়তিবাদকে যুগোপযোগী করে তুলতে **বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন** করেছিলেন। মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে এই ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

ইকবাল মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দাবির যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনায় যেমন প্রয়াসী ছিলেন, অন্যদিকে তেমন **মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার সংযোগ** প্রদর্শনে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, 'স্বদেশের প্রতি ভালবাসা এবং স্বদেশের সম্মানরক্ষায় প্রাণবিসর্জনের জন্য প্রস্তুতি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ···যেসব দেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘু কেবলমাত্র সেখানেই জাতীয়তাবাদ তাঁদের পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে মুসলমানদের বাস সেখানে ইসলাম জাতীয়তাবাদকে স্থান করে দেয়, কেননা ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ কার্যক্ষেত্রে সমার্থক।'[৪৪]

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা (বিশেষ করে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ধ্যানধারণা) রেনানের চিন্তাভাবনার অনুসারী বলে অভিমত প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন, ভারত উপমহাদেশে একটিমাত্র জাতিগঠনের উপযোগী মনস্তাত্ত্বিক ও আবেগগত সমরূপতার অভাব আছে। বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধনে আকবর বা কবীরের প্রয়াস হিন্দু-মুসলমান জনতার কাছে অভ্যর্থনা পায়নি। হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থা সমন্বয়ী কার্যক্রমের বিরোধী শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। এই কারণে ইকবাল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বৈচিত্র্য অস্বীকার করার উপায় নেই। এই সত্য অস্বীকার করলে ভারতীয় সমাজে উত্তেজনা বাড়বে বৈ কমবে না। অথচ, এই সত্যটি স্বীকার করে নিলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা বাড়তে পারে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধসংস্কৃতির সাথে ভারতীয় হিন্দুরা একাত্মতা বোধ করেন বলে ইকবাল ভেবেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের সংহতির সাথে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয়-রাজনৈতিক যোগসূত্র অটুট ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে ভারত এশিয়ারই ক্ষুদ্রাকৃতি একটি প্রতিরূপ।[৪৫]

আজিজ আহ্‌মদ মনে করেন, ইকবালের এরূপ বক্তব্য **'দ্বিজাতি তত্ত্বের' প্রকাশ্য ঘোষণা** ছাড়া আর কিছু নয়। অস্পষ্ট আঁচড়ে এই তত্ত্বের রূপরেখা এঁকেছিলেন স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান এবং মৌলানা মোহাম্মদ আলী এবং এর পূর্ণরূপের রূপকার হয়ে উঠেছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্।[40]

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত একটি নিবন্ধে জওহরলাল নেহ্‌রু ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংহতির প্রবক্তা ইকবালের রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকে গোঁড়াপন্থী হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনার মিত্র বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।[41] ইকবাল ভারতে স্বতন্ত্র একটি মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দার্শনিক ভিত্তি তিনি রচনা করেছিলেন বলে বহু ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, ইকবাল হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না।

আলী সর্দার জাফ্‌রী বুদ্ধিজীবী ও কবি হিসাবে ইকবালকে নীৎসে, সপেনহাওয়ার, মার্কস, লেনিন, গজলী, জালালউদ্দিন রুমী, ডারউইন, আইনস্টাইন, ম্যাকট্যাগার্ট, হোয়াইটহেড্, বার্গসঁ, ভর্তৃহরি, গালিব, গ্যেটে, টিপু সুলতান, জওহরলাল নেহ্‌রু প্রমুখ ব্যক্তিদের সমকক্ষ ও সমগোত্রীয় প্রতিভার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন।[42] জাফ্‌রীর এই উক্তি সঙ্গত কারণে অনেকের কাছে অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে; তার চেয়ে বড় ত্রুটি এই যে, এই উক্তি ইকবালের চিন্তাভাবনায় স্ববিরোধ বা বৈপরীত্য প্রকাশে কুণ্ঠিত বলে মনে হয়।

ইকবাল বিপ্লবী কবি ছিলেন কিনা নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা শক্ত। মানবদরদী কবি ছিলেন অবশ্যই। তাঁর 'ফরমান-ই-খুদা' কবিতা (আল্লা যেখানে তাঁর দূতদের গরীব মানুষদের জাগ্রত করে তুলতে আদেশ দিচ্ছেন) শোষণের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রতিবাদের কবিতা যদি না-ও হয়, মানবদরদে ভাস্বর কবিতা নিশ্চয়ই। তিনি পশ্চিমী সভ্যতার বস্তুবাদী জগৎদৃষ্টি বা সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি আর্থনীতিক ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় পরিস্থিতিতে ধনতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন এমন কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কার্ল মার্কসের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কবিতা লিখেছিলেন; সেখানে মার্কসকে বস্তুবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত করা ছাড়া অন্য কোনরূপ প্রশংসা করা হয়নি। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় বিষয়বস্তু এমনই প্রকৃতির যে দার্শনিক বিচার-বিশ্লেষণে তার স্বরূপ উপলব্ধিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

এরূপ প্রতীতির জন্য তিনি অনেক ক্ষেত্রে সুললিত বাগাড়ম্বরের অন্তরালে রক্ষণশীল বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন।[43] অনেক সময় তিনি যুক্তিবাদের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সুফিবাদের অতীন্দ্রিয়তার শরিক হননি। রুমির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও তিনি হাফিজ শিরাজির অতীন্দ্রিয়তার নিন্দা করেছিলেন।

নীৎসের মহামানব তত্ত্বের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। ১৯১০ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'সত্যের চেয়ে শক্তি অনেক বেশী স্বর্গীয় এবং ঈশ্বর শক্তির আধার।' তাঁর রচনাবলীতে নেপোলিয়ন, মাৎসিনি, বিসমার্ক, মুসোলিনি, লেনিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি নাদির শাহ্ ও আহ্মদ শাহ আবদালিকে 'ভারত, চীন, তুরস্ক ও সিরিয়ার গৌরব' বলে অভিহিত করেছিলেন। আসগর আলী ইঞ্জিনীয়র মন্তব্য করেছেন যে, ইকবাল ইসলামীয় সংস্কৃতির অনিবার্য ব্যাপ্তির সম্ভাবনায় বিভোর ছিলেন।[44]

রাজনৈতিক দর্শনচিন্তায় দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইকবাল ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়মনে স্বতন্ত্র একটি সত্তা মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। 'সার্বজনীন কবি' হিসাবে তাঁকে অভিনন্দিত করার ব্যাপারে ঐক্যমতের অভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনি পরিবর্তনের জয়গানে উদ্বুদ্ধ কবি সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি উর্দু কবিতার পুরোন বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী ও অলঙ্কারকে নূতন ভাব ও অর্থদ্যোতনায় সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মানুষের **'স্বকীয় সত্তা'** বা 'খুদি' সম্পর্কিত ধারণাটির প্রকাশ ও বিকাশে তন্ময়, অনুপম কবিতাবলীর মাধ্যমে তিনি ভারতবাসীর হৃদয়মন জয় করে নেন। 'আসরর্-ই-খুদি' এবং 'রুমুজ্-ই-বেখুদি' দীর্ঘ কবিতা দু'টি ঐ ধারণাটির অনবদ্য প্রকাশমাধুর্যে ভরপুর।

আহ্মদি আন্দোলন

ইসলামের বাণীর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ভারতে প্রচার করার অভিলাষে অনুপ্রাণিত এই আন্দোলন প্রগতিশীল সামাজিক মতাদর্শ বিস্তারে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। এই আন্দোলনের জন্ম স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ানে। ইংরাজী শিক্ষা ও খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের প্রচারের ফলশ্রুতিতে পরিবর্তিত ভারতীয় সত্তার যুগোপযোগী দেশীয় স্বাতন্ত্র্যের

সংজ্ঞা পুনর্নির্ধারণের তাগিদে বঙ্গদেশে যেমন ব্রাহ্মসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন অন্দোলনে ব্যাপৃত হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পাঞ্জাবেও তেমন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় নিজেদের ধর্মসংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় ও আধুনিকীকরণে নিয়োজিত হয়েছিল। ১৮৯৯ সালে মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ অমৃতসরের উত্তরে গুরদাসপুর জেলার কাদিয়ানে যখন এই আন্দোলনের সূচনা করেন তখন ঐ জেলার জনসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষের কাছাকাছি: শতকরা ৪৯ ভাগ মুসলমান, ৪০ ভাগ হিন্দু, ১০ ভাগ শিখ এবং হাজার চারেক খ্রীস্টান।[45] খ্রীস্টান ধর্মসম্প্রদায় পরিচালিত হাসপাতাল, স্কুল, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংখ্যা ও প্রভাব খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী ছিল। গুরুদাসপুরের ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির পরিসংখ্যান মোটামুটি সমগ্র পাঞ্জাবের সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানের সাথে সাযুজ্য বজায় রেখেছিল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, পাঞ্জাবের ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে বলশালী হয়ে একে অপরের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে সচেষ্ট থেকেছিল। মোগল যুগে মুসলমান সম্প্রদায় শিখদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করেছিল এবং বাদশাহী খেয়ালখুশীতে শিখেরা অত্যাচারিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল যুগের অবসানের পর ক্রমে ক্রমে, এবং রণজিৎ সিংয়ের আমলে বিশেষ করে দ্রুতবেগে শিখেরা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হলে দেশীয় সকল সম্প্রদায়ই হতমান হয়ে পড়ে, আর খ্রীস্টান ধর্মযাজকেরা তাঁদের প্রচারযন্ত্রকে জোরদার করে। স্বামী দয়ানন্দ এরূপ পরিবেশে হিন্দু বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের স্বপ্নে মোহিত হয়ে 'সত্য প্রকাশ' রচনা করেন এবং আর্য সমাজ আন্দোলনের সূচনা করে পাঞ্জাবে 'হিন্দু নবজাগরণের' সম্ভাবনা সৃষ্টি করেন। আর্য সমাজের ধর্মীয়-সামাজিক আন্দোলন যখন প্রবল গতিবেগ সঞ্চার করে তখন ইসলাম অনুসারী পাঞ্জাবী ভারতীয়দের মধ্যেও অনুরূপ ধর্মীয়-সামাজিক ইস্‌লামী কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এই প্রয়োজন মেটাতে কাদিয়ানের মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ আহ্‌মদি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান।

আহ্‌মদ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কোরাণ, বাইবেল ও হিন্দু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন। তিনি সুন্নী ও সিয়া মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের নানারূপ পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন; পশ্চিমী উদারনৈতিক

ভাবধারার কিছু কিছু প্রভাব তাঁর ধর্মমতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সুফীদের অতীন্দ্রিয়তার তত্ত্ব তাঁর ধর্মমতে ছায়াপাত ঘটালেও তিনি সুফী ধর্মাদর্শ গ্রহণ করেননি। খারাজী, সিয়া, সুন্নী ও সুফী ইসলামের ধর্মতত্ত্ব বা ক্রিয়াকর্ম থেকে আহ্‌মদী ইসলাম ধর্ম স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে।

স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান কোরাণের ব্যাখ্যা যুক্তিবাদের রীতিপদ্ধতিতে করেছিলেন; উদার, রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিতে প্রতিভাবান সৈয়দ আহ্‌মদ শিক্ষিত মুসলমানদের জন্য কোরাণের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবস্থা করে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যে অচঞ্চল, আপেক্ষিকতার বিচারে অগ্রসর হিন্দুদের সাথে ক্রমশ প্রতিযোগিতায় সক্ষম একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যুক্তিবাদের কষ্টিপাথরে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতির বিচার-বিশ্লেষণ সৈয়দ আহ্‌মদের অভিপ্রেত ছিল। আলীগড়ের অ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ এবং দেওবন্ধ ও লক্ষ্ণৌর মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি সৈয়দ আহ্‌মদের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত ছিল। মীর্জা গোলাম আহ্‌মদের ধর্মাদর্শ পশ্চিমী উদারনীতির স্পর্শলাভে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু তিনি মুসলমান হৃদয়ের আবেগের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বাণীপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে অভিহিত করেছিলেন; নিজেকে ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত প্রতিশ্রুত ত্রাতা বা 'মাহ্‌সী মওদুদ্' ও কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলামের ধর্মযুদ্ধ পরিচালনার নেতা বা মহ্‌দী বলে উল্লেখ করেছিলেন। মোজেসের পরে ইসলামী চতুর্দশ শতাব্দীতে মেরির পুত্র যিশু যেমন ত্রাতা হিসাবে আবির্ভূত হয়ে মর্য্যাদালাভ করেছিলেন, মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ তেমন যিশুর পরে আবির্ভূত পবিত্র পয়গম্বর হিসাবে মর্যাদা লাভের জন্য দাবি তুলেছিলেন। অবশ্য গোলাম আহ্‌মদ শান্তিপ্রিয় ত্রাতা ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ১৮৭৭ থেকে ১৯০৮ সালে লাহোরে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উর্দু, পারসী ও আরবী ভাষায় ধর্মসংক্রান্ত রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত (প্রথম খণ্ড ১৮৮০ সালে প্রকাশিত) তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আহ্‌মদিয়ার প্রমাণসমূহ' ইসলাম ধর্মকে যুক্তিবাদী, তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারী ও সংবদ্ধতার গুণসমৃদ্ধ করে তোলার তাগিদে রচিত হয়। পুস্তকটি অ-মুসলমানদের সঙ্গে কথোপকথনের প্রতিশ্রুতিতে শুরু হলেও শেষপর্যন্ত সমাপ্ত হয় কোরাণের তত্ত্বগুলির নিসংশয় অভ্রান্ততার দাবি রেখে। এমন

বক্তব্যও পেশ করা হয় যে, পুস্তকখানির যুক্তিসমূহ আর্য সমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের 'ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে' নস্যাৎ ও বরবাদ করতে সক্ষম হবে।

মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ খ্রীস্টান ও সিয়া-সুন্নী মুসলমান সম্প্রদায়গুলির ধর্মগুরুদের সাথে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের খ্যাতি ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব প্রদর্শন করতে সক্ষম হন। দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ৫০০০ হাজার মুসলমান শ্রোতার সামনে তিনি তিনজন মোল্লার যুক্তিজাল খণ্ডন করে আহ্‌মদি ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইসলাম থেকে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত জনৈক ভারতীয়ের সাথে ১৮৯৩ সালে দ্বাদশ দিনব্যাপী তর্কবিতর্ক তাঁকে খ্যাতিমান করে তোলে। খ্রীস্টান পত্রপত্রিকাগুলি তাঁকে ভণ্ড আখ্যা দেয়; সিয়া, সুন্নী নির্বিশেষে মুসলমান পত্র-পত্রিকাগুলি তাঁকে সমালোচনায় বিদ্ধ করতে থাকে। আর্য সমাজের জঙ্গী অংশের সাথে তাঁর বিরোধ তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর ধর্মাদর্শ শিয়ালকোট, লুধিয়ানা, অমৃতসর প্রভৃতি শহরগুলির মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে শুরু করে। আহ্‌মদি পত্রপত্রিকা ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা শহরে প্রকাশিত হতে থাকে। ইসলামী সকল গোষ্ঠীর ধর্মীয় মতামত, খ্রীস্টান ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের সাথে আহ্‌মদি ধর্মদর্শন ও উপাসনার রীতিনীতি পার্থক্য নির্দেশ করে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট, যুক্তিবাদী আহ্‌মদি ইসলাম তত্ত্ব মুসলমানদের 'নবজাগরণে' সহায়ক হয়েছিল। অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ রাজভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন; তিনি ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাম্য বলে বার বার ঘোষণা করেছিলেন।[46] 'জেহাদ' শব্দটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কানে অপ্রিয় শোনায় বলে তিনি শান্তিপূর্ণ জেহাদের কথা বলেছিলেন এবং ঐ জেহাদ যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত নয় তা-ও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে কালপেক্ষ করেননি।

আহ্‌মদিরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করে ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবেই শুধুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজনীতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার তাগিদে। স্বাধীন ভারতে মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যালঘিষ্ঠ একটি গোষ্ঠী হিসাবে অবস্থিতি ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের অত্যাচারের সম্ভাবনার কালো হাত সম্প্রসারণে সহায়তা করবে ভেবে তাঁরা ভারতীয় স্বায়ত্তশাসন দাবির বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি

খিলাফৎ আন্দোলনের সময় তুরস্কের খলিফাতন্ত্রের অধিকার সমর্থনে লাহোরীদের মত আহ্‌মদিরা এগিয়ে আসেননি। তুরস্কের দাবিকে তাঁরা রাজনৈতিক আখ্যা দিয়েছিলেন, বিশ্বব্যাপী ইসলামের ধর্মীয় দাবি হিসাবে চিহ্নিত করেননি। কাদিয়ানের আহ্‌মদিরা মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। কাশ্মীরের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে আহ্‌মদিরা অন্যান্য মুসলমান গোষ্ঠীগুলির সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। আহ্‌রার গোষ্ঠী আহ্‌মদিদের 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দেয়।

১৯০৯ সালে হংকঙের সুন্নী মুসলমানেরা মুসলমানদের কবরখানায় আহ্‌মদি মৃতদেহ কবরস্থ করার অধিকার অস্বীকার করে। নাইজেরিয়াতে আবদুর রহমান নিয়ের আহ্‌মদি ধর্মবিশ্বাস প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি নানাবিধ ধর্মীয় গণ্ডগোলের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। আইভরি কোস্ট ও সিয়েরে লিয়ঁ আহ্‌মদি প্রচারের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। আহ্‌মদি গোষ্ঠী সর্বত্রই সিয়া, সুন্নী, খ্রীস্টান, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে আহ্‌মদি সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে অন্যান্য মুসলমান গোষ্ঠীগুলির সাথে আহ্‌মদিদের দাঙ্গা বেধে যায়। পাকিস্তানের আহ্‌মদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লা খানের 'ইসলাম জীবন্ত একটি ধর্ম' শীর্ষক বক্তৃতার পর করাচীর আহ্‌মদি সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। চৌদ্দটি মুসলমান গোষ্ঠীর দাবিতে পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর বিচারপতি মোহাম্মদ মুনিরের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগে বাধ্য হন।

পরবর্তী দুটি দশকে আহ্‌মদিরা কিছুটা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ধর্মীয়-সামাজিক ক্রিয়াকর্ম পালনের সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে আবার আহ্‌মদি-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হলে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে আইনসভার অক্টোবর মাসের গোপন অধিবেশনে আহ্‌মদিদের অ-মুসলমান আখ্যা দিয়ে বিড়ম্বিত করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[47]

'প্রকৃত মুসলমান কে?' এই প্রশ্নের সদুত্তর ভারত ও পাকিস্তানে আজও চূড়ান্তভাবে নির্ণীত হয়ে যায়নি। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যায়, অনেক সময় প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়ার চেয়েও সঠিক প্রশ্ন উত্থাপন অনেক

সময় বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আহ্‌মদি আন্দোলন মুসলমান সমাজের সামনে সঠিক প্রশ্নটি উত্থাপন করে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান সমাজ

ধর্মসংস্কার ও ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে নূতন আগ্রহ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'তিনটি দশক থেকে ভারতীয় মুসলমান সমাজে কতগুলি প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারাপ্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকে।

উদারনৈতিক ধ্যানধারণার প্রভাব মুসলমান সমাজে কিছুটা ব্যাপ্তি লাভ করলে সামাজিক কুসংস্কারগুলি দূর করার জন্য আবেগ সৃষ্টি হয়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ-ইত্যাদি কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান শুরু হয়। অচিরে এই অভিযান সীমিত সাফল্য লাভ করে বৃহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনার প্রহর গুণ্‌তে থাকে। মুসলমান নারীসমাজে প্রচলিত পর্দাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। বদরুদ্দিন তায়েবজী পর্দাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বোম্বেতে আন্দোলন গড়ে তোলেন; সংযুক্ত প্রদেশে অনুরূপ আন্দোলন শক্ত বনিয়াদের উপর সংস্থাপিত করেন প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক আব্দুল হালিল শরার্‌।

নারীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল মুসলমান ব্যক্তিবর্গ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে। নারীশিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স মুসলমান নারীদের শিক্ষার জন্য নিয়মিত ও বিশেষ ব্যয়বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমান পুরুষদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন কিছু পূর্বে সংগঠিত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকেই তা প্রবল শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় মুসলমান সমাজ ঔপনিবেশিক আমলে শুধুমাত্র ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মধ্যেই প্রগতিশীল, আধুনিক জীবনের সূত্রগুলির সন্ধান করেছিল এমন নয়। রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও কর্মের জগতে ঐ সমাজ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদী আদর্শ রূপায়ণে তৎপর হয়ে উঠেছিল। তুর্কী তথা আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঐ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তার দিগন্তকে নূতন আলোর সন্ধান দেয়। ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান যুবক ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে অংশ-

গ্রহণের প্রেরণা লাভ করেন। আধুনিক তুরস্কের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ এবং ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী মনোভাব মুসলমান যুবশক্তির রাজনৈতিক চিন্তার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলনের নেতৃত্ব সমকালীন ভারতে প্রধানত সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত ছিল। মুসলমান যুবশক্তির একাংশ এরূপ আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে।[48] মুসলমান যুবকেরা জাতীয়তাবাদ ও শ্রেণীসচেতনতার শিক্ষা এরূপ আন্দোলন থেকে লাভ করেন। ভারতের ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক কাঠামো, শ্রেণীসম্পর্ক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অভিজ্ঞতা লাভ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার শরিক হয়। সোবিয়েত বিপ্লবের সমসাময়িক কাল থেকে এই অংশ স্বদেশে ও বিদেশে কর্তব্যরত থেকে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা করতে থাকে।

নারীমুক্তি আন্দোলন

নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম উদ্যোগ ব্রিটিশ ভারতে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, শহরবাসী, মধ্যবিত্ত ভদ্রমণ্ডলীর চিন্তাভাবনার অন্যতম ফলশ্রুতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নারীসমাজের পক্ষে ঐরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। বৈদিক যুগের আদি পর্যায়ের পর থেকে ভারতীয় নারীসমাজ ক্রমান্বয়ে অধিকার হারিয়ে মধ্যযুগে গৃহকোণের সীমিত পরিসরে বন্দী হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতেও নারীসমাজ সামগ্রিকভাবে ঐ বন্দীদশার শিকার ছিল। কাজেই নারীদের পক্ষে 'আপন ভাগ্য জয়' করবার অধিকার লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। আবার, গতানুগতিক সামাজিক মূল্যবোধের ধ্বজাধারী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে নারীমুক্তির সমর্থনে অগ্রসর হওয়া নিজেদের মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত করার সামিল ছিল। অতএব তাঁরা নারীমুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্রিয় ছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতীয় নারীসমাজের বন্দীদশা ঘোচাতে বিশেষ আগ্রহী ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববর্তী উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে ঐ কর্তৃপক্ষ রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও তাঁদের অনুগামীদের নারীমুক্তি প্রয়াসে কিছুটা সহায়তা দান করলেও, বিদ্রোহ-পরবর্তী ভারতে ঐরূপ সহায়তা দানে পরাঙ্মুখ হয়ে ওঠে।

ইংরাজী শিক্ষিত, শহরবাসী, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নারীমুক্তি আন্দোলনের আবেগ প্রধানত দুটি সূত্র থেকে সংগৃহীত হয়েছিল : ধনতান্ত্রিক ব্রিটেনের উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ধ্যানধারণার প্রতি আকর্ষণ এবং নিজেদের পারিবারিক-সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নের প্রবল আকাঙ্খা। মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য নূতন সুযোগসুবিধা সৃষ্টি ও বাধাবিঘ্নের অপসারণে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম প্রধানত নিয়োজিত ছিল। সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সমস্যা অনুধাবন করা ও ঐগুলি সমাধানের জন্য প্রবল আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার তাগিদ তাঁদের চিন্তাস্রোতে তীব্রতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ক'টি দশক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর অভিভাবকত্বে এতই শক্তিহীন ছিল যে, ঐ শ্রেণীর পক্ষে স্বাধীন ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্বার্থে ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার পতাকাতলে সমবেত করা সম্ভব ছিল না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পূর্বে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন আন্দোলন রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়নি। দরিদ্র, নিরন্ন, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয় কৃষক সমাজের পক্ষেও সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন সৃষ্টি করা অসম্ভব ছিল।

এসব কারণে নারীমুক্তি আন্দোলন তথা সমাজ সংস্কারের বহুমুখী প্রয়াস শিক্ষিত, পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত মধ্যবিত্ত সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বহির্গামী না হতে পেরে ঐ সমাজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আবর্ত সৃষ্টি করে। নারীমুক্তি আন্দোলন মধ্যবিত্ত সমাজের দিকপাল পুরুষ বুদ্ধিজীবীদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্দীপনায় জন্মলাভ করার কয়েকটি দশক পরেই শিক্ষিতা মহিলাদের নেতৃত্ব ও একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনের স্পর্শ পেয়ে কালকেতুর মত মাতঙ্গগতি লাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে অদ্যাবধি নারীমুক্তি আন্দোলন নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে বৃদ্ধিলাভ করে; স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় যে, ঐ আন্দোলন বিচিত্র পথে গমন করলেও সর্বত্রগামী হয়নি।

সতীদাহ নিবারণ

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, বৈদিক যুগের শেষদিকে ভারতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মোগল যুগের

শেষাশেষি সতীদাহ প্রথার সার্বিক প্রচলন ছিল না ; যেখানে যেখানে ছিল, তীব্রতা সর্বত্র সমান ছিল না। সুদূর দক্ষিণ ভারতে ঐ প্রথার প্রকোপ স্তিমিত হয়ে এসেছিল। পশ্চিম ভারতেও ঐ প্রথার বিশেষ প্রকোপ ছিল না। গুজরাট বরাবরই ঐ প্রথার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত ছিল। মারাঠারা বা চিত্‌পাবন ব্রাহ্মণেরা কোনদিনই ঐ প্রথাকে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়নি।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সূচনাকালে একমাত্র বাংলা প্রেসিডেন্সি জুড়ে ছ'-সাতটি দশক সতীদাহ প্রথা সংখ্যাগত দিক থেকে ও তীব্রতার বিচারে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। আবার, কোলকাতা শহর ও তার আশপাশের জেলাগুলিতেই (হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া ও ২৪-পরগণা) 'সাধ্বী স্ত্রীদের' (অর্থাৎ সতী) সংখ্যা ছিল সর্বাধিক ; ১৮১৫ থেকে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সমগ্র প্রেসিডেন্সির শতকরা ৫৭ ভাগ সতীই এই এলাকাগুলির 'সাধ্বী স্ত্রী' ছিলেন।[19] স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিমী প্রভাবযুক্ত এলাকাগুলিতেই অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সতীদাহ প্রথা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আর্থনীতিক ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত মনে করে সতীদাহ প্রথাকে বারংবার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বাংলার ম্যালথুসীয় পদ্ধতির আদিম রূপ হিসাবে বিবেচনা করা সম্পূর্ণ সত্য প্রকাশের পক্ষে অনুপযোগী মনে হয়। দুষ্পরিবর্তনীয় হিন্দু সম্পত্তি আইনের বিধান থেকে নিশ্চিত অব্যাহতি লাভ করে অধিকতর সম্পত্তির মালিক হওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে সদ্য বিধবাকে ধর্মীয় অনুশাসনের দোহাই পেড়ে মৃত স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার রীতি প্রচলিত হয়েছিল বলে রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। বিদেশী শাসকবৃন্দ ও খ্রীষ্টান মিশনারিরা এই প্রথাকে হিন্দু সমাজের চরম বর্বরতার নিদর্শন বলে অভিহিত করেছিলেন। আবার এই প্রথার বিলোপকে ব্রিটিশ তথা পশ্চিমী সভ্যতার দান বলে অভিনন্দিত করে তাঁরা কৃতিত্বের ঝুলিটি বেন্টিঙ্কের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে আত্মগর্ব লাভ করেছিলেন।

অথচ সতীদাহ প্রথার ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তার পশ্চাতে ঔপনিবেশিক শাসন সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ উপস্থিতির ফলে শহর কোলকাতা ও তার আশপাশ অঞ্চলের সামাজিক জীবনে ঊর্ধ্বমুখী সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের অনুসারী হবার মানসিকতায় আক্রান্ত, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থলগ্নীতে নিযুক্ত অভিজাত বংশীয় হিন্দুরা 'নয়া ধনিকে' পরিণত

হয়ে বৃহৎ হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। বিদেশী মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের প্রতি মোহাবেশ তাঁদের প্রাচীন হিন্দু সমাজের বন্ধন থেকে কতকটা ছিন্ন করে দেয়। এটা তাঁদের কাছে সুখকর ছিল না। আবার, পশ্চিমী জীবনধারার সাথে সম্পূর্ণ একাত্ম হওয়াও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজের মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়া এবং 'পুণ্যকর্মের' জন্য খ্যাতিলাভ করার দুরন্ত তাড়নায় তাঁরা সতীদাহ প্রথাকে নৈতিকতা ও ধর্মীয় বৈধতার আশীর্বাদধন্য বলে মনে করেছিলেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরাও আর্থনীতিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর তথাকথিত উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহ নীতি পালন করে 'হিন্দু সংস্কৃতির ঐতিহ্য' অনুসরণ করার পরীক্ষা দিয়ে গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে তৎপর হয়েছিলেন। নিম্ন মর্যাদাগত অবস্থা থেকে উচ্চ মর্যাদাগত স্তরে পৌঁছানর প্রক্রিয়াটি (সমাজতত্ত্বে 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়া বলে নামাঙ্কিত) বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বিশেষ করে গতিবেগ লাভ করেছিল। ১৮১৫-১৬ সালে বাংলায় নথীভুক্ত সতীদাহ সংখ্যার প্রায় ৫৫ ভাগ ছিল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য পরিবারগুলির, আর বাদবাকি সব সামাজিক উচ্চমান অর্জনে অভিলাষী তথাকথিত নিম্নবর্ণের (বিশেষ করে সদ্‌গোপ, তিলি, নমশূদ্র, কৈবর্ত, গোয়ালা, সাহা ও আগুরী) পরিবারগুলির। সতীদাহ প্রথা বাংলার 'বাবু' সংস্কৃতিতে আত্মপীড়নমূলক একটি ক্রীড়ার সমতুল্য হয়ে উঠেছিল। 'উচ্চ-নীচ' বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রথা বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। রামমোহনের পরিবারও এই বিপর্যয়ের আঘাতমুক্ত ছিল না।

রামমোহন রায় ও তাঁর অনুগামীরা সঠিক কারণে সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করেন। হিন্দু শাস্ত্রগুলির গভীরে প্রবেশ করে উপযুক্ত যুক্তি ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তিনি সতীদাহ প্রথাকে অশাস্ত্রীয় প্রমাণ করেন। খ্রীস্টান মিশনারিরা রামমোহনের পূর্বেই ঐ প্রথার বিরুদ্ধে আক্রমণ রচনা করেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে আইন রচনা করে সতীদাহ প্রথা রদ করা হয়। কিন্তু লক্ষণীয়, রামমোহন শুধুমাত্র বাংলা প্রেসিডেন্সিতে আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটানোর সুপারিশ জানিয়েছিলেন; বেন্টিঙ্ক আঞ্চলিকতার যুক্তি অগ্রাহ্য করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করেন।[50]

শিশুহত্যা ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন রদ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশুহত্যার বীভৎস রীতি চালু ছিল। ধর্মীয় কোন নির্দেশের ফলে এরূপ বীভৎসতার উৎপত্তি ঘটেনি, ঘটেছিল আর্থনীতিক কারণে। ব্যয়বহুল বিবাহ প্রথার নির্মম পীড়নে পিতা-মাতা বাধ্য হয়ে অনেক সময় মেয়ে শিশুকে হত্যা করতেন। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারগুলিতে মেয়ে শিশু বোঝা হিসাবে গণ্য হত। ঐরূপ কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়ে শিশুহত্যার রীতি চালু ছিল। তাছাড়া, গঙ্গাসাগরে প্রথম সন্তান বিসর্জনের বর্বর রীতি অনুসরণের ঘটনা বিরল ছিল না। খ্রীস্টান মিশনারিরা শিশুহত্যার সমাজতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয়দের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান। এমন কি ভারতীয় মাতাকেও নিষ্ঠুরা বলে অভিহিত করতে তাঁরা কসুর করেননি। বিশপ হেবার গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনরতা ভারতীয় নারীর যে চিত্রাঙ্কন করেন[51] তা ব্রিটেনের শিশুপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েছিল :

> 'ঐ দেখো, পবিত্র স্রোতস্বিনীর পাশে
> দাঁড়ায়ে বিধর্মী জননী ; নিজের হাতে
> নিজের শিশুকে উর্মিমুখর জলধারায়
> করেছেন নিক্ষিপ্ত।
>
> ... ...
>
> মাতৃহৃদয় ইস্পাতকঠিন—
> অবিচল ; শিশুর কান্না আনে না কোন চাঞ্চল্য।
> আহা ! পাঠিয়ে দাও সেখানে বাইবেল, পাঠিয়ে দাও,
> যেন তার হৃদয়ে পৌঁছয় বাইবেলের বাণী......'

[লেখকের অনুবাদ : ইংরাজী থেকে]

খ্রীস্টান মিশনারিদের বিচারে ভারতীয় সমাজে নিষ্ঠুর প্রথাগুলির জন্য দায়ী ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় রীতিনীতি ও অনুশাসন। ভারতীয় জনসাধারণকে মানবিক গুণে সমৃদ্ধ করার একমাত্র উপায় হিসাবে তাঁরা খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তন কাম্য মনে করেছিলেন। তাঁদের কাছে, অর্থাৎ শ্বেতকায় খ্রীস্টান মানুষের কাছে, বাদামী রঙের ভারতীয়গণ বিরাট বোঝা হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল। সমকালীন মুষ্টিমেয়, ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী সামাজিক-ধর্মীয় ব্যাধিগুলির

দূরীকরণে হিতবাদী দর্শনানুগ আইনগত কর্মপন্থা গ্রহণের সমর্থক ছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় হিন্দু সমাজে ধর্মান্তর নীতিতে উৎসাহ দেওয়া বিপজ্জনক মনে করে আইন রচনার মাধ্যমেই শিশুহত্যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করে।

'পর্দা'ব্যবস্থার বিরোধিতা

ভারতের সমগ্র নারীসমাজ আজও পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে পুরুষের সাথে একযোগে, প্রকাশ্যে কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র অংশগ্রহণ করেছে এমন নয়। ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে পর্দা ব্যবস্থা আজও বর্তমান। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দা ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই এমন নয়। পর্দা ব্যবস্থার মাত্রাগত তীব্রতা দুটি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতর হলেও উভয় ক্ষেত্রেই তা শিথিলতর হয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে পর্দা ব্যবস্থার ফলে ভারতীয় নারী যাবজ্জীবন 'কারাগারে' অতিবাহিত করতেন বলা যায়। কর্মহীনতার ফলে 'তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ অনুভূতিগুলি ভোঁতা হয়ে যেত, জ্ঞানের আলো তাঁর দৃষ্টিকে আলোকিত করত না, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত থেকে অন্ধকারে পথ হাতড়ে ফিরতে হত তাঁকে, এবং যে সমাজে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তারই রীতিনীতির যূপকাষ্ঠে তিনি হতেন শহীদ।'[52]

পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ, পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোতে চক্ষুষ্মান ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা পত্রপত্রিকায় ও আইনসভায় সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকেন। কালক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলারা নিজেরাই পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে অগ্রসর হন। অভিজাত মহিলারা পর্দার আবরণ ছিন্ন করে প্রগতিশীল মনোভাবের উদাহরণ স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে ভূপালের বেগমদের ভূমিকা সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯২৭ সালে সারা ভারত মহিলা শিক্ষা সম্মেলনে বরোদার মহারানী বলেন, 'যদি সামাজিক জীবনের মানোন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষিত করে তুলতে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়, তাহলে পর্দাপ্রথার বিলুপ্তি ঘটাতেই হবে।'[53]

শিক্ষাবিস্তার, নগরীকরণ, পারিবারিক-সামাজিক ও আর্থনীতিক জীবনে নারীর ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ, নারীসমাজের রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি

ইত্যাদি পর্দাপ্রথার প্রতিকূল পরিবেশ রচনা করতে থাকে। পর্দাপ্রথার নিগড় ক্রমশ শিথিল হতে থাকে।

বাল্যবিবাহ রদ ও বিধবাবিবাহ বৈধকরণ

বাল্যবিবাহ পুরুষের তুলনায় নারীর পক্ষে অনেক বেশী ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে দশ বৎসর অন্তত পূর্ণ হবার পূর্বে নারী ও পুরুষের বিবাহ অনুষ্ঠান ১৮৬০ সালে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। বাল্যবিবাহের কুফল দূর করতে এই আইনের কার্যকরী ভূমিকা অতি সামান্য ছিল। কিন্তু ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ রদ আইনের তাৎপর্য অসামান্য ছিল। ঐ আইনে নারীর বিবাহযোগ্য বয়স ন্যূনপক্ষে ১৪ ও পুরুষের ক্ষেত্রে ১৮ ধার্য করা হয়। পরবর্তীকালে উভয় ক্ষেত্রেই বয়ঃসীমা আরও বর্দ্ধিত হলে ও ভারতীয় জনমতের সমর্থন বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে জোরদার হয়ে উঠলে ঐ অভিশপ্ত প্রথার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

বিধবাদের বিবাহের অধিকারের সমর্থনে আন্দোলন গঠনে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বোম্বের মালাবারি, নরমদ, রানাডে ও নটরাজন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, বিংশ শতাব্দীর ভারতে আজও বিধবাবিবাহ বিরল। আইনগত বাধানিষেধের অপসারণ সত্ত্বেও ভারতীয় সামাজিক মনস্তত্ত্বে প্রাচীন অভ্যাস বা সংস্কার এত বেশী পরাক্রমে ক্রিয়াশীল ছিল এবং আজও এতটা আছে যে, শিক্ষিত জনমত বুদ্ধিগত দিক থেকে বিধবাবিবাহের সমর্থক হয়েও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বুদ্ধির দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়তার অভাব অতীতেও প্রদর্শন করেছিল এবং এখনো করে চলেছে।

দেবদাসী ব্যবস্থার অবসান

প্রাচীন গ্রীসের দেবদেউলে অনুষ্ঠিত পতিতাবৃত্তির মত ভারতে দেবদাসী ব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল। মন্দিরের সেবাকর্মে নিযুক্ত থেকে রাজার দেহমনের তৃপ্তি বিধান দেবদাসীদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। দেবদাসীরা বংশপরম্পরায় একই বৃত্তি অনুসরণ করে নারীসমাজের মধ্যে 'জন্মগতভাবে নির্ধারিত একটি বর্ণ' সৃষ্টি করেছিলেন বলা যায়। এঁরা সাধারণ পতিতার মত

অধঃপতিত জীবনযাপন করতেন না; নৃত্যগীতে পারদর্শিতা লাভ করে শিল্পীর মর্যাদা লাভ করতেন। কিন্তু কালক্রমে নৃত্যগীত এঁদের জীবনযাপনের গ্লানিকর দিকটির সাথে সঙ্গতি রেখে জনমানসে মর্যাদা হারাতে থাকে; ও'ম্যালী লিখেছেন যে, এঁদের শিল্পকলা 'সম্ভ্রান্ত মহিলাদের কাছে কুরুচিপূর্ণ' হয়ে ওঠে। বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেবদাসী প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। এই প্রসঙ্গে ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সালে প্রণীত একটি আইনের বিধানে অপ্রাপ্তবয়স্কাদের দেবদাসীর বৃত্তিতে নিয়োগ ভারতীয় ফৌজদারি আইনসংহিতার ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়।

রাজনৈতিক আন্দোলন ও নারীসমাজের অংশগ্রহণ

সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় ইতিহাসে মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের পর থেকে ভারতীয় নারীসমাজ দ্রুত পুরুষ সমাজের সহযোগী হয়ে অবিচল নিষ্ঠায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাধা করে চলেছে। গোষ্ঠীগতভাবে নারীরা রাজনীতির মহৎ জীবনের আকর্ষণ বোধ করেন গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে। রাজনৈতিক কার্যকলাপে তখন পর্যন্তও নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত পর্যায়ে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে নারীশিক্ষা বিস্তার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে তাঁদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ত্রিশের দশকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে ঐ সচেতনতা ব্যাপক কর্মতৎপরতায় আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের পূর্বেকার ভারতে নারীসমাজের রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের কোনরূপ অধিকার ছিল মনে হয় না। কেবলমাত্র সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত পরিবারের অনুকূল পরিবেশে মুষ্টিমেয় সংখ্যক স্বনামধন্যা মহিলা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের নাম সর্বকালের জন্য মুদ্রিত করতে পেরেছিলেন। সুলতানা রাজিয়া, চাঁদবিবি, নূরজাহান ও অহল্যাবাই হোলকারের নাম এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্ভব

পর্যন্ত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতে রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্তা নারীর সংখ্যাও একবার একহাতের গোনাতেই সম্ভব ছিল। সম্ভব ছিল এই পশ্চাৎপদ অবস্থার ব্যাখা করাও। ব্রিটিশ 'বণিক মূলধন' উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকটি বন্দরনগর-কেন্দ্রিক আর্থনীতিক বাজার সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক উন্নয়নের পথটির সন্ধান দিলেও ভারতের আর্থ-সামাজিক জনজীবনে নারীর অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে অক্ষম ছিল। উদারনৈতিক ভাবধারাপুষ্ট কিছু কিছু আইন নারীর মর্যাদা সৃষ্টির সহায়ক হলেও ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করার পক্ষে সেগুলি মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না। ব্রিটিশ বণিক মূলধন ভারতের সামাজিক অর্থনীতির সাথে আপোষ-রক্ষা করে শোষণের পথটি অব্যাহত রেখেছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শিল্পজাত মূলধন সচেতনভাবে ব্রিটিশ ধনিকদের স্বার্থ রক্ষা করে ও ভারতে দেশীয় ধনিকশ্রেণীর উদ্ভবে বাধা সৃষ্টি করে ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির স্বাধীন ধনতান্ত্রিক রূপান্তরে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছিল। ভারতীয় সমাজে সামন্তবাদের ঘনছায়া ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্ফীতকায় মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনে সৃষ্ট সীমিত পরিসর ধনতান্ত্রিক বাজারের আলোর রোশ্‌নিতে কিছুটা ম্লান হলেও অপসৃত হয়নি। এরূপ সমাজে ভারতীয় নারীর জীবন গৃহকোণের সীমা ছাড়িয়ে বাইরে পরিব্যাপ্ত হবার স্বাধিকার লাভ করত না। তাছাড়া, নারীশিক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি সরকারী ও বেসরকারী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ঐরূপ শিক্ষাবিস্তার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে গতিবেগ লাভ করেনি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে গণভিত্তি লাভের জন্য নূতন কর্মোদ্যোগ ও কৌশল অবলম্বন করলে শিক্ষিত নারীসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনৈতিক সমর্থন সোচ্চার হয়ে ওঠে; রাজনৈতিক আন্দোলনের বন্ধুর, দুর্গম, অনভ্যস্ত পথে ভারতীয় নারীদের যাত্রা শুরু হয়। এই রাজনৈতিক যাত্রাপথ নারীসমাজের ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর অংশের অংশগ্রহণে জনাকীর্ণ হতে থাকে; অসহযোগ, আইন অমান্য ও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে ভারতীয় নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র শিক্ষিত নারীদের রাজনৈতিক কাজকর্মে গান্ধী সমবেত করতে পেরেছিলেন এমন নয়; শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত নারীদেরও তিনি রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞে সমিধ সরবরাহের কাজে নিয়োগ

করতে পেরেছিলেন। অরন্ধন পালন, খদ্দর বস্ত্রের জন্য সুতো কাটা, সমাজসেবামূলক কাজকর্মে অংশগ্রহণ, সভা-শোভাযাত্রায় যোগদান, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, আন্দোলন পরিচালনার ব্যয়নির্বাহের জন্য পরিধেয় অলঙ্কার দান ইত্যাদি সকল ধরনের কাজকে তিনি রাজনৈতিক তাৎপর্যে সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন। এই সকল কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে ভারতীয় নারীসমাজ 'পরিবারের পরিচারিকার অমর্যাদার গ্লানি' থেকে স্বদেশপ্রেমীর মর্যাদার গৌরবে সম্মানিতা হন। সীমিত সুযোগে ক্লিষ্ট নির্বাচনব্যবস্থাতেও ভারতীয় নারীসমাজ সোৎসাহে কর্তব্য পালন করে এবং অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রামে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আসমুদ্র হিমাচল সচকিত করে তোলে। 'এক হাতে তাঁরা অহিংস প্রতিরোধ আঁকড়ে ধরেন, আর অন্য হাতে ভোটের অধিকার।'[54]

ত্রিশের দশকে আইন অমান্য ও চল্লিশের দশকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে শত-সহস্র নারী গণআন্দোলনে সামিল হন, মাদকদ্রব্যের বিপণিসমূহে অবস্থান শুরু করেন, সভা-শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন, কারাগারের জীবন অকুতোভয়ে বরণ করেন এবং লাঠি-গুলির সামনে প্রসারিত বক্ষে ধ্বনিত করেন 'বন্দেমাতরম'। মহিলাদের মধ্য থেকে সর্বভারতীয় নেত্রীদের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, অরুণা আসফ আলী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রমুখ নেত্রীদের নাম ভারতের সীমানা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, আর প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরার মত শহীদ নারীরা ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমী নারীমূর্তির অক্ষয় চিত্রটি উজ্জ্বল রাখেন। সীমিত সংখ্যায় হলেও মহিলারা ১৯৩৬ সালে গঠিত কংগ্রেস-পরিচালিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিতে মন্ত্রিপদের দায়িত্ব পালন করেন; কেউ কেউ স্পীকার, সেক্রেটারি, আণ্ডার সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারির পদ অলঙ্কৃত করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক পিছুটান, ভারতবাসীর অপরিসীম দারিদ্র্য, শিক্ষালাভের যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধার অভাব, সামাজিক জীবনে দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে নানাবিধ অন্তরায় ইত্যাদি বহু কারণে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নারীসমাজের অংশগ্রহণ কখনো সার্বিক হয়ে উঠতে পারেনি। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত

পরিবারগুলির নারীরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত নারীসমাজের বৃহৎ অংশের পক্ষে এরূপ যোগদান সম্ভব ছিল না। তা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নারী-সমাজের সীমিত অংশের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কর্মতৎপরতা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়গুলির পরিবারগুলির মহিলারা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের স্পর্শরহিত ছিলেন এমন নয়। গান্ধী তাঁর জীবনযাত্রা, বেশভূষা, আহার, রাজনীতি, বক্তব্য উপস্থাপনার সারল্য, ধর্মবোধ, গ্রাম-ভারতের উপযোগী বাগ্‌ধারা ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের কাছে স্বদেশ-প্রেমের বাণী পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। হরিজন, দেবদাসী, মজুর, চাষী প্রভৃতি সকল রমনীদের কাছে তিনি 'গান্ধী মহারাজ' ও 'গান্ধী ভগবান' হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

মৌল সামাজিক শ্রেণীর অংশ হিসাবে নারীসমাজকে অধিকার-সচেতন করে তোলার অনেকখানি কৃতিত্ব বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলির। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গোষ্ঠীগতভাবে ক্রিয়াশীল থেকে ঐগুলি অক্ষরজ্ঞানশূন্য, দরিদ্র ভারতীয় নারীদের তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর হাজার হাজার নারীকে কর্মবিরতি, হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা, সম্মেলন ইত্যাদিতে সামিল করে ঐগুলি জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার বামপ্রান্তিক দিগন্তটির উন্মোচনে সহায়তা করেছিল। রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেহনতী নারীরা জাতীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলির কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেন এবং শ্রমিক সংগঠন ও কৃষক সভাগুলির সদস্যপদ অর্জন করে ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতের আবির্ভাব লগ্নকে ত্বরান্বিত করেন। শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনের অনেকগুলিই শুধুমাত্র স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে লিপ্ত থেকে ক্ষান্ত হয়নি, সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্বপ্ন সার্থক করার জন্যও কর্মসূচী রচনা করেছিল। ভারতীয় নারীসমাজ ঐসকল সংগঠনগুলির মাধ্যমে জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের সাথে পরিচিত হয়।

জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের যৌবন জলতরঙ্গ থেকে ভারতীয় নারীসমাজের রাজনৈতিক চেতনার বন্ধ্যাভূমিতে বারিসিঞ্চন ঘটে। জাতীয় স্বাধীনতা ও

ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য নারীসমাজের সংগ্রামী উদ্যোগ গ্রহণ ঐ বারিসিঞ্চনের সোনার ফসল।

অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতীয় হিন্দু সমাজ মানুষকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' জেনেও ভারতীয়দের একাংশকে অপবিত্র ঘোষণা করে হেয় জ্ঞান করেছে এবং ঐ একাংশের স্পর্শ বা ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তথাকথিত পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে নিজেকে ক্লিষ্ট করেছে। অপবিত্র বলে ঘোষিত মানুষদের পক্ষে পবিত্রতা অর্জনের পথ খোলা ছিল না। জন্ম ও পিতৃপিতামহের জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি হিন্দু ব্যক্তিমানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণায়ক শক্তি হিসাবে পরিগণিত ছিল। কাজেই জন্মসূত্রে অপবিত্র আখ্যাপ্রাপ্ত হতভাগ্য মানুষের দল ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বা নৈপুণ্য প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদাবৃদ্ধির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল।

সব সমাজে, সব সময় কোন-না-কোন ধরনের স্তরবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভারতীয় হিন্দু সমাজে বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যে, মর্যাদা-মানকের সর্বনিম্নে অবস্থিত অস্পৃশ্যদের অপমানিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত অন্তরাত্মার ক্রন্দনে ভারতীয় সামাজিক স্তরবিন্যাস অভিশপ্ত হয়ে উঠেছিল।

অস্পৃশ্যতার সমস্যাটি ভারতের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে ব্যাপ্তি ও গভীরতায় সমরূপ নয়। আবার, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে সমস্যাটি একই রকম প্রতিক্রিয়াশীলতায় আবিল এমন নয়।

অস্পৃশ্য মানুষেরা নানা উপবর্ণে বিভক্ত। এমন কতগুলি উপবর্ণ আছে যেগুলি একে অপরের কাছে অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে ; আবার এমন কতগুলি উপবর্ণ আছে যেগুলি কোন কোন উপবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য, কিন্তু অন্যান্য উপবর্ণের কাছে নয়।[55]

সমাজতত্ত্ববিদেরা অভিমত প্রকাশ করে থাকেন যে, অস্পৃশ্যতার সমস্যাটির একটি সর্বভারতীয় রূপ আছে। ভারতের সর্বত্র অস্পৃশ্য ব্যক্তিরা সাধারণ কতগুলি বিধিনিষেধের কবলে পড়ে নিগৃহীত হন।

অস্পৃশ্যতার সমস্যাটির সর্বভারতীয় সামাজিক তাৎপর্য সম্যকভাবে অনুধাবন করতে হলে আর্থনীতিক ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যদের অবস্থান ও ধর্মীয় জীবনে তাদের

অপাঙ্‌ক্তেয় ভূমিকার সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন। ধর্মীয় জীবনে তথাকথিত নিম্নবর্ণগুলির অকিঞ্চিৎকর মর্যাদা আর্থনীতিক জীবনে উচ্চবর্ণগুলির উপর তাদের নির্ভরশীলতার স্মারক। বেদনাবিধুর সত্য এই যে, সর্বাপেক্ষা দরিদ্ররাই সবচেয়ে বেশী উচ্চবর্ণগুলির শোষণের শিকার।

বর্ণপ্রথার তীব্রতা ও শক্তি শুধুমাত্র হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করে এমন নয়, ভারতীয় মুসলমান ও খ্রীস্টান সমাজকেও করে। ধর্মান্তরের পরেও ভারতীয় খ্রীস্টানদের পক্ষে হিন্দু সমাজের বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার প্রভাবমুক্ত থাকা সম্ভব নয়। হিন্দু সমাজের বর্ণসদৃশ নানা গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীতে ভারতীয় খ্রীস্টান ও মুসলমানেরা বিভক্ত।

মুসলমান ও খ্রীস্টান ব্যক্তিরা বিজয়ী শক্তি হিসাবে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন; এই কারণে, কে. কে. থক্কর লিখেছেন, তাঁরা বাস্তবে অস্পৃশ্য-রূপে গণ্য হননি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দু সামাজিক অনুশাসন তাঁদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হত মাত্র।

সমাজপ্রগতির পথে জগদ্দল পাথরের মত প্রোথিত অন্যতম স্থায়ী প্রতি-বন্ধক হিসাবে বিরাজিত অস্পৃশ্যতার সমস্যাটির বিরুদ্ধে বুদ্ধ, রামানুজ, রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর, নানক, তুকারাম প্রমুখ ধর্মগুরুরা বীরের মত সংগ্রাম করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের মানবতাবাদী কার্যক্রম তথাকথিত ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার কাছে পরাস্ত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবার সিংহভাগ কৃতিত্ব ছিল ব্রাহ্মসমাজের। প্রধানত পশ্চিমী ধ্যানধারণার উপর নির্ভর করে তাঁরা অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে লড়বার রসদ সংগ্রহ করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে অস্পৃশ্যতা বিরোধী সামাজিক কার্যক্রম সংযুক্ত করে দিতে তৎপর ছিলেন। কংগ্রেসের আদিযুগের জঙ্গী জাতীয়তাবাদীরা বর্ণব্যবস্থাকে কর্মবিভাজন নীতির সার্থক সামাজিক প্রয়োগ ভেবে নিয়ে ভ্রান্ত পথে বিচরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কখনো অস্পৃশ্যতাকে গ্রহণীয় আদর্শ বলে প্রচার করেননি।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করে তুলতে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেন গান্ধী।

১৯০২ সাল থেকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত হরিজন সেবক সঙ্ঘ অস্পৃশ্যদের জন্য সমাজ উন্নয়নমূলক বহুবিধ কাজকর্ম করতে থাকে। তিনি হিন্দু মন্দিরগুলিতে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অধিকার লাভের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ভারতের মুক্তি আন্দোলন ও অস্পৃশ্যদের সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক অধিকার সৃষ্টির আন্দোলনের গতিবেগের একটি নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। ত্রিশের দশকের শেষদিকে কংগ্রেস-পরিচালিত প্রাদেশিক সরকারগুলি অস্পৃশ্যদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। অস্পৃশ্য সমাজের নিজস্ব নেতৃত্বে কয়েকটি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত ডঃ আম্বেদকর-পরিচালিত মাহাদ সত্যাগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখের দাবি রাখে।

অস্পৃশ্যদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গান্ধীবাদী, সমাজতন্ত্রী ও হিন্দু শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসীদের দ্বিমত ছিল না। কিন্তু অবস্থার কারণ ও সেগুলির অপসারণ সম্পর্কে তাঁদের ঐক্যমত ছিল না। ভারতে 'হিন্দু রাজ' প্রতিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ সাভারকার অনুন্নত শ্রেণীগুলির মর্যাদাবৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিলেন। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের সামাজিক সাম্যের আদর্শের হাতছানিতে অস্পৃশ্যদের ক্রমবর্ধমান অংশের ধর্মান্তর গ্রহণে আগ্রহ দেখে শঙ্কিত রক্ষণশীল হিন্দুদের অনেকে অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদাবৃদ্ধিতে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। গান্ধীবাদী ও সমাজতন্ত্রীরা মানবিক ও আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিতে অস্পৃশ্যতা সমস্যাটি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনের স্তরে সমাধান খুঁজেছিলেন।[56] মানবিক ও আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমের উপর আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারে সমাজতন্ত্রী ও গান্ধীবাদীদের মৌল পার্থক্য ছিল, বলাই বাহুল্য।

অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য পরিচালিত আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রধানত উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের একাংশের মানবতাবাদী আদর্শের প্রেরণায় জন্মলাভ করেছিল। অস্পৃশ্য সমাজের নিজস্ব নেতৃত্ব ছাড়া ঐ সমাজের অধঃপতিত অবস্থার মৌল পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না।

১০ জনসমাজ, সংখ্যালঘু সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ

জনসমাজ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির জীবনপ্রভাত

বুর্জোয়া শ্রেণী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করেছিল। এই ভূমিকার অন্যতম প্রমাণ আধুনিক জাতিগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যায়। উদীয়মান ধনতন্ত্রের যুগে আধুনিক ইউরোপীয় জাতিগুলির জন্ম হয়। এই যুগে সামন্ততান্ত্রিক যুগের অচলায়তন সমাজের দুর্গপ্রাকার আঘাতের পর আঘাত হেনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। বিশাল জনসমষ্টিকে আশ্রয় দিয়ে বিশাল শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠতে থাকে। শহর ও গ্রামের মধ্যে নূতন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। বুর্জোয়া ও সর্বহারাশ্রেণীর উদ্ভবের সাথে সাথে মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী নূতন সমাজের যুগোপযোগী আশা-আকাঙ্খা ও চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণা প্রচারে অগ্রসর হয়। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ধরে আধুনিক ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ পথপরিক্রমা শুরু করলেও একথা ঠিক নয় যে, নূতন আর্থ-সামাজিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত যে-কোন জনসমাজ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম। আর্থনীতিক বাজারে জাতীয়তাবাদের প্রথম পাঠ গ্রহণ করার পরেও নির্দিষ্ট জনসমাজের পক্ষে জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য আরও বহুবিধ উপকরণের প্রয়োজন হয়। সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে ধ্যানধারণার সাধারণ ঐক্যমত জাতিগঠনে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ব্রিটেন ও মহান ফরাসী বিপ্লবোত্তর ফ্রান্স ধনতান্ত্রিক বিজয় সম্পন্ন করে ঐ ধরনের ঐক্যমতের নূতন বনিয়াদের উপর ব্রিটিশ ও ফরাসী জাতির জন্ম দেয়। রাষ্ট্রশক্তির মালিক নবীন বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামরিকবাহিনী এবং জাতীয় পতাকা ব্যবহারের মাধ্যমে 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'-র আদর্শ স্থাপন করে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত ইতালী ও জার্মানীতেও অনুরূপ প্রক্রিয়ায় ইতালীয় ও জার্মান জাতির জন্ম হয়।

পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির মত স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ভারতে জাতিগঠনের কাজটি শুরু হয়নি। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতীয় ধনিক-

শ্রেণীর আবির্ভাব যত কাল সম্ভব রুখে দিতে প্রয়াসী ছিল। ঐ শ্রেণীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে ব্রিটিশ ধনতন্ত্রের কিছু কিছু প্রগতিশীল কার্যক্রমের (সম্পত্তির ব্যক্তিমালিকানা, বাণিজ্যিক কৃষি, শিল্পায়ন, যোগাযোগ ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন, সমাজসংস্কার ইত্যাদি) ফলশ্রুতিতে পশ্চিমী ভাবধারাপুষ্ট, নূতন আর্থনীতিক বাজারে অংশগ্রহণে লাভবান মধ্যবিত্ত একটি শ্রেণী আবির্ভাবলগ্নের পর থেকেই জাতিগঠনের দায়দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হয়। এই শ্রেণী ফরাসী বা ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীর মত বিপ্লবী ছিল না। উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা এই শ্রেণীর ছিল না। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামের সামর্থ এই শ্রেণীর ছিল না।

ভারতের সকল অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসন একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রসার ভারতের সর্বত্র সমান তীব্রতায় বা ব্যাপ্তিতে ঘটেনি। ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলির জনসাধারণ বা সম্প্রদায়গুলি একই সময় রাজনৈতিক সচেতনায় সমৃদ্ধ হয়নি। ফলে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন একদিকে যেমন রাজনৈতিক চেতনার অসম বণ্টনের ফলে দ্রুত গতিবেগ লাভে অক্ষম হয়েছে, অন্যদিকে তেমন ঐ আন্দোলনের শেষ দিকে সব প্রদেশের জনসাধারণ নবলব্ধ চেতনায় বলীয়ান হয়ে সংগ্রামের প্রান্তরে অবতীর্ণ হয়েছে।

ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য তৈরী করা হয়েছিল। প্রায় প্রতিটি প্রদেশে প্রধান একটি জনসমাজের সাথে একাধিক জনসমাজ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আত্মবিকাশের সুযোগবঞ্চিত অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রদেশগুলির আর্থনীতিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, বাণিজ্যিক অগ্রগতি, শিক্ষাবিস্তার এবং সর্বোপরি ১৯৩০-'৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপ্তি প্রধান-অপ্রধান সকল জনসমাজেরই চেতনার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে। প্রাদেশিক সাহিত্য ও পত্রপত্রিকার বিকাশ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর কর্মোদ্যোগ জনসমাজগুলির আত্মবিকাশের দাবিকে দুর্বার করে তোলে।

বিভিন্ন প্রদেশের জনসমাজগুলি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বিহারী, কর্নাটকী, মালয়ালী, গুজরাটি জনসাধারণ ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে

তোলেন। তেলেগু ভাষাভাষীরা মাদ্রাজ প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধ্র-প্রদেশ গঠনের দাবি করতে থাকেন। মহারাষ্ট্র থেকে পৃথক হয়ে সংযুক্ত কর্নাটক প্রদেশ গঠনের দাবিতে কর্নাটকীরা ঐক্যবদ্ধ হন। বিহারী, ওড়িয়া, মালয়ালী, গুজরাটি প্রভৃতি জনসমাজগুলি অনুরূপ দাবিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

আত্মবিকাশের দাবিতে জনসমাজগুলির আন্দোলন জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী-কাল থেকে 'ব্রিটিশ রাজ' ভারতের সামন্তবাদী শক্তিগুলির সাথে আঁতাত গড়ে তুলে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে পরাভূত করতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রক্ষণ-শীল, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদী শ্রেণীস্বার্থকে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংহত করে ব্রিটিশ রাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণ বজায় রাখতে তৎপর ছিল। প্রদেশগুলির জনসমাজসমূহ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি আত্মবিকাশের দাবিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসমাজগুলি বিদেশী শাসনকে তাদের আর্থনীতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করতে শেখে। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা, 'জাতীয়' রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা বা বিকাশের আন্দোলন ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিবেগ বৃদ্ধি করে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জনসমাজগুলির জাগ্রত চেতনার স্বরূপ উপলব্ধিতে সক্ষম হয়েছিল। উভয় দলই ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি স্বীকার করে নেয়। পুনর্গঠিত প্রদেশ বা রাজ্যগুলি নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও দ্বিমত ছিল না। এমন কি, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসাবে অবস্থানে অসম্মত প্রদেশকে বিযুক্তির অধিকার দানের ক্ষেত্রেও ঐক্যমত ছিল। ভাষাগত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিকাশের সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার জন্য শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ সৃষ্টির ব্যাপারেও মতামতের সাদৃশ্য লক্ষণীয় ছিল।

জনসমাজগুলির আন্দোলন : পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রতিফলন

নবজাগ্রত জনসমাজগুলির আত্মবিকাশের জন্য আন্দোলন দুই ধরনের প্রবণতায় বিধৃত ছিল।

একদিকে জনসমাজগুলি নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ইত্যাদির পূর্ণতম বিকাশের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠতে থাকে। অঞ্চলগত সংহতির দাবিও ঐ আন্দোলনের গতিবেগ সঞ্চারে সহায়ক হয়। বলা বাহুল্য, আত্ম-বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দাবিতে গঠিত আন্দোলন জাতীয় স্বার্থের অনুকূল ও স্পষ্টত প্রগতিশীল তাৎপর্যে বলীয়ান ছিল। এরূপ আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষ থেকে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের দিগন্ত দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে। জনসমাজ-গুলি যতই আত্মসচেতন ও আত্মবিকাশে উন্মুখ হয় ততই জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

অপরদিকে জনসমাজগুলির আন্দোলন বহু ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের বিরোধী খাতে প্রবাহিত হয়েছিল ; বিভেদ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এরূপ আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ঐক্যশক্তিকে দুর্বল করেছিল। জন-সমাজগুলির আত্মবিকাশের আকাঙ্খার প্রাবল্যকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টায় রত ছিল। নির্দিষ্ট কোন জনসমাজের ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ভিন্ন জনসমাজভুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব গড়ে তুলে স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারে নিজস্ব জনসমাজকে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী ছিল। পেশাগত শ্রেণীগুলি অনুরূপভাবে চাকুরি, নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুবিধা আদায় করা বা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জনসমাজগুলির স্বাতন্ত্র্যের উপর অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় ঐক্যকে কিছুটা বিপদের সম্মুখীন করেছিল। অন্যান্য কায়েমী স্বার্থমহলগুলি আন্তর্প্রাদেশিক বিরোধ বা জনসমাজগুলির অনৈক্যকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে লাভবান হতে তৎপর ছিল।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে জনসমাজগুলি ক্রমশ সংগঠিত হয়ে উঠলে এবং শোষিত সামাজিক শ্রেণীগুলি জনসমাজ বা প্রদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সংঘবদ্ধতা রচনায় অগ্রসর হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় কায়েমী স্বার্থমহল সন্ত্রস্ত বোধ করতে থাকে। শোষণ, মুনাফা, কর্তৃত্ব, সুযোগ ইত্যাদি কুক্ষিগত করার স্বার্থে জনসমাজগুলির ক্রমবর্ধমান ঐক্য ও শোষিত শ্রেণীগুলির সংঘবদ্ধতা দুর্বল করতে কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ ব্যক্তি ও সংগঠনগুলি তৎপর থাকে। জনসমাজগুলির স্বতন্ত্র সত্তাকে ব্যবসায়িক, ধর্মীয়, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি নানাবিধ স্বার্থের গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি ভারতীয় ঐক্যসৃষ্টিতে বাধা দিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করে।

জাগ্রত জনসমাজগুলি একদিকে যেমন ভারতীয় জাতীয়তা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতা আনয়নে সহায়ক হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনই কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় অনেক সময় জাতীয় স্বার্থ ভুলে সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থতার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[1]

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় : জাতীয় সংখ্যালঘু, না, জাতি ?

অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে গণ্য করার অসুবিধা ছিল অনেক। তাঁরা ভারতের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম সর্বত্রই বসবাস করতেন। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকেননি। সারা ভারত জুড়ে নির্দিষ্ট কোন ভাষায় তাঁরা কথাবার্তা বলতেন না, বসবাসের প্রদেশ অনুযায়ী তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলতেন।

বেশভূষার ব্যাপারে তাঁদের সর্বভারতীয় নির্দিষ্ট কোন পোশাক ছিল না। মালাবার অঞ্চলের মোপ্‌লারা মুসলমান হলেও বেশভূষা ও খানাপিনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় হিন্দুদের অনুরূপ ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার মুসলমান চাষীদের মধ্যে বেশভূষা ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপারে কোনরূপ মিল ছিল না। বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যা-ভ্যাস, রীতিনীতি, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয় ছিল। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের সঙ্গে দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের মুসলমানদের বৈসাদৃশ্য ধর্মীয় বিশ্বাসের সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র পরিলক্ষিত ছিল।

আর্থনীতিক দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুদের মতই নানারূপ সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। হিন্দুদের মত তাঁদের মধ্যেও নবাব, রাজা, মালিক, শ্রমিক, জমিদার, প্রজা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, দোকানদার, কৃষক প্রভৃতির অভাব ছিল না। সমগ্র ভারত জুড়ে বা নির্দিষ্ট কোন প্রদেশে সকল মুসলমানদের শ্রেণীস্বার্থ এক ছিল না; শোষক ও শোষিত শ্রেণীর শ্রেণী-সংঘাত মুসলমান সমাজেও বর্তমান ছিল। তাঁদের আর্থনীতিক জনজীবন ভারতীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতই কোন দিক থেকে স্বতন্ত্র ছিল না। হিন্দু রাজা, জমিদার, মালিক, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ মুসলমান নবাব,

ভূস্বামী, কারখানা-মালিক, বণিক প্রভৃতির স্বার্থের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল না। মুসলমান ও হিন্দু মেহনতী মানুষের স্বার্থ অভিন্ন ছিল।

সকল ভারতবাসীর রাজনৈতিক স্বার্থ ব্রিটিশ শাসন অবসানের সাথে যুক্ত ছিল। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রগতি অর্জনের পথে ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান সকল ভারতবাসীর কাছে প্রতিবন্ধক হিসাবে বিরাজ করেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সকল ভারতবাসীর সাধারণ শত্রু হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিল।

সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন, বণিকসভা, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত কর্মচারী বা বৃত্তিভোগী লোকজনদের ইউনিয়ন, ভূমিমালিকদের সংগঠন ইত্যাদি গড়ে তুলতে থাকেন। ভারতীয় জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা ধর্ম-বিশ্বাস নিরপেক্ষভাবে সকল ভারতবাসীদের সংগ্রামের ময়দানে সমবেত করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র একটি জাতি হিসাবে বিবেচনা করার অন্য একটি অসুবিধা ছিল এই যে, ভারতীয় সংস্কৃতির রূপকার হিসাবে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ও যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে-ছিল। ভারতীয় মিশ্র সংস্কৃতির দর্পণে উভয় সম্প্রদায় নিজেদের প্রতিবিম্ব খুঁজে পেতেন। সাহিত্য, স্থাপত্য, ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা সর্বত্রই ইসলাম ভারতীয়করণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে ভারতীয়ত্বে ধন্য করেছিল। এমন কি, ওয়াহ্‌বী-ফরাইজী আন্দোলনের যুগ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের শেষদিন পর্যন্ত অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিদেশী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে মৃত্যুবরণে অভিলাষী মুসলমান বীরের অভাব ঘটেনি।

বর্তমানে প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে বসবাসকারী ভারতীয় মুসলমানেরা সর্ব-বৃহৎ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচ্য হলেও অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ মালয়ালী, কর্নাটকী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটি বা অনুরূপ জনসমাজের বৈশিষ্ট্যে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা, ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ-নীতিক জনজীবন ছিল বলেই তাঁদের একটি জনসমাজ বলে চিহ্নিত করা সঙ্গত ছিল, তাঁরা সবাই ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে নয়।

অন্যান্য সংখ্যালঘু

ভারতীয় প্রত্যেক প্রদেশে প্রধান জনসমাজের পাশাপাশি বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই সম্প্রদায়গুলি ভারতের নির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক এলাকায় ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বসবাস না করে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলের জনসমাজগুলির সাথে মিলেমিশে জীবন ও জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নির্দিষ্ট কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতের সর্বত্র যে একটি ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম বা আর্থনীতিক জীবনের বন্ধনে আবদ্ধ আছে এমন নয়। অধিকাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রদেশগুলির সামাজিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জনজীবনের অংশীদার হয়ে বসবাস করে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজ করলেও ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা বা সামাজিক ন্যায়বিচারের কোন-না-কোন নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এজন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ভাষাগত সংখ্যালঘু, সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু ইত্যাদি নানা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবিভক্ত ভারতে মুসলমান, শিখ, খ্রীস্টান, পার্শী, 'অনুন্নত' সম্প্রদায় ও উপজাতিগুলির স্বাধিকার রক্ষার সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করেছিল।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ : কারণ বিশ্লেষণ

ঔপনিবেশিক ভারতে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ উভয় সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায় ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের উস্কানিতে কলেবর বৃদ্ধি করেছিল। এরূপ সাম্প্রদায়িকতার 'ভারতীয়ত্ব' এত বেশী ছিল যে, রাজনৈতিক বিশেষ কোন মতাদর্শের বাঁধাবুলিতে এই সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করার প্রয়াস সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করতে পারে না। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিজ্ঞান ইত্যাদি সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্মিলিত সহায়তা ছাড়া গবেষকের পক্ষে ঐরূপ সাফল্য লাভ করা অসম্ভব। গবেষক যদি হিন্দু বা মুসলমান হন তবে বস্তুনিষ্ঠার প্রতি তাঁর আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁর ভিন্নতর সামাজিকীকরণ, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের জন্য সত্যদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা বেশী।

ভারতে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশে ক্রিয়াশীল কারণগুলিকে মোটামুটি কতগুলি শিরোনামে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায় :

১. **সুযোগসুবিধা-বঞ্চিত মুসলমান অভিজাতশ্রেণী:** উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি স্বতন্ত্র একটি ধারা হিসাবে 'মুসলমান জাতীয়তাবাদের' উদ্ভব ঘটে। ঔপনিবেশিক ভারতে সুযোগসুবিধা-বঞ্চিত সামন্ত মুসলমান অভিজাততন্ত্রের উচ্চতর অংশের মধ্যে ঐরূপ জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক রূপ প্রথম বিকশিত হয়। ব্রিটিশ ধনিক-শ্রেণীর শোষণ ও অপশাসনে জর্জরিত মুসলমান অভিজাতশ্রেণী একদিকে যেমন নিজস্ব স্বার্থরক্ষায় সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল, অপরদিকে তেমন আর্থ-সামাজিক ও সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের বিচারে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর হিন্দু ধনিকশ্রেণীর প্রতিযোগিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কৌশল আবিষ্কার জরুরী মনে করেছিল। এই শ্রেণী ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়, আবার হিন্দু ধনিকশ্রেণীর রাজনৈতিক-আর্থনীতিক ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়িয়ে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধিতে তৎপর হয়।

২. **বিশ্বজোড়া ইসলামী সংস্কৃতির সাথে আত্মীয়তা:** ভারতে ইসলাম অন্য ধর্মগুলির সাথে সমন্বয়ের পথে অনেকটা অগ্রসর হলেও, ভারতীয় মুসলমানদের অনেকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের বিদেশী ভাবতেন। স্যর আবদুর রহিম বলেছিলেন,'...আমরা যখন রাস্তা অতিক্রম করে আমাদের মতই শহরবাসী হিন্দুদের বসবাসের এলাকায় প্রবেশ করি তখন ভারতে আমরা সকল সামাজিক ব্যাপারেই নিজেদের সম্পূর্ণ বিদেশী বলে অনুভব করি।'[৪] খিলাফৎ আন্দোলনের সময় ধর্মীয় আদর্শ ও সংস্কৃতি রক্ষার তাগিদে ভারতীয় মুসলমানেরা তুরস্কের খলিফার বিশ্বজোড়া মুসলমান জগতের উপর ধর্মীয় কর্তৃত্ব ও 'পবিত্র স্থান' হিসাবে বিবেচিত আরব, ইরাক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের উপর তাঁর সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জন করতে রাজী ছিলেন। অথচ তুর্কীরা ১৯২২-'২৩ সালে লুসেনে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনায় 'পবিত্র স্থানের' উপর খলিফার কর্তৃত্বের দাবির উপর জোর না দিয়ে প্রতিরক্ষা ও 'পেট্রল' প্রাপ্তির স্বার্থে ভিলায়েতের উপর দখলদারি কায়েম করতে বেশী উৎসাহ দেখান। ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ তুর্কীরা মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে খলিফাতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটায়। খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে ডব্লিউ. সি. স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ভুল আদর্শ, রোমান্টিকতা ও বাস্তবতাবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গী' ব্যর্থতা ডেকে এনেছিল। অধ্যাপক এফ. রহমান এই আন্দোলনকে 'ভাবী স্বাধীন ভারতে অ-মুসলমান সংখ্যা-

গরিষ্ঠের বিরুদ্ধে মুসলমানদের নিরাপত্তা খোঁজার অর্ধ-সচেতন প্রয়াস' বলে বর্ণনা করেছিলেন।[3]

জওহরলাল নেহ্‌রু-বর্ণিত 'ইসলামী ঐতিহ্য ও অক্সফোর্ড শিক্ষার' অদ্ভুত সংমিশ্রণ মহম্মদ আলী বলতেন, 'ইসলাম ও ভারত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে আমি উন্মাদ।' গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩০-'৩১) আলী বলেন, ভারতীয় মুসলমান হিসাবে তিনি দুটি সমকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃত্তের অভ্যন্তরে চিন্তা ও মননের রাজ্যে বাস করেন—একটি ভারতের মঙ্গলামঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত এবং অপরটি ইসলামের ভাল-মন্দের সাথে।[4] আলী সাহেবের মত ব্যক্তিদের স্বরূপ সমকালীন বহু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে প্রতিভাত ছিল না এমন নয়।

৩. **ঔপনিবেশিক শাসনকর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ**: হিন্দুদের তুলনায় ভারতীয় মুসলমানেরা ঔপনিবেশিক আমলের শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টক দশক পর্যন্ত অনেক বেশী অনাদৃত, অপমানিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ছিলেন। শাসকশক্তি হিসাবে কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষমতার অধিকারী মুসলমান সমাজের মর্মকেন্দ্রে এরূপ অনাদর, অপমান, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার তীক্ষ্ণ শেল নির্মমভাবে বিদ্ধ করেছিল। স্বাভাবিক কারণে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেশী প্রকট ছিল। ওয়াহ্‌বী ও ফরাইজী আন্দোলন ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিসাবে প্রথমে সংগঠিত হলেও কালক্রমে শ্রেণীসচেতনায় সমৃদ্ধ হয় এবং ব্রিটিশ-বিরোধী স্বরূপে বিধৃত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে মুসলমানদের অংশগ্রহণ হিন্দুদের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ছিল। মৃত্যুবরণও তাঁদের করতে হয়েছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

শাসকশক্তি প্রতিশোধ গ্রহণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনে মুসলমানদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আর, আপেক্ষিকতার বিচারে হিন্দুরা তখন নানাবিধ সুযোগসুবিধা লাভের অধিকার ভোগ করেছিল। স্যর উইলিয়ম হাণ্টার ঝাঁঝাল মন্তব্য করেছেন যে, 'হিন্দুরা তাঁদের প্রাক্তন মনিবদের ফেলে-দেওয়া রুটির খণ্ডগুলি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করেছিল।'[5]

৪. **ইংরাজী শিক্ষা ও খ্রীস্টধর্ম সম্পর্কে বৈরী মনোভাব**: উনবিংশ শতাব্দীতেও ভাষা হিসাবে আরবী, পারসী ও উর্দু সমকালীন ইংরাজীর চেয়ে

নিম্নমান ছিল না। ইউরোপীয় জ্ঞানের পরিচয় আরবী-পারসীর মধ্য দিয়ে কিছুটা লভ্য ছিল। ইউরোপীয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও নবজাগরণের পূর্বে কয়েক শতাব্দী জুড়ে ইসলাম সারা বিশ্বে উচ্চতর সভ্যতা-সংস্কৃতির বাহক হয়ে উঠেছিল। ফলে, মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষাগুলির যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিনটি দশকের আগে ভারতীয় মুসলমানেরা তাঁদের রাজনৈতিক-সামরিক ক্ষমতার দখলদার ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা শিক্ষায় কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু এরূপ অনাগ্রহ সাম্প্রতিক কালের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝর্নাধারায় মুসলমান চিন্তা ও মননকে অবগাহনের মুক্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে।

খ্রীস্টধর্মের সংস্পর্শে এসে হিন্দুধর্ম নূতন ব্যাখ্যায় আরও বর্ণাঢ্য ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম উভয়ই ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্যের কেন্দ্রভূমি থেকে উদ্গত বলে মুসলমানেরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কাছ থেকে গ্রহণযোগ্য কিছু পায়নি।[6]

যুগোপযোগী ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে সরাসরি গ্রহণ করতে না পেরে ভারতীয় মুসলমানেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় পিছিয়ে পড়তে থাকে। এই কারণে ব্রিটিশ ভারতের প্রশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য, পেশা ইত্যাদিতে হিন্দুদের একচেটিয়া অংশগ্রহণ বা অগ্রগতি দীর্ঘকাল বজায় থাকে। তাছাড়া, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিপুল সংখ্যক মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ভারতে ব্যাপ্তি লাভ করেছিল বোম্বে, মাদ্রাজ, কোলকাতা প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির অনেক পরে। স্বভাবতই ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণ বা ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানেরা অনেক পরে মনস্থির করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। শিক্ষা ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়গুলির অসম অগ্রগতি ধীরে ধীরে এক পক্ষকে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন করে এবং অপরপক্ষকে সুবিধাজনক অবস্থা বজায় রাখার মনোভাব গ্রহণে প্ররোচিত করে।

৫. সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন সরবরাহে সরকারী-বেসরকারী ব্রিটিশ প্রয়াস : ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারী নীতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ছয়-সাতটি দশক পর্যন্ত স্পষ্টত মুসলমান বিদ্বেষে ভরপুর থাকে। ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরো বলেছিলেন, '...আমাদের নীতি হোল হিন্দুদের সাথে সমঝোতা

গড়ে তোলা।' সিপাহী বিদ্রোহ দমনের কিছু পরে লর্ড এলফিনস্টোন অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, রোমানদের প্রাচীন প্রশাসনিক আদর্শ 'বিভক্ত করো ও শাসন করো' নীতি হিসাবে ব্রিটিশ ভারতে গৃহীত হওয়া উচিত। ব্রিটিশদের মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হীনবল করে তুলতে ঐ সম্প্রদায়কে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাতে তাঁরা নানারূপ ফন্দীফিকিরের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব, সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী, প্রদেশ পুনর্গঠন ইত্যাদি নানা ধরনের ছলাকলা ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

১৮৭২ সালে স্যর উইলিয়ম হান্টার তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান্‌স' গ্রন্থে মুসলমানদের ন্যায্য অভিযোগগুলির প্রতি সুবিচার করার দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ডব্লিউ. এস. ব্লান্ট ১৮৮৩-'৮৪ সালে বহুবার ভারতীয় মুসলমানদের 'দাঁত খিঁচিয়ে' ব্রিটিশদের ভয় পাইয়ে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পরামর্শ দেন।[7] 'ইংল্যাণ্ডে আমরা সদাসর্বদা ভারতে মুসলমান অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় থাকি', তিনি তাঁর 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন: এ প্রাইভেট ডায়েরি' (১৯০৯)' বইতে লেখেন, '...কিন্তু তাঁরা যদি চুপচাপ বসে থাকে, আর অনুগ্রহ-বঞ্চিত অবস্থায় থাকার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে থাকে তবে ব্রিটিশ জনগণ তাঁদের ঐ অবস্থায় ফেলে রাখতে বেশ খুশী হবে।' আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর্চবোল্ড ও আরও কয়েকজন প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুসলমানদের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড' বইতে মন্তব্য করেন যে, ১৯০৬ সালে সিমলাতে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর কাছে মুসলমান প্রতিনিধিদলের স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী দাবির পশ্চাতে মিঃ আর্চবোল্ডের বুদ্ধিপরামর্শ ক্রিয়াশীল ছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত মুসলমানদের হিন্দু পেশাগত শ্রেণী এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুগামী মধ্যবিত্ত মানুষদের ক্রমবর্ধমান জঙ্গী জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে সংগঠিত করে তুলবার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

৬. **অসম আর্থনীতিক বিকাশের প্রতিক্রিয়া:** ব্রিটিশ ভারতের আর্থনীতিক উন্নতির বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ফলাফল অবিভক্ত ভারতে মুসলমান

সম্প্রদায়ের অনেকের মনে বঞ্চনা, হতাশা ও আপেক্ষিক অনগ্রসরতার বেদনা গভীরতর করে। কায়েমী স্বার্থমহল এই বেদনাকে কাজে লাগিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তুলনামূলকভাবে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর, সরকারী চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধতর হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করে। মহাজন, জমিদার, দালাল, ধনিক, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহদাংশের চোখে ঐ অংশের ভূমিকা শোষকের ন্যায় বলে প্রতিভাত হয়েছিল। ভারতের সর্বত্রই যে এরূপ চিত্র বিরাজিত ছিল এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সংযুক্ত প্রদেশের কোন কোন অংশে বৃহৎ জমিদার ও অভিজাতদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।

উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, ঔপনিবেশিক প্রভুদের তৈরী করা আর্থনীতিক বাজারে লাভবান হয়ে এবং গ্রামের জমিদারী থেকে প্রাপ্ত নিশ্চিত আয়ের মাধ্যমে সন্তানসন্ততিদের শহর এলাকায় শিক্ষিত করে সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নে ব্রতী হন। সাহিত্য, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁরা চিন্তা ও মননে ঊনবিংশ শতাব্দীর তিন-চারটি দশকে যে ধরনের 'নবজাগরণ' আনয়ন করেন তা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু পরিব্যাপ্ত হয়নি এমন নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। জনজীবনের অন্দরমহলে নবজাগরণী আহ্বান পৌঁছুতে পারেনি। দরিদ্র, নিরক্ষর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু-মুসলমান চাষীর সমস্যা ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু 'বাবু' সম্প্রদায়ের আলোচ্য বিষয়সূচীতে স্থান লাভ করেনি। বলাই বাহুল্য, ঐ 'বাবু' সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থমহলগুলি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুত্বের ধ্বজা ধরে তারা আর্থনীতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধা সীমিত সংখ্যক, হিন্দু সুবিধাভোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হয়। সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাচীর গড়ে তুলে তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের শক্তিকে স্থায়ী করে তোলে। জাতীয় আন্দোলনের উত্তাল ঊর্মিমালার তলদেশে সাম্প্রদায়িকতার প্রবাহটি হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার অশুভ সম্মিলনে পুষ্ট হয়ে প্রবল ঘূর্ণিতে রূপান্তরিত হয়।

এক বৃন্তে দু'টি কুসুমের মাঝে কণ্টক সমারোহ

হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায় দু'টিকে এক বৃন্তে দু'টি কুসুমের সাথে তুলনা করেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম। সৈয়দ আহ্‌মদ খান ভারতকে তুলনা করেছিলেন সুন্দরী বধূর সাথে যাঁর দু'টি চোখ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দু'টির প্রতীক হয়ে 'সমান দ্যুতিতে' জ্বলে তাঁকে স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে করে তুলবে হরিণনয়না।[8]

হিন্দুধর্মের মহান ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত হয়ে ইসলাম ভারতে তরবারির দাপট কমিয়ে ধর্মসমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আকবর থেকে দারা শিকোহ্ পর্যন্ত ঐ সমন্বয়ী ধারাটি কখনো জোয়ার, কখনো ভাঁটার টানে প্রবাহিত হয়েছে।

১৯৩১ সালে গান্ধী গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে বলেছিলেন যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান কলহ ব্রিটিশ আগমনের সময় থেকে শুরু। ঐতিহাসিক বিচারে এরূপ বক্তব্য সঠিক মনে হয় না। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, শিবাজীর নেতৃত্ব প্রমাণ করেছে হিন্দুধর্মের মহীরুহটি 'সত্যি মরে যায়নি', শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজনৈতিক দাসত্ব, প্রশাসন থেকে বহিষ্কার ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অত্যাচার সত্ত্বেও ঐ মহীরুহ 'নূতন পত্ররাজি ও শাখাপ্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, ঊর্ধ্ব গগনে আবার মাথা তুলতে পারে।'[9] শ্রীযুক্ত সরকারের বক্তব্য থেকে ধারণা জন্মে যে, মুসলমান শাসনের যুগে হিন্দুধর্ম অবদমিত ছিল, হিন্দুরা নিগৃহীত ছিল। আবার, একথাও ঠিক, মোগল শাসনের অন্তিম দিনগুলিতে মারাঠা দাপটে মুসলমানেরা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত বোধ করেছিলেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লার মত সুফী পণ্ডিত আহ্‌মদ শাহ্ আবদালিকে লিখেছিলেন, 'মুসলমান সম্প্রদায় শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে ⋯ ⋯ নিশ্চয়ই কর্তব্যের তাগিদে ভারতে অভিযান করা, মারাঠা প্রভুত্ব ধ্বংস করা, অ-মুসলমানদের নিষ্ঠুর কবল থেকে দুর্বল ও বৃদ্ধ মুসলমানদের রক্ষা করা আপনার পক্ষে সমীচীন হবে।'[10]

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পাশাপাশি আন্তর্সাম্প্রদায়িক বৈরী মনোভাবের অভাব ছিল না। ব্রিটিশ শাসনকালে উদ্ভূত সমাজিক অর্থনীতির নানারূপ 'ত্রুটিবিচ্যুতি ও 'বিভেদ, বিভাগের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার' ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ ঐরূপ মনোভাবের তীব্রতা বৃদ্ধিতে

ইন্ধন যোগায়। অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্রেও এই মনোভাব আত্মপ্রকাশ করেছিল। আলতাফ হুসেন হালির 'মুসাদ্দাস' (ইসলামের জোয়ার-ভাঁটা, ১৮৭৯) ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এই মনোভাব থেকে মুক্ত ছিল না বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয়ে থাকে।[11] হালি মুসলমান জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রয়াসে রত ছিলেন। আর, বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষয়িষ্ণু, অত্যাচারী, নীতিবিচ্যুত মুসলমান অপশাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন।

ভারতে মুসলমান 'নবজাগরণের' অন্যতম পথিকৃৎ স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান বিগত শতাব্দীর আশির দশকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত হলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে। ভারতকে তিনি বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত মহাদেশ হিসাবে বিবেচনা করতেন, দেশ হিসাবে নয়। বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শুরু থেকে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ যেরূপ দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রচারে লিপ্ত ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে স্যর আহ্‌মদের বক্তব্যে তার পূর্বাভাষ মেলে।

১৮৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি প্রতিবেদনে ভারতকে 'বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ ও বংশানুক্রমিক মনোভাবাপন্ন শ্রেণী, জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত বিশাল ভূখণ্ড' বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।[12] বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্তও ব্রিটিশ শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা কাম্য মনে করেনি। গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টো সেক্রেটারী অফ স্টেট লর্ড মর্লেকে লেখেন, 'আপনার চেয়ে একবিন্দুও বেশী বিশ্বাস আমার নেই যে, প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কারের পরেও ভারতে বসবাসকারী জাতিগুলির পক্ষে ইংরাজ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করা কাম্য, বা সম্ভব, বা চিন্তাভাবনার যোগ্য।'[13] লর্ড মিণ্টো মিঃ জিন্নাহ্‌র বহু আগে ভারতে বসবাসকারী একাধিক জাতির অস্তিত্ব প্রচারে লিপ্ত ছিলেন।

'কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্তব্যরত প্রতিনিধি দল'

১৯০৬ সালে ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। লীগের প্রথম প্রস্তাবে তিনটি উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়: ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা, তাঁদের রাজনৈতিক

স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন করা।

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসের পয়লা সিমলাতে 'ব্রিটিশ রাজের ভারতীয় মুসলমান প্রজাদের মধ্য থেকে কতিপয় অভিজাত ব্যক্তি, দেশীয় রাজ্যগুলির মন্ত্রী, মহান ভূস্বামী, আইনজীবী, বণিক' প্রভৃতি নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদল গভর্নর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে শাসনক্ষেত্রের সকল স্তরে—জিলা বোর্ড, পৌরসভা ও আইনসভাগুলিতে—মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি করে। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য মুসলমান প্রতিনিধি যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর মাধ্যমে নির্বাচিত করা প্রায় অসম্ভব বলে ঐ প্রতিনিধিদল অভিমত প্রকাশ করে। লর্ড মিণ্টো ঐ অভিমতের সাথে ঐক্যমত প্রকাশ করেন। ১৯০৯ সালের ভারত শাসন আইনে যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর পাশাপাশি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করার বিধি প্রবর্তিত হয়।

মৌলানা মহম্মদ আলী সিমলায় আগত প্রতিনিধিদল 'কর্তৃপক্ষের আদেশে কর্তব্যরত' ছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন।[14]

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার থেকে জিন্নাহ্‌র 'চৌদ্দ দফা'

মর্লে-মিণ্টো শাসনসংস্কারের সুপারিশে রচিত ভারত শাসন আইন (১৯০৯) সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর পাশাপাশি ভারতীয় 'বিভিন্ন সম্প্রদায়, শ্রেণী ও স্বার্থের' প্রতিনিধিত্বের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করে। লেডী মিণ্টোর ব্যক্তিগত দিনলিপি থেকে জানা যায় যে, তাঁর মতে স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী কোটি কোটি মুসলমানকে ষড়যন্ত্রমূলক বিরোধিতার পথ থেকে টেনে আনুগত্যের পথে মুখ ফেরাতে বাধ্য করার ফলপ্রসূ পদ্ধতি হিসাবে কার্যকরী হয়েছিল। লর্ড অলিভিয়র বিশের দশকে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনায় বলেছিলেন যে, ঐ শাসন মুসলমান সম্প্রদায়কে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে ব্যবহারে রত ছিল। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টির প্রয়াসকে ভারতীয় ঐক্যের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত একটি হীন অপকৌশল হিসাবে বিবেচনা করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে ব্যাপকতর করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিকে বাড়াতে নিঃসন্দেহে কিছুটা ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

কংগ্রেস ও লীগের রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার সাদৃশ্য, অসহযোগ এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সাযুজ্য ও হিন্দু-মুসলমানদের যৌথ সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি করে।

অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্তী দশকটিতে ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবী কর্মতৎপরতা জাতীয় স্তরে আত্মপ্রকাশের তাগিদে চঞ্চল হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে রাজনৈতিক অস্থিরতার অবসান ঘটাবার বাসনায় সাইমন কমিশন নিয়োগ করে। ঐ কমিশনের গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির হাতে ভাবী ভারতের সংবিধানের রূপরেখা রচনার দায়িত্ব অর্পণ করে। ঐ রূপরেখা আলোচনার জন্য ১৯২৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় প্রতিনিধিসভায় মুসলিম লীগের সভাপতি হিসাবে জিন্নাহ্ 'চৌদ্দ দফা' দাবি উপস্থাপিত করেন: ১. অবশিষ্ট ক্ষমতায় সমৃদ্ধ প্রদেশগুলি নিয়ে গঠিত যুক্ত-রাষ্ট্রীয় সংবিধান; ২. সকল প্রদেশের একই রকম স্বাতন্ত্র্যভোগের অধিকার; ৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা ও নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির পর্যাপ্ত ও ফলপ্রসূ প্রতিনিধিত্বের এমন ধরনের ব্যবস্থা যাতে কোন প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘু বা সমান প্রতিনিধিত্বের পর্যায়ভুক্ত না হয়ে পড়ে; ৪. কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধিত্ব এক-তৃতীয়াংশের কম হবে না; ৫. স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলী বজায় থাকবে, যদি-না কোন সম্প্রদায় নিজস্ব ইচ্ছায় যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী গ্রহণে সম্মতি জানায়; ৬. আঞ্চলিক পুনর্গঠন কোন সময়েই যেন পাঞ্জাব, বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিপন্থী না হয়; ৭. বিশ্বাস, আরাধনা, ধর্মীয় রীতিনীতি পালন, প্রচার, সংগঠন এবং শিক্ষার অধিকার সকল সম্প্রদায়ের জন্য নিশ্চিত করতে হবে; ৮. কোন আইনসভা বা নির্বাচিত সংস্থায় কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ বা তার বেশী সংখ্যক সদস্যের অসম্মতি থাকলে কোন বিল বা প্রস্তাব বা ঐগুলির অংশবিশেষ পাশ করান যাবে না; ৯. বোম্বে বিভাগ থেকে সিন্ধুকে স্বতন্ত্র করতে হবে; ১০. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে অন্যান্য প্রদেশের মত সংস্কার প্রচলন করতে হবে; ১১. সংবিধানে অন্যান্য ভারতীয়দের মত সরকারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক সংস্থাগুলিতে মুসলমানদের জন্য পর্যাপ্ত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা

করতে হবে, অবশ্য দক্ষতার প্রতি যথাযোগ্য লক্ষ্য রেখে; ১২. মুসলমান সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যক্তিসংক্রান্ত আইন রক্ষার জন্য সংবিধানে যথেষ্ট রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং মুসলমান দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাদেশিক ও স্বায়ত্তশাসনমূলক সরকারগুলির অনুদান ব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশভোগী করে তুলতে হবে; ১৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে; ১৪. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলির সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।

পীরপুর রিপোর্ট ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ

চৌদ্দ দফার সব ক'টি দাবিই কংগ্রেসের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল এমন নয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রদেশ সংক্রান্ত ধারাগুলি কার্যকর করে তুলতে কংগ্রেস ও লীগ ঐক্যমত হলে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নেহ্‌রুর সাংবিধান প্রস্তাব বা জিন্নাহ্‌র চৌদ্দ দফা তাৎক্ষণিক গুরুত্ব হারায়।

১৯৩৭-'৩৯ সালে কংগ্রেস পরিচালিত মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্মের মূল্যায়নের জন্য মুসলিম লীগ একটি অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে; ঐ কমিটির রিপোর্ট পীরপুর রিপোর্ট নামে খ্যাত। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে 'মুসলমান অভিযোগ' লিপিবদ্ধ করার নামে ঐ রিপোর্টের তৃতীয় অধ্যায়ে এমন সব রোমহর্ষক কাহিনী ও তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছিল যে, পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক ১৯৩৭-'৩৯ সালে ভারতে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। রিপোর্টের মূল বক্তব্য ছিল এই: অসহায়, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বৈরতান্ত্রিক অত্যাচার-অবিচারে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস সরকারের 'বিদ্যামন্দির' পরিকল্পনার উল্লেখ করে পীরপুর রিপোর্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের বিক্ষোভের অন্যতম কারণ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়। 'মন্দির' শব্দটি হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চনার স্থানকে নির্দেশ করে; সরকারী বিদ্যালয়কে মন্দির হিসাবে বিবেচনা করা মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেননা পৌত্তলিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাপারে যুক্ত থাকা ধর্মানুরাগী মুসলমানের কাছে অধর্মের সামিল। মুসলমান ছাত্রদের নাকি বলপূর্বক 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত যুক্তকরে গাইতে বাধ্য করা হত; গান্ধীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ছাত্র-ছাত্রীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে হত। মুসলমানদের মানসিক, ধর্মীয়,

স্বার্থগত কোন বিষয়েই সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ না করে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি বিদ্যামন্দির জাতীয় নানা পরিকল্পনায় মুসলমান জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল বলে পীরপুর রিপোর্ট অভিমত প্রকাশ করে।[15]

ঐ রিপোর্ট নিঃসন্দেহে কল্পনাবিলাস, অতিরঞ্জন ও বৈরী মনোভাবে বিকৃত ছিল। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির কাজকর্ম যে মুসলমানদের বৃহৎ অংশের কাছে ঘৃণ্য ঠেকেছিল ঐ রিপোর্ট তার স্পষ্ট অভিব্যক্তি বহন করে।

'বন্দেমাতরম' ও সাম্প্রদায়িকতা

মুসলিম লীগের বক্তব্য ছিল : 'বন্দেমাতরম' মুসলমান বিদ্বেষী 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের অংশবিশেষ ; হিন্দু রীতিপদ্ধতিতে দেশকে দেশমাতৃকার স্বরূপে বিধৃত করে হিন্দুধর্মের আরাধ্যা দেবীমূর্তির সাথে সাযুজ্য রচনার প্রয়াস ঐ সঙ্গীতে লক্ষিত হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কবিতাটিকে সঙ্গীতাকারে গ্রহণের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল ঐ কবিতাটির 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিটির সাথে বহু বৎসরের দেশপ্রেমিক স্মৃতির প্রতি মর্যাদানের প্রেরণায়। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে, সভা, সমিতি, মিছিল ও ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জনের সময় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি জনগণের কণ্ঠে দৃপ্ত আবেগে ধ্বনিত হয়েছে। ঐ ধ্বনির কাছে স্বদেশপ্রেমী জাতীয় ঋণ অত্যন্ত বেশী। জওহরলাল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, 'বন্দেমাতরম' কবিতার প্রথম দুটি স্তবক সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলা ঠিক নয় ; হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার কাছেই ঐ দুটি গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত।

যুক্তির বিচারে নেহরুর বক্তব্য সঠিক ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত পরিবেশে খুবই কম ক্ষেত্রে যুক্তি আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। কাজেই তাঁর বক্তব্য মুসলিম লীগের কাছে ১৯৩৮-'৩৯ সালে সহানুভূতিমূলক সাড়া জাগাবে আশা করা অস্বাভাবিক ছিল। মুসলমানদের পক্ষে স্বদেশকে পিতৃভূমি কল্পনা করা যত সহজ, মাতৃভূমি কল্পনা করা তত সহজ নয়। অবক্ষয়ে ও অন্যায়-অবিচারে জর্জরিত পড়ন্ত মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে সন্তানসেনাদের বিদ্রোহ 'আনন্দমঠের' বিষয় হলেও, স্থূল বিচারে মিশ্র সংস্কৃত-বাংলায় রচিত 'বন্দেমাতরম' মুসলমানদের কাছে অগ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। ইসলাম-ভক্ত জনতার কাছে 'বন্দেমাতরম' হিন্দুদের মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপতার লক্ষণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

জাতীয় ভাষার প্রশ্ন ও সাম্প্রদায়িকতা

জাতীয় ভাষা বা আন্তপ্র´াদেশিক ভাষা নির্ধারণের প্রশ্নে কংগ্রেস-লীগের মতানৈক্য সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির সহায়ক কারণ হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল। জাতীয় ও আন্তপ্র´াদেশিক যোগাযোগের ভাষা হিসাবে সরকারীভাবে কংগ্রেস 'হিন্দুস্তানী' গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল—লিখবার সময়ে হিন্দী বা উর্দু উভয় হরফই গ্রহণ করার সপক্ষে কংগ্রেসের মতামত ব্যক্ত হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯৩৮ সালের মে মাসে কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রীপ্রধানদের ভাষা সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন।

মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ভাষা নীতির বিরোধিতা করেছিল। হিন্দুস্তানীর পরিবর্তে পারসিক রীতির উর্দু গ্রহণের পক্ষে লীগ মতস্থির করেছিল। মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় ঐ উর্দু ভাষার পরিবর্তে অন্য কোন ভাষান্তর গ্রহণে সম্মত ছিল না। ঐ ভাষার সাহিত্যসম্পদ মুসলমান সংস্কৃতির বাহক হিসাবে তাঁদের বিমুগ্ধ করে রেখেছিল; স্বভাবতই মুসলিম লীগ তাঁদের দাবিতে উর্দু ছাড়া অন্য কোন ভাষার মাধ্যম গ্রহণে গররাজী ছিল। উত্তর ভারতের জনগণের বিশাল একটি অংশের মধ্যে প্রচলিত উর্দু ভাষার পরিবর্তে লীগ পারসিক রীতির উর্দুকেই সরকারী স্বীকৃতি দিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। কংগ্রেসের কাছে এই রীতির উর্দু গ্রহণে দুস্তর বাধা ছিল। ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেস-লীগ মতান্তর ও মনান্তর হিন্দু-মুসলমান জনগণের বিপুল অংশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

লাহোর প্রস্তাব

কংগ্রেস-লীগ সম্পর্কের অবনতি যখন দ্রুত ঘটছিল তখন ইউরোপ মহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সরকার শুধুমাত্র নিজস্ব সিদ্ধান্তে ফ্যাসিবাদী ও নাৎসি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় অগ্রসর হলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রতিশ্রুতি ছাড়া যুদ্ধপ্রয়াসে ভারতীয় জনবল ও অর্থবল নিয়োগের বিরোধিতা করে। কংগ্রেসের দাবি বিবেচনায় কোনরূপ ব্রিটিশ আগ্রহ লক্ষিত না হওয়ায় 'হাই কম্যাণ্ডের' নির্দেশে কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। সব ক'টি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে ১৯৩৯ সালের ২২শে ডিসেম্বর দিনটিকে 'বিগত আড়াই বৎসরব্যাপী অত্যাচার, শোষণ ও অন্যায়ের কবল থেকে পরিত্রাণ' পাওয়ার জন্য জিন্নাহ্ মুক্তিদিবস

হিসাবে পালনের নির্দেশ দেন। 'আল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে' প্রার্থনা করে ও কংগ্রেসী শাসনের অবসানে প্রস্তাব পাশের মধ্য দিয়ে 'স্বস্তি' প্রকাশ করে লীগ ঐ দিনটি সর্বভারতীয় স্তরে পালন করে। স্ট্যান্‌লি ওলপার্ট মন্তব্য করেছেন যে, লীগের এই প্রস্তাব সংগ্রামের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বাধীনতা অর্জনের কংগ্রেসী স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ করে দেয়।[16]

১৯৪০ সালের মার্চ মাসে জিন্নাহ্‌, লাহোর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে একটি ভাষণে বলেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি ও সুখ আনয়ন করতে হলে আমাদের সকলের কাছে যে পথ খোলা আছে তা হল ভারতকে বিভক্ত করে প্রধান জাতিগুলির জন্য স্বাধীন, জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করা।'[17]

ভারত উপমহাদেশকে বিভক্ত করার অন্তত ছ'টি পরিকল্পনা মুসলিগ লীগ নেতৃত্বের কাছে উপস্থাপিত হয়েছিল; একটি প্রস্তাবের বয়ানে তিনটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্রের পত্তন কাম্য মনে করা হয়েছিল: ১. পাকিস্তান, ২. বঙ্গদেশ ও ৩. হায়দ্রাবাদের নিজামের পারিবারিক নামানুসারে ঐ রাজ্যের একাংশ নিয়ে গঠিত উসমানিস্থান। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে 'স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম' দুটি মুসলমান রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হয়েছিল: ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ও পূর্বে মুসলপ্রধান ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত দুটি অঞ্চল। লাহোর প্রস্তাবের অস্পষ্টতার জন্য সংবাদ-পত্রগুলি ঐ প্রস্তাব সঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' শিরোনামায় ভূষিত করে। জনমানসে এই ভুল ধারণা গড়ে ওঠে যে লীগ একটি মুসলমান রাষ্ট্রের দাবিদার।

লাহোর প্রস্তাবের শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, লীগের কার্যকরী সমিতি এমনভাবে সংবিধানের একটি বয়ান রচনা করবে যাতে এই অঞ্চল দুটি স্ব স্ব এলাকায় প্রতিরক্ষা', বৈদেশিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বহিঃশুল্ক ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। ভারতে একাধিক 'স্বতন্ত্র, সার্বভৌম' মুসলমান রাষ্ট্রের পত্তন যে মুসলীম লীগের অনভিপ্রেত ছিল না তা ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে সিন্ধু আইনসভায় গৃহীত প্রস্তাবের বয়ান থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়: একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মুসলমানেরা উপমহাদেশের মুসলমান-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে 'তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্রগুলি' গঠনের অধিকারী। অবশ্য, লাহোর প্রস্তাবের ব্যাখ্যায় এরূপ অভিমতও কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক প্রকাশ করেছেন যে,

মুসলীম লীগ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে মুসলমান দুটি 'স্বাধীন রাষ্ট্রের' ইউনিয়ন বা সমবায় গঠনের দাবিদার ছিল; অর্থাৎ একটি মুসলমান রাষ্ট্রের পত্তনই লীগের কাম্য ছিল,—যা কিছু ভুল বোঝাবুঝি তা প্রস্তাবের দুর্বল বয়ান রচনার ফলশ্রুতি।

যাই হোক, লাহোর প্রস্তাব কংগ্রেসকে বিক্ষুব্ধ ও হতবাক করে দেয়। গান্ধী ঐ প্রস্তাবকে ভারতের অঙ্গচ্ছেদের জন্য তৎপরতা বলে অভিহিত করেন। তিনি মুসলমানদের 'কল্যাণবোধ ও স্বার্থের' খাতিরে 'প্রত্যক্ষগোচর আত্মহত্যার' প্রয়াস থেকে নিবৃত্ত হতে আহ্বান জানান। তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের সমালোচনায় বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের অধিকাংশ অন্য ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত বা ধর্মান্তরিত পিতামাতার সন্তান; তাঁরা ধর্মান্তরিত হবার পর স্বতন্ত্র একটি জাতিতে পরিণত হননি। তাঁর যুক্তি, বলা বাহুল্য, বাঙালী মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে প্রতীয়মান হয়, কেননা তাঁদের বেশভূষা, ভাষা, খাদ্য, আচার-আচরণ প্রায় সকল ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুদের মত। ১৯৪০ থেকে '৪৭ পর্যন্ত গান্ধী ও জিন্নাহ্‌র আবেগভরা মতামত বিনিময় ও যুক্তিতর্ক চলতে থাকে; অনুরূপভাবে নিম্নতর পর্যায়ে লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব ও এক জাতি তত্ত্বের সপক্ষে-বিপক্ষে তর্কযুদ্ধ চলতে থাকে; উভয় পক্ষ ঐতিহাসিক 'সাক্ষ্য-প্রমাণ' সংগ্রহ ও উপস্থাপনায় তৎপর হয়ে ওঠে; পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ নিজেদের বক্তব্য 'প্রমাণ' করতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের আগেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। গান্ধীর 'একক ভারতীয় জাতীয়তার' প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ্‌ 'জানতে' চেয়েছিলেন, 'কোথায় সেই জাতি, যাকে জাতীয়তাচ্যুত করা হচ্ছে? কোথায় সেই কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকার, যার কর্তৃত্বকে অমান্য করা হচ্ছে? ব্রিটিশ শক্তি ভারতকে সংবদ্ধ রেখেছে, ঐ শক্তিই ঐক্যবদ্ধ ভারত ও এককেন্দ্রিক সরকারের ধারণার ধারক ও প্রচারক হয়ে উঠেছে।'[18] এই বক্তব্য ব্রিটিশ আমলাদের মনঃপুত হয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ব্রিটিশ-কল্পিত দুই ভারত

১৯৪০ সালের মে মাসে উইনস্টন চার্চিল মন্ত্রিসভা চেম্বারলিনের মন্ত্রিসভার স্থান গ্রহণ করে। যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে

ভারতীয় জনবল, অর্থবল ও দ্রব্যসামগ্রী একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হতে থাকে। কংগ্রেসের অসহযোগিতায় বিব্রত গভর্নর জেনারেল লিনলিথ্গো জিন্নাহ্কে সিমলায় ভারত ও যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান জানান। জিন্নাহ্ তাঁকে কতগুলি প্রস্তাব দেন এবং ঐগুলির ভিত্তিতেই লিনলিথ্গো ১৯৪০ সালের 'আগস্ট প্রস্তাব' প্রচার করেন। 'যুদ্ধ পরিচালনার সাথে ভারতীয় জনমতকে অধিকতর সংযুক্ত করার' তাড়নায় লিনলিথ্গো তাঁর কার্যনির্বাহী সমিতিতে ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম কয়েকজন সদস্য গ্রহণের ইচ্ছার কথা প্রস্তাবে ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশীয় রাজা ও সমগ্র ভারতীয় জনজীবনের বিভিন্ন স্বার্থের প্রতিনিধিত্বে সক্ষম ব্যক্তিবর্গ নিয়ে যুদ্ধের ব্যাপারে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের কথা বলেন। তিনি জিন্নাহ্কে এরূপ আশ্বাসও দেন যে, আগামী দিনে 'মুসলমান ভারতের সম্মতি পূর্বাহ্নে না সংগ্রহ করে' সরকার কোন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনা করবে না। স্বদেশে ও বিদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের ভূমিকা জিন্নাহ্র মতামতকে মর্যাদা দিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে আগ্রহী করে তোলে। সেক্রেটারি অফ স্টেট এল. এস. আমেরি পর্যন্ত ভারতীয় জনমতের সার্বিক প্রতিফলনে কংগ্রেসের 'ব্যর্থতা' উল্লেখ করে লীগের ভূমিকার অপ্রত্যক্ষ স্বীকৃতি দেন।

কংগ্রেস ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীকে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনার কর্তৃত্ব দেয়। গান্ধীর কণ্ঠে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' রণধ্বনির মধ্য দিয়ে ভারতের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের তীব্রতা মূর্ত হয়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র বসু কারারুদ্ধ হলে বঙ্গদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ফরওয়ার্ড ব্লক বেআইনী ঘোষিত হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে রেলগাড়ী যাত্রাপথে বিপদের সম্মুখীন হতে থাকে, ব্রিটিশ সৈন্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্রাণ হারাতে থাকে এবং সরকারী অফিসে, বাজারে ও প্রেক্ষাগৃহে বোমা বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে।[19]

ক্রিপ্স মিশন পরিকল্পনা

চীনকে কার্যত গ্রাস করে 'জাপানী সেনাবাহিনী' ভারতের পূর্ব সীমান্তে উপস্থিত হলে চার্চিলের মত সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীও ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার মোকাবিলায় আর কালবিলম্ব না করে তাঁর সম্মিলিত

মন্ত্রিসভার শ্রমিক দলের সদস্য স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি কংগ্রেস ও লীগের কাছে যে প্রস্তাব পেশ করেন তার মর্ম ছিল এই, যুদ্ধ শেষ হলে ভারত 'ডোমিনিয়ন' রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে; ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে যদি কোন প্রদেশ বিযুক্ত হতে চায় তবে ঐ অধিকার ঐ প্রদেশকে ভোগ করতে দেওয়া হবে। গান্ধী ক্রিপ্‌সকে প্রশ্ন করেন, 'আপনার যদি এটুকুই দেবার থাকে তবে আপনি এলেন কেন? আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রথম উড়োজাহাজ ধরবার জন্য আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি।' মুসলিম লীগ ক্রিপ্‌স প্রস্তাব গ্রহণে প্রাথমিক উৎসাহ প্রদর্শন করেছিল, কেননা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি নিজেদের অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে ভারতীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের অধিকার কার্যত প্রয়োগ করতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের মত লীগ-ও ঐ প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করে।

ওয়াভেল পরিকল্পনা

১৯৪৫ সালের ১৪ই জুন গভর্নর জেনারেল ওয়াভেল তাঁর কার্যনির্বাহী সমিতিতে 'প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির সুষম প্রতিনিধিত্ব' নীতি প্রবর্তনের ঘোষণা করেন; মুসলমান ও বর্ণহিন্দুদের প্রতিনিধিত্বের হার সমান হবে বলে ওয়াভেল প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়। সাম্প্রদায়িক নীতিভিত্তিক আসন বণ্টন কংগ্রেস ও লীগকে যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক সংগঠনের অমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবে ভেবে কংগ্রেস ঐ প্রস্তাব বাতিল করে। বর্ণহিন্দু ও হিন্দু দুটি প্রকোষ্ঠে হিন্দু জনসাধারণকে বিভক্ত করে কংগ্রেসের কর্তৃত্বকে দুর্বল করার অভিসন্ধি ঐ প্রস্তাবে নিহিত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে ওয়াভেল সিমলায় সম্মেলন আহ্বান করলে জিন্নাহ্ সম্মেলনে যোগদানকারী সকল মুসলমানদের মনোনয়নে লীগের কর্তৃত্ব দাবি করেন। কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদকে তিনি 'শো কেস্' বা প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহৃত মুসলমান আখ্যা দিয়ে তাঁর সাথে বৈঠকে বসতে অস্বীকার করেন।

সিমলা বৈঠকের দু'সপ্তাহ বাদে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল বিজয়ী হলে রক্ষণশীল চার্চিল মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। নবনির্বাচিত শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাট্‌লী পরিচালিত ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা যুদ্ধোত্তর কালে

ভারতকে ব্রিটিশ শাসনাধীন রাখা অসম্ভব বিবেচনা করে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্কল্প ঘোষণা করে। স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব অনুযায়ী গণপরিষদ গঠনের জন্য ১৯৪৫-'৪৬ সালের শীতকালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই নির্বাচন ভারতীয় জনগণের দ্বিধাবিভক্ত, মেরুপ্রান্তিক সম্প্রদায়গত অবস্থানকে প্রকট করে তোলে। ভারতীয় মুসলমান সমাজের উপর মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা

১৯৪৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের রাজকীয় নৌবাহিনী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরের দিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাট্‌লী ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স ও মিঃ এ. ভি. আলেকজাণ্ডারকে নিয়ে গঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি দৌত্য দল গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

ক্যাবিনেট মিশনে নামে পরিচিত এই দৌত্য দল বহু আলাপ-আলোচনার পর নিজস্ব পরিকল্পনার রূপরেখাটি প্রকাশ করে: ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে ভারত ইউনিয়ন গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে একটি শাসনবিভাগ ও একটি আইনবিভাগ থাকবে। মৌল যে-কোন সাম্প্রদায়িক বিষয় সম্পর্কে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতার অনুমোদন ছাড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালনের জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্বভার ন্যস্ত হবে। অন্যান্য সব বিষয় ও অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর বর্তাবে।

প্রদেশগুলি A, B, C তিনটি বিভাগে যূথবদ্ধ হবার স্বাধীনতা ভোগ করবে। B বিভাগে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থান, C বিভাগে বঙ্গদেশ ও আসাম এবং A বিভাগে অন্যান্য সকল অঞ্চল স্থান লাভ করে।

সদ্য নির্বাচিত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি মোটামুটিভাবে দশ লক্ষ মানুষের ভিত্তিতে 'সাধারণ', মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতিতে গণপরিষদ গঠনে প্রতিনিধি প্রেরণ করবে।

গণপরিষদ সংবিধান রচনা করার কাজ সমাপ্ত না করা পর্যন্ত 'ভারতীয় জনগণের পূর্ণ আস্থাভাজন' একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব পালন করবে।

সংবিধান চালু হলে যে-কোন প্রদেশ প্রয়োজন মনে করলে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিধানগুলি পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে 'নিহিত' আছে বলে মুসলিম লীগ ঐ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং সংবিধান রচনার কাজে এই আশায় অংশগ্রহণ করতে চায় যে, 'সম্পূর্ণ সার্বভৌম পাকিস্তান' রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত গঠিত হবে। ১৯৪৬ সালের ৬ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অনুমোদন করে। কমিটি অবশ্য 'সীমিত হলেও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের' পক্ষে মত প্রকাশ করে।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের ব্যাখ্যা, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা, ভাবী ভারতের সংবিধান রচনা সংক্রান্ত প্রশ্নে মতভেদ, মুসলিম লীগ কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের মর্মান্তিক পরিণতি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার বিস্তার ভারত বিভাগের সম্ভাবনাকে অনিবার্য করে তুলতে থাকে।

ঔপনিবেশিক শোষণকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত শক্তি সঞ্চয় করেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অন্তিম পর্যায়ে সুস্থ, সাবলীল গতি হারিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আবর্জনা গতিমুখে জমাট বেঁধে স্রোতধারাকে বিপথগামী করে তোলে। ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের অন্তিম দিনগুলিতে কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ অতীতের অভিজ্ঞতা ও সমকালীন পরিস্থিতির বিপুল চাপে পর্যুদস্ত হয়ে, বা ক্লান্ত বোধ করে নিরুত্তাপ সম্মতিতে ভারত বিভাজন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। হিন্দু, মুসলমান ধনিকশ্রেণী ঔপনিবেশিক ধনিকশ্রেণীর অধস্তনতা থেকে মুক্তির আশু সম্ভাবনা ও পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভের সুযোগ লক্ষ্য করে লীগ ও কংগ্রেসের নেতৃত্বের উপর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করে।

ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি যেরূপ সামাজিক-রাজনৈতিক জন-জীবন গড়ে তুলেছিল তারই অসমতল ও অবিন্যস্ত রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে লীগ ও

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যান্ত্রিক পুতুলের মত আচরণে বাধ্য হয়ে ভারত বিভাগের পক্ষে সায় দেন। নেহরুর মত ব্যক্তিও অপ্রকাশ্য বক্তব্যে বলেছিলেন, 'মাথা কাটা গেলেও মাথাধরার হাত থেকে আমরা পরিত্রাণ পাব।'[২০]

একমাত্র গান্ধী ভারত বিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণে অসম্মত ছিলেন। সখেদে তিনি বলেছিলেন, 'বিদেশী শাসনের সাথেই পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল; উত্তরাধিকারী হিসাবে আমরা অতীতের ভুল সংশোধনের জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিনি।' হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে বিশ্বাসী গান্ধী নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত নরনারীর লাঘব মোচনে শান্তি ও প্রেমের দূত হিসাবে ভাবী ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তানে সফররত থাকেন। 'আমার কাছে নোয়াখালির মুসলমান ও বিহারের হিন্দুদের অপরাধ একই পরিমাণের এবং সমান পরিমাণে নিন্দার্হ।'[২১] এই প্রত্যয় গান্ধীর বিশ্বাসে ধ্রুবতারার মত আমৃত্যু অনির্বাণ হয়ে থাকে।

আর, মেহনতী হিন্দু-মুসলমান অনুন্নত, বিভেদ-জর্জর আর্থ-সামাজিক পরিবেশে প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় সমৃদ্ধ, সংবদ্ধ জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে নেতৃত্ব দান করতে বিফল হয়ে ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে নায়কের ভূমিকা লাভ না করে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করতে বাধ্য হয়।

সাম্প্রদায়িকতা: মুখোশ মাত্র, পশ্চাতে ক্রিয়াশীল স্বার্থসংঘাত

সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশ ধারণ করে ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির কায়েমী স্বার্থমহলগুলি স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যাপৃত থেকে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সামনে দুস্তর বাধাবিঘ্নের সমাবেশ ঘটিয়েছিল। চাকুরি, নির্বাচিত পদ, আসন ইত্যাদি লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভারতীয়দের শক্তিশালী অংশসমূহ সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরে নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম করে সুবিধালাভের আশায় প্রহর গুণেছিল।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নের সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়ের কোন সংযোগ নেই। সুযোগ-সুবিধা আদায়, শতকরা হিসাবে লাভ-লোকসান, আসন প্রাপ্তি এবং আনুকূল্যলাভ ঐ প্রশ্নটির সাথে যুক্ত ছিল। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটি সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারী পেশাগত শ্রেণীগুলির অংশসমূহের সংগ্রামের প্রতিরূপ মাত্র। মুসলমান ও অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাদের নিজেদের কাছে সরকারী

চাকুরি, মর্যাদা ও প্রভাব অর্জনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শ্রেণীগুলির তুলনায় দুর্বল অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈষম্যমূলক এরূপ পরিস্থিতি থেকে দ্রুত মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব ঘটে। আবার, স্থিতাবস্থা বজায় রেখে স্বার্থসংরক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কায়েমী স্বার্থমহল-গুলিও এরূপ মনোভাব বিস্তারে সহায়ক হয়।

শুধুমাত্র চাকুরি আর বেতন-ভাতা ইত্যাদি ঘিরে সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি হয়েছিল এমন নয়। সামাজিক, আর্থনীতিক আরও নানা কারণে উদ্ভূত অন্যান্য বহু ধরনের সংগ্রামও ঐ ঘূর্ণিবাত্যায় গতিবেগ সঞ্চার করে। বঙ্গ-দেশে ঐতিহাসিক নানা কারণে ভূমিব্যবস্থা এরূপভাবে সংগঠিত ছিল যে, কৃষকেরা প্রধানত মুসলমান ও নিম্নবর্ণসম্ভূত হিন্দু এবং জমিদারদের অধিকাংশ হিন্দু ছিলেন। আবার, হিন্দু জমিদারদের অধিকাংশ উচ্চবর্ণসম্ভূত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে এই চিত্রটি স্পষ্ট দৃশ্যমান ছিল। অমলেন্দু দে তাঁর 'রুট্‌স্ অফ সেপারিটিজম ইন নাইনটিন্থ সেনচুরি বেঙ্গল' বইতে মন্তব্য করেছেন যে, 'পূর্ববঙ্গ এই কারণে স্বাতন্ত্র্য জন্মানোর পক্ষে উর্বর জমি হয়ে উঠেছিল।'

কে. বি. কৃষ্ণ সাম্প্রদায়িকতার সমস্যাটির সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের সম্পর্কটিকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করেছেন। 'দি প্রবলেম অফ মাইনরিটিস্' গ্রন্থে তিনি নিম্নোক্ত তিন ধরনের সংগ্রামের সাথে সাম্প্রদায়িকতার সংযোগ-টিকে বিধৃত করেছেন[২২]:

১. বিভিন্ন পেশায় নিযুক্তির দাবিতে মুসলমান, শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং 'অস্পৃশ্য' সম্প্রদায়ের সদস্যরা হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার উদ্ভব ঘটলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা ক্রমবর্ধমান হতে থাকে।

২. বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতীয়রা ব্যবসা, বাণিজ্য, দোকানদারি ইত্যাদিতে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়ে অনেক ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থমহলগুলির প্ররোচনায় সাম্প্র-দায়িকতার পথে পদক্ষেপ করেছিল। হিন্দু মহাজন ও মুসলমান ঋণগ্রহীতা, হিন্দু জমিদার ও মুসলমান চাষী, হিন্দু ও মুসলমান জমিদার, হিন্দু ও মুসলমান মহাজন আর্থনীতিক সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে

নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কুমীরকে ডেকে এনেছিল।

৩. অনগ্রসরতা, নিরক্ষরতা, অবিবেচক উন্মাদনা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্ররোচনা এবং সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল অংশগুলি রাজনৈতিক-আর্থনীতিক সংগ্রামে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে।

সামন্তযুগীয় নানা ধরনের সম্পর্কের সাথে হাত ধরাধরি করে অগ্রসরমান ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্র এবং ভারতীয় শ্রেণী, সম্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে **ঔপনিবেশিক শাসনের ভারসাম্য রক্ষার সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশল** ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতিতে নানা ধরনের বিরোধপূর্ণ সংগ্রাম ও সাম্প্রদায়িকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল।

অসাম্প্রদায়িক মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠন

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে হিন্দু-মুসলমান দেশপ্রেমিক ঐক্যের অভাব ঘটেনি কোনদিন। এমন কি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবিতে সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, তখনও ঔপনিবেশিক অপকৌশলের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলিত কর্মপ্রয়াসের উদাহরণ বিরল হয়ে যায়নি; পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের দাবিদার নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের মধ্যে যৌথ কর্মোদ্যোগ গ্রহণের বহু ঘটনা বর্তমান। ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে অনৈক্য সৃষ্টিকারী হিন্দু-বিরোধী প্রবণতায় ক্লিষ্ট মুসলমান জাতীয়তাবাদ ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির বিচিত্র রূপ; সাম্রাজ্যবাদী 'বিভক্ত করো, আর শাসন করো' স্বার্থান্বেষী নীতির ফলশ্রুতিতে প্রধানত ঐ রূপ বিশাল আকার ধারণ করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মুসলমান রাজনৈতিক সংগঠন সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে থেকে সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ক্রিয়াশীল ছিল। মুসলমানদের সুস্থ রাজনৈতিক চেতনার বিকাশে এসকল সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত আব্দুল গফ্ফর খানের 'খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার' উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে মূর্ত করে তোলে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে কৃষক সমাজের একাংশের মধ্যে এই সংগঠন জমির খাজনা প্রদান বন্ধ করার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। গান্ধীর

আদর্শ ও রীতিপদ্ধতিতে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অনলস সংগ্রাম খুদাই খিদ্‌মদ্‌গার আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছিল।

মুসলমান তাঁতীদের নিয়ে গঠিত 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স' রাজনৈতিক দিক থেকে কংগ্রেসের কাছাকাছি বিরাজ করত; লীগ-বিরোধী ও পাকিস্তান ধারণার সমালোচক এই সংগঠনটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের চৌহদ্দির মধ্যে মুসলমান সমাজের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনে রত ছিল। 'আহ্‌রার' দলটি পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় ১৯৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩০-'৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে এবং ১৯৪০-এ কংগ্রেস-পরিচালিত সত্যাগ্রহে এই দলের সদস্যরা যোগদান করেন। এক দশকের কিছু বেশী সময়কাল পর্যন্ত এই দল পাঞ্জাবের কৃষকসমাজের উপর রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল।

আহ্‌রার দলের মত ভারতীয় মুসলমানদের অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠন— 'খাক্‌সার দল'— ১৯৩১ সালে আল্লামা মাসরিকি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল সদস্যদের ধর্মনিষ্ঠ ও সমাজসেবার কাজে উৎসর্গীকৃত জীবন-যাপনের নির্দেশ দিয়েছিল। ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করে সমকালীন মুসলমান জীবন থেকে অনাচার, ব্যভিচার দূর করার উদ্দেশ্যে এই দল জঙ্গী কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল। প্রাচীন ইসলামের ধর্মাদর্শকে এই দল আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করেছিল। এই দল সামরিক বাহিনীসুলভ নিয়মশৃঙ্খলা প্রবর্তন করেছিল। দলের নেতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন সদস্যদের পক্ষে আবশ্যিক ছিল। এই দল বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নবিভোর ছিল; মাসরিকি বলেছিলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুনর্বার সম্রাট, শাসক, বিশ্ববিজয়ী ও দুনিয়ার সার্বভৌম প্রভু হওয়া।' এই ধরনের উক্তি, বলা বাহুল্য, ফ্যাসিবাদী প্রবণতার দ্যোতক। শুধুমাত্র পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ ও সিন্ধুতে খাক্‌সার আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল এমন নয়, দক্ষিণ ভারতের মুসলমান সমাজেও এই আন্দোলনের প্রভাব কিছুটা ক্রিয়াশীল ছিল।

আহ্‌রার দলের উদ্দেশ্য ছিল 'হুকুমৎ-ই-ইলাহিয়া' (ভগবানের সরকার) ও খাক্‌সার দলের লক্ষ্য ছিল 'ইসতিখ্‌লাফ ফি আল্‌-আরড্‌' (পৃথিবীতে 'খিলাফৎ' অর্থাৎ ইসলামী সরকার) প্রতিষ্ঠা করা। উভয় দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে মুসলমান হৃদয়ে বিরাজমান অতীত রাজনৈতিক প্রভুত্বের মধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের মনোভাবটি অত্যন্ত স্পষ্ট। মুসলিম লীগ

যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি তোলে তখন এই মনোভাবটি মুসলিম জনগণের বৃহদাংশকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের উন্মাদনায় চঞ্চল করে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠে। আহ্‌রার বা খাক্‌সার দল হিন্দুবিরোধী না হলেও ইসলামী ক্ষমতার প্রতি তাদের অপার আকর্ষণ একদিক থেকে মুসলিম লীগের রণধ্বনির মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল বলা যায়।

বেলুচিস্তানে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল— 'ওয়াতন দল।' দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে এই দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুগামী ছিল। মুসলমান সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা 'সারা ভারত সিয়া রাজনৈতিক সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সম্মেলন সাধারণভাবে কংগ্রেসের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকাণ্ডের সমর্থক ছিল।

বঙ্গদেশে ফজলুল হক-পরিচালিত 'কৃষক প্রজা দল' মুসলমানদের মধ্যে শক্ত ও ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করেছিল। নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক পথে দরিদ্র, ঋণ জর্জরিত চাষীদের কিছুটা সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে কৃষক প্রজা দল সহায়তা করেছিল। হক সাহেবের মন্ত্রীপ্রধানত্বের সময়ে আইনসভায় এমন কতগুলি আইন পাশ হয় যা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে চাষীদের উপকার সাধন করে। যেহেতু বঙ্গদেশে হিন্দু চাষীর তুলনায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল, মুসলমান চাষীরা স্বভাবতই কৃষক প্রজা দলকে কিছুটা গণভিত্তি লাভ করতে সহায়তা করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই গণভিত্তি মুসলিম লীগের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় দলের মর্যাদা, জঙ্গীপনা, হিন্দু প্রাধান্যের বিরোধিতাকে সম্বল করে ও মুসলমান চাষীর দারিদ্র্য, অশিক্ষা কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগ বঙ্গদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। জনদরদী জননেতা ফজলুল হক জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সাম্প্রদায়িকতার ঝাণ্ডা নিয়ে মুসলিম লীগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কতিপয় জাতীয়তাবাদী মুসলমান সদস্য ও 'জামায়েৎ-আল্-উলেমা', আহ্‌রার দল ও অন্যান্য ছোটখাট জাতীয়তাবাদী মুসলমান সংগঠনের সদস্যদের প্রয়াসে ১৯৪০ সালে আল্লা বক্সের সভাপতিত্বে 'আজাদ মুসলিম সম্মেলন' স্থাপিত হয়। মুসলিম লীগের পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করে এই সম্মেলন কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবি সমর্থন করে এবং ঘোষণা করে যে, ভারতীয় জাতীয় স্বাধীনতার

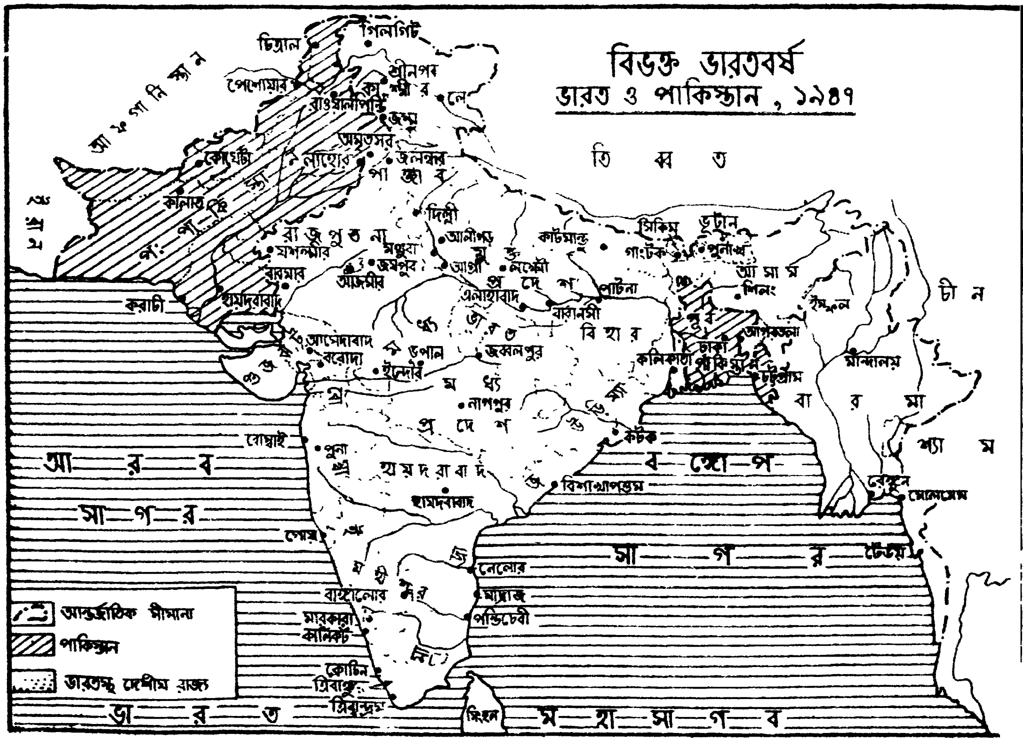
পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে কোন প্রদেশ প্রয়োজনীয় বোধ করলে বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের দাবি তুলতে পারবে।[৪৩]

প্রাক্-স্বাধীনতার বৎসরগুলি ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, দল বা ব্যক্তিবর্গ ভারতের অঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন দাবি করেছিল এমন নয়। এমন কি ভারত-বিভাগ যখন প্রায় নিশ্চিত তখনও বহু মুসলমান প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন।

পাকিস্তান : শব্দগত ও ধারণাগত ইতিহাস

জিন্নাহ্ ভারতবিভাগের ধারণাটি সর্বপ্রথম জন ব্রাইটের ১৮৭৭ সালের বক্তব্যে প্রকাশিত হয় বলে বিভার্লি নিকল্‌সকে বলেছিলেন। ১৮৮৩ সালে ডব্লিউ. এস. ব্লান্ট্ উত্তর ভারতে মুসলমান শাসিত ও দক্ষিণ ভারতে হিন্দু শাসিত দু'টি রাষ্ট্রের উপযোগিতার তত্ত্ব কোলকাতায় প্রকাশ করেন। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯২৮ সালের মতিলাল নেহ্রু রিপোর্টে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিতে প্রাধান্য স্থাপনের বাসনার প্রতি অল্পবিস্তর স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৪ সালে মুসলিম লীগের বোম্বে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ থেকে সাহারানপুর পর্যন্ত মুসলমান প্রাধান্যের দাবি উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ভৌগোলিক দিক থেকে সংবদ্ধ, এবং প্রায় দু'দশকের মধ্যে অর্জিত, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধারণাটির জনক হিসাবে কৃতিত্ব ইকবালের প্রাপ্য বলে বহু গবেষক ও রাজনৈতিক প্রচারক মত প্রকাশ করেছেন। জিন্নাহ্ও বলেছেন, 'হজরৎ আল্‌মা ইকবালের মস্তিষ্কে যে পাকিস্তানের ধারণাটি জন্মলাভ করেছিল তা অনেকেরই জানা আছে। নিজের জনগণের শ্রেষ্ঠতম অভীপ্সার তিনি ছিলেন মুখপাত্র।'[৪৪]

১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে ইকবাল বলেন, 'পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান সংযুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে আমি দেখতে অভিলাষী। স্বায়ত্ত-শাসন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে থেকেই হোক বা বহির্ভূত থেকেই হোক, মুসলমানদের পক্ষে, অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের জন্য...


বিভক্ত ভারতবর্ষ
ভারত ও পাকিস্তান, ১৯৪৭
তিব্বত
আফগানিস্তান
গিলগিট
চিত্রাল
শ্রীনগর
কাশ্মীর
লে
পেশোয়ার
রাওয়ালপিণ্ডি
জম্মু
অমৃতসর
লাহোর
জলন্ধর
পাঞ্জাব
কোয়েটা
দিল্লী
রাজপুতনা
আলীগড়
মথুরা
জয়পুর
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
কাটমাণ্ডু
সিকিম
ভুটান
গাংটক
পুনাখা
আসাম
শিলং
আজমীর
পাটনা
করাচী
এলাহাবাদ
বারাণসী
বিহার
আমেদাবাদ
ভূপাল
জব্বলপুর
আগরতলা
ঢাকা
কলিকাতা
পাকিস্তান
চট্টগ্রাম
মান্দালয়
বরোদা
ইন্দোর
মধ্য প্রদেশ
নাগপুর
বারমা
চীন
কটক
শ্যাম
বোম্বাই
পুনা
আরব
হায়দরাবাদ
বঙ্গোপ
বিশাখাপত্তম
রেঙ্গুন
মোলমেন
সাগর
গোয়া
সাগর
টেভয়
নেলোর
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
আন্তর্জাতিক সীমানা
পাকিস্তান
ভারতস্থ দেশীয় রাজ্য
কালিকট
কোচিন
ত্রিবান্দ্রম
ভারত
সিংহল
মহাসাগর

একটি সংবদ্ধ উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের পত্তন আমার কাছে চূড়ান্ত বিধিলিপি বলে মনে হয়।'[25]

ইকবালের উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিস্তারের মধ্যে বঙ্গদেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ঐ রাষ্ট্রের মধ্যে থেকে তিনি আম্বালা বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী ছিলেন না। কেননা ঐ বিভাগে অ-মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা বর্তমান ছিল। তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমান 'রাষ্ট্রটিকে' ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য হিসাবে গণ্য করেতেও গররাজী ছিলেন না, যদি অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলিকে স্বয়ংশাসিত রাজ্যগুলির উপর ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করা যায়। তিনি হিন্দু বা হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না, তিনি বলেছিলেন, '...অন্যান্য সম্প্রদায়ের রীতিনীতি, আইন, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে।' কিন্তু নিজস্ব ধর্মীয় গোষ্ঠীর সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবন ও সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্মসংক্রান্ত মতামতের উপর তাঁর গভীর ভালবাসা বর্তমান ছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মতামত উদারনৈতিকতা ও সুপরিবর্তনীয়তার স্পর্শে বিধৃত হয়েছিল। আরবী সাম্রাজ্যবাদের লৌহকঠিন, অসহিষ্ণু ধর্মাদর্শের পরিবর্তে তিনি মোগল যুগের উদারনৈতিক ও সহিষ্ণু ভারতীয় ইসলামের ধর্মাদর্শ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।[26]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তি ইকবালের রচনা হলেও ঐ রাষ্ট্রের দাবিকে রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতায় ও হিন্দু বিরোধিতায় আয়ুধের রূপ দেন জিন্নাহ্। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য হিন্দুশাহী প্রতিষ্ঠিত হবে, জাতি হিসাবে মুসলমানেরা লাঞ্ছিত হবে। হিন্দু ও মুসলমানেরা কোনদিন ভারতে একক জাতীয়তা সৃষ্টি করতে পারবে না। তাঁরা দুই ভিন্ন সভ্যতার শরিক; তাঁদের ধর্মদর্শন, সামাজিক প্রথা, সাহিত্য, মহাকাব্য, জীবনযাত্রার প্রণালী, ইতিহাস, ঐতিহাসিক নায়ক সব কিছুই ভিন্ন। 'মুসলমানেরা যে-কোন সংজ্ঞানুসারে একটি জাতি; অতএব তাঁদের বাসভূমির জন্য নিজেদের ভূখণ্ড ও রাষ্ট্র প্রয়োজন।'[27]

১৯৩৯ সালের ২৬শে মার্চ মুসলিম লীগের কার্যকরী সমিতি মুসলমানদের জন্য একটি সাংবিধানিক কাঠামো রচনার জন্য উপসমিতি গঠন করে। ঐ উপসমিতি বহু খসড়া প্রস্তাব বিচার-বিবেচনা করে। ইকবাল, চৌধুরী রহমৎ

আলী, ডঃ সৈয়দ আব্দুল লতিফ, অধ্যাপক সৈয়দ জাফরুল হাসান, আলীগড় মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মহম্মদ আফজল হোসেন কাদ্রি, মাম্‌দোতোর স্যর মোহাম্মদ শাহ্‌ নওয়াজ খান, স্যর আবদুল্লা হারুন এবং স্যর সিকান্দার হায়াৎ খানের প্রস্তাব বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের লাহোর প্রস্তাব পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে। কিন্তু ঐ প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি অনুপস্থিত ছিল। ১৯৪৩ সালে দিল্লীতে মুসলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জিন্নাহ্‌ শব্দটি ব্যবহার করেন। অবশ্য ১৯২৯-'৩০ সালে লণ্ডনে 'কয়েকজন তরুণ ব্যক্তি' শব্দটি প্রথম চয়ন করেছিলেন। জিন্নাহ্‌ পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করার পর মুসলিম লীগের বিরোধীরা প্রচার করতে থাকেন যে, জিন্নাহ্‌ 'পাক্‌' অর্থাৎ ভারতের পূর্বে ও উত্তর-পশ্চিমে পবিত্র ভূখণ্ড প্রতিষ্ঠার পর অন্যান্য মুসলমান-শাসিত দেশের সাথে মৈত্রী রচনা করে 'না-পাক্‌' অর্থাৎ অপবিত্র হিন্দু ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন। জিন্নাহ্‌ বলেছিলেন, 'আপনারা খুব ভাল করেই জানেন পাকিস্তান শব্দটির পিতৃত্ব আমাদের উপর হিন্দু ও ব্রিটিশ পত্রপত্রিকার একাংশ চাপিয়ে দিয়েছে। ...এখন আমি আমার হিন্দু ও ব্রিটিশ বন্ধুদের বলি : আমাদের একটা শব্দ যোগাড় করে দিয়েছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।'[২৪]

চৌধুরী রহমৎ আলী ও তাঁর তিনজন কেমব্রিজ বন্ধুর স্বাক্ষরিত চার পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকায় ('নাউ অর্ নেভার') পাকিস্তান শব্দটি প্রথম লিখিত স্বরূপে প্রকাশ পায়। তিনি অবশ্য আল্লার অসীম কৃপায় শব্দটি লাভ করেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। শব্দটি যুগপৎভাবে পারসী ও উর্দু। মুসলমানদের এশীয় তথা ভারতীয় পবিত্র স্থানগুলির নির্বাচিত বর্ণগুলির সমন্বয়ে শব্দটি গঠিত হয়েছে বলে চৌধুরী ঘোষণা করেন :

পাঞ্জাবের	P
আফগানিয়ার (উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ)	A
কাশ্মীরের	K
ইরানের	I
সিন্ধুর	S
তুখারিস্থানের	T
আফগানিস্থানের	A
বেলুচিস্তানের	N.

জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগ : দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা ও হাতিয়ার

মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ মুসলমান স্বাতন্ত্র্যের দাবিকে রাজনৈতিক আদর্শ ও পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে সর্বাগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অথচ তাঁর প্রথম যৌবনের ক্রিয়াকর্মের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজের ভাবী 'কায়দে আজম'-এর কোনরূপ স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় না।

১৯০৬ সালে তিনি দাদাভাই নওরোজীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে জিন্নাহ্ তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছিলেন, মুসলিম লীগের সদস্য হিসাবে নয়। তিনি গোখেলের ব্যক্তিত্বের অনুরাগী ছিলেন বলে অনেকে তাঁকে 'মুসলমান গোখেল' বলতেন। তিনি গোখেলের সাথে ইউরোপ গমন করেছিলেন। সেক্রেটারি অফ স্টেট লর্ড ক্রিউর কাছে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে বর্ধিত ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাতে তিনি কংগ্রেস প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে লণ্ডন গিয়েছিলেন।

দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতীয় সমাজের নানা ধরনের বিভেদ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের নানা কৌশল ও অপকৌশল জিন্নাহ্‌র মত উদারনৈতিক, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ী স্বরূপের অনুরাগী এবং ইংরাজ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতীয় নেতাকে তথাকথিত মুসলমান জাতির শক্তিশালী প্রবক্তা ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। হেগেলীয় বাক্‌বিন্যাস রীতি অনুসরণ করে বলা যায় যে, ভারতীয় ইতিহাসের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক শক্তিগুলি মুসলমান জাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের অট্টালিকা প্রায় তৈরী করে এনেছিল, ঐতিহাসিক পুরুষ জিন্নাহ্ শুধুমাত্র শেষ প্রস্তরখণ্ডটি স্থাপন করলে ঐ অট্টালিকা সম্পূর্ণতা লাভ করে। মাইকেল ব্রেসার অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, জিন্নাহ্ যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে মারা যেতেন তাহলে পাকিস্তান রাষ্ট্র জন্মলাভ করত না। ভারতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের বিচার না করে ব্রেসার জিন্নাহ্‌র ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত গুরুত্বে ভারাক্রান্ত করেছেন।

১৯১৩ সালের শরৎকালে জিন্নাহ্ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুযায়ী কংগ্রেস-লীগ সমঝোতায় তিনি তিলকের মত সহযোগী রূপকারের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তখন পর্যন্ত তিনি লীগের গোঁড়াপন্থী নবাব ভিকার-উল-মুল্‌কের সহযোগীদের দলে ছিলেন না।

আবার প্রগতিশীল বলে কথিত গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তও তিনি ছিলেন না। গ্ল্যাড্‌স্টোন-ডিসরেলীর রচনাবলী পাঠ করে তিনি রাজনীতি-কূটনীতির বন্ধুর পথে পদযাত্রায় উৎসাহিত হন। দীর্ঘকাল তিনি ঐ পথে পদচারণায় রত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসকের অনিচ্ছুক হাত থেকে রাজনৈতিক সংস্কার ছিনিয়ে আনতে তিনি তৎপর ছিলেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে ১৯৩৭ সালের প্রথম দিকে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনের সময় পর্যন্তও জিন্নাহ্ মুসলমানদের দাবিদাওয়া সংযত, নরম ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন: 'আমাদের আন্দোলন বৈরী ভাবাপন্ন নয়। ভগ্নীপ্রতিম প্রতিটি সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের আন্দোলন সৌহার্দ্যের নবীন শাখা সম্প্রসারিত করে।'[29] অবশ্য প্রয়োজন বিবেচনা করলে গরম ভাষায় বক্তৃতা করতেও তিন কসুর করেননি।

১৯৩৭-এর মাঝামাঝি সময় থেকে জিন্নাহ্ শক্তি বা ক্ষমতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ব্যবহারিক রাজনীতি পরিচালনাতে উৎসাহ বোধ করতে থাকেন। মুসলমান জনতার সঙ্গে এই সময় থেকে তাঁর সংযোগ শুরু হয়। তার আগে গান্ধী বা জওহরলালের তুলনায় মুসলমান জনগণের কাছে জিন্নাহ্ কম জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু ঐ সময় থেকে জনপ্রিয়তার পাল্লা জিন্নাহ্‌র দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। অথচ নানা দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, সারা ভারতে মুসলমান সমাজের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হবার পক্ষে জিন্নাহ্‌র অনেক অসুবিধা ছিল। বিদ্রূপাত্মকভাবে জওহরলাল লিখেছেন: 'স্যাভিল রো, বণ্ড স্ট্রীট এবং মাটির কুঁড়েঘর ঘেরা ভারতীয় গ্রামের যে পার্থক্য' জিন্নাহ্‌র সাথে 'ভারতীয় জনগণের মধ্যে ততটা দূরত্ব বর্তমান।'[৪০] মুসলিম লীগ কাউন্সিলের জনৈক পদচ্যুত সদস্য মন্তব্য করেছিলেন যে, 'জাতীয় বা ধর্মীয় সঙ্কট যতই বৃহদাকার হোক না কেন (জিন্নাহ্‌কে) তা চঞ্চল করে না। জালিয়ানওয়ালাবাগ তাঁকে প্রভাবিত করে না। খিলাফতের মহাসংঘর্ষে ইসলামীয় ভ্রাতৃত্বের ভগ্নাবস্থা তাঁকে চঞ্চল করে না।'[৪১] জিন্নাহ্‌র নিজের উক্তিও আছে যে, তিনি জনতার উত্তেজনা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি উর্দু জানতেন না, উত্তর ভারতের মুসলমান জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা তাঁর পক্ষে দুরূহ ছিল। তিনি গোঁড়াপন্থী মুসলমান হিসাবে বিবাহ না করে জনৈকা পার্শী মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানদের

মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, সুন্নী মুসলমান ছিলেন। এরূপ একজন ব্যক্তি কিরূপে মুসলমান জনতার কাছে কায়দে আজম হিসাবে পরিগণিত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের সংগ্রামে প্রধান নেতার ভূমিকা পালন করলেন তা ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর কূটনৈতিক কার্যক্রম, মুসলমান সমাজের সমকালীন অবস্থা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক মহলগুলির কর্মকাণ্ড, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভুলত্রুটি, এবং সর্বোপরি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মেহনতী মানুষের দুর্বল অবস্থা ও ধনিকশ্রেণীর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে তাঁকে নেতৃত্বের দাবিদার করে তুলতে বেশ কিছুটা সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

জিন্নাহ্ মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী ও অংশকে সংঘবদ্ধ করে একটি প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত স্তম্ভের আকৃতিতে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজনীতিকে তিনি শুধু আদর্শগত বিষয় হিসাবে গণ্য না করে ক্ষমতা অর্জনের পদ্ধতি হিসাবেও গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৭ সালের মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন, ন্যায়বিচার ও অভিপ্রেত ব্যবহার রাজনীতিক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদনের উপর নির্ভর করে না, করে দাবি আদায়ের শক্তি বা ক্ষমতার উপরে। এজন্য তিনি ধর্মীয় উপগোষ্ঠী, প্রাদেশিক বিভাগ ও আর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে বিভক্ত মুসলমান সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তিধর হতে পরামর্শ দেন। শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন হলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি শয়তানের সঙ্গে বা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও মিতালী রচনা করতে সম্মত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে পাটনা অধিবেশনে মুসলিগ লীগের মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'সাম্রাজ্যবাদকে ভালবাসি বলে আমরা ঐরকম করব এমন নয়, কিন্তু দাবার বোর্ডে খেলোয়াড়কে তার নিজের চাল চাল্‌তে হবেই।'[৩৪]

মুসলিম লীগের নেতৃত্ব বরাবর মুসলমান উচ্চবিত্ত, অভিজাতশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের অধীন ছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানেরা প্রধানত কৃষক ছিলেন; হিন্দুরা প্রধানত শহরবাসী বণিক, দোকানদার, শিক্ষক, উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেরাণী ইত্যাদি পেশাগত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তাছাড়া, জমিদার ও মহাজনেরাও হিন্দু ছিলেন। মহম্মদ ইকবাল জিন্নাহ্‌কে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলায়, রাজনৈতিক কাজকর্ম ঘনীভূত করে সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশগুলিকে ভাবনাচিন্তার বাইরে রাখতে

পরামর্শ দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্ ঐ পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমান সমাজকে একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মুসলমান জমিদার, চাষী, ধনিক, তুলা উৎপাদক, শ্রমিক, বেকার, রাজকর্মচারী সবার স্বার্থকেই তিনি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'লীগ মুসলমানদের কোন স্বার্থেরই বিরোধী নয়।'[৪৪]

দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সাম্প্রদায়িক প্রকৃতিতে বিধৃত হয়েছিল। বিড়লা, ডালমিয়া, মফৎলাল, কির্লোস্কার প্রভৃতি হিন্দু ধনিক, ব্যাঙ্কমালিক ও ব্যবসায়ীদের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পড়ে মুসলমান ধনিক আদমজী ও ইস্পাহানিরা তাঁদের আর্থ-নীতিক স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে উপযুক্ত রাজনৈতিক নেতার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। জিন্নাহ্‌র মত ব্যক্তির মধ্যে তাঁরা নির্ভরযোগ্য নেতা খুঁজে পান। কালক্রমে মুসলমান ধনিকের স্বার্থে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ প্রস্তাব পাশ করে মুসলমান জনগণকে মুসলমানদের উৎপাদিত বা বিক্রীত ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের আবেদন জানায়।

সরকারী কাজকর্মে নিযুক্ত কর্মচারীদের অভিমত ও সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক জনজীবন অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে জিন্নাহ্ উপলব্ধি করেছিলেন। 'প্রশাসনে পরিব্যাপ্ত হিন্দুশাহীর' বিরুদ্ধে তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত মুসলমান যুব সম্প্রদায়কে ইসলামীয় প্রশাসনিক কাজকর্মের অর্থকরী দায়দায়িত্ব গ্রহণের অগ্রিম 'আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬-এর নির্বাচনে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা লীগের পক্ষে ঝটিকা-বাহিনীর মত কাজ করেছিল।

কৃষক প্রজা দলের সাথে আঁতাত গড়ে তুলে তিনি দরিদ্র, নিরন্ন, নিপীড়িত বাঙালী মুসলমান কৃষক সমাজের কাছে লীগকে পরিচিত করিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বাংলার মন্ত্রীপ্রধান তথা কৃষক প্রজা দলের প্রধান নেতা ফজলুল হক ও তাঁর অনুগামীরা কালক্রমে জিন্নাহ্‌র জনপ্রিয়তায় মুসলিম লীগের অনুপন্থী হয়ে পড়তে বাধ্য হন।

জিন্নাহ্ গোঁড়াপন্থী মুসলমান মোল্লা নেতাদের সমর্থনও আদায় করতে সক্ষম হন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, ১৯৩৭-'৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির মুসলমান জনসংযোগ কার্যক্রম, হিন্দু

সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির ক্রিয়াকলাপ, গান্ধীর রামরাজ্য গঠনের আদর্শ, প্রগতিশীল শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসারে সন্ত্রস্ত মোল্লারা আত্মরক্ষার তাগিদে মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হন। জিন্নাহ্ বিলক্ষণ জানতেন গ্রামীণ মুসলমান জনসাধারণের কাছে কোরাণের শিক্ষাভিত্তিক রাষ্ট্র ও 'শরিয়ত'-ভিত্তিক আইন-ব্যবস্থার ধ্বজা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে না পারলে লীগের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তিনি মান্‌কী শরীফের পীর সাহেবের সমর্থনও আদায় করতে সমর্থ হন।

১৯৩৭ সাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতালাভের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম লীগের গণভিত্তি সাম্প্রদায়িক শক্তিসমাবেশে দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। মুসলিম লীগ বিরোধী মুসলমানকে জিন্নাহ্ তখন 'কুইসলিং' বা বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দিতে শুরু করেন। মুসলমান সমাজের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা তিনি লীগের জন্য আদায় করতে সক্রিয় থাকেন। সাম্প্রদায়িকতার বিষজর্জর সমকালীন ভারতের মুসলমানদের কাছে তিনি মনখোলা সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন :

'আপনারা কি পাকিস্তান চান, না, চান না?'

[জনতার 'আল্লা হো আকবর' চীৎকার]

'বেশ, আপনারা যদি পাকিস্তান চান, তবে লীগের প্রার্থীদের ভোট দিন। আমরা যদি আজ আমাদের কর্তব্যের কথা উপলব্ধি না করি, তবে আমরা শূদ্রদের অবস্থায় পতিত হব। এবং ভারতে ইসলাম পরাভূত হবে। আমি মুসলমানদের হিন্দুদের দাস হতে দেব না কখনো। আল্লা হো আকবর।'[34]

উদারনৈতিক রাজনৈতিক নেতা হিসাবে জীবন শুরু করে জীবনসায়াহ্নে জিন্নাহ্ মুসলমান সম্প্রদায়ের কায়দে আজমে পরিণতি লাভ করেছিলেন। ভারতের সামাজিক-আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে এই পরিণতি অস্বাভাবিক মনে হয় না। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্য গ্রহণ করেও অনেকে জিন্নাহ্‌র এই পরিণতি ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন।

হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল 'পাওয়ার অ্যাণ্ড পারসোন্যালিটি' বইতে লিখেছেন, '...ক্ষমতাভিলাষী ব্যক্তি বঞ্চনার জবাবে ক্ষতিপূরণলাভের মাধ্যম হিসাবে ক্ষমতালাভের জন্য সাধনা করেন। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বা যে-পরিবেশে ঐ ব্যক্তিত্ব কর্মরত তাকে পরিবর্তিত করে, ক্ষমতাপ্রাপ্তি ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিজস্ব অনুচ্চ মূল্যায়নের হাত থেকে অব্যাহতি দেবে আশা করা হয়।'[35]

উড্রো উইলসন সম্পর্কে বিশ্লেষণে আলেকজাণ্ডার এল. জর্জ ও জুলিয়েট এল. জর্জ অনুরূপ মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেছেন। এরিক এরিকসন মার্টিন লুথার ও গান্ধীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যাখ্যায় মনস্তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নাথান লীট্‌স্‌ ল্যাসওয়েলের ঢঙে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ ফলপ্রসূ বলে ভেবেছেন।

ল্যাস্‌ওয়েল বহু উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন 'আপেক্ষিকভাবে জীবনের শেষদিকে গুরুতর বঞ্চনার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতার্জনের জন্য ক্রোধোন্মত্ত মনঃসংযোগ' সৃষ্টি হয়ে থাকে। অস্ট্রিয়ার সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের স্ত্রীর অকালমৃত্যু ও জন ব্রাইটের (যাঁর ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাষ্ট্রে খণ্ডিকরণের ১৮৭৭ সালের বক্তব্য জিন্নাহ্‌ উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করতেন) প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু উভয় ব্যক্তিকে ক্ষমতার্জনের দুর্দমনীয় সঙ্কল্প রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত রাখে। স্ত্রীর তরুণ বয়সে মৃত্যু এবং বিবাহিত জীবনের ব্যর্থতা জিন্নাহ্‌কে বঞ্চিত জীবনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ক্ষমতালাভের সাধনা তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে এঞ্জিনের মত ঠেলে একই চক্রপাকে ধাবমান করে তোলে। ত্রিশের দশক থেকে তিনি বিশেষভাবে শক্তি অর্জনের জন্য মুসলমান সমাজকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে সক্রিয় থাকেন। নিজে ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে থাকেন। লীগকে নিজের শক্তিশালী হাতিয়ার করে তুলতে থাকেন। তিনি তাঁর প্রত্যয় ঘোষণা করে বলতে শুরু করেন, 'রাজনৈতিক জ্ঞান ছাড়াই উপলব্ধি করা যায় যে, ক্ষমতা দ্বারা সমর্থিত না হলে সব রক্ষাকবচ ও চুক্তি ছেঁড়া কাগজে পরিণত হয়। রাজনীতির অর্থ ক্ষমতা; শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণতা, শোভনসুন্দর ব্যবহার ও সদিচ্ছার জন্য আবেদনের উপর তা নির্ভরশীল নয়।' মুসলমান শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন করেন, '...ব্রিটিশ সরকার কি আপনাদের কথা ভাবে? না। কেননা আপনারা সংগঠিত শক্তি নন। কাজেই নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করুন এবং সংহতি সৃষ্টি করুন।'[36]

১৯৩৯ সালের শেষাশেষি জিন্নাহ্‌ ভারতে পার্লিয়ামেণ্টারি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে 'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাতে তিনি অভিনব যে বক্তব্য রাখেন তা হল এই: মুসলমানেরা ভারতে সংখ্যালঘু হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। 'উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বঙ্গদেশে এবং করাচী থেকে কোলকাতা

পর্যন্ত বিস্তৃত বারান্দা-পথের সর্বত্রই মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।'[৪৭] অর্থাৎ জিন্নাহ্‌র মতে ভারতে অন্ততঃপক্ষে দুটি জাতির বাস—হিন্দু ও মুসলমান। জীবনে জিন্নাহ্ একটিমাত্র প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তাতে তিনি ভারতের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অচল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। এরূপ সংবিধান মুসলমান জাতির উপর হিন্দু শাসন আরোপ করতে সহায়ক হবে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতে ব্রিটিশ ধাঁচে পার্লিয়ামেণ্টারি গণতন্ত্র প্রচলিত থাকার কারণ হিসাবে তিনি ঐ দুটি দেশে ব্রিটিশ বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতার উল্লেখ করেন। ভারতে ঐ ধরনের গণতন্ত্রের কোন ভবিষ্যৎ নেই। হিন্দু, মুসলমান দুটি জাতির জন্য দু'টি রাষ্ট্র গঠন অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

হিন্দু-মুসলমান সমঝোতার ভিত্তিতে শাসনতান্ত্রিক পথে জাতীয় মুক্তির যোদ্ধা ১৯২৯ সালের শেষদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রদায়িক নেতায় পরিণত হন। লীগের অভ্যন্তরে তিনি কায়দে আজম হিসাবে সকলের উপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফজলুল হক, এইচ. এস. সুরাবর্দী, চৌধুরী খালিকুজ্জমান, লিয়াকৎ আলী খান, সিকান্দার বক্‌ত প্রভৃতি সকল লীগ নেতাই জিন্নাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সাম্প্রদায়িকতার সাগরসৈকতে লবণাক্ত জলরাশি ও বালুকাভূমির অনুকূল পরিবেশে জিন্নাহ্‌র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি 'ক্যাক্‌টাস'-এর সঞ্জীবতায় শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ

সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার কাজে ভারতের বিশেষ কোন ধর্মীয় গোষ্ঠী একচেটিয়াভাবে লিপ্ত ছিল এমন নয়। প্রোটেস্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মীয় গোষ্ঠী ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির প্রতিকূল চাপে, স্বার্থরক্ষার তাগিদে বা বঞ্চনার বাহুগ্রাস থেকে মুক্তির সহজ উপায় হিসাবে চিন্তাজগৎ বা কর্মজগতে সাম্প্রদায়িকতার বিষধর সর্পকে কোন-না কোন সময় আশ্রয় দিয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতে **হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উৎস শুধুমাত্র সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে সুক্কায়িত ছিল এমন নয়।** উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মসংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতিক আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

বৈসাদৃশ্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে অনেক সময় বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন করেছে এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবে ইন্ধন যুগিয়েছে। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের তত্ত্বটি নির্ভুল নয়। ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, ভারতীয় সমাজে হিন্দু-মুসলমানদের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনের মান, সাম্রাজ্যবাদের বিভেদমূলক ভূমিকা, হিন্দু ও মুসলমান ধনিকশ্রেণীর মুনাফালাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কংগ্রেস ও লীগের আদর্শ ও নেতৃবৃন্দের চরিত্র, হিন্দু-মুসলমান মেহনতী মানুষের যৌথ আন্দোলনের একান্ত অভাব ইত্যাদি একযোগে ক্রিয়াশীল থেকে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার হাঁপরে ক্রমাগত ফুঁ দিয়ে সুপ্ত অগ্নিকে শিখায় পরিণত করে।

মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক প্রধান মুখপাত্র হিসাবে যেমন মুসলিম লীগ ভূমিকা পালন করেছিল, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল হিন্দু মহাসভা। হিন্দু মহাসভার স্থায়ী সভাপতি ভি. ডি. সাভারকার জঙ্গী মনোভাব নিয়ে হিন্দুদের একটি জাতি এবং ভারতকে 'হিন্দুদের আবাসভূমি' বলে অভিহিত করেন। তাঁর মতে মুসলমানেরা 'অঞ্চলগত দিক থেকে ভারতীয়' এবং ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু তাঁদের সংখ্যালঘিষ্ঠের মর্যাদা নিয়ে বসবাস করতে হবে এবং হিন্দু জাতির সঙ্গে 'অধস্তন সহযোগিতার' সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। হিন্দু মহাসভা ভারতবিভাগের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। সাভারকার লিখেছিলেন, 'ভারতমাতা আমাদের (হিন্দুদের) কাছে এক ও অবিভাজ্য। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুস্থানের ঐক্য প্রমাণিত সত্য হিসাবে বিরাজিত। এই জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের ভারতবিভাগের দাবি কখনো সহ্য করবে না।' তিনি আরও লিখেছিলেন, 'ভারতভূমি, এই হিন্দুস্থান, ভারত আমাদের পিতৃ ভূ, আবার পুণ্য ভূ। ...... তদুপরি, আমাদের রয়েছে সার্বজনীন সাদৃশ্য: যুগযুগান্তর ধরে অগণিত শতাব্দীর সান্নিধ্য ও সমন্বয় আমাদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ভাষাগত ও কুলগত সাদৃশ্যের মাধ্যমে একটি সুষম, জৈবিক দেহের মত অভিন্ন জাতিতে পরিণত করেছে।'[১৪]

এ ধরনের বক্তব্য মুসলিম লীগের বক্তব্যের অবিকল বিপরীত প্রতিরূপ। ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতীয় হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন একটি স্বতন্ত্র জাতি বলে মুসলিম লীগের অভিমত ও মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হিন্দুরা

স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে হিন্দু মহাসভার বক্তব্য একই ভুলের আধুলির এপিঠ্-ওপিঠ্। সাভারকার ভারতীয় মুসলমানদের একটি জাতি বলে চিহ্নিত করেও তাঁদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অধিকার স্বীকার করেননি। সাম্প্রদায়িক মনোভাব যুক্তির আমোঘ নিয়ম মানে না!

গান্ধীপূর্ব কংগ্রেসের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকল ভারতীয়দের একটিমাত্র জাতির অন্তর্ভু'ক্ত বলে মনে করতেন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বনিয়াদ রচনায় আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা ব্রিটেনে প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের প্রতি রাষ্ট্রীয় আচরণের অনুরূপে ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে মুসলমান ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বরণ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁরা বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী মুসলমান প্রতিনিধিদের প্রয়োজনবোধে রেলভাড়া, থাকা-খাওয়ার খরচ যোগাতে কার্পণ্য করেননি। মুসলমান প্রতিনিধিদের তিন-চতুর্থাংশ ঐক্যমত না হলে ঐ সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের উপরে কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করতে পারবে না বলে বিধান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা নিজেরাই জারি করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ভিত্তি হিন্দু জীবনদর্শনের উপর স্থাপন করে এবং ভারতকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বলীয়ান হিন্দুদের মাতৃভূমি হিসাবে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করে কংগ্রেসের প্রথম যুগের জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের অংশগ্রহণ কঠিন করে তুলেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ একচক্ষুবিশিষ্ট হরিণের মত বিপথগামী হয়েছে বহুবার। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের স্বরূপের ভিন্নতর, দেশীয় নমুনা সৃষ্টির আগ্রহে জঙ্গী নেতৃবৃন্দ ইসলামী ধর্মদর্শন ও প্রতীকের ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষ চিন্তাভাবনা না করে হিন্দু দেবদেবী ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের রূপকল্প ব্যবহার করে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বস্তুগত কতগুলি প্রতীক রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, মা কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, ভবানী এবং শিবাজী, রাণা প্রতাপ বা শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দৈব বা মানবীয় প্রতীকের আবেদন মুসলমান প্রাণে সাড়া জাগাতে অক্ষম ছিল।

জঙ্গী নেতৃবৃন্দ মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু তাঁদের চৈতন্যে ভারতীয় মুসলমানদের অস্তিত্বের রাজনৈতিক গুরুত্ব সঠিক প্রতিবিম্বিত হয়নি।

প্রথম বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালে

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা হিন্দু তান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিপ্লবদীক্ষার রীতি অনুসরণ করে এবং হিন্দুত্বের গৌরব বাগাড়ম্বরে প্রচারের উপর জোর দিয়ে মুসলমানদের অংশগ্রহণ প্রায় অসম্ভব করে তোলেন। কিন্তু যতই জাতীয় স্তরে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে ততই হিন্দু-মুসলমান সৌভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপিত হতে থাকে।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ, অনুদার ধর্মীয় আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী কৌশল

গান্ধীর মত অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের মহান প্রবক্তা তাঁর চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে হিন্দুয়ানির স্পর্শ থেকে মুক্ত রাখতে পারেননি। মুসলমান সমাজের অবিমিশ্র শ্রদ্ধাভক্তি তিনিও লাভ করেননি। গান্ধী তাঁর উপবীত ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে একসাথে খানাপিনা করেছিলেন, রামধুন গানে আল্লা ও ঈশ্বরকে একযোগে স্থান দিয়েছিলেন, খিলাফৎ আন্দোলনে কায়মনোবাক্যে মুসলমানদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দাঙ্গা-বিধ্বস্ত দুর্গত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য করেননি। কিন্তু গান্ধী তাঁর স্বপ্নের ভারতকে রামরাজ্য হিসাবে প্রতিভাত দেখেছিলেন। 'আমার স্বপ্নের রামরাজ্য,' তিনি বলেছিলেন, 'রাজকুমার আর কপর্দকশূন্য ব্যক্তির অধিকারগুলি যুগপৎ রক্ষা করবে।'[৪৭] দরিদ্র মানবাত্মার প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল; কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল ধনিকশ্রেণীকে তাঁদের বিত্ত ও সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার থেকে নিবৃত্ত করে জনকল্যাণে ব্যয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা যাবে। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পত্তির মালিকানা ছেড়ে দিয়ে জনগণের অছি হিসাবে কাজ করে যেতে উৎসাহী হবেন। ১৯৩৪ সালে সংযুক্ত প্রদেশের জমিদারদের একটি প্রতিনিধি দলকে তিনি বলেন যে, তাঁদের সম্পত্তির অধিকার আক্রান্ত হলে তিনি তাঁদের পক্ষে লড়াই করবেন। রামরাজ্যের রাষ্ট্রাদর্শ, সময় বিশেষে জমিদারদের পক্ষ সমর্থন, গীতা, ঈশোপনিষদ প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থের পুনঃপুনঃ আশ্রয় গ্রহণ এবং তাঁর হিন্দু সাধুর জীবনযাত্রার পদ্ধতি মুসলমানদের কাছে তাঁকে আপনজন করে তোলেনি। এমন কি, মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড গান্ধী বিরোধিতার অভাব ঘটেনি। জিয়াউদ্দিন আমেদ স্যুলেরি মন্তব্য করেছিলেন যে, গান্ধী মুসলমানদের প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী; 'মুসলমানদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক সব কিছুই গান্ধীর মহাত্মাসুলভ আশীর্বাদধন্য হয়েছিল।'[৪৮]

সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িকতার সামাজিক-ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও বিবর্তন গান্ধী সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পারেননি। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তিন দশকব্যাপী কঠোরতম সংগ্রামে অগ্রণী যোদ্ধা হয়েও তিনি হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবর্ধমান তিক্ত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করার দুর্ভাগ্য ভোগ করেছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি তিনি জনসাধারণের দুর্বল নৈতিক কাঠামোর মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতীয় সমাজের সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক জীবনধারনের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নয়। ঐতিহাসিক দিক থেকে প্রধানত হিন্দুদের নিয়ে গড়ে ওঠা ধনিক, জমিদার, মহাজন ও বণিকতন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে ভারতে মুসলমান জনসাধারণের ব্যাপক আর্থনীতিক অসন্তোষের বিকৃত, কুৎসিৎ প্রকাশ হচ্ছে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা। 'আর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বল মুসলমান উচ্চশ্রেণীগুলি তাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুসলমান জনসাধারণের শ্রেণীসুলভ অসন্তোষকে সাম্প্রদায়িকতামুখীন করে তুলেছিল। এরূপে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ঘটেছিল।'[41]

বলা বাহুল্য, এরূপ পরিবেশে হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করে হিন্দু-মুসলমান কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আহ্বান করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। এরূপ সংগ্রামের মাধ্যমেই একমাত্র সাম্প্রদায়িকতার কারবারীদের মুসলমান জনতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার জাতীয় দায়িত্ব পালন করা সম্ভব ছিল। 'আবেগপ্লুত স্বদেশপ্রেমিক আবেদন, মানবিকতার গভীর অন্তঃপুরে পৌঁছানর প্রয়াস, ঘন ঘন উপবাস ইত্যাদি নানা ধরনের পদ্ধতির মাধ্যমে গান্ধী তিন দশক ধরে সাম্প্রদায়িকতা উৎপাটন করতে বীরোচিত কর্মসাধনায় লিপ্ত ছিলেন। (কিন্তু) সাম্প্রদায়িকতা উচ্চগ্রামে পৌঁছেছিল।'[42]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতাদের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা সবাই মুসলিম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। গান্ধী প্রখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারকে বলেছিলেন, ভারতীয়রা 'দু'টি জাতি নয়। ...ভারতে আমাদের সার্বজনীন সংস্কৃতি আছে। উত্তরে হিন্দী ও উর্দু হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই বুঝতে পারে। মাদ্রাজে হিন্দু ও মুসলমানেরা তামিল ভাষায় কথা বলে, বঙ্গদেশে তাঁরা বলে বাংলায়—হিন্দী বা উর্দুতে নয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সর্বদাই

গোহত্যা বা ধর্মীয় মিছিল উপলক্ষ করেই সংঘটিত হয়। তার মানে হচ্ছে এই : আমাদের কুসংস্কার গোলযোগ সৃষ্টির কারণ, স্বতন্ত্র জাতীয়তা নয়।'[43]

গান্ধী তাঁর ক্ষুরধার বাস্তব বুদ্ধিতে অনুভব করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানেরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র হতে চায়, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাঁদের বাধা দিয়ে আটকে রাখতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, 'ভারতীয় মুসলমানেরা যদি সত্যিই প্রস্তাবিত (ভারত) বিভাগ ঐকান্তিকভাবে দাবি করে তবে অহিংসার অনুগামী মানুষ হিসাবে আমি বাধা সৃষ্টির জন্য জোর করতে পারি না। কিন্তু আমি অঙ্গচ্ছেদের পক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থন জানাতে পারি না। আমি অহিংসার প্রত্যেকটি পদ্ধতি একে প্রতিরোধ করবার জন্য ব্যবহার করব। হিন্দুস্থান ও ইসলাম শত্রুভাবাপন্ন দুটি সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতিনিধি এরূপ ধারণার বিরুদ্ধে আমার সমগ্র অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ...কিন্তু এ তো হল আমার বিশ্বাস। স্বতন্ত্র জাতি বলে মুসলমানেরা যদি ভাবে তবে আমি আমার ধারণা তো আর তাঁদের কণ্ঠনালী দিয়ে জোর করে ঢেলে দিতে পারি না।'[44]

সকল প্রদেশের হিন্দু কংগ্রেসী নেতারা চিত্তরঞ্জনের মত বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেননি। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা বিশের দশকের মাঝামাঝি উত্তর ভারতের নানা প্রদেশে তুষের আগুনের মত অবদমিত সক্রিয়তায় জ্বলন্ত থাকে। ১৯২৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনগুলির সময় মতিলাল নেহরু তাঁর পুত্র জওহরলালকে লেখেন, 'মালব্য-লালা চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় যে ধরনের অপপ্রচার আমার বিরুদ্ধে শুরু করা হয়েছে তার মোকাবিলা করতে আমার রুচিতে বাধে। জনসমক্ষে আমাকে হিন্দু-বিরোধী ও মুলসমানপ্রেমী বলে খারিজ করা হয়েছে, কিন্তু গোপনে প্রায় প্রত্যেক নির্বাচককে বলা হয়েছে আমি মুসলমানদের মত গোমাংস ভক্ষক ; তাঁদের সঙ্গে মিলে সকল জায়গায়, সব সময়ে গোহত্যা আইনসিদ্ধ করে তুলতে চাই।' ঐ চিঠিতে তিনি আরও মন্তব্য করেন, 'বিড়লার অর্থপুষ্ট হয়ে মালব্য-লালা চক্র কংগ্রেসকে দখল করে নিতে প্রচণ্ড প্রয়াসে লিপ্ত। তাঁরা সম্ভবত সাফল্য লাভ করবে, কেননা আমাদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়।'[45]

রাজনৈতিক বাস্তবতা অনুধাবনে ব্যর্থতা বা শোষিত হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীগুলিকে হিন্দু-মুসলমান শোষক শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামী ঐক্যে বিধৃত

করার অসামর্থ শুধু হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাকে গতিবেগ অর্জনে সহায়তা করেছিল এমন নয়, সামাজিক-আর্থনীতিক নানা কারণের সাথে হিন্দু ও ইসলামীয় ধর্মআন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও ঐ গতিবেগকে তীব্রতর করেছিল।

মালাবার অঞ্চলের দরিদ্র, মুসলমান মোপ্‌লা কৃষকদের হিন্দু জমিদার বিরোধী জঙ্গী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা ও মুলতানে মহরম অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নামে দু'টি হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন জন্মলাভ করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মালখান রাজপুতদের ইসলামচ্যুত করে হিন্দুধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করতে আন্দোলন শুরু করেন। সংগঠন আন্দোলন পণ্ডিত মালব্যের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়: অস্পৃশ্যতা দূর করা ও হিন্দুদের আত্মরক্ষার জন্য লাঠি খেলা ও অসিচালনা শিক্ষা দেওয়া। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রদ্ধানন্দ নিহত হলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তিক্ত হতে শুরু করে। কোন কোন মহলে প্রতিশোধ গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হয়। মুসলমানদের একাংশ 'তাব্‌লিগ' ও 'তান্‌জিম' আন্দোলন শুরু করে দেয়। 'জামিয়াৎ আল্ উলেমা-ই-হিন্দ্' ২০০০ অ-মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে ও ১১০০০ ধর্মান্তরিতকে পুনরায় ইসলাম আলিঙ্গনে সহায়তা করে।[46]

খ্রীস্টধর্ম ও ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীর ধর্মান্তর ঘটাতে অভিলাষী। কিন্তু হিন্দুধর্ম যুগ-যুগান্তর ধরে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে ধর্মান্তরিত করা অশাস্ত্রীয় গণ্য করেছে। দয়ানন্দ ও বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মকে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের মত মিশনারি ধর্ম করে তোলেন। হিন্দুধর্ম খ্রীস্ট ও ইসলাম ধর্মের মত আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসমীচীন কিছু দেখতে পাননি। যুক্তিতর্কের বিচারে, ইসলামী ও খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচার প্রয়াসের নিরিখে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলনকে অসমীচীন আখ্যা দেওয়ার মনোভাবই হয়তো অসমীচীন। কিন্তু এসব আন্দোলন সূত্রপাতের সময়কাল, সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রচারভঙ্গী এমন ছিল যে, মুসলমানদের মনে এরূপ ধর্মীয় আন্দোলন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নজীর হিসাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

চল্লিশের দশকের প্রথম অর্ধে সাম্প্রদায়িকতা যখন তুঙ্গে তখন সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ঐ সমস্যার আগুনে ঘৃতাহুতি দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের তৎকালীন গভর্নর সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ব্রিটিশ উচ্চতন কর্তৃপক্ষ ঐ সমস্যা সমাধানে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিল না।

অথচ তখনও সমাধানের সুযোগ ছিল।[47] ডঃ খান সাহেব ও তাঁর ভাই গফ্ফ্‌র খান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হিন্দু, মুসলমান নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ দীর্ঘকাল জনপ্রিয়তা অর্জনে অসমর্থ ছিল। সদিচ্ছা থাকলে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগ রোধ করা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল।

সারা উপমহাদেশের আর্থনীতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রতি আকর্ষণ বিভক্ত ভারতের সংবিধানিক রূপরেখা গ্রহণে জহরলাল নেহ্‌রুর মনে প্রাথমিক অনীহা সৃষ্টি করেছিল। আর্থনীতিক দিক থেকে দুর্বল ভাবী ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ধারণা কয়েকটি দশকের মধ্যেই সত্য প্রমাণিত হয়েছে—পশ্চিম পাকিস্তান ও তার 'গ্রামীণ বস্তি' পূর্ব পাকিস্তান এক রাষ্ট্রের ছত্রছায়ায় থাকতে পারেনি এবং ভারত-রাষ্ট্র ভারতবর্ষ বিভাগের ফলে দুর্বল রয়েছে। আর্থনীতিক দিক থেকে নেহ্‌রুর বক্তব্য সঠিক হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির উৎস তিনি সঠিক নিরূপণ করতে পেরেছিলেন মনে হয় না। কংগ্রেসী সকল নেতা জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু ভারতের মুসলমানদের অধিকাংশ সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা আত্মিক দিক থেকে হিন্দুদের থেকে স্বতন্ত্র জাতিত্বে সংবদ্ধ বলে বিশ্বাসে অটল থাকলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেবার উপায় ছিল কি? অবশ্য বিভিন্ন উপাদানের নিরিখে ভারতীয় মুসলমানেরা স্বতন্ত্র জাতিত্বের অধিকারী ছিলেন কিনা সে-বিষয়ে তার্কিক প্রশ্ন উত্থাপন করা প্রয়োজন ছিল।

হিন্দু রাজনৈতিক নেতৃত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বাস্তবতা স্বীকারে দূরদর্শিতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিল। ১৯২৩ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁর স্বরাজ্য দলের দর্শনীয় সাফল্যের পর সরকারী চাকুরি ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত মুসলমান প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে এরূপ কার্যক্রম বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আবুল কালাম আজাদ মন্তব্য করেছেন যে, এই কারণে বঙ্গভূমিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের বীজ রোপণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

দ্রুত অবনতির পথে গেলেও লাহোর প্রস্তাব থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার দিনগুলি পর্যন্ত সর্বভারতীয় স্তরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ভারত বিভাগ অনিবার্য করে তুলেছিল এমন নয়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ ছিল।

সাম্প্রদায়িকতার বিষদুষ্ট ভাবী দু'টি রাষ্ট্রের ধনিকশ্রেণীর সপ্রেম আনুগত্য লাভ করে বহুবিধ সুযোগসুবিধা ও মুনাফা অর্জনে লালায়িত ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী হিন্দু-মুসলমান বিরোধ প্রশমনে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে অতি দ্রুত ভারত উপমহাদেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে প্রয়াসী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সুভাষচন্দ্র বসু পরিচালিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, দুর্বল ব্রিটিশ সামর্থ, ১৯৪৬-এর নৌবিদ্রোহ, ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের স্পষ্ট চিহ্নের প্রকাশ ও ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি ক্ষমতা হস্তান্তরের জরুরী তাগিদ সৃষ্টির সহায়ক হয়।

হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার কোনটিই সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সৃষ্টি নয়। ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির ঔপনিবেশিক রূপান্তরের সাথে সাথে পরিস্ফুট হিন্দু, মুসলমান সম্প্রদায়ের **অসম অগ্রগতি ও বৈষম্য-মূলক সুযোগসুবিধা** ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতার উৎসমুখ হিসাবে কাজ করে। উত্তর ভারতের বিক্ষুব্ধ মুসলমান ভূস্বামী ও মুষ্টিমেয় শিল্পপতিরা আর্থনীতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার গ্রহণ করে হিন্দুবিরোধী হয়ে ওঠেন। আবার, হিন্দু কায়েমী স্বার্থমহল আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা অব্যাহত রাখতে সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। কলুষতায় আবিল সাম্প্রদায়িক ধারাপথে সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণগুলি যথারীতি বিকৃত স্বরূপে পঙ্কিলতা সরবরাহ করতে থাকে। আর, ঐ ধারাপথকে রাষ্ট্রীয় সীমারেখা হিসাবে ব্যবহার করে দু'টি রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের কৃতিত্ব কুড়িয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত উপমহাদেশের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাঁচে।

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ!'

রাজনীতিদুষ্ট হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন

সারা দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ নানা ধরনের গোষ্ঠী সচেতনতার উদ্ভব ঘটিয়েছিল; গোষ্ঠী সচেতনতার

সম্মিলনে বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় চেতনার সার্থক রূপটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি নূতন পরিস্থিতিতে ধর্মসংস্কৃতির যুগোপযোগী সংস্কার ও ভিন্ন ধর্মসংস্কৃতির প্রগতিমূলক দিকগুলির আত্মিকরণ প্রয়াসে লিপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে হিন্দুধর্ম প্রথমে, পরে ইসলাম এরূপ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিল বলা যায়। এরূপ প্রচেষ্টার অন্যতম ফলস্বরূপ জাতীয় চেতনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

জাতীয় চেতনার সার্বিক রূপটির রূপকার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাদেও বহু ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা খণ্ডিত আকারে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে (প্রধানত বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে) প্রকাশিত হতে থাকে। হিন্দুধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দু জাতীয়তা-বাদের ধ্বজা ধারণ করে অখণ্ড ভারত হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠা করে। জাতীয় স্তরে উন্নীত এই সংগঠন ভারতীয় রাজনৈতিক চিত্রে দক্ষিণপন্থার ধর্মীয় বাহিনী হিসাবে বিরাজ করতে থাকে।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের পশ্চাতে কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণ ক্রিয়াশীল ছিল। তুর্কী-আফগান ও মোগল শাসনে ভারতীয় হিন্দুরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী লাঞ্ছিত সংখ্যালঘিষ্ঠের মর্যাদা লাভ করেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারত একের পর এক যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে পর্যদুস্ত হয়ে ব্রিটেনের পদানত হয়। লাঞ্ছিত সংখ্যালঘুর মনোভাব এবং ভয় ও অসহায় অবস্থা থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজ মুক্তি পায় না। তদুপরি, খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের ধর্মপ্রচার নিম্নবর্ণ ও 'অস্পৃশ্য' হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসে জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করলে হিন্দু সমাজ শঙ্কিত বোধ করতে থাকে। ১৮৭১ সালে সর্বভারতীয় আদমসুমারী চালু হলে সম্প্রদায়গত সংখ্যাতত্ত্বের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বঙ্গদেশে ও পাঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে উঠলে হিন্দুদের মধ্যে উৎকণ্ঠার উদ্রেক হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষিত হিন্দুরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগসুবিধার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আগামী দিনের সম্ভাব্য হৃত সুযোগ-সুবিধার দুঃস্বপ্নে শঙ্কিত বোধ করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই হিন্দুধর্মীয় নানা ধরনের সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে। কোন কোন সংগঠন হিন্দুধর্মের 'বৈপ্লবিক' সংস্কারে প্রয়াসী হয়,

আবার কোন কোন সংগঠন হিন্দুধর্মের গোঁড়ামিকে পাথেয় করে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু প্রায় সব সংগঠনগুলিই স্বল্পকাল স্থায়িত্ব বজায় রেখে বিলুপ্ত হয়। একমাত্র ১৮৮৭ সালে পণ্ডিত দীন দয়ালু প্রতিষ্ঠিত ভারত ধর্ম মহামণ্ডল এক দশকের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই সংস্থার প্রথম অধিবেশন হরিদ্বারে আহ্বান করা হয়েছিল, তারপর প্রতি বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুকরণে বাৎসরিক অধিবেশন ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর জাঁকজমক ও হিন্দু রীতিপদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্য ও দ্বারভাঙ্গার মহারাজা এই সংস্থার সমর্থক ছিলেন। এই সংস্থা হিন্দু মহাসভার আদর্শ ও সংগঠনের একটি ছক্ বা নমুনা সৃষ্টিতে সহায়ক হলেও প্রত্যক্ষ কোন সূত্রে হিন্দু মহাসভার পিতৃত্বের দাবিদার নয়।

১৯০৬ সালে পণ্ডিত রামভজ দত্ত লাহোরে হিন্দু সহায়ক সভা স্থাপন করেন। আর্য সমাজ ও সনাতন ধর্মসভার বহু সদস্য (প্রধানত পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশের) রামভজ দত্তের সংগঠনটির সমর্থক ছিলেন। হিন্দু সহায়ক সভা প্রধানত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হলেও স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতা স্পষ্টতই রাজনীতির হিন্দুকরণে বিশ্বাসী ছিলেন।

১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে হিন্দুসভার জন্ম হয় পাঞ্জাবে এবং এই সভাই বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু মহাসভার বনিয়াদ রচনা করে। বিশেষ করে ১৯০৯ সালের ভারত শাসন সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা থাকায় পাঞ্জাব হিন্দুসভার নেতৃবৃন্দের প্রতীতি বদ্ধমূল হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতে মুসলমান তোষণ করে বিভেদের বীজ বপন করে হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করতে বদ্ধপরিকর। এই সভা হিন্দুস্বার্থ রক্ষা করার জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রম রূপায়ণে সক্ষম সর্বভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। ১৯১৫ সালে কুম্ভমেলার দিনটিতে হরিদ্বারে সর্বভারতীয় হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সংহতি সৃষ্টি, হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, সকল শ্রেণীর হিন্দুদের অবস্থার উন্নয়ন, সর্বক্ষেত্রে ও সকল স্থানে হিন্দুস্বার্থ রক্ষা, ধর্মীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদ্ভাব রক্ষা ও সরকারের সঙ্গে রাজভক্তি আপ্লুত সহযোগিতা এবং ধর্মীয়, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে হিন্দুদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এই সম্মেলন একটি নূতন সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করে।[48] সর্বদেশক হিন্দুসভার উদ্ভব ঘটে।

হিন্দুসভার ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসের হরিদ্বার সম্মেলনে হিন্দু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তৎপরতা নূতন একটি সংগঠনের মাধ্যমে রূপলাভ করে। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার উৎপত্তি ঘটে। মহাসভার শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং গান্ধী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনে সহায়তা দানের নীতি ঘোষিত হয়।

১৯২১ সালের আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভারতে মোপ্‌লা মুসলমানদের বিদ্রোহ হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের প্রাণে আঘাত হানে। সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় মহাসভা মালকান রাজপুতদের ইসলামের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করতে তৎপর হয়। প্রতিক্রিয়ারূপে ইসলামের ধ্বজাধারীরা আগ্রা, মথুরা ও ভরতপুর অঞ্চলে ইসলামের প্রচারে উঠে পড়ে লেগে যান। বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ ১৯২৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি আগ্রাতে সম্মিলিত হয়ে ভারতীয় হিন্দু শুদ্ধি সভা গঠন করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সভাপতি নির্বাচিত হন।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ১৯২৩ সালের হিন্দু মহাসভার বারাণসী সম্মেলনে শুদ্ধি আন্দোলনের সমর্থকদের বিপুল সংখ্যায় যোগদান করতে আবেদন জানান। তিনি ঐ সম্মেলনে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রসারে হিন্দু ঐক্যের দ্যোতক সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। বিশ ও ত্রিশ দশকের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য ও গোলযোগের দিনগুলিতে শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন অশুভ ফলাফলে লাঞ্ছিত হয়েছিল। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান ও খ্রীস্টানে রূপান্তরিত করা যথাক্রমে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের ধর্মাদর্শের পর্যায়ে পড়ে; হিন্দুধর্ম অনুরূপ আদর্শ গ্রহণ করলে তাকে আপত্তিকর ভাবা অযৌক্তিক। কিন্তু যে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে এরূপ আদর্শ রূপায়িত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রতিকূল বা অনুপযোগী ছিল। একই আদর্শ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম তাৎপর্য বহন করে থাকে; এক সময়ে প্রগতিশীল বলে বিবেচিত আন্দোলন কালান্তরে প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্যোতক হয়ে উঠতে পারে। শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ করতে সহায়ক হয়েছিল।

ডক্টর বি. এস. মুন্‌জী, ভাই পরমানন্দ ও ভি. ডি. সাভারকার হিন্দু মহাসভাকে জঙ্গী রাজনৈতিক হিন্দু মতাদর্শে দীক্ষিত করে তোলেন। তাঁদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা হিন্দুত্বের চৌহদ্দিতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে তুলতে প্রয়াসী হয়, আর্য সংস্কৃতির ধারক হিসাবে

চীন, জাপান, শ্যাম, সিংহল, ভারত প্রভৃতি দেশের সংহতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে এবং মুসলমান দেশীয় নৃপতিবৃন্দের হিন্দু প্রজাদের স্বার্থরক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়। মহাসভা হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব রচনা করে এবং গান্ধীবাদী জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণে ব্রতী হয়। ১৯৩২ সালে এন. সি. কেলকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার নয়াদিল্লী অধিবেশনে ডঃ হেগওয়ারের নেতৃত্বে গঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রতি সমর্থন জানানো হয় এবং আশা প্রকাশ করা হয় যে, সকল প্রদেশেই এই সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাভারকার 'হিন্দু' শব্দটির যেরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করেন তা-ই হিন্দু মহাসভার সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি লেখেন, 'যে ব্যক্তি সিন্ধু থেকে মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূমিকে পিতৃভূমি ও পবিত্রভূমি বলে মনে করেন ও দাবি করেন তিনি হিন্দু।' তিনি আরও বলেন, 'ভারতে উদ্ভূত যে-কোন ধর্মে বিশ্বাস থাকাই যথেষ্ট নয় (অর্থাৎ হিন্দুস্থানকে পুণ্যভূমি ও পবিত্রভূমি বলে মনে করলেই শুধু হল না), সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এই ভূমিকে পিতৃভূমি বলেও স্বীকার করতে হবে।'[49] সাভারকারের নির্দেশিত এই সংজ্ঞা হিন্দুত্ব, হিন্দুয়ানি, হিন্দু জাতি ও হিন্দু রাষ্ট্রবাদের ধারণা রচনার ভিত্তি হিসাবে ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯৩৮ সালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহাসভায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে সভাপতি পদে বৃত হন।

স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দু মহাসভার রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে হিন্দু স্বার্থরক্ষার জঙ্গী কার্যক্রমের তাগিদ পূর্বতন তীব্রতায় অনুভূত হয় না। কিন্তু মহাসভা সাংগঠনিক অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাছাড়া, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বা সেবার আদর্শ ঘোষণা করে হিন্দু প্রাধান্য রক্ষার তাগিদে নূতন নূতন দলও গঠিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে আর্থনীতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকার ও সংখ্যালঘু মুসলমানদের বৈরী বা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের ফলে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থেকে মুক্তিলাভ বা প্রতিরোধ গড়ার 'কল্পিত বা অনুভূত প্রয়োজন' থেকে রাজনৈতিক হিন্দুয়ানির জন্ম হয়েছিল। অনুরূপভাবে বলা যায়, সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় ও সরকারের মনোভাবে ক্ষুব্ধ মুসলমানেরা

নিজেদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাজনীতিদুষ্ট ইসলামের অনুসারী হয়ে ওঠেন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সকল শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর্থনীতিক স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর রাজা, মহারাজা, নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমানের এক অংশ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে শান্ত, সমাহিত সমুদ্রের মত স্বচ্ছন্দ, তরঙ্গবিহীন জীবনের স্বপ্নবিভোর দিনের প্রতীক্ষায় রত থাকেন। জনসমর্থনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধির আশায় তাঁরা রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার ঝুলি কাঁধে নিয়ে ধর্মীয় মুখোশ পরে নেন। স্বার্থ বজায় রাখা ও ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের প্রতিযোগিতা পরিহারের মাধ্যমে সুবিধাজনক আর্থনীতিক রাজনৈতিক সুযোগ সৃষ্টির তাগিদ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টিতে প্রাধান্য পেয়েছিল। **হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।** আশঙ্কা থেকে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি; রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আশঙ্কার সৃষ্টি হলে হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা আবার ভারতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না এমন কথা হলফ করে কেউ বলতে পারেন না। সাম্প্রদায়িকতার আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ উপমহাদেশে কতটা শিথিল হয়েছে তা বিচারবিশ্লেষণের আজও প্রয়োজন আছে।

১১ বর্ণব্যবস্থার নূতন তাৎপর্য ও আধুনিক শ্রেণীগুলির ভূমিকা

বর্ণব্যবস্থা : ভারতীয় হিন্দু সমাজের 'কালজয়ী' স্তরবিন্যাস

হিন্দুধর্ম সকল হিন্দুকে ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ রেখে সারা ভারতে সাংস্কৃতিক ঐক্য শতাব্দীর পর শতাব্দী রক্ষা করেছিল। বর্ণব্যবস্থা অনুরূপ দীর্ঘ সময় হিন্দুদের বিভিন্ন গোষ্ঠী বা বর্ণে বিভক্ত রেখে দিয়ে যুগপৎ ভাল-মন্দের বাহক হয়ে উঠেছিল।

কালের যাত্রায় ঐ বর্ণগুলি বিবাহ, খানাপিনা, জীবিকা, পেশা ইত্যাদি সামাজিক ব্যাপারে এমনভাবে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট হয়ে পরস্পর থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছিল যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্য ইত্যাদি মূল্যবোধ হিন্দু সমাজে লাঞ্ছিত ও ক্লিষ্ট বোধ করেছিল। বর্ণগুলি উচ্চতর-নিম্নতর ক্রমপর্যায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চতর বা নিম্নতর অবস্থায় বর্ণের অবস্থান অনুযায়ী বর্ণভুক্ত মানুষের মর্যাদার মান নির্ধারিত হত। ব্যক্তিমানুষের বর্ণ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হত এবং তাঁর জীবিকা বা পেশা বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট হত। কোন ব্যক্তির পক্ষে তার বর্ণ ত্যাগ করে অন্য বর্ণ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; কোন ব্যক্তির বিত্ত বা প্রতিভা জন্মসূত্রে লব্ধ বর্ণগত মর্যাদার সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে অক্ষম ছিল। ব্যক্তির নিজস্ব কৃতিত্ব বা মেধার উপর বর্ণ নির্ভর করত না; বর্ণান্তর গ্রহণ করাও সম্ভব ছিল না। জন্মসূত্রে অর্জিত বর্ণ অমোঘ নিয়মে আমৃত্যু ব্যক্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকত। বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্বের জন্য হিন্দু সমাজে **গুণভিত্তিক অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠতে পারেনি, জন্মসূত্রে গড়ে উঠেছিল।** 'বিশেষ কোন সামাজিক কর্মে সর্বোত্তম যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তির মেধা ও সামর্থ স্বাধীনভাবে উক্ত কাজে নিযুক্ত করা অসম্ভব ছিল।'[1] বর্ণব্যবস্থা ব্যক্তির উদ্যোগ, আত্মবিশ্বাস ও কর্মোদ্দীপনা অবদমিত অবস্থায় রাখার সহায়ক হয়েছিল। জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশে এই ব্যবস্থা প্রতিবন্ধকের কাজ করেছিল। এই ব্যবস্থা অস্পৃশ্যতার সমস্যা সৃষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল ছিল।

বর্ণব্যবস্থা **অগণতান্ত্রিক ও স্বৈর ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে উঠেছিল।** এই ব্যবস্থায় সামাজিক বৈষম্য নিয়মশৃঙ্খলাবদ্ধ ও বৈধ হয়ে উঠেছিল। সামাজিক স্তরবিন্যাস সকল ধরনের সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বৈষম্য দৃশ্যমান নয় এমন ধরনের সমাজ প্রায় অবর্তমান বলা চলে। কর্ম বা পেশাভিত্তিক বৈষম্য সব সমাজেই লক্ষণীয়। কিন্তু ভারতীয় বর্ণব্যবস্থার প্রগতিবিরোধী প্রধানতম দিকটি ছিল এই যে, জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণ অনুযায়ী নির্দিষ্ট পেশা বা কর্মকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আজীবন অনুসরণ করতে বাধ্য থাকতেন। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ মানুষের সুযোগসুবিধার তারতম্য বর্ণব্যবস্থার নিয়মে বৈধ হয়ে, ভারতীয় হিন্দু সমাজে অনড়, অটল পাথরের মত স্থায়িত্ব লাভ করে প্রগতির উৎসমুখ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

আইনগত সাম্যের ক্ষেত্রেও বর্ণব্যবস্থা প্রতিবন্ধকতার শক্তিকে জোরদার করেছিল। সামাজিক পিরামিডের সর্বোচ্চে অবস্থিত ব্রাহ্মণেরা ধর্ম পালন এবং জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বর্ণভুক্ত মানুষের তুলনায় অনেক বেশী অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করতেন। **হিন্দুযুগে রাষ্ট্রশক্তি ব্রাহ্মণদের প্রতি পক্ষপাতে দুষ্ট ছিল।** আইনের চোখে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা যেরূপ বিচার লাভ করতেন, শূদ্রদের পক্ষে ঐরূপ বিচারের আশা দুরাশা ছিল। উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ হিন্দুরা আইনগত সাম্যের সুষম বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন না। একই অপরাধে অপরাধী হলেও ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের শাস্তির মাত্রা ভিন্ন ধরনের হত—বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে লঘু, শূদ্রের ক্ষেত্রে কঠোর।

বৈদিক যুগের পূর্বেকার ভারতে বর্ণব্যবস্থার উৎপত্তি ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়। সমগ্র হিন্দুযুগ, মধ্যযুগ পেরিয়ে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত বর্ণব্যবস্থা কমবেশী তীব্রতায় অব্যাহত থেকেছিল। থেকেছিল বলেই ঐ আমলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি নিরপেক্ষ হলেও সামাজিক সুযোগ-সুবিধাভোগী উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই পশ্চিমী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সর্বাগ্রে। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে অনুরূপ প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সামাজিক স্তরবিন্যাসের উচ্চতর স্তরে অবস্থানের সুযোগে উচ্চবর্ণ হিন্দুরা ঔপনিবেশিক শাসনে শিক্ষাদীক্ষায় ও আর্থনীতিক জগতে নিম্নবর্ণ হিন্দুদের তুলনায় নিজেদের অনেক বেশী সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই দিক থেকে **বলা যায়, ঔপনিবেশিক শাসন বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে ভূমিকা গ্রহণ না করে তাকে শক্তিশালী করতে সহায়ক হয়েছিল।** আবার, একথাও

সত্য যে, ঔপনিবেশিক শাসনে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক নানাবিধ পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে **বর্ণব্যবস্থার নিগড় কিছুটা শিথিল** হয়েছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা

১৮৫৩ সালের ২৫শে জুন 'নিউ ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত নিবন্ধে কার্ল মার্কস মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ইংল্যাণ্ড ভারতীয় সমাজের সমগ্র কাঠামোটি ভেঙ্গে দিয়েছে, পুনর্গঠনের লক্ষণগুলির আবির্ভাব এখনো ঘটেনি।' আবার, ঐ একই পত্রিকায় ৮ই অগাস্টের একটি প্রবন্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'রেলওয়ে ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত আধুনিক শিল্প ভারতীয় বর্ণগুলির ভিত্তিস্বরূপ বংশানুক্রমিক শ্রমবিভাজনের বিলোপ সাধন করবে।'[২]

কারিগরী-আর্থনীতিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক পরিবর্তনের অনুমিত সংযোগসূত্রগুলি **মার্কসের মন্তব্য অনুসারী প্রক্রিয়ায় হুবহু ক্রিয়াশীল হয়নি**। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বর্ণব্যবস্থার উপর স্থাপিত ভারতীয় সমাজ ভেঙেচুরে যায়নি; নিজেকে কিছুটা পরিবর্তিত করে কারিগরী-আর্থনীতিক নূতন বাস্তবতাকে হজম করে নিতে পেরেছিল। মার্কসের বক্তব্যের সারবত্তা অবশ্য এর ফলে কিছুমাত্র হ্রাস পায় এমন নয়। ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি চূড়ান্ত কোন অভিমত প্রকাশ করেননি; ভারতীয় সমাজের ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন সমাজের ভিত্তি রচিত হবার সম্ভাব্য একটি প্রক্রিয়া তিনি অনুমান করেছিলেন মাত্র। আর্থনীতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় সন্দেহাতীতভাবে দর্শনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাচীন বর্ণব্যবস্থার স্থবির তরণী চলমান জীবনের স্রোতে তীরের সাথে সংযুক্ত রজ্জুর বন্ধন আজ অনেকটা হারিয়েছে।

ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার বহু আগে ভারতীয় হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থায় আঘাত হানার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। বিশেষ করে উত্তর ভারতে গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অভ্যুত্থান এবং সম্ভবত **ইসলামের প্রভাব** হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিকে শিথিল করতে সক্ষম হয়েছিল।[৩] জন্মসূত্রে অর্জিত পবিত্রতা-অপবিত্রতার ধারণাটি দক্ষিণ ভারতের তুলনায় উত্তর ভারতে দৃঢ়তা হারিয়েছিল ধর্মসংস্কৃতির বহু রকম ধারার মিলন-সংঘাতের যুগপৎ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়।

ব্রিটিশ আমলে ভারতের সামাজিক অর্থনীতির মৌল পরিবর্তনের ফলে এমন কতগুলি শক্তির সমাবেশ ঘটে যা ভারতীয় ধর্মীয় সমাজগুলির দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তনের সূচনা করে। বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় মনোভাব পূর্বতন সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করতে কিছুটা সক্ষম হয়। নিম্নলিখিত শক্তিগুলির প্রভাব প্রধানত বর্ণব্যবস্থার নিগড় হ্রাসে সহায়ক হয়েছিল :

১. আধুনিক শহরগুলির প্রভাব

শিল্পায়নের ফলে ব্রিটিশ আমলে নগরীকরণ প্রক্রিয়া জোরদার হয়ে উঠেছিল। প্রধান বন্দরনগরগুলি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ চরিতার্থতার প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকজন, শিল্প, রাস্তাঘাট, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি দ্রুত আহরণ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে মহানগরে পরিণত হয়ে যায়। প্রশাসনিক কাজকর্মের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠা স্থানগুলি শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তাছাড়া, কলকারখানার কেন্দ্রগুলি সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-মালিক ও তাঁদের আত্মীয়-পরিজনদের প্রয়োজন মেটাতে শহরের লক্ষণাক্রান্ত হয়ে উঠতে থাকে। কালক্রমে ঐগুলি শিল্পনগরের রূপ ধারণ করে।

আধুনিক শহরগুলিতে হোটেল, রেস্তোরাঁ, সিনেমা, থিয়েটার, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি, রেলওয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণভুক্ত মানুষের প্রয়োজন মেটাতে আবির্ভূত হয়। যানবাহন, আমোদ-প্রমোদ, আহার-বিহার ও বসবাসের স্থানগুলিতে বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলি মান্য করা অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। ট্রাম-বাস-রেলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র, হরিজন ছুঁৎমার্গ ত্যাগ করে যাতায়াত শুরু করতে বাধ্য হন। আর্থনীতিক প্রয়োজনে স্থানান্তরে যাতায়াত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে, আর ঐ কারণে বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুন মান্য করা সম্ভব না হলেও যাতায়াত বন্ধ হয়নি। গরজ বড় বালাই! হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে বিভিন্ন বর্ণের, এমন কি ধর্মের, মানুষও বেশী-বেশী সংখ্যায় সমবেত হতে থাকেন। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণীর মানুষেরা খাদ্যগ্রহণের সময় হোটেল-রেস্তোরাঁগুলিতে বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুনগুলি স্বেচ্ছায় ও অনেক ক্ষেত্রে অনিচ্ছায় অমান্য করতে থাকেন। ধনিকশ্রেণীর মানুষেরাও ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈশ্য নির্বিশেষে প্রয়োজনের তাগিদে নগরের পরিবেশে একসাথে আহার-বিহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকেন।

ঐতিহাসিক দিক থেকে একথা অবশ্যই সত্য যে, নগরীকরণের বিস্তারের সাথে সাথে ভারতের বর্ণব্যবস্থার নিগঢ় স্পষ্টত হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ইউরোপে যেমন শিল্পায়ন নগরীকরণ প্রক্রিয়ার জনক হয়ে গ্রামীণ জীবনের সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কার প্রভৃতিকে জঞ্জালের মত দ্রুত অপসারণ করে, ভারতে তেমনটি হয়নি। ধীরগতিতে এরূপ অপসারণের কাজ চলেছে। ভারতের নগরগুলিতে বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই এমন নয়। তবে গ্রামে যেমন দাপটের সঙ্গে আছে, শহরে তেমন নেই।

প্রথমে ইংল্যাণ্ডে, পরে ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে, দেশীয় ধনিকশ্রেণী শিল্পায়নে নেতৃত্ব দিয়ে, নগরের উৎপত্তি ঘটিয়ে এবং গ্রাম ও নগরের বৈষম্য কমিয়ে নূতন এক সংস্কৃতির জন্ম দেয়। অনুরূপ একটি শ্রেণী ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের আগে জন্মলাভ করেনি। যখন করেছে তখন ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অভিভাবকত্বে ঐ শ্রেণীর ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। স্বভাবতই ঐ শ্রেণীর পক্ষে ইউরোপীয় ধনিকশ্রেণীর মত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নায়ক হওয়া সম্ভব হয়নি। ভারতীয় শিল্পায়নের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতি ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর লাভ-লোকসানের নিরিখে নির্ণীত হয়েছে। ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর মন্দগতি আর্থনীতিক উদ্যোগ শিল্পায়নে যথেষ্ট গতিবেগ সৃষ্টি করতে না পারায় নগরীকরণ প্রক্রিয়া কাম্য শক্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। শহরের সংখ্যা ভারতের মত বিশাল দেশের তুলনায় নগণ্য থেকেছে। বন্দরনগরগুলি ব্রিটিশ ধনিক-শ্রেণীর মূলধনে ফুলে-ফেঁপে আয়তন বৃদ্ধি করে গ্রামীণ ভারতকে শোষণ করেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে পঙ্গু ধনতান্ত্রিক বিকাশের ফলে তথাকথিত শহর-এলাকার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলেও ভারতের গ্রামনির্ভর চরিত্র বজায় থেকেছে। সুষম নগরীকরণের বিকাশেব অভাবে ভারতীয় জনমানসে গ্রামীণ ভাবধারার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বন্দরনগর ও তথাকথিত শহর এলাকাগুলির মানুষেরা আদর্শ শহুরে ভাবধারায় সমৃদ্ধ এমন কথা বলা যায় না। বর্ণব্যবস্থার কুফলগুলি থেকে গ্রামগুলি যেমন মুক্ত নয়, 'শহরগুলিও' নয়। বর্ণব্যবস্থার প্রভাব ভারতের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কম আর বেশী, এই যা। সংগঠনগত দিক থেকেও বর্ণব্যবস্থার অস্তিত্ব শহর এলাকাগুলিতে নেই এমন নয়। আই. পি. দেশাই ও ড্যাম্‌লে ভারতীয় নগরীকরণকে নকল ধরনের বলে চিহ্নিত করেছেন।[4] তাঁদের মতে ভারতের শহরগুলি আকৃতিতে যা-ই হোক না কেন, প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াকর্মে গ্রামীণ।

আর. ডি. ল্যামবার্ট প্রশ্ন তুলেছেন : শহরাঞ্চলের মানুষের ধ্যানধারণাকে গ্রামীণ মানুষের ধ্যানধারণা পরিবর্তনের নিয়ামক হিসাবে বিবেচনার তত্ত্বটি ভারতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি ? মহানগর বা ইস্পাতনগরগুলি বাদ দিলে লক্ষ্য করা যায় যে, শিল্প নিজেকে সংশ্লিষ্ট গ্রামীণ পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস করে তোলে। শিল্পকেন্দ্রিক অঞ্চল গ্রামীণ ভাবধারার শিকার হয়ে পড়ে। এমন কি, সমাজতত্ত্ববিদদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, কোলকাতা-বোম্বে প্রভৃতি নগরগুলিতেও 'গ্রামের' অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।[5] গ্রামীণ বহু ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠান ঐ 'গ্রামগুলিতে' বর্তমান। বর্ণব্যবস্থা তাই ভারতের কোন শহর থেকেই অচিরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে আশা করা যায় না।

২. আধুনিক শিক্ষার প্রভাব

পশ্চিমী ধাঁচের আধুনিক শিক্ষার প্রচলন বর্ণব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। এই শিক্ষা ইউরোপীয় উদারপন্থার কতগুলি মৌল নীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। আইনের চোখে সমতা, নাগরিকদের ক্ষেত্রে পৌর স্বাধীনতার সার্বিক ব্যাপ্তি, জীবিকা বা পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতা ইত্যাদি উদারনৈতিক ধ্যানধারণা ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর কাছে লভ্য ছিল। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে বর্ণভিত্তিক সমাজের অনুশাসনগুলি হুবহু মান্য করা অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকে। তাঁর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী বুর্জোয়া-উদারনৈতিক আদর্শের প্রভাব পড়তে থাকে। জন্মসূত্রে নির্ধারিত বর্ণ অনুযায়ী ব্যক্তিমানুষের সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের তত্ত্বে অটল বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। খাদ্যগ্রহণ, পেশাগত কাজকর্ম পরিচালনা, পরিবার গঠন, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে বর্ণব্যবস্থার প্রতি অনুগত থাকার ঝোঁক ক্রমশ কমতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন ব্রিটিশ ভারতের শহরগুলিতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল বলে মুষ্টিমেয় ভারতবাসীর পক্ষে ঐ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। যাঁরা শিক্ষিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই আবার বর্ণব্যবস্থার সাথে আপোষ করে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব, প্রতিপত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধিতে আগ্রহী ছিলেন। স্বদেশীয় জনসাধারণের সমর্থনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা ঐরূপ সমর্থনের

একান্ত প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বর্ণব্যবস্থার অযৌক্তিক ও অমানবিক রীতিনীতির প্রতি বীতস্পৃহ ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন ভারতবাসীর সংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র, নগণ্য একটি ভগ্নাংশ ছিল মাত্র।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের ফলে শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে বর্ণব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠতে থাকে।

৩. ব্রিটিশ প্রণীত আইনের প্রভাব

ক্রমে ক্রমে সারা ভারতে একই রকম আইনব্যবস্থা চালু করে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে হলেও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি হাতিয়ার রচনা করেছিল বলা যায়। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে অপরাধের শাস্তির প্রকৃতি ও মাত্রা অপরাধীর বর্ণের উপর নির্ভরশীল ছিল। হিন্দু আমলে রাষ্ট্র, বর্ণ বা গ্রাম সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলি একই রকম অপরাধে অপরাধী হলেও বিভিন্ন ব্যক্তিকে বর্ণ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির বিধান দিত। মুসলমান রাজশক্তি কায়েম হলে শহরাঞ্চলে বিচারব্যবস্থা একটি সংহত রূপ পরিগ্রহ করলেও গ্রামীণ বিচারব্যবস্থা পূর্বতন রূপটিকে আঁকড়ে ধরে থাকতে সক্ষম হয়।

ব্রিটিশ ভারতে বিভিন্ন বর্ণের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত সমিতিগুলি সদস্যদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দ্রুত হারাতে থাকে। বর্ণসংক্রান্ত নিয়মকানুন অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর জরিমানা ধার্য বা অনুরূপ ধরনের শাস্তি-বিধানের ক্ষমতা ঐ সমিতিগুলির কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। বর্ণগুলির আইনগত ভিত্তি অস্বীকৃত হলে শাস্তিবিধানের ক্ষমতা স্বভাবতই বেআইনী হয়ে পড়ে। বর্ণগুলি হীনবল হয়ে উঠতে থাকে। বর্ণোদ্ভূত অসামর্থ দূরীকরণ আইন (১৮৫০), বিশেষ বিবাহ আইন (১৮৭২), বিশেষ বিবাহ সংশোধন আইন (১৯২৩) ইত্যাদি বর্ণের অশুভ প্রভাব কিছুটা লাঘব করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক বৈষম্য দূরীকরণের কাজে ব্রতী হয়েছিল এমন নয়। বর্ণব্যবস্থার অসামর্থ থেকে সকল ভারতবাসীকে আইনানুগ মুক্তি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক মানবিক একটি কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল মাত্র। ভারতীয় সমাজজীবন থেকে বর্ণের অভিশাপ দূর করার কোন বাসনা বা কার্যক্রম ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। বরং বলা যায়, ১৮৫৭ সাল পরবর্তী ভারতে সমাজসংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণে অনীহা প্রদর্শন করে

শাসনকর্তৃপক্ষ পরোক্ষে রক্ষণশীল ভারতীয় মহলগুলির সহায়তা করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক-বিদ্রোহ বৎসরগুলিতে রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমাজসংস্কারমূলক কাজে সরকারী আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের শিশুপাঠ্য পুস্তকগুলি সরকারী অনুমোদনের ফলে বিপুল প্রচার লাভ করে।[6] কিন্তু বিদ্রোহ-পরবর্তী বৎসরগুলিতে সমাজসংস্কারের কার্যক্রমে সরকারী উৎসাহ শুদ্ধ হয়ে যায়। সরকারী আইন সমাজসংস্কারের নীতি রূপায়ণের আদর্শ ত্যাগ করে।

৪. নূতন সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রভাব

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতের অর্থনীতির মৌল পরিবর্তন ঘটে: সামন্তবাদী ভারতীয় অর্থনীতির বিচিত্র ধরনটির রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক পথে বিকাশ লাভ করতে থাকে। ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদির সাথে যুক্ত বহু রকম কাজকর্ম করতে দক্ষ মানুষের প্রয়োজন দেখা দেয়। নানারূপ পেশার উদ্ভব ঘটতে থাকে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র অনুসারী শ্রমবিভাগের মাধ্যমে সব রকম পেশায় দক্ষ মানুষ সরবরাহ করা অসম্ভব ছিল। চতুর্বিধ শ্রমবিভাগের ছকটি পশ্চাৎপদ, ব্রিটিশপূর্ব অর্থনীতির সাথে মোটামুটি সামঞ্জস্য বজায় রাখলেও ধনতান্ত্রিক বিকাশের সাথে সাথে তা অচল হয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয়দের মধ্যে নূতন নূতন সামাজিক গোষ্ঠী তৈরী হতে থাকে; নূতন স্তরবিন্যাস রচিত হতে থাকে। পুঁজিপতি, শ্রমিক, জমিমালিক কৃষক, ভাগচাষী, ডাক্তার, উকীল, প্রযুক্তিবিদ্, বাস্তুকার, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক ও পরীক্ষক ইত্যাদি পেশায় বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায় থেকে মানুষের সমাবেশ ঘটতে থাকে। বর্ণ ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের চেয়ে এই গোষ্ঠীগুলির স্বকীয় রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক স্বার্থ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিল-মালিক, বণিক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, সাংবাদিক, শিক্ষক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ সংঘবদ্ধ হতে থাকেন। জীবিকা ও পেশাগত সংঘবদ্ধতা এরূপভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, আর বর্ণভিত্তিক সংহতি হ্রাস পেতে থাকে। বর্ণভিত্তিক প্রাচীন উল্লম্ব সামাজিক স্তরবিন্যাস দুর্বল হয়ে অনুভূমিক স্তরবিন্যাসের পথ সুগম করে দেয়।[7]

৫. রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

ঔপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সাথে সাথে ভারতবাসীর বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপতা প্রবলতর হতে থাকে। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিকভাবে ঐ বিরূপতাও সামঞ্জস্য রক্ষা করতে থাকে। সকল ভারতবাসীর সাধারণ শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপস্থিতি বর্ণ, ধর্ম, প্রদেশ, অঞ্চল, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে ভারতীয়গণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উষালগ্ন থেকে শুরু করে মধ্যগগনের দীপ্তিকাল পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃস্থানীয় চিন্তা বরাবরই বর্ণ সম্পর্কে বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করেছিল। বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহন রায় তাঁর মতামত 'বজ্রসূচি'-তে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবন থেকে অবশ্য বর্ণ-নির্ধারিত সকল বিধি-নিষেধ বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এমন নয়। পশ্চিমী চরম যুক্তিবাদের প্রবক্তা 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের স্রষ্টারা বর্ণব্যবস্থার কুফল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সঙ্গে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্থাপিত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আদর্শ, রণকৌশল ও আন্দোলনের পদ্ধতি বর্ণ বা সম্প্রদায়গত আবেদনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করেনি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, লিবারেল ফেডারেশন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত সংগঠনগুলি বর্ণ বা ধর্মবিশ্বাসের পরিধির সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে ভারতবাসীর কাছে তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক আবেদন পৌছে দিতে পেরেছিল। বর্ণগত সুযোগসুবিধার প্রলোভনে তাদের ভাবী দিনের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ভারতের চিত্রটি কলঙ্কিত হয়নি।

১৯২১-'২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-'৩৩ সালের আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামকে সাবালকত্বের গৌরব দান করে। সংগ্রামী চেতনা সারা ভারতে ব্যাপ্তি লাভ করে বর্ণভিত্তিক কূপমণ্ডুকতাকে আঘাত করতে শুরু করে। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সংগঠনগুলির আন্দোলন বরাবরই বর্ণব্যবস্থার প্রভাবমুক্ত থাকে। জাতীয় আন্দোলন ও শ্রেণীসচেতন সংগ্রাম বর্ণব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য শিথিল করে তুলতে সহায়ক হয়।

৬. শ্রেণীসংগ্রামের প্রভাব

সমকালীন অর্থনীতির প্রয়োজনে উদ্ভূত সামাজিক শ্রেণীগুলি আধুনিক জীবনের বস্তুগত দিকগুলিকে প্রকৃত স্বরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। শোষিত শ্রেণীগুলি শোষক শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করতে শেখে। আর্থিক সুযোগসুবিধা আদায়ের জন্য শোষিত শ্রেণীগুলি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। এরূপ আন্দোলন ঐ শ্রেণীগুলির রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়। বর্ণভিত্তিক সঙ্কীর্ণ ঐক্যের পরিবর্তে শ্রেণীগত ঐক্য দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে। শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি, বণিক, মিল-মালিক, বুদ্ধিজীবী, জমিদার প্রভৃতি শ্রেণীগুলি নিজ নিজ স্বার্থের প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্ব-ভারতীয় চরিত্র অর্জন করে। শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলি শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বর্ণভিত্তিক ঐক্যের অবাস্তবতাকে প্রকট করে তোলে।

ঔপনিবেশিক ভারতের সব শ্রেণীগুলিই রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রয়োজনে বর্ণের অমোঘ নিয়ম অবজ্ঞা করতে বাধ্য হয়। বিভিন্ন বর্ণভুক্ত শ্রমিক-কৃষকেরা যেমন একজোট হতে শেখে, বিভিন্ন বর্ণভুক্ত ধনিকেরাও তেমন ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে। শ্রেণী-সংগ্রাম বর্ণব্যবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণ দূর করতে সক্ষম হয় এমন নয়। যুগযুগান্তের অভ্যাস, প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব, ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের অসম বিকাশ ইত্যাদি কারণে অধুনিক সামাজিক শ্রেণীগুলি বর্ণব্যবস্থার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পায়নি।

বর্ণব্যবস্থার সামাজিক-রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণঃ সাম্প্রতিক গবেষণার নিরিখে

প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাস তাঁর শিক্ষক ঘুরাইর বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করে ১৯৫৭ সাল নাগাদ এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ভারতীয় বর্ণ-ব্যবস্থা 'ক্ষুদ্র রাজত্ব' ছেড়ে স্বাধীনভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তাঁর মতে বর্ণব্যবস্থা গ্রামীণ আঞ্চলিক এলাকায় শুধুমাত্র সীমিত না থেকে সারা ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত হয়েছেঃ **'বোতল-পোরা প্রেতাত্মা ছিপি খুলে বেরিয়ে পড়েছে।'** 'বর্ণব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা বিলোপ সংক্রান্ত আলোচনার রিপোর্টে' তিনি লিখেছিলেন, 'সাধারণভাবে নিশ্চিতরূপে একথা বলা চলে

যে, বিগত একশত বৎসরে বর্ণসংহতিতে বিপুল বৃদ্ধি ও তার ফলে অঞ্চলস্থ বিভিন্ন বর্ণগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতাতে হ্রাস লক্ষ্য করা গিয়েছে।'[৪]

শ্রীনিবাসের উক্তিটি অবশ্য আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্ণগুলির ক্ষেত্রে 'সংহতিবৃদ্ধি' খুঁজতে হবে প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকগুলির অপসারণ এবং পরিবহন ও গণজ্ঞাপন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির মধ্যে। গণতান্ত্রিক ভাবধারা, সংগঠন ইত্যাদির সুযোগ গ্রহণ করে বর্ণগুলি নিজেদের সংহতি ব্যাপ্ত করে দিতে পেরেছে। আবার সংযোগব্যবস্থার উন্নতির ফলে নির্দিষ্ট বর্ণভুক্ত মানুষেরা দূরত্বের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে।

একদিকে যেমন বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্ণগুলির সংহতির বৃদ্ধি ঘটেছে, অন্যদিকে তেমন বর্ণগুলির মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার হ্রাস ঘটেছে। আবার, বর্ণগুলি যতই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে সংশ্লিষ্ট মানুষকে সংহত করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে, গ্রামীণ এলাকাতে বর্ণব্যবস্থার কঠোর নিয়মকানুন ততই শিথিল হয়েছে। দৈনন্দিন গ্রামজীবনে বর্ণ-সংগঠনগুলির অনুপ্রবেশ ক্রমহ্রাসমান হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ভারতে বর্ণগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক সময় উত্তেজনাময় পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-বিরোধী অব্রাহ্মণ আন্দোলন একাধিকবার সংগঠিত হয়েছে। বিভিন্ন বর্ণভুক্ত শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তর, দক্ষিণ নির্বিশেষে হরিজনদের জীবন, গৃহ, সম্পত্তি ইত্যাদি উচ্চবর্ণভুক্ত মানুষদের স্বার্থান্ধ অংশের ষড়যন্ত্রের আগুনে ছাই হয়েছে বারবার। সমাজতত্ত্ব-বিদদের একাংশ এসব ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণ করে রায় দিয়েছেন যে, **ভারতে বর্ণব্যবস্থা আরও জোরদার হয়েছে।** বর্ণভুক্ত মানুষদের নিজেদের মধ্যে সংহতি বেড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদদের সাম্প্রতিক রচনাবলী পাঠে প্রতীতি জন্মে যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ এবং বিশেষ করে নির্বাচনব্যবস্থায় সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীগুলির অধিকতর সুবিধা বর্ণগুলির ক্ষমতা অর্জন ও প্রয়োগের নূতন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। ক্ষমতাবান হয়ে বর্ণগুলি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতালাভে ক্রমবর্ধমান উদ্যোগ গ্রহণ করছে। **বর্ণগুলি রাজনীতিসমৃদ্ধ হচ্ছে, রাজনীতি বর্ণব্যবস্থার ক্রটিবিচ্যুতিতে আবিল হচ্ছে না।**[৫] শ্রীনিবাসের মতে বর্ণগুলির ক্ষমতা

এই কারণে জোরদার হচ্ছে। নির্মলকুমার বসু এরূপ ক্ষমতাবৃদ্ধিকে প্রকৃত সত্যের একটি বিশেষ দিক মাত্র বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, উৎপাদন-ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক সম্পর্ক ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক পথপরিক্রমায় দীর্ঘকাল রত থেকে ভারতের বর্ণব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ভিত্তিকে যে ক্রমাগত দুর্বল করে তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুর্বল করে তোলার প্রক্রিয়াটি ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে অব্যাহত শক্তিতে ক্রিয়াশীল।

আন্তর্বর্ণ সম্পর্ক বিংশ শতকের ভারতে উত্তেজনাবিহীন থেকেছে এমন নয়। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ সংগ্রাম ভারতীয় সামাজিক জীবনকে অশান্ত করেছে বহুবার। একদিকে যেমন এই অশান্তি **বর্ণগুলির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে,** অন্যদিকে তেমন **বর্ণব্যবস্থার দুর্বলতা দ্যোতনা করে**। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণ-বিরোধী বিক্ষোভগুলি নিঃসন্দেহে বর্ণব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা মূর্ত করে তুলেছিল। বর্ণ অনুযায়ী উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ এ ধরনের বিক্ষোভগুলির ফলে সাম্প্রতিক কালের ভারতে বেশ কিছুটা কমেছে। বর্ণগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অনুরূপভাবে ক্রমহ্রাসমান হয়েছে।

সংগঠনগত দিক থেকে বর্ণব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হলেও, ধারণাগত দিক থেকে ঐ ব্যবস্থার সারাংশ অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে কয়েকজন দিকপাল সমাজতত্ত্ববিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন বর্ণভুক্ত হয়েও বর্ণব্যবস্থার নিয়মকানুন ও বাধানিষেধের প্রভাব থেকে অনেকাংশে মুক্ত বলে সিদ্ধান্তে এসেছেন ডেভিড পোকক্। তিনি বলেছেন, **'বর্ণগুলি আছে, কিন্তু বর্ণব্যবস্থা আর নেই।'**[10] এই আপাতবিরোধী সত্যের মর্মার্থ এই, বর্ণব্যবস্থার উচ্চ-নীচ পর্যায়ক্রমিক মর্যাদা সংগঠনবিহীন তারতম্যের আবির্ভাবে বিলীন হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকার ভারতীয়দের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ভারতের অভ্যন্তরেও ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে উঠ্ছে বলে কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ মনে করে থাকেন। পোকক্, ঘ্যুরাই প্রমুখ সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌দের গবেষণালব্ধ ধারণার অন্যতম মূল বক্তব্য এই যে, বর্ণব্যবস্থা বিলুপ্তির পথে না গিয়ে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সাথে নিজেকে সুসমঞ্জস করে অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়াসে চলমান থেকেছে। ঘ্যুরাই থেকে শুরু করে এ. আর. দেশাই, শ্রীনিবাস ছাড়িয়ে তরুণ ভারতীয় সমাজতত্ত্ব-বিদ্‌দের কেউই মনে করেন না যে, বর্ণব্যবস্থা ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে উৎখাত হয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন, বর্ণব্যবস্থা যেমন ছিল

তেমন আছে, কেউ কেউ বলেন—যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়েছে, আবার অন্য কেউ কেউ বলেন—যেমন ছিল তেমন আর নেই, রূপান্তরিত স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

উদ্ভবকাল থেকে শুরু করে সমকাল পর্যন্ত ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা নির্দিষ্ট, স্থায়ী ও সমরূপ স্তরবিন্যাসের পত্তন ঘটিয়ে স্থবির থেকেছে এমন নয়। অন্তপ্র'বাহী চলমান একটি প্রক্রিয়ায় সমগ্র ব্যবস্থাটি গতিশীলতা অর্জন করেছে। এই গতিশীলতা বিভিন্ন নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষকে উচ্চবর্ণের সমতুল্য মর্যাদালাভে সহায়তা করেছে, আবার অন্যদিকে সংস্কৃত শাস্ত্র ও বৈদিক হিন্দুধর্মীয় রীতিপদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা করেছে। যে প্রক্রিয়ায় এই দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধন সম্ভব হয়েছে শ্রীনিবাস তার নামকরণ করেছেন **সংস্কৃতায়ন**। তাঁর মতে ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সংস্কৃতানুগ রীতিপদ্ধতির প্রচলন বেশী লক্ষ্য করা যায়। নিম্নবর্ণভুক্ত মানুষেরা ব্রাহ্মণদের অনুকরণে সংস্কৃতানুগ রীতিপদ্ধতি অনুসরণ করে মর্যাদালাভে আগ্রহী হয়; নিম্নবর্ণগুলি শ্রেষ্ঠতর মর্যাদালাভের তাগিদে শুধুমাত্র উচ্চতম বর্ণই নয়, অন্যান্য উচ্চবর্ণগুলির অনুকারকে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলি ও নিম্নবর্ণগুলিকে হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় জোটবদ্ধ রাখতে সাহায্য করেছে।[11]

হিন্দুধর্মের বিস্তার সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজতর হয়ে থাকে: দেবদেবী, মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকা, নদী, বৃক্ষরাজি, পর্বতমালা, ধর্মীয় উপকথা ও স্থানমাহাত্ম্য ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উপাদান। বর্ণব্যবস্থা এরূপ উপাদানগুলির অন্যতম প্রধান। কোন গোষ্ঠীর হিন্দুধর্মের অঙ্গনতলে আবির্ভাব বর্ণভুক্তির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়। নিম্নবর্ণ গোষ্ঠী উচ্চতর বর্ণের রীতিনীতি, আচার-বিচার, আচরণ অনুসরণ করে বর্ণমানকের উর্ধ্ব'দিকে নিজের স্থান নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়। ডঃ ভি. রাঘবনের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, 'সংহত ও সুসমঞ্জস' ব্যবস্থা হিসাবে সর্বভারতীয় হিন্দুধর্মের স্বরূপ গঠনে বর্ণব্যবস্থার ভূমিকা ছিল অপরিসীম।[12]

সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া বর্ণব্যবস্থার অতীত, বর্তমান ও ভাবী বাস্তবতার মৌল গতি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম এমন নয়। তবে এই প্রক্রিয়াটি যে ক্রিয়াশীল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু **সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার ধারণাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়।** নিম্নবর্ণভুক্ত ব্যক্তিরা উচ্চবর্ণভুক্ত ব্যক্তিদের রীতিনীতি, আচার-বিচার কেন অনুকরণ করে তা ব্যাখ্যা না করে এই

ধারণাটি অনুকরণের ঘটনাকেই গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তাছাড়া, অনুকরণের ব্যাপারটি যে শুধুমাত্র নিম্নবর্ণ থেকে উচ্চবর্ণ অভিমুখে ধাবিত হয় এমন নয়, উল্টোটিও ঘটে থাকে। সংস্কৃতায়নের ধারণাটি এই উল্টো প্রক্রিয়া সম্পর্কে নীরব। আবার, এ ধারণাটি জনমানসে উচ্চতর মর্যাদায় সমাসীন বিদেশীদের অনুকরণ সম্পর্কেও নীরব। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় উচ্চবর্ণ-গুলির অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা ইউরোপীয়গণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃতায়ন এ দিকটিতে আলোকসম্পাত করেনি। সর্বশেষে বলা যায়, সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় অনুকরণের সংজ্ঞাটি সঠিকভাবে নির্দিষ্ট না হওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন, হাজার হাজার বছর পরেও সকল বর্ণভুক্ত হিন্দুরা উচ্চতম বর্ণভুক্ত মানুষদের রীতিপদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারে কেন সংস্কৃত হল না বোঝা দুরূহ।[১৪]

'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড সোসাইটি অ্যামঙ দি কুর্গস্ অফ সাউথ ইণ্ডিয়া' শীর্ষক গবেষণামূলক নিবন্ধে বর্ণিত সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া যে অসম্পূর্ণ উপলব্ধি করে স্বয়ং শ্রীনিবাস ও আরও কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান ও গবেষণা পরিচালনা করেন। সারা ভারতে ব্রাহ্মণদের অনুসৃত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার অনুকরণের সাধারণ একটি নমুনা বজায় থাকলেও তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলে এই নমুনাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকেনি। কোন কোন অঞ্চলে রাজকীয় বা ক্ষত্রিয় জীবনযাত্রা প্রণালী ব্রাহ্মণ জীবনযাত্রা পদ্ধতির সমপরিমাণ, এমন কি অধিকতর, মর্যাদা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এসব অঞ্চলে ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত রাজপুতদের জীবনযাত্রায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। এমন কি, কৃষক বা বণিক সম্প্রদায় যেসব অঞ্চলে ক্ষমতাবান, সেসব অঞ্চলে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণভুক্ত নির্বিশেষে সকলেই ঐ দুই সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রভাব অনুভব করেছেন। ১৯৫২ সালের পরবর্তী বৎসরগুলির গবেষণা ও পশ্চিমী নৃতত্ত্ববিদ্‌দের সমালোচনায় সমৃদ্ধ হয়ে শ্রীনিবাস তাঁর সংস্কৃতায়ন তত্ত্বে কিছু কিছু সংযোজন, সংশোধন করেন।[14]

শ্রীনিবাস জে. এফ. ষ্টালের সমালোচনার সাথে ঐক্যমত হয়েছেন যে, 'সংস্কৃতানুগ হিন্দুত্ব' সংস্কৃতায়নের সাধারণ একটি সর্বভারতীয় কাঠামোর উপর সুস্থির হয়ে আছে এমন নয়। ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক তারতম্য সংস্কৃতায়নের ছকটিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছে। অনেক ক্ষেত্রে ছকটি স্থান ও কাল

অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয়েছে। ভি. রাঘবনের গবেষণামূলক কাজকর্ম বর্ণব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য' প্রতিধ্বনিকে পুনরুদ্ধার করতে প্রয়াসী হয়েছে।[15] সংহতি ও বৈচিত্র্য রক্ষার তাগিদে বর্ণব্যবস্থা একদিকে যেমন সংস্কৃতানুগ হিন্দুত্বে বিধৃত থাকতে প্রয়াসী হয়েছে, অপরদিকে তেমন কাল ও অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী নিজেকে ভিন্নতর করে তুলতে তৎপর থেকেছে। সমকালের ভারতে অঞ্চলগত বিপুল বিভিন্নতা সত্বেও বর্ণব্যবস্থার সামগ্রিক একটি ঐক্য লক্ষণীয়।

আধুনিক সামাজিক শ্রেণীগুলির বিকাশ

ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে ভারতে ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল। আবার, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের নিশ্চয়তা ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য সামন্তবাদী শক্তিগুলির সাথে ঐ শ্রেণী সময়, সুযোগ ও পরিস্থিতি বুঝে আপোষরফায় অগ্রসর হয়েছিল। এরূপ দ্বৈত ঘটনার ফলশ্রুতিতে ঔপনিবেশিক ভারতে নূতন কতগুলি সামাজিক শ্রেণীর বিকাশ ঘটে এবং প্রাচীন সামাজিক শ্রেণীগুলির ক্রমান্বয় রূপান্তরের মাধ্যমে চরিত্রগত মৌল পরিবর্তন সাধিত হয়।

ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার পত্তন, আধুনিক শিল্পের জন্ম, রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা, শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিতে দেশী-বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ এবং পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার প্রসার ভারতীয় সমাজে নূতন কতগুলি সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টির সহায়ক হয়েছিল। এই শ্রেণীগুলি হল: ১. জমিদার, ২. প্রজা, ৩. উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত জমিমালিক কিষাণ, ৪. কৃষিশ্রমিক, ৫. ধনিকশ্রেণী, ৬. সর্বহারাশ্রেণী, ৭. পশ্চিমী ভাবধারাপুষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্রেণী।

রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতি রাজন্যবর্গ, বণিক সম্প্রদায়, মহাজন, গ্রামীণ কারিগর ও শহরবাসী হস্তশিল্পীরা প্রাচীন সমাজের শ্রেণীব্যবস্থার শুধুমাত্র প্রতীকরূপে ঔপনিবেশিক ভারতে অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন এমন নয়, সামাজিক অর্থনীতির ধনতান্ত্রিক বিকাশের গতিপ্রকৃতির সাথে সাযুজ্য রচনা করে নিজেদের ভূমিকার নূতন সংজ্ঞা নির্ণয়ে তৎপর হয়েছিলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সামন্তপ্রভুরা ঔপনিবেশিক আমলেও বিলাসব্যসনে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের শ্রেণীগত ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের কাছে হস্তান্তরিত

হয়েছিল ; তাঁদের রাজ্যগুলির অর্থনীতি ব্রিটিশ ভারতের অর্থনীতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক বিচারব্যবস্থা ও রেলওয়ে দেশীয় রাজ্যগুলিতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও সামাজিক, আর্থনীতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতের সমকক্ষ আধুনিকীকরণে বিধৌত হয়নি একথা সত্য। দেশীয় রাজন্যবর্গও সামন্তপ্রভুর চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন এমন নয়। কিন্তু তাঁরা ভূমিরাজস্বের উপর নির্ভরশীলতার হ্রাস ঘটাতে বাধ্য হয়ে ক্রমে ক্রমে আধুনিক শিল্পগুলিতে অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। সীমিত ক্ষেত্রে দেশীয় রাজন্যবর্গ ধনিকশ্রেণীর অংশ হিসাবে বিবর্তনের পথপরিক্রমায় রত হয়েছিলেন বলা যায়।

বণিক ও মহাজন সম্প্রদায় ব্রিটিশপূর্ব ভারতে বিরাজমান ছিল। ঔপনিবেশিক আমলে ঐগুলির গুরুত্ব শুধু বেড়ে যায় এমন নয়; ঐগুলি বিকাশোন্মুখ সামাজিক অর্থনীতিতে শ্রেণী হিসাবে নিজেদের ভূমিকাকে যুগোপযোগী করে তুলতে সক্ষম হয়। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে মহাজনেরা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্দেশিত হারে কৃষক ও কারিগরদের ঋণ দিতেন, কিন্তু ঋণের অর্থ অনাদায়ে ভূসম্পত্তি, গবাদি পশু ইত্যাদি তাঁরা নিজেদের মালিকানায় কুক্ষিগত করতে পারতেন, কেননা গ্রামের সব জমিজমার মালিক ছিল গ্রামীণ সম্প্রদায়। ব্রিটিশ আমলে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা কায়েম হলে এবং কৃষিজ দ্রব্য পণ্যদ্রব্যে পরিণত হলে মহাজনদের কর্মজগতের পরিধি বিস্তৃততর হয় এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতিতে উৎপাদনব্যবস্থা ও জাতীয়-আন্তর্জাতিক বাজারের সম্পর্ক যতই নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে বণিক সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ পূর্বতন সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র অতিক্রম করে ততই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়। ব্রিটিশ ভারতে গ্রামীণ ও শহুরে, কৃষিজ ও শিল্পজ সকল রকম উৎপাদন বাজারের চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পড়েছিল। বণিক সম্প্রদায় জমিদার, প্রজা, ভূমিমালিক কৃষক, শিল্পপতি প্রভৃতি উৎপাদকদের কাছ থেকে কৃষিজ ও শিল্পদ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের বিপুল সুযোগ লাভ করেছিল। এরূপভাবে বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাণিজ্যিক বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর জন্মলগ্ন সূচিত হয়।

ঔপনিবেশিক ভারতে গ্রামীণ কারিগর এবং শহরের হস্তশিল্পগুলিতে নিযুক্ত শিল্পীরা শ্রেণী হিসাবে অবলুপ্ত হয়েছিল এমন নয়। নূতন সামাজি ক

শ্রেণীগুলির পাশাপাশি তারাও অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল, কিন্তু ভারতের সামাজিক অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের অধস্তন কারিগর হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত থাকার বাধ্যবাধকতা থেকে তারা মুক্তি পায় এবং স্বাধীন উৎপাদক হিসাবে বাজারে বিক্রয়যোগ্য শিল্পদ্রব্য সরবরাহের স্বাধীনতা লাভ করে। শহরবাসী হস্তশিল্পীরা রাজা, মহারাজা, বাদশাহ, নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিদের অধীনে কর্মরত না থেকে স্বাধীন মর্যাদায় নিজেদের দক্ষতা ও নৈপুণ্য অনুযায়ী বাজারের জন্য সরাসরি উৎপাদনে লিপ্ত হয়। ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে গ্রামীণ কারিগর ও শহরবাসী হস্তশিল্পীরা জীবিকানির্বাহের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আধুনিক ভারতীয় সামাজিক শ্রেণীগুলির উদ্ভব, বিকাশ ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রধানত শ্রেণীগুলির সঙ্ঘবদ্ধতার ইতিহাস সম্পর্কে আলোকসম্পাত করা হয়েছে।

জমিদারশ্রেণী: 'রাজ'-অনুগত শোষক

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে জমিদারি ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক যুগ জুড়ে বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঐ প্রয়োজন মিটিয়েছিল বলা যায়। ব্রিটিশ রাজ জমিদারশ্রেণীকে **রাজভক্ত, অনুগত মিত্রশক্তি** হিসাবে লাভ করেছিল এবং এই শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনে আগ্রহী ছিল। পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের তাগিদ, বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল।

একাধিক গভর্নর জেনারেল জমিদারি ব্যবস্থার উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্টকরণের তাৎপর্য এবং ক্ষমতাবান জমিদারশ্রেণীর অচঞ্চল রাজভক্তির রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করেই তাঁরা এরূপ সন্দেহমুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন।[16] বেন্টিঙ্ক থেকে শুরু করে, লরেন্স, লীটন প্রভৃতি সকলেই জমিদারি ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষায় আগ্রহী ছিলেন।

ভারতীয় জমিদারদের চিন্তাভাবনা, আবেদন-নিবেদন, এবং দাবিদাওয়া

ব্রিটিশ রাজের স্বার্থের পরিপন্থী হিসাবে কখনো প্রতিভাত হয়নি। ১৮৩৮ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫১ সালে একই শহরে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' জন্মলাভ করে। স্বল্পকাল স্থায়ী প্রথম সংগঠন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী দ্বিতীয় সংগঠনটির কাজকর্ম পর্যালোচনা করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার তাগিদ ঐগুলির বিষয়বস্তু, চরিত্র ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয় সংগঠনটি ভারতীয় সংগঠিত রাজনীতির প্রত্যূষে জনসাধারণের নামে ও প্রয়োজনে কিছু কিছু গণতান্ত্রিক দাবি উত্থাপন করেছিল; বলা বাহুল্য, অধিকাংশ দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, সংগঠনটির অভিজাত শ্রেণীচরিত্র ক্রমশ প্রতিভাত হতে থাকে। জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কোন সময়েই এই সংগঠনটি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি।

১৮৫৭ সালের ২২শে মে গৃহীত একটি প্রস্তাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন দিল্লী ও মীরাটের বিদ্রোহীদের আচরণের নিন্দা করেছিল। দিল্লীর পতন ঘটলে বর্ধমানের মহারাজা ও ২,৫০০ জন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি ব্রিটিশ রাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাঁর 'ইণ্ডিয়ান ডায়েরি'-তে (১৯৩০) ই. এস. মণ্টাগু লিখেছিলেন যে, 'সর্বোত্তম ধরনের রক্ষণশীল ভারতীয় বর্ধমানের মহারাজার নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন মোটামুটি একটি রক্ষণশীল সংস্থা। ...ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে—নিরুত্তাপ সম্মতিমাত্র নয়, ঐ ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। তিনি একজন বৃহৎ ও ধনী জমিদার এবং তাঁর বাসনা রয়েছে যেন তাঁকে স্বাধীন শাসকে পরিণত করা হয়।'[17]

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা জমিদারদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে আরও বেশী রাজভক্ত চরিত্রে ক্লিষ্ট করে। 'রাজ' আনুগত্যের শপথের উপর ভিত্তি করে জমিদারেরা আরও বেশী সুযোগসুবিধা দানের দাবি জানাতে তৎপর হন। জমিদারি ব্যবস্থার সর্বভারতীয় ব্যাপ্তি তাঁদের কাম্য হয়ে ওঠে। স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী হিসাবে তাঁরা ভবিষ্যতে বিপ্লবের সম্ভাবনাকে রুখে দিতে সক্ষম বলে আত্মগর্ব প্রচারে লিপ্ত হন। স্বদেশের শাসন পরিচালনা করার সামর্থ ভারতীয়দের নেই বলে তাঁরা মনে করতেন। শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী নিয়মতান্ত্রিক শাসন ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বর্ণনা করেন। সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুর 'হিন্দু আনুগত্য' সংক্রান্ত তত্ত্বে 'রাজ' আনুগত্য প্রচার করেন। রাজেন্দ্রলাল

মিত্র বলেন, দেশপ্রেমের অর্থ যদি বিদেশী সবকিছুকে মন্দ বিবেচনা করার সামিল হয়, তাহলে দেশপ্রেম বস্তুটি নিজেই বর্জনীয়। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কুখ্যাত দেশীয় ভাষা আইন (১৮৭৮) পাশের ব্যাপারে সরকার পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল ব্রিটিশ সহযোগিতায় স্বায়ত্তশাসন কল্পনা করেছিলেন। নির্বাচনপ্রথা এবং প্রত্যক্ষ কর আরোপ ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাটিকে তিনি জমিদার স্বার্থরক্ষক বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। ১৮৮৩ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের খসড়া আলোচনার সময় তিনি আইনসভায় প্রজাবিরোধী বক্তব্য উপস্থাপনে কুণ্ঠিত হননি।

জমিদারেরা ভারতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল ভূমিকা পালন করেছিলেন বলা যায় না। আর্থ-সামাজিক স্থিতাবস্থা তাঁদের কাম্য ছিল। বণিক বা শিল্পপতিদের কর্মোদ্যোগ তাঁদের মধ্যে ছিল না। তাঁরা রক্ষণশীল ও অগণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। যতদিন সম্ভব তাঁরা ব্রিটিশ রাজের নিরাপত্তা ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করেছিলেন; যতদিন সম্ভব তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসারে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম দুর্বার হয়ে উঠলে তাঁরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে দক্ষিণপন্থার শক্তিকে জোরদার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। পরে কেউ কেউ রক্ষণশীল ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনে সক্রিয় হয়েছিলেন।[18] দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সভ্যতা-ধ্বংসকারী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে নিশ্চিত রক্ষাকবচ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। শ্রেণী হিসাবে জমিদারেরা সমাজসংস্কার বা সমাজপ্রগতির বিরোধী শক্তি হিসাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু'তিন দশক নাগাদ জমিদারদের সংখ্যা বিপুল হয়ে দাঁড়ায়—১৮৮৩ সালে দেড় লক্ষের কিছু বেশী। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যসংখ্যা স্বভাবতই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, তথাকথিত জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন আসলে মধ্যস্বত্বভোগী, তালুকদার বা ধনী কৃষক। এঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সমাজজীবনে নিজেদের জমিদার ও রক্ষণশীলতার ধ্বজাধারী হিসাবে প্রচারে রত থাকলেও, আর্থনীতিক বিচারে এঁদের মধ্যবিত্ত হিসাবে গণ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। এঁদেরই সন্তানসন্ততিরা চাকুরি, পেশা বা বৃত্তিতে অংশগ্রহণ করে বিশিষ্ট হয়ে

উঠতে থাকেন। ভূমিনির্ভর শ্রেণী থেকে উদ্ভূত এরূপ ব্যক্তিদের কাছে শিল্প-বাণিজ্যের পথ খোলা ছিল না। বাণিজ্যিক ও কারিগরী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এঁদের কর্মজীবনের সূত্রপাত ঘটেনি। উৎপাদনব্যবস্থার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কবিচ্যুত হয়ে, পশ্চিমী সাহিত্যধর্মী শিক্ষাদীক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা সরকারী চাকুরি, আইনব্যবসা, অধ্যাপনা-শিক্ষকতা, চিকিৎসা, পৌরোহিত্য, দালালি ইত্যাদি কাজকর্মের মধ্যে আত্মনিয়োগ করেন। প্রশাসনিক ও আইনগত পরিস্থিতির অনুকূল পরিবেশে ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর জন্মলগ্ন সূচিত হয়।[19]

ব্রিটিশ শাসনকালে দেশীয় রাজন্যবর্গ, জমিদারশ্রেণী, পেশাগত গোষ্ঠীগুলি, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং বণিকসভার প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন ব্যাপারে সরকারী মনোনয়নের পক্ষপাতিত্ব লাভ করেছিলেন। রাজন্যবর্গ ও জমিদারশ্রেণী সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই সরকারী সুনজর ও সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা সমীচীন মনে হয় না যে, জমিদারগণ ব্রিটিশ শাসনকালে নিজেদের আর্থিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঔপনিবেশিক ভূমিরাজস্ব নীতি, বিশ্ববাজারে কৃষিজ দ্রব্যের মূল্যহ্রাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কৃষি, শিল্পে অনগ্রসরতা, প্রজাদের অপরিসীম দারিদ্র্য ইত্যাদি নানা কারণে **জমিদারদের আর্থিক অবস্থা ক্রমান্বয় অধোগতি** অর্জন করেছিল।[২০]

কিছু কিছু উদারনীতিবাদী জমিদারদের চিন্তাভাবনা ও কার্যকলাপ এবং বহুশ্রেণী-ভিত্তিক ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কৌশল বিক্ষুব্ধ প্রজাদের রোষবহ্নি থেকে জমিদারশ্রেণীকে বাঁচবার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় গান্ধী জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হননি ঠিকই; কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের অনেকেই ভূস্বামী পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে জমিদারবিরোধী কার্যক্রমে জাতীয় আন্দোলন নিজেকে নিয়োজিত করতে সুদীর্ঘকাল অক্ষম ছিল।

প্রজা: নূতন ভূমিব্যবস্থার পিলসুজ

জমিদারি ব্যবস্থা পত্তনের সাথে সাথে তাঁদের অধীনস্থ প্রজাদের জীবন ক্রমশঃ দুর্বিষহ হয়ে উঠতে থাকে। খাজনার বোঝায় ভারগ্রস্ত, চাষরত কৃষক

জমিদারদের অন্যান্য বহু ধরনের শোষণে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে থাকে। জমিদার ও চাষীর মধ্যবর্তী স্থানে বহু পরগাছা শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে; এই শ্রেণীগুলি কৃষকের রক্ত শুষে বিকশিত হতে থাকে।

রায়তওয়ারি অঞ্চলগুলিতে ভূমিমালিক কৃষকেরা আর্থনীতিক সামর্থের বিচারে উচ্চ, মধ্য ও নিম্নবিত্ত তিনটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু সকল বিভাগের মালিক-চাষীই সরকারী খাজনা, কম-বেশী ক্ষুদ্রায়তন কৃষিজমি, কৃষিক্ষেত্রের ক্রমবর্ধমান খণ্ডিকরণ, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি কারণে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হতে থাকে। নিম্নবিত্ত মালিক-চাষী ক্রমশ কৃষিজমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়; মহাজন, বণিক ইত্যাদি শ্রেণীগুলি ক্রমশ কৃষকদের জমি কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়। কৃষকদের একাংশ জমির মালিকানা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়। কৃষিতে সর্বহারাশ্রেণীর আবির্ভাব যেমন ঘটতে থাকে, গ্রামে অনুপস্থিত জমিদার তেমন সৃষ্টি হতে থাকে। মধ্যম ধরনের আয়বিশিষ্ট মালিক-চাষীদের অবস্থাও ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে গিয়ে নিম্নবিত্ত মালিক-চাষীদের সমতুল্য হয়ে ওঠে।

প্রজাদের তুলনায় মালিক-চাষীরা আগে জাতীয় চেতনার শরিক হয়ে পড়েছিল। কেননা প্রজারা ভারতীয় জমিদারদের আরোপিত খাজনার দাবির সম্মুখীন হত। ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর শোষণের স্বরূপ নিরক্ষর, মূঢ়, দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হত না; কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রের কোষাগারে ভূমিরাজস্বের দাবি মেটাতে বাধ্য মালিক-চাষীদের পক্ষে ঔপনিবেশিক শোষক শক্তিকে সনাক্ত করা সহজ ছিল। কৃষিজমির মালিক কৃষকেরা এই কারণে প্রজাদের আগেই সংগঠিত প্রতিবাদের রাজনীতি গ্রহণে সক্ষম হয়েছিল। বিভিন্ন প্রদেশে প্রজারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ইউনিয়ন গড়ে তুলেছিল বা কৃষিশ্রমিক, চাষী ও চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সম্মিলিত সংস্থা হিসাবে সংগঠিত কিষাণসভাগুলির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিল। কিষাণ-সভা, ইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠনগুলির নেতৃত্ব জওহরলাল নেহ্‌রু, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, স্বামী সহজানন্দ, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ প্রমুখ একনিষ্ঠ জাতীয়তা-বাদীদের করায়ত্ত থাকায় **প্রজাদের আন্দোলন প্রথম থেকেই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সাথে একাত্ম হয়ে পড়ে।** প্রজা আন্দোলন প্রজাদের শ্রেণীগত দাবিদাওয়া ও পতাকা নিয়ে জাতীয় আন্দোলনে সামিল হয়।

ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্র একদিকে যেমন প্রজারা জীবনসংগ্রামের

অভিজ্ঞতায় বুঝতে শিখেছিল, অন্যদিকে তেমন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে আন্দোলনরত থেকে বহুশ্রেণী-ভিত্তিক মোর্চার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিল। কৃষাণ সভাগুলি উচ্চহার ভূমিকর, জমিদারি শোষণ, মহাজনদের প্রজাস্বার্থ বিরোধী বেআইনী কাজকর্ম ইত্যাদির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। ঐ সভাগুলি জমিদারি ব্যবস্থাকে 'অপচয়মূলক, অযোগ্য, সাম্য বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী' বলে আখ্যা দিয়েছিল।[৭১] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কৃষক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর কিষাণসভাগুলির দাবিদাওয়া ও মনোভাব কিছুটা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিল।

কিষাণ, কিষাণ আন্দোলন ও তার প্রকৃতি

ভারতীয় কিষাণের কর্মের, ঘর্মের আর সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যন্ত ঐতিহাসিকের সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে বলা যায়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ঐরূপ ইতিহাস রচনার প্রয়াস গুরুত্ব লাভ করছে।

গবেষণালব্ধ নূতন তথ্যের ভিত্তিতে ক্রমশ একটি ঐক্যমত গড়ে উঠছে যে, 'সংগঠিত রাজনীতির' উদ্ভবের বহু আগে ভারতীয় কিষাণেরা 'ব্রিটিশ রাজের ন্যায়ানুগ শাসনের প্রতি বিশ্বাস' হারিয়ে নানা ধরনের অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিল। জন্ম থেকেই কৃষক আন্দোলন যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয় স্বাধীনতার দাবি ও কৃষক জনতার মুক্তির প্রয়াসে অনুপ্রাণিত ছিল এমন নয়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যতই তীব্র হয়েছিল এবং কৃষকদের অবস্থা যতই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল, কৃষক আন্দোলন ততই রাজনৈতিক সচেতনাতে সমৃদ্ধ হয়েছিল। সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে কৃষক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথ-পরিক্রমার পর শ্রেণীসচেতন চরিত্র অর্জন করেছিল। ভারতীয় গ্রামীণ প্রতিবাদের বৈপ্লবিক চরিত্র অর্জন দীর্ঘকালব্যাপী জটিল প্রক্রিয়ায় সম্ভব হয়েছিল। কৃষক আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল, আবার জাতীয় আন্দোলনের চরিত্রে নিজেই প্রভাবিত হয়েছিল।

ফ্যাননের ঔপনিবেশিক দেশগুলির কৃষকশ্রেণী সম্পর্কিত অভিমত ভারতীয় কিষাণদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে।[৭২] 'ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে কৃষকেরাই একমাত্র বৈপ্লবিক শ্রেণী' এরূপ অভিমতের

সমর্থনে ভারতীয় কৃষক আন্দোলনকে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ভারতের কৃষকদের সংগ্রাম আগাগোড়া বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিল এমন নয়। ভারতের ঔপনিবেশিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি ভারতের সর্বত্র একই সময়ে সমানভাবে বিস্তৃত হয়নি; স্বভাবতই কৃষকদের সংগ্রামী চেতনাও অসমানভাবে অগ্রগতির পথনির্দেশ পেয়েছিল। এই কারণে কৃষক আন্দোলন কখনো কখনো রক্ষণশীলতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্প্রদায়িকতার জঞ্জালে মুখ থুব্‌ড়ে পড়েছিল, আবার শোষিত শ্রেণী হিসাবে ভারতীয় অর্থনীতিতে 'আপেক্ষিক বঞ্চনার' শিকার হয়ে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ক্যাথলিন গওগ্‌ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় কিষাণদের বিদ্রোহগুলি বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সংঘটিত হয়েছিল ভেবে ঐগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৪৪] তাঁর মতে উদ্দেশ্যগুলি ছিল নিম্নরূপ: ১. ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে প্রাক্তন শাসক ও সামাজিক সম্পর্কের পুনর্প্রবর্তন; ২. নির্দিষ্ট কোন অঞ্চল বা জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন সরকার গঠনের জন্য ধর্মীয় প্রতিরোধ; ৩. সামাজিক ডাকাতি; ৪. সমষ্টির স্বার্থে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ত্রাসবাদী বলপ্রয়োগ; ৫. নির্দিষ্ট অভাব-অভিযোগ ইত্যাদির অবসান ঘটাতে গণঅভ্যুত্থান। ভারতীয় কিষাণদের বিদ্রোহগুলি নির্ভেজাল এরূপ পাঁচটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই শুধুমাত্র সংঘটিত হয়েছিল মনে করা ঠিক নয়। আর, উদ্দেশ্যগুলিও স্পষ্টরূপে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল এমন নয়।

ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ভারতে কায়েম হবার পর থেকেই কৃষক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকদের বিক্ষোভ হিংসাত্মক রূপ ধারণ করে। ব্রিটিশ রক্ষণশীল ঐতিহাসিকেরা কৃষকদের অভ্যুত্থানগুলিকে 'দাঙ্গাহাঙ্গামা', 'গণ্ডগোল' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেন। কৃষকদের বিক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ অনুদ্ঘাটিত রাখার অপচেষ্টায় তাঁরা কৃষকদের জঙ্গী প্রতিরোধের ঘটনাবলীকে 'আইন ও শৃঙ্খলার' উপর আঘাত হিসাবে বিবেচনা করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে কৃষকদের উপর খাজনার বোঝা নির্দিষ্ট করে দেবার দাবি উপস্থাপিত করেছিলেন রামমোহন রায়। কিন্তু কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সমকালীন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা বা বক্তব্য রচনায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারত-ব্রিটেন সহযোগিতায় এমন এক সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনায়

বিমুগ্ধ ছিলেন যেখানে শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থনীতিক লেনদেনের ফলে সমভাবে ব্রিটিশ ও ভারতীয়গণের প্রগতি সম্ভব হয়ে উঠবে। মুক্ত বাণিজ্যের সমর্থক ব্রিটিশ ধনিক নীলকরদের স্বার্থ এই কারণে তাঁদের কাছে ভারতীয় চাষীর স্বার্থের পরিপন্থী মনে হয়নি। অথচ রামমোহনের মৃত্যুর তিন দশক পরেই নীলচাষের অঞ্চলগুলিতে ভারতীয় কিষাণেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এমন কি ভারতীয় জমিদারদের একাংশ পর্যন্ত ঐ বিদ্রোহে সহায়তা করে ঔপনিবেশিক ধনিকশ্রেণীর আক্রমণের হাত থেকে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রের অপরিস্ফুট প্রকাশ ও মতাদর্শগত বিশ্বাসের জন্যই রামমোহন, দ্বারকানাথ ও তাঁদের অনুগামীদের পক্ষে ভারতীয় কৃষকদের প্রতি মানবিক সহানুভূতির গণ্ডী অতিক্রম করে কৃষক সমাজের মুক্তির রাজনৈতিক পথ নির্ণয়ে মনযোগী হওয়া সম্ভব হয়নি।

১৮৭০ সাল থেকে ১৮৯৭ সালে বহু ছোট-বড় দুর্ভিক্ষ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছিল। কৃষকদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল; বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক মন্দা চরম দুর্দশাকে অসহ্য করে তুলেছিল। জমিদার, মহাজন এবং সরকার বিরোধী কৃষক আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা কৃষকেরা ১৮৭৫ সালে মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, নব্বুইর দশকে অনুরূপ বিদ্রোহ পাঞ্জাবে মাথাচাড়া দেয়।

অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে ভারতীয় কৃষক আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ততা, আঞ্চলিকতা ও আবেগপ্রবণতার বেড়াজাল ছিন্ন করে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের মুক্তাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারেনি। বিহারের চম্পারণ জেলার নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গান্ধীর সত্যাগ্রহ এবং গুজরাটের কৈরা জেলার কৃষকদের ভূমিরাজস্ব মকুবের দাবিতে তাঁর নির্দেশিত পথে আন্দোলনও ঐ অঙ্গনে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন ভারতীয় কৃষকসমাজের বৃহৎ এক অংশকে 'সংগঠিত রাজনীতির' পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। স্বরাজের রাজনৈতিক দাবির সাথে ঐ অংশ কৃষিজমির উপর ধার্য করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার কার্যকর পন্থা প্রত্যক্ষ করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের চারদিকে ভারতের বিভিন্ন

অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আবার কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াও ঐ সময় গুণ্টুর, কর্নাটক প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। সংযুক্ত প্রদেশের সীতাপুর, রায় বেরিলী ও অন্যান্য জেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষকেরা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ছাড়াই নানা ধরনের দাবির ভিত্তিতে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে হতোদ্যম কিষাণেরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। অন্ধ্রে রায়ত ও কৃষিশ্রমিকদের অনেকগুলি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশ, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে কিষাণসভা গড়ে ওঠে। মোতিলাল নেহ্রুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২৮ সালের সর্বদলীয় সম্মেলনে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশের কিষাণসভাগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন তাতে কৃষকসমাজের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল।[24] জাতীয় স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক দাবিতে ঐ স্মারকলিপি বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। গুজরাটের বরদোলই জেলার ১৯২৮-'২৯ সালের কিষাণ আন্দোলনের সাফল্য সারা ভারতের কৃষকসমাজকে অনুপ্রাণিত করে। ১৯২৯ সালের বিশ্বজোড়া আর্থনীতিক সংকটে ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছয়। অন্ধ্র, কর্নাটক, সংযুক্ত প্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে কৃষক আন্দোলন বিস্তৃত হয়।

ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালিত হয়। গান্ধীর নেতৃত্ব এই সময় কংগ্রেসের আদর্শ, সংগঠন ও আন্দোলনেব কৌশল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ প্রাধান্য লাভ করে। আইন অমান্য আন্দোলনের উৎসাহ-উদ্দীপনা অস্তমিত হয়ে ক্রমে ক্রমে রাজশক্তির সাথে শাসনতান্ত্রিক সমঝোতার গোলকধাঁধায় পথ খুঁজতে তৎপর হলে সংগ্রামরত কৃষকেরা স্বতন্ত্র নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে।

ত্রিশের দশকে কিষাণ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সময় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল, সাম্যবাদী গোষ্ঠীগুলি ও বামপন্থী রাজনীতির লক্ষণাক্রান্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে রায়ত

ও কিষাণদের সংগঠন গড়ে ওঠে। বিহার কিষাণসভা সংগ্রামী মনোভাবে ও কর্মকাণ্ডে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। সংযুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক কিষাণসভা ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারি ব্যবস্থার অবসান দাবি ঐ সভার দাবিসনদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করে। বঙ্গদেশের কৃষক প্রজা দল অনুরূপ দাবি জানায় এবং কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের পরিকল্পনা রচনা করে।

১৯৩৫ সালে সর্বভারতীয় কিষাণ কংগ্রেস লক্ষ্ণৌতে প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংগঠন ভারতের সমগ্র কৃষক সমাজের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনাযোগ্য না হলেও, ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে তা অনন্য হয়ে ওঠে। এই সংগঠন ভারতীয় গ্রামীণ জনসাধারণকে স্থানীয় বা আঞ্চলিক দাবিদাওয়ার ক্ষুদ্র গণ্ডীর সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিয়ে জাতীয় রাজনৈতিক-আর্থনীতিক বৃহত্তর চেতনার সাথে একাত্ম করে তোলে।

১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনী ইস্তেহারে কৃষক সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় বহু রকম অধিকার সৃষ্টি ও অভাব-অভিযোগ দূর করার প্রতিশ্রুতি স্থান লাভ করে। সরকার গঠনের পর কংগ্রেসী সরকারগুলি প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হয়নি এমন নয়। কিন্তু সরকারী অর্থের অপ্রতুলতা, ঔপনিবেশিক কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের পাশাপাশি সামন্তবাদী সম্পর্কের বিচিত্র অবস্থান এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কৃষির সাথে যুক্ত নানা ধরনের শ্রেণীস্বার্থের উপস্থিতি কৃষির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণের অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, কংগ্রেস-পরিচালিত সরকারগুলি স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল। ঐ সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কিষাণসভাগুলি বহু সভা, সম্মেলন ও অভিযান সংগঠিত করে নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায় করার জন্য সরকারগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল।

কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে কৃষকসমাজের বৈপ্লবিক, রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন; তিনি ঐ সমাজের ভূমিকাকে সর্বক্ষেত্রে, সকল সময়ে 'গ্রামীণ মূর্খতায়' বা রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতায় অধঃপতিত মনে করেননি। ভারতীয় কৃষক সমাজ ঔপনিবেশিক ভারতে অবিমিশ্র বৈপ্লবিক বা প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা পালন করেনি। দরিদ্র, অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, সারা ভারতের দূর-দূরান্ত গ্রাম-এলাকায় বিক্ষিপ্ত, সামান্য ভূসম্পত্তির মালিকানা বজায় রাখতে তৎপর, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কৃষকদের পক্ষে বিপুল সংঘশক্তি গড়ে তোলা দুরূহ ছিল।

তাছাড়া, ভারতীয় কৃষিতে শোষক ও শোষিত বহু শ্রেণীর উদ্ভব ঘটায় সার্বিক ঐক্য রচনার কাজও সহজ ছিল না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের দাবিতে বিপ্লবাত্মক সংগ্রামের পথে বহুবার অগ্রসর হয়েছিল; সমতলভূমি ও পাহাড়ী উপজাতীয় কৃষকেরা নির্দিষ্ট অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের দাবিতে রাজনৈতিক সচেতনতায় বলীয়ান সর্বভারতীয় কৃষক আন্দোলন বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত অপেক্ষমান থেকেছিল।

এমন কি সংগঠিত রাজনীতির সংস্পর্শে এসেও ভারতীয় চাষী বহু কারণের যোগসাজসে পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন থেকেছিল। শ্রী জ্ঞান পাণ্ডে সংযুক্ত প্রদেশের সরকারী গোয়েন্দা দপ্তরের ১৯২১ সালের ৭ই জানুয়ারির একটি দলিল উদ্ধৃত করে সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে এলাহাবাদ জেলার কিষাণসভা পরিচালিত আন্দোলনে সমবেত কৃষকদের গান্ধী সম্পর্কে সমকালীন ধারণার নিম্নোক্ত চিত্র সরবরাহ করেছেন: 'তিনি হচ্ছেন একজন মহাত্মা অথবা সাধু, একজন পণ্ডিত, এলাহাবাদ নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ, এমন কি একজন দেবতা। তিনি ···একজন বণিক, তিনি এক আনায় এক গজ কাপড় বিক্রি করেন।··· সরকারের উপর তাঁর প্রভাব অপরিসীম এই বিশ্বাসই নিঃসন্দেহে গান্ধীর প্রতি ভক্তির আংশিক কারণ।'[25]

শুধুমাত্র অজ্ঞতা নয়, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাও ভারতীয় কৃষকদের আন্দোলনকে হীনবল করেছিল। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতে বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকে মোপ্‌লা বিদ্রোহের উদ্ভব ও ত্রিশের দশকে পূর্ববঙ্গের কৃষক আন্দোলনে সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার উদাহরণ হিসাবে বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। বুদ্ধিজীবী মহলে এরূপ একটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে যে, উভয় অঞ্চলেই জমিদার ও খাজনা প্রদানের ভিত্তিতে চুক্তিবদ্ধ মধ্যবর্তী জমি-মালিকেরা ছিলেন উচ্চবর্ণসম্ভূত হিন্দু, আর শোষিত প্রজারা ছিলেন মুসলমান; তাই বিদ্রোহ ও অসন্তোষ সাম্প্রদায়িকতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মোপ্‌লা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব আলোকসম্পাতে সক্ষম হলেও পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িক কৃষক রাজনীতির জটিলতা ব্যাখ্যায় অক্ষম। সেখানে শিক্ষা, পেশা ও সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের অগ্রগতি যতটা অসম ছিল, জমির খাজনার আয়ের উপর নির্ভরশীল হিন্দু-মুসলমানদের সংখ্যার তারতম্য

ততটা ছিল না। নিম্নলিখিত তালিকা[26] থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ঐরূপ আয়ের উপর নির্ভরশীল হিন্দুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা :

খাজনার আয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সাম্প্রদায়িক বিভাগ

(প্রতিটি বিভাগের সংশ্লিষ্ট মোট সংখ্যার শতকরা হিসাবে)

বিভাগ	মুসলমান	উচ্চবর্ণ হিন্দু	অন্যান্য
১. দার্জিলিঙ্ বাদে রাজসাহী বিভাগ	৩৭.২২	২০.০৪	৪২.৭৪
২. ঢাকা বিভাগ	৩৩.৪৪	৩৮.৫০	১৮.০৬
৩. চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৯.১৩	৩০.৭৪	২০.১৩

[ব্যাখ্যা : উচ্চবর্ণ হিন্দু বলতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ বোঝান হয়েছে।]

আশ্চর্য মনে হলেও ঘটনা এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, হিন্দু জমিদার ও তালুকদাররা কৃষক সমাজের অংশ বলে বিবেচিত হতেন না, অথচ অনুরূপ মুসলমান ব্যক্তিরা হতেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বা মুসলিম লীগের মতাদর্শ ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দর্পণে কৃষির সাংগঠনিক স্বরূপ সঠিক প্রতিবিম্বিত হয়নি। সাম্প্রদায়িক ও কায়েমী স্বার্থমহল বহিরাগত এই দর্পণে পূর্ববঙ্গীয় কৃষক সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত স্বরূপে প্রদর্শন করে রাজনৈতিক সংঘ-বদ্ধতায় সামিল করতে তৎপর হয়েছিল ; কৃষক সমাজের পূর্বতন ঐক্য ভেঙ্গে খণ্ডিত সত্তায় রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে শক্তি যোগাতে তৎপর হয়েছিল।

গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় কৃষক আন্দোলনের মূল ধারাটি বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত হতে পারেনি। গান্ধী নিঃসন্দেহে সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা ও জাতিবৈরী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রথম সারির অনলস যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাভাবনা দরিদ্র মেহনতী জনতার জন্য বিপ্লবী কার্যক্রমের সন্ধান দিতে অক্ষম ছিল। তাঁর নৈতিক দর্শন, শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বরূপ উপলব্ধিতে অনীহা ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ ঐরূপ কার্যক্রমের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে গান্ধী সম্পর্কে জওহরলালের মন্তব্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য[27] :

'গান্ধীজীকে মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান সন্তদের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং তিনি যা' কিছু বলেছেন তার অনেক কিছুই এই (বর্ণনার) সাথে খাপ খায়।'

'...তিনি আবেগপ্রবণভাবে নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যে যেতে চান, কিন্তু তা আধুনিক ধ্যানধারণা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তিনি দু'য়ের মাঝে সামঞ্জস্য আনতে, অথবা লক্ষ্যে পৌছানর অন্তর্বর্তী পদক্ষেপগুলির ছক্ রচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই কারণে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার আবির্ভাব।'

'...তিনি সমাজ বা সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের জন্য ব্যাপৃত নন। তিনি মানুষের পাপ দূর করার কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখেন।'

'...তিনি মোটামুটিভাবে একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী।'

'...বলপ্রয়োগের সাথে সম্পর্কের জন্য তিনি সমাজতন্ত্র, বিশেষ করে মার্কসবাদকে, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। শ্রেণী যুদ্ধ শব্দ দু'টি থেকেই বিরোধ ও বলপ্রয়োগের আভাস পাওয়া যায় এবং এই কারণে তাঁর কাছে অপ্রীতিকর ঠেকে।'

'...এবং তা সত্ত্বেও তাঁর কার্যকলাপের অনেকগুলি থেকেই কোন ব্যক্তি ভাবতে পারেন যে, তিনি সঙ্কীর্ণতম স্বয়ংসম্পূর্ণতায় ফিরে যেতে চান। শুধু-মাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রায় একটি গ্রামের দিকে।'

আধুনিক শিল্প, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে গান্ধীর সমালোচনা-পূর্ণ বক্তব্য সত্ত্বেও একথা সত্য যে, তাঁর চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ড ও নেতৃত্ব অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও ভারতীয় জনজীবনকে আধুনিকতার পথনির্দেশ দিয়েছিল। তিনি চার দশক জুড়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের দার্শনিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ঘূর্ণিবাত্যার সাথে পরিচয় ঘটিয়ে সমাজজীবনের 'পরিবর্তনশীলতার নিরঙ্কুশ গতি' সম্পর্কে উপলব্ধির ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৪] কিন্তু তাঁর নির্দেশিত পথে কৃষক আন্দোলন কৃষি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লবের সূচনা করেনি। কেননা ঐ আন্দোলন সমাজের বিপ্লবী শক্তিগুলির নেতৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে ব্রহ্মাস্ত্র লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারেনি। ধর্মনিরপেক্ষ, শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব কৃষকসমাজকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের নায়কত্বের কৃতিত্ব থেকে বহু দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অথচ পশ্চিম ইউরোপের ধর্মসংস্কার টমাস মুনজারের নেতৃত্বে দরিদ্র কৃষক জনতার বৈপ্লবিক আন্দোলন ডেকে আনতে পেরেছিল, কেননা ধর্মীয় ধ্যান-

ধারণা সত্ত্বেও ঐ আন্দোলন প্রধানত বিপ্লবী শক্তিগুলির সমাবেশ সম্ভব করেছিল। অনুরূপ সমাবেশ বিপ্লবী ফ্রান্সেও ঘটেছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, শিল্প-বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে নিযুক্ত মূলধন ও জমিদারি শোষণের শিকার ভারতীয় কিষাণেরা সংগ্রামের প্রান্তরে বহুবার সমবেত হয়েছিল, কিন্তু বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবে বিজয়ী বীরের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

মাও-জেদঙ বলেছিলেন, 'কোটি কোটি কৃষক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মত উত্থিত হবে...যতই বলশালী হোক না কেন, কোন ক্ষমতাই দ্রুতগামী, উদ্দাম ঐ শক্তিকে ধরে রাখতে পারবে না। তারা অবরুদ্ধ রাখার সকল বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে মুক্তির পথে ধাবিত হবে।'[২৭]

ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক অর্থনীতিতে কৃষকশ্রেণীর পক্ষে অনুরূপ ঝড় সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। কৃষির কায়েমী স্বার্থের সাথে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ থাকায় ধনিকশ্রেণী কৃষিবিপ্লব চায়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির বুদ্ধিজীবীরা আর্থনীতিক স্বার্থের কারণে ও উৎপাদনব্যবস্থার সাথে নিবিড় সংযোগের অভাবে ঐ বিপ্লবের নেতৃত্বদানে স্পষ্টতই অপারগ ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, কৃষিবিপ্লব তথা সমাজবিপ্লবের দায়িত্ব বহন করা ঐ শ্রেণীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কৃষক সংগ্রাম ঔপনিবেশিক ভারতে অসন্তোষের ঘনকৃষ্ণ মেঘের সঞ্চার ঘটিয়েছিল বারবার। 'ভারত ছাড' আন্দোলনের সময় (১৯৪২) ঐরূপ মেঘের বিপুল সঞ্চার ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়েও শেষ পর্যন্ত কালবৈশাখীর স্বল্পস্থায়ী ঘূর্ণিতে সমাপ্ত হয়।

ভারতীয় কৃষকের অশ্রু ঝরার কাহিনী, কর্মের ইতিবৃত্ত, সংগ্রামের ইতিহাস ও সাফল্য-অসাফল্য সম্পূর্ণভাবে আজও লিপিবদ্ধ হয়েছে মনে হয় না।

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ভূমিকা ও চরিত্র

ইতিহাসের ধারাপথে পৃথিবীর সর্বত্র বুদ্ধিজীবীরা সমাজ-পরিবর্তন ও স্থায়িত্বের প্রধান স্থপতি হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁরা সমাজচেতনার রূপকার ও ব্যাখ্যাকার হিসাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের গৌরবের অধিকারী। কিন্তু তাঁদের ধ্যানধারণা সামাজিক উৎপাদনের অন্তঃপ্রদেশ থেকে রসসংগ্রহ করে শাখাপ্রশাখা — ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে; শ্রেণীস্বার্থ নিরপেক্ষ হয়ে তাঁরা গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত অস্তিত্ব বজায় রাখতে

পারেন না। ইতিহাসের প্রতিটি যুগেই আর্থনীতিক উৎপাদন এক বা একাধিক স্তরবিন্যস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষের সমাবেশ ঘটায়; তাঁরাই অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির সংহতি সংস্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরাই জনসাধারণের চিন্তাভাবনা ও ব্যবহারিক জীবনকে অব্যাহত রাখতে বা পরিবর্তিত করতে ক্রিয়াশীল থাকেন।

যে-কোন মানুষের কর্মে বুদ্ধির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সেজন্য সকলেই বুদ্ধিজীবী এমন নয়। গ্রাম্‌সি মনে করেন, চিন্তা ও মননের বিকাশের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে নির্দিষ্ট পেশাগত কর্ম সামাজিক সম্পর্কের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে; আর ঐ কর্ম কায়িক শ্রমের দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে শ্রমজীবী মানুষের জনতা তৈরী করে। তাঁর মতে বুদ্ধিজীবীরা সমাজের দিকনির্ণয়, উচ্চমান প্রযুক্তির নির্দেশনায় রত থাকেন: এরূপ নির্দেশনা উৎপাদন, সংস্কৃতি বা রাজনীতি-প্রশাসন সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হতে পারে।[30] বুদ্ধিজীবীরা শুধুমাত্র লেখাপড়া ও চিন্তাভাবনায় কালাতিপাত করেন এমন নয়। তাঁদের মধ্যে আমলা, রাজনৈতিক নেতা, ধর্মযাজক, পরিচালক, প্রযুক্তিবিদ প্রভৃতিরাও অন্তর্ভুক্ত। **সমাজ ও অর্থনীতির সাথে জৈবিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের গ্রাম্‌সি সনাতনী বুদ্ধিজীবীদের তুলনায় কিছুটা পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভেবেছেন।** সনাতনী বুদ্ধিজীবীরা সমকালীন সমাজের প্রভুশ্রেণীর স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে রক্ষার কাজে ব্যস্ত থাকেন না; তাঁরা অপসৃত পূর্বতন সামাজে কোন-না-কোন শ্রেণীর সাথে জৈবিক সম্পর্কতুল্য নিবিড়তায় আবদ্ধ থাকলেও বর্তমানকালে নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর সাথে অনুরূপ সম্পর্কে যুক্ত নন। কিন্তু তাঁরা সামাজিক নানা সংগঠনের চাপ ও আর্থিক প্রয়োজনের তাগিদে শেষ পর্যন্ত সমকালীন সমাজের উদীয়মান শ্রেণী বা প্রভুশ্রেণীর জগৎদৃষ্টিকে ধ্রুব বলে মানতে বাধ্য হন।[31] আর, সামাজিক অর্থনীতির সাথে জৈবিক ধরনের সম্পর্কে আবদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা সামাজিক শ্রেণীগুলির কোন-না-কোনটির সাথে স্বার্থবন্ধনে যুক্ত থাকেন। মোটকথা, গ্রাম্‌সির মতে উভয় ধরনের বুদ্ধিজীবীরাই চূড়ান্ত বিচারে সমকালীন সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিবিম্বিত করেন এবং তাঁদের চিন্তাধারা উদীয়মান শ্রেণী বা প্রভুশ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

'মহান' বুদ্ধিজীবীরা সমকালীন সমাজে জগৎদৃষ্টি সৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকেন, আর ঐ দৃষ্টিকে সাধারণ্যে সহজ, সরল করে তোলার কাজে ব্যাপৃত থাকেন

'ক্ষুদে' বুদ্ধিজীবীরা (যেমন, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, যাজক, পুরোহিত, ছাত্র প্রভৃতিরা)।[৪৪]

আধুনিক শিল্প ও বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাবের পাঁচ-ছ' দশক আগে ব্রিটিশ ভারতে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্মলগ্ন সূচিত হয়। রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর সহযোগী বন্ধুরা আধুনিক ভারতের প্রথম বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছিলেন। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হলে এবং ক্রমে ক্রমে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমী শিক্ষাসংস্কৃতিতে দীক্ষিত এবং পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞান ও উদারনৈতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয়দের একটি গোষ্ঠী আবির্ভূত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে সাথে এই গোষ্ঠীর আয়তন বিশালতর হয়। এই গোষ্ঠীভুক্ত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাই আধুনিক ভারতীয় জাতির ধারণাটির স্রষ্টা; তাঁরাই জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও আর্থনীতিক উন্নয়নের দাবি জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে প্রচার করেন। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের যুগোপযোগী মহৎ কর্তব্য পালনে তাঁরাই প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁরাই প্রাদেশিক সাহিত্যগুলির বিকাশ সম্ভব করে তোলেন; গণতন্ত্র ও স্বদেশপ্রেমের ভাবমন্দাকিনীর উত্তাল ঊর্মিমালা জাতীয় মানসের বেলাভূমিতে প্লাবন এনে নবীন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সবুজ সমারোহ ডেকে আনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ-ছ'টি দশক ধরে উদীয়মান ব্রিটিশ ধনিক-শ্রেণীর সহায়তায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ভারতীয় সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কারের দুর্গের উপর আক্রমণ রচনার ক্ষেত্রেও তাঁরা অনুরূপ সাহায্য লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে উপনিবেশ রক্ষার স্বার্থ বিপন্ন হলে ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রয়োজন দেখা দিলে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সামন্তবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাথে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে গোষ্ঠীস্বার্থ তথা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ রাজনৈতিক সংঘ, সংগঠন, আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য ভূমিকা সর্বদাই লক্ষণীয় ছিল। উদারনৈতিক পর্যায়, জঙ্গী পর্যায় এবং সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের পর্যায়ে এঁদের সংগ্রাম জাতীয় গৌরবগাথার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, মহিলা সংগঠন ইত্যাদি নানা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে এঁরা আধুনিক ভারতীয় জনজীবনের রূপকার। এঁদেরই একাংশ মুক্তিসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণার প্রচারে ঐ অংশ একনিষ্ঠ দায়িত্ব পালনে ব্রতী থাকেন।

গ্রাম্‌সি-বর্ণিত বুদ্ধিজীবী সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ ভারতীয় ক্ষেত্রে হুবহু প্রয়োগ করে অভিপ্রেত ফলাফল লাভ করা দুরূহ। নওরোজী, ফিরোজশাহ্‌ মেহ্‌তা, দীন্‌শা ওয়াচ, রানাডে, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, সুব্রাহ্মনীয় আয়ার প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় রত ছিলেন বলা চলে না। আবার, তিলক, লাজপৎ, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতিরাও কোন বিশেষ শ্রেণীর ধ্যানধারণা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন এমন নয়। এমন কি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনসাধারণী পর্যায়ের যুগের বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দকেও (গান্ধী, মোতিলাল, চিত্তরঞ্জন, রাজাগোপালাচারি, কৃপালনী, বিঠলভাই, বল্লভভাই, জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র, প্রভৃতি) বিশেষ কোন আর্থনীতিক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। তাঁরা কেউ-ই সনাতনী বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর তৈরী ভারতীয় সামাজিক অর্থনীতির গৃহকোণে এঁরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন। এঁরা কেউই কলকারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির মালিক ছিলেন না। উৎপাদনব্যবস্থার সাথে জৈবিক নিবিড়তায় এঁরা যুক্ত ছিলেন না। এঁরা ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর পূর্বপুরুষ হিসাবে বা প্রতিভূ হিসাবে বিবেচনাযোগ্য নন। ভারতে যখন স্বদেশী ধনিক ও সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম হয়নি তখনও এঁরা শুধুমাত্র নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার কাজে লিপ্ত না থেকে আগামী দিনের সম্ভাব্য নবজাতক শ্রেণীগুলির স্বার্থ সুরক্ষিত করার দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হননি। রাশিয়ায় ধনিকশ্রেণী বা সর্বহারাশ্রেণীর জন্মের আগে উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীরা ঐ শ্রেণীগুলির দাবিদাওয়ার আগাম দাবি উত্থাপন করেছিলেন।[৪৪] ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা অনুরূপ ধরনের দায়দায়িত্ব কিছুটা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

কালক্রমে তাঁদের ধ্যানধারণা উদীয়মান সামাজিক শ্রেণীগুলির প্রয়োজনের সাথে সাযুজ্য রচনা করে। ধনিকশ্রেণী, 'পেটিবুর্জোয়া' শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের চিন্তাভাবনা নিয়োজিত রেখেছিলেন।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের **চিন্তা ও মননে কতগুলি স্ববিরোধ** দানা বেঁধেছিল। ঔপনিবেশিক সামাজিক অর্থনীতির জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় এই স্ববিরোধগুলি স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে আধুনিক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, অথচ ঐ শাসনব্যবস্থার কবর খুঁড়তে তাঁদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। পশ্চিমী জগৎদৃষ্টি ও মূল্যবোধগুলিকে তাঁরা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আবার ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও প্রাচীন মূল্যবোধগুলির প্রতিও তাঁরা আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। ভারতীয় সমাজের বর্ণব্যবস্থা একদিকে যেমন তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎস ছিল, অন্যদিকে তেমন পশ্চিমী শিক্ষা তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল। ঔপনিবেশিক নগরীকরণের দুর্বলতা তাঁদের চিন্তাভাবনার পরিধি সঙ্কীর্ণ করে রেখেছিল। আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা সকলেই শহরবাসী ছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় গ্রামগুলির অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সমস্যা সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল না। তাঁদের অভাব-অভিযোগ, দাবিদাওয়া ইত্যাদি শহরবাসী মধ্যবিত্তশ্রেণীর পরিমণ্ডল ত্যাগ করে সার্বিক চরিত্র অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিমী শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অসম অগ্রগতি ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ অবস্থা হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থচিন্তায় ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণের পক্ষে প্রতিকূল শক্তি হিসাবে ক্রিয়াশীল ছিল।

সর্বহারাশ্রেণী: জন্মলগ্ন, বয়োবৃদ্ধি ও প্রকৃতি

ফ্যাক্টরিশিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর জন্ম হয় বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকে—কোলকাতা ও বোম্বেতে। নব্বুইর দশকে ঐ শ্রেণীর শ্রমজীবীর সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০। ভারতে বৃহৎ শিল্পের বিকাশ সীমিত সংখ্যক অঞ্চলে আবদ্ধ থাকায় সর্বহারাশ্রেণীর অস্তিত্ব প্রধানত কোলকাতা ও বোম্বেতে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে: বোম্বেতে ১১৮,০০০ এবং কোলকাতায় ১২০,০০০। এমন কি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ২৫,০০০-র বেশী সর্বহারাশ্রেণীর

লোকজন ছিল না। সমগ্র ভারতে ফ্যাক্টরিশ্রমিক, রেলওয়ে কর্মী ও খনিশ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল ৭০০,০০০—৮০০,০০০-র মধ্যে।[84]

পেশাগত দিক থেকে শিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় সর্বহারাশ্রেণীর অধিকাংশ বস্ত্র ও পাটের কলগুলিতে নিয়োজিত ছিল। অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানা, রেলওয়ের সাথে যুক্ত ফ্যাক্টরি ও মেরামতির কারখানাগুলিতে কয়েক সহস্র শ্রমিক কর্মরত ছিল। আর বাদবাকী শ্রমিকেরা ভারতের পক্ষে দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্বের অধিকারী খাদ্য, সিমেণ্ট ও অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ১৮৯২ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে ফ্যাক্টরি আইনের আওতাভুক্ত ১১৮,০০০ শ্রমিকের মধ্যে মহিলা ও শিশুর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২২,৮৪৪ ও ৫,৯৪৬। সমগ্র শ্রমিক সংখ্যার মধ্যে ৭৭,৮৭২ তুলোর সুতো তৈরী ও সুতী বস্ত্র বোনার কাজে রত ছিল। ৮,০২৮ জন শ্রমিক তুলো ঝাড়াই-মাড়াইর কাজে নিযুক্ত ছিল। বয়নশিল্পের অন্যান্য শাখায় (পশম, রেশম, হোসিয়ারি ইত্যাদি) নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,৫৫২, রেলওয়ে কর্মশালাগুলিতে ১২,১৯৬, লৌহ কারখানাগুলিতে ৩,৪৬৬ ও ছাপাখানাগুলিতে ২,১৪০।[85]

ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও বিস্তার আধুনিক শিল্প, যানবাহন ও বাগিচাশিল্প প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে যুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশ কৃষক সমাজের বিশেষ কতকগুলি বর্ণভুক্ত ছিল। ঐ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভারতীয় হস্তশিল্পগুলির বেকার কারিগরদের সংখ্যাধিক্য ছিল না। ফ্যাক্টরিশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি এতই কম ছিল যে, কারিগরদের পক্ষে ঐ অর্থে সংসার প্রতিপালন করা অসম্ভব ছিল। দরিদ্র কৃষকেরা অপরিসীম দারিদ্র্যে পীড়িত হয়ে মহাজন, জমিদার এবং সরকারী খাজনা সংগ্রাহকদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ত; তাঁদের পক্ষে শহর এলাকায় চাকুরির অন্বেষণে আসা অসম্ভব ছিল। এই কারণে বোম্বে ও আমেদাবাদের শিল্পকারখানাগুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকেও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল চাষী পরিবারগুলির লোকজনেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

ঔপনিবেশিক ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের স্বচ্ছন্দ গতির অভাব ও শিল্পক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের সঙ্কীর্ণ পরিধির সীমাবদ্ধতা ভারতীয় জনসংখ্যাকে আপেক্ষিক বিচারে বিপুলাকৃতি করে তুলেছিল। শুধুমাত্র গ্রামীণ ভারতে জনসংখ্যার বিপুল চাপ অনুভূত হয়েছিল এমন নয়, শহর-

গুলিতেও চাকুরিপ্রার্থীদের বিশাল বাহিনী গড়ে উঠেছিল। এই বাহিনীর উপস্থিতি ধনিকশ্রেণীর পক্ষে শ্রমিকদের শোষণ করার অতিরিক্ত সুযোগ এনে দিয়েছিল।

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে অতিমাত্রায় শোষণ করে মুনাফার বিপুল তহবিল গড়ে তুলে ভারতের দেশী-বিদেশী ধনিকশ্রেণী যন্ত্রপাতি আমদানি করেছিল, বিদেশী প্রযুক্তিবিদদের বেতন যুগিয়েছিল এবং একচেটিয়া কারবারী প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছ থেকে উচ্চমূল্যে শিল্পসামগ্রী ক্রয় করেছিল। চার্লস উড্ হাউস অফ কমন্সের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে মজুরি খাতে ভারতস্থ শিল্পপতিদের বিশাল মুনাফা অর্জনের কথা কবুল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের নির্দিষ্ট সংখ্যক মজুরের সাপ্তাহিক আয় যখন ছিল ৪০০ পাউণ্ড তখন অনুরূপ সংখ্যক ভারতীয় মজুরের সাপ্তাহিক আয় ছিল ১০০ পাউণ্ড।[৪৬]

ব্যাঙ্ক ও শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের উপর ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর একচেটিয়া প্রভুত্বের জন্য ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীকে হৃদয়হীন শোষণের শিকার হতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক স্বার্থে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছিল, ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বদেশী প্রযুক্তিবিদ সৃষ্টিতে বাধা দেওয়া হয়েছিল এবং ব্রিটেন থেকে আমদানি করা নিম্নমান যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বাধ্য করা হয়েছিল। কৃষির প্রযুক্তিবিদ্যাগত মান শিল্পের অনুরূপ মানের চেয়েও নিম্নপর্যায়ের ছিল। মধ্যযুগীয় নিম্নমানে ভারতীয় কৃষি অধঃপতিত ছিল। কর্মদিবস যথেচ্ছ বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য বাড়িয়ে মুনাফার পাহাড় গড়া ঔপনিবেশিক ভারতের ধনিকশ্রেণীর পক্ষে সহজ পন্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দরিদ্র, নিরন্ন, শিক্ষার আলোকবঞ্চিত ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী সীমাহীন শোষণ সত্ত্বেও ক্রমে ক্রমে শ্রেণীসচেতন হয়ে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতীয় এই প্রমিথিউসের বন্ধনমুক্তি শুরু হয়েছিল বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে।

১৯৩৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিনিধি এস. ভি. পারুলেকর ভারতীয় শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দারিদ্র্যের চিত্র তুলে ধরেছিলেন। রোগ, বার্ধক্য, মৃত্যু, বেকারত্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিকদের সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। হুইট্‌লি কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, বেশীর ভাগ শিল্পকেন্দ্রগুলিতে শ্রমিক পরিবারগুলির মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই ঋণভারে জর্জরিত ছিল।

শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান দারিদ্র্যসীমার সমীপবর্তী ছিল। মজুরির হার অত্যন্ত নীচু ছিল। ত্রিশের দশকে শ্রমিককল্যাণের স্বার্থে কতগুলি আইন রচিত হয়। ১৯৩১ সালে ভারতীয় বন্দর আইন, ১৯৩৪ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন ও ফ্যাক্টরি আইন, ১৯৩৫ সালে খনি আইন এবং ১৯৩৬ সালে মজুরিদান আইন পাশ হয়। বলা বাহুল্য, শ্রমিককল্যাণে সরকারী এই প্রয়াস আগামী দিনের বৃহত্তর সম্ভাবনার পথিকৃৎ হলেও খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিক এরূপ প্রয়াসের ফলভোগ করেছিল। শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শ্রম ও শ্রমিক সংক্রান্ত আইনগুলির এক্তিয়ার বহির্ভূত ছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা শ্রেণীসচেতন সংগ্রামের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা ধনিকশ্রেণীর অনেক পরে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। চাষবাস বা গ্রামীণ শিল্প থেকে উৎখাত হয়ে শিল্পকেন্দ্র-গুলিতে কর্মরত থেকে ভারতীয় গ্রামজীবনের সঙ্গে জড়িত মানুষেরা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল বলে নানারূপ পশ্চাৎপদতার কারণে এই শ্রেণী রাজনৈতিক সচেতনতায় বলীয়ান হয়েছিল দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে। তারা ছিল প্রায় অক্ষরজ্ঞানশূন্য, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিভেদের শিকার এবং ধর্মীয় নানা কুসংস্কার ও নিয়তিবাদে বিশ্বাসী। সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী নিঃসন্দেহে পশ্চাৎপদ ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে উদ্ভূত আর্থনীতিক সঙ্কটে মেহনতী জনতার দুরবস্থা, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসার এবং দেশী-বিদেশী ধনিকদের শোষণ শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। ১৯১৮ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে বোম্বে, কোলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর, শোলাপুর, জামসেদপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি শিল্পনগরগুলিতে অসংখ্য ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ক্রমশ ব্যাপকতর হতে থাকে। রাউলাট আইনের প্রতিবাদে বোম্বে ও অন্যান্য বহু শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকেরা রাজনৈতিক ধর্মঘটে সামিল হয়। আর্থনীতিক দাবিদাওয়ার লড়াই ক্রমে ক্রমে জাতীয় সংগ্রামের সাথে জড়িত হয়ে পড়তে থাকে। এই সময় কোলকাতা, বোম্বে, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের বিভিন্ন শিল্প-গুলিতে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে এন. এম. যোশী, লালা লাজপৎ রায় ও জোসেফ ব্যাপতিস্তার অক্লান্ত প্রয়াসে সারা ভারত ট্রেড

ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই সংগঠনটি অসীম গুরুত্বের অধিকারী।

১৯১৮ সালের পূর্বে ভারতে শ্রমিকদের কোনরূপ কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি এমন নয়। ১৮৯৭ সালে প্রধানত ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের উচ্চপদস্থ রেলকর্মীরা একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা গড়ে তুলেছিলেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে কোলকাতার মুদ্রণশিল্পের কর্মীরা ও বোম্বের ডাকবিভাগের কর্মচারীরা কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইউনিয়নগুলির সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল এবং ঐগুলি নির্দিষ্ট কোন কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে পারেনি। ১৯০৮ সালে বোম্বের বস্ত্রকলের শ্রমিকেরা তিলকের কারামুক্তির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল। এই ধর্মঘট ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার শুভ ইঙ্গিতের বার্তাবহ ছিল; লেনিন ঐ ধর্মঘটে অংশগ্রহণের ঘটনাটিকে তাদের 'প্রথম রাজনৈতিক কর্ম' বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।[৪৭] তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, ১৯১৮ সালের পূর্ববর্তী ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট ছিল বিরল ঘটনা। ধর্মঘটগুলি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, অসংগঠিত এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক চেতনার অভাবে ক্লিষ্ট। হুইট্‌লি কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, তখন যোগ্য নেতৃত্ব ও জোরদার সংগঠনের অভাবে এবং জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর অবর্তমানে শ্রমিক-শ্রেণী হীনবল ছিল। শিল্পে অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হলেই শ্রমিকেরা আন্দোলনের পথে অগ্রসর না হয়ে একমাত্র বিকল্প পন্থা হিসাবে গ্রামে প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করতে অভ্যস্ত ছিল।

জন্মের পর থেকে প্রায় এক দশক সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস উদারনীতির সমর্থক রাজনীতিবিদদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। জঙ্গী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ কিছুকালের মধ্যেই শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২২ সাল থেকে ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থী চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ও ক্রমবিস্তার লক্ষ্য করা যায়। সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ক্রমশ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কর্মসূচী ও ক্রিয়াকর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন।[৪৪] ঐ কর্ম-সূচীতে সমাজতান্ত্রিক ভারত-রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য ঘোষণা করা হয়; উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনার দাবি জানান হয়। শ্রমিকশ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতিবিধান, সংঘ-সমিতি-

সমাবেশ গড়ে তোলার স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির দাবিতে ঐ কর্মসূচী রচিত হয়েছিল। শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ এবং বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্দেশ্যও ঐ কর্মসূচীতে স্থান পেয়েছিল। সামগ্রিক বিচারে ঐ কর্মসূচী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তার স্মারক হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

ত্রিশের দশকের শুরু থেকে ভারতের গ্রামীণ জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য ও শহরগুলির শ্রমিক জনতার উপর ক্রমবর্ধমান শোষণ বিশেষরূপে প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯২৮ ও '২৯ সালে বোম্বের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সমকালীন ঔপনিবেশিক এশিয়ার বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা (দি রেড ফ্ল্যাগ বোম্বে গিরনী কামগড় ইউনিয়ন) প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়। ১৯২৮ ও '৩০ সালের জি. আই. পি. এবং এস. আই. রেলওয়ের শ্রমিকদের ধর্মঘট শ্রমিক-শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবর্ধমান শক্তির পরিচয় দেয়। এই সময় সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা তিন লক্ষ অতিক্রম করে।[39] সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নিজস্ব পতাকাতলে সমবেত হয়ে সংঘবদ্ধ শ্রমিকেরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। শ্রমিকদের উপর সরকারী দমন-পীড়ন মাত্রাতিরিক্ত হয়ে উঠতে থাকে। ধর্মঘটের স্বাধীনতা সীমিত করা হয়। বামপন্থী শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রয়োগ করা হতে থাকে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম সারির বামপন্থী নেতাদের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

এই সময় থেকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীর বক্তব্যে তীব্র সমালোচনা লক্ষিত হতে থাকে। অবশ্য এই সমালোচনা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রভাবমুক্ত ছিল; লাঞ্ছিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি মমত্বের জন্য তিনি ধনতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না; পুঁজি ও শ্রমের সমন্বয় সাধন করা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলন এমনভাবে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন যাতে ধনিকশ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী একযোগে অংশগ্রহণ করতে পারে। কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের ভিত্তিতে শ্রমিক আন্দোলন পরিচালনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ভারতীয়

বংশোদ্ভূত সাকলাৎওয়ালার বক্তব্য অনুধাবন করে গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন যে, সাকলাৎওয়ালা 'ভারত ও ভারতীয় পরিস্থিতি' বোঝেন না।

গান্ধীর বক্তব্যের সাথে মৌল পার্থক্য সত্ত্বেও সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী আইন অমান্য আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়নি। ১৯৩৭ সালে ভারতের অধিকাংশ প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস-পরিচালিত মন্ত্রিসভা গঠনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল।

মতাদর্শগত কারণে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে একাধিকবার ভাঙন ধরেছিল। ১৯৩৮ সালে বিযুক্ত সংস্থাগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং তারপর থেকে শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠতে থাকে। আর্থনীতিক দাবিদাওয়া আদায়ের আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম সম্মিলিতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতনতার দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে তুলতে থাকে।

ধনিকশ্রেণীর বিকাশ ও ভূমিকা

উদারপন্থা আশ্রয়ী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শৈশবের দিনগুলিতে সামাজিক বিভিন্ন স্তরের মানুষকে আন্দোলনে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের বিরাট একটি অংশ ঐরূপ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ভারতীয় সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রপত্রিকা তাঁদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। দাদাভাই, সুরেন্দ্রনাথ, তেলাঙ্, রানাডে, আগরকর, তিলক, গোখেল, সুব্রাহ্মনীয় আয়ার, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, মদনমোহন মালব্য, কে. কে. মিত্র, রামপাল সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করেছিল। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শিল্প বা বাণিজ্যের মালিক বুর্জোয়া শ্রেণী উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। এমন কি, বিদেশী জিনিসপত্র বর্জন ও স্বদেশী প্রয়াসে প্রস্তুত জিনিসপত্র ব্যবহারের দাবিতে সংগঠিত জঙ্গী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও বুর্জোয়া শ্রেণী সাহায্যের হাত প্রসারিত করেনি। গান্ধীপূর্ব ভারতে উদারপন্থী ও চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যকরী সমর্থন আদায় করতে পারেননি। কেননা, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর

শৈশবকাল তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঐ শিশু শ্রেণীর দ্বন্দসংঘাত তখনও শুরু হয়নি। বরং ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর ছত্রছায়ায় আশ্রয় লাভ করে 'হাঁটি হাঁটি পা পা' শিখে সুযোগসুবিধা লাভের জন্ত ঐ শ্রেণী কৃপাপ্রার্থী ছিল। জমিদার ও ভূস্বামীরাও বর্তমান শতাব্দীর আগে জাতীয়তাবাদী চৈতন্যে সমৃদ্ধ ছিলেন না।

বিগত শতাব্দীর আশির দশকে বণিক, শিল্পপতি, জমিদার, ভূস্বামী, আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও সরকারী আমলাদের সম্মিলিত শক্তিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের 'উগ্র' বা 'রাজদ্রোহী' ক্রিয়াকলাপ অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা গ্রহণে আগ্রহী ছিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও ভারতীয় স্বার্থের বৈপরীত্য এ ধরনের পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে অন্তরায় ছিল। কিন্তু একথা সত্য যে, ভারতীয় ধনিকশ্রেণী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি। এই শ্রেণীর অবর্তমানে শহরবাসী, পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। এই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল ব্রিটিশের তৈরী ভারতীয় আর্থনীতিক বাজারে। জমি থেকে লব্ধ বা পেশা থেকে প্রাপ্ত আয়ে এই শ্রেণীর বিত্ত গড়ে উঠেছিল। এই শ্রেণী কলকারখানার মালিক ছিল না। এই শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন আন্দোলন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীকে ব্রিটিশ-বিরোধী করে তুলতে সক্ষম হয়নি। স্বার্থের তাগিদ, নিজস্ব শক্তির সীমাবদ্ধতা ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মন্দগতি ভারতীয় ধনিক-শ্রেণীকে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় সরব হতে প্রেরণা দেয়নি।

বিগত শতাব্দীর আশির দশক থেকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর বিকাশ দ্রুততর হতে থাকে এবং ঐ শ্রেণীর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫-'০৮) থেকে ঐ শ্রেণী নিজস্ব দাবিগুলি ও অধিকার-সমূহ উপস্থাপনা করতে শেখে। ভারতীয় উদীয়মান শিল্পপতিদের আর্থনীতিক স্বার্থ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতায় বিঘ্নিত হলে প্রতিবাদের রাজনীতির সূত্রপাত ঘটতে থাকে। ভারতের সামাজিক অর্থনীতির পটভূমিতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর প্রিয় মুক্ত বাণিজ্যের নীতি ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। স্বভাবতই এই নীতির বিরুদ্ধে শিল্পপতিরা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে থাকেন, এবং গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত বেদনাদায়ক বৈষম্যমূলক বাণিজ্যনীতির অবসানের জন্য সংঘবদ্ধ হতে থাকেন।

ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর উপস্থিতি ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর কাছে শুধু অনভিপ্রেত ছিল এমন নয়, সরাসরি স্বার্থবিরোধী ছিল। এই সময়ে ভারতীয় পেশাগত শ্রেণীগুলি চাকুরি, পেশা বা বৃত্তিগুলিতে ব্রিটিশ প্রাধান্য কমিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে সামিল হচ্ছিল। এই শ্রেণীগুলি চাকুরি, বৃত্তি, পেশা, শিল্প ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয়করণের আর্থনীতিক-রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে সচেষ্ট ছিল। ভারতীয় ধনিকশ্রেণীও শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের আধিপত্য হ্রাস করার জন্য নিজস্ব নেতৃত্বে স্বদেশী শিল্পায়ন, দেশীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ইত্যাদির দাবিতে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯০৬ সালে প্রথম সারা ভারত শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, শিল্পপতিদের দাবিদাওয়া ও পেশাগত শ্রেণীগুলির চাহিদা এই সময় একাত্ম হয়ে ওঠে।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর একটি অংশ বিদেশী জিনিস বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের কার্যক্রম সোৎসাহে সমর্থন করে। বলা নিষ্প্রয়োজন, শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে এই উৎসাহ অনায়াস-লভ্য ছিল। বোম্বের শিল্পপতিরা ঐ যুগে বঙ্গভূমিতে 'স্বদেশী বস্ত্র' সরবরাহ করে মোটা রকম মুনাফার মুখ দেখেছিল।[40] তখন থেকে শিল্প ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ধনিকশ্রেণীর একাংশ বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির সাথে একযোগে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণে অগ্রসর হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল থেকে ভারতে শিল্পায়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হলে এবং লৌহ, ইস্পাত ইত্যাদি শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ধাপে ধাপে বেড়ে চলে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ সময় থেকে ব্যাপক ও দৃঢ় গণভিত্তি লাভ করতে থাকে। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কিষাণ, মজদুর, হরিজন, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি সকল স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিভূ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। অসহযোগ আন্দোলন (১৯১৯-'২১) ভারতীয় সমাজের প্রায় সকল স্তরের নরনারীর রাজনৈতিক সচেতনতার উৎসমুখ খুলে দেয়।

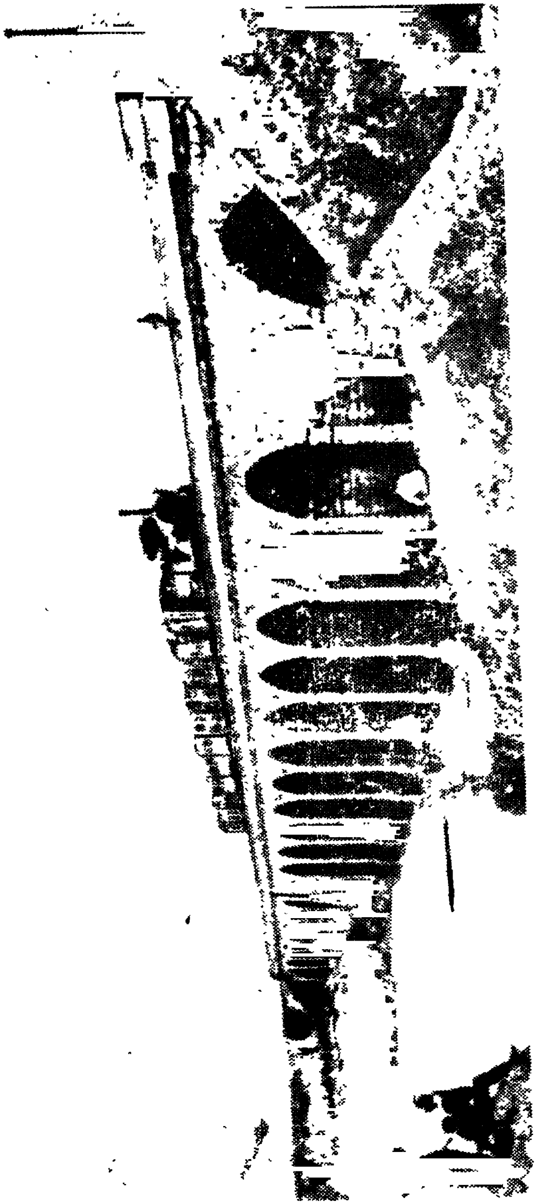
ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সম্মুখে একটি দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস-পরিচালিত মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন ও সাহায্য যুগিয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করা এই শ্রেণীর কাছে



চিত্র ১



চিত্র ২

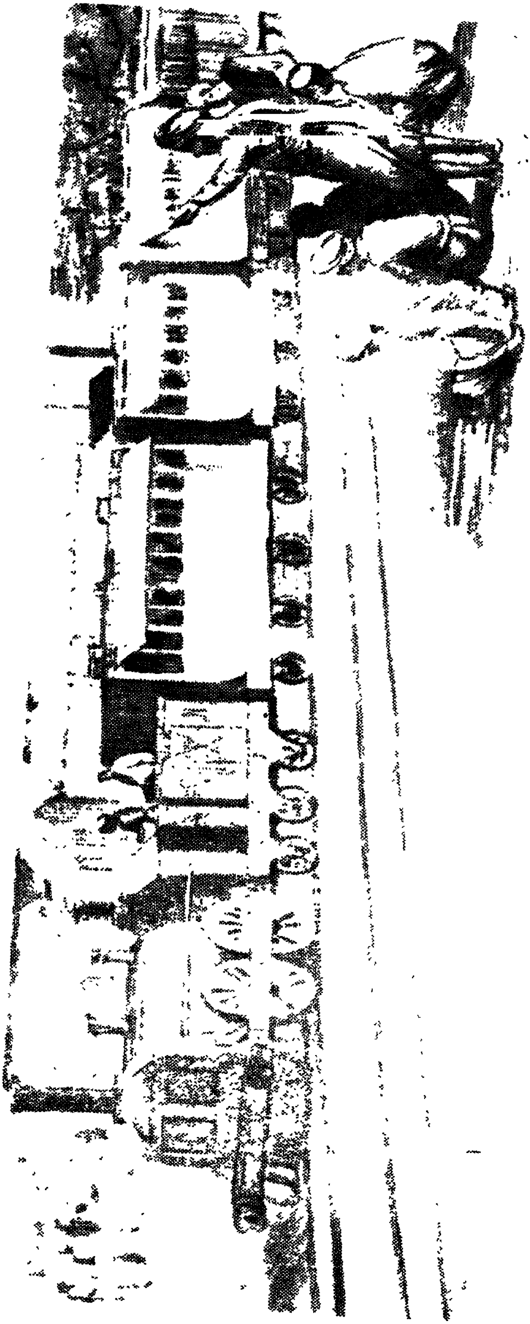




চিত্র ৪



চিত্র ৫



চিত্র ৬

চিত্র

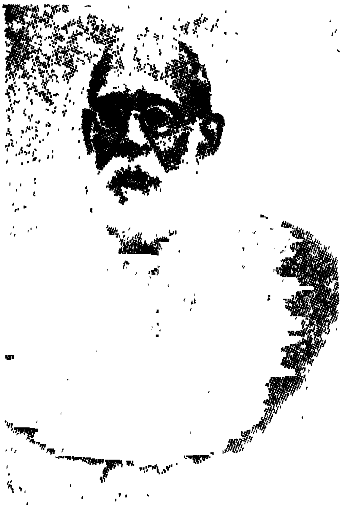




চিত্র ৮



চিত্র ৯



চিত্র ১০



চিত্র ১১



চিত্র ১২



চিত্র ১৩



চিত্র ১৪



চিত্র ১৫





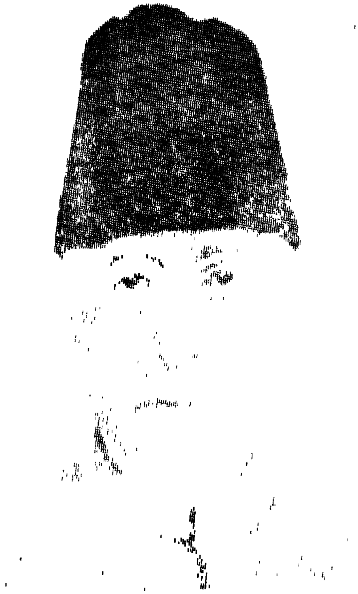
চিত্র



চিত্র ১৮



চিত্র ১৯



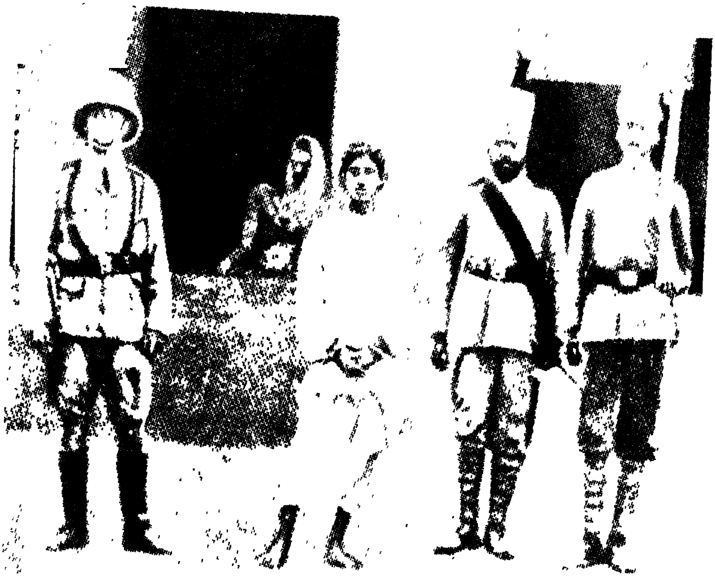
চিত্র ২০



চিত্র ২১



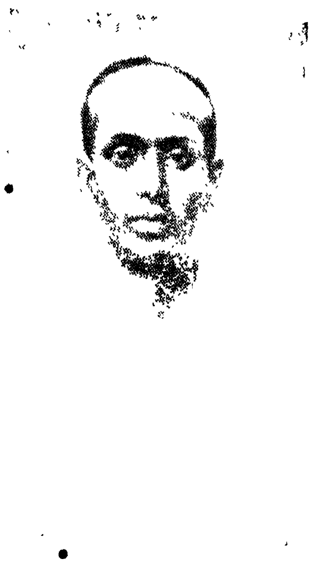
চিত্র ২২



চিত্র ২৩



চিত্র ২৪



চিত্র ২৫



চিত্র



চিত্র ২৭



চিত্র ২৮



চিত্র ২৯



চিত্র



চিত্র ২.



চিত্র ৩২



চিত্র ৩৩



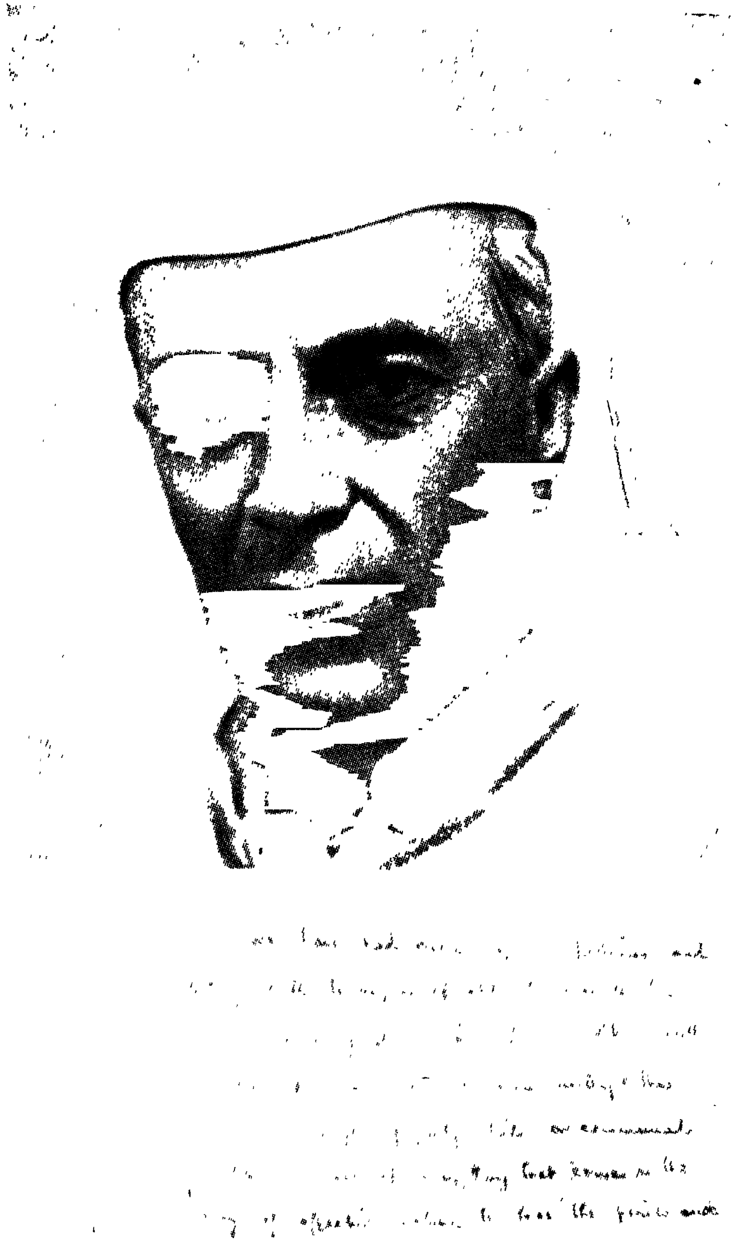
চিত্র ৩৪



ডাণ্ডি মার্চ ১



ডাণ্ডি মার্চ ২



চিত্র ৩৬



চিত্র ৩৭



চিত্র ৩৮



চিত্র ৩৯

চিত্র



চিত্র



চিত্র ৪১



চিত্র ৪২

সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। আবার, উৎপাদনের লাইসেন্স, ঋণ, অনুদান, শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি, বাজার ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা লাভের জন্য এই শ্রেণীর পক্ষে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী তথা ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের মুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।[41] **দ্বৈত স্বার্থের বিরোধমূলক পরিস্থিতিতে** এই শ্রেণী **দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম হিসাবে** কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনে সমর্থন ও সহযোগিতা যোগাতে মনস্থ করে, আর **স্বল্পকালীন বাস্তবোচিত কর্মপন্থা হিসাবে** ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণী ও ঔপনিবেশিক শাসন-কর্তৃপক্ষের অনুগত থেকে স্বার্থসিদ্ধি করতে তৎপর থাকে। সামগ্রিকভাবে ভারতের ধনিকশ্রেণী এরূপ দ্বৈত কার্যক্রম গ্রহণ করলেও ব্রিটিশ ভারতে **ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণীর সম্পূর্ণ সহযোগী** বা **কংগ্রেসের একনিষ্ঠ অনুগামী** ভারতীয় ধনিক ছিলেন না এমন নয়।

জন্মলগ্নের পর থেকেই নবজাতক ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৮৮৭ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স-এর প্রতিষ্ঠা এরূপ চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটায়। ১৯০০ সালে কোলকাতায় মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স জন্মলাভ করে। ১৯০৭ সালে বোম্বেতে ইণ্ডিয়ান মার্চেন্ট্স চেম্বার স্থাপিত হয়। ১৯০৯ সালে মাদ্রাজে সাউথ ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স ও ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্র চেম্বার অফ কমার্স স্থাপিত হয়। বিগত শতাব্দীর শেষ দুটি দশক থেকে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম তিনটি দশকের মধ্যে কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিদের প্রধান সংগঠনগুলি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রাদেশিক রাজধানী বা বন্দরনগরে এধরনের সংগঠন বা শাখা সংগঠন গড়ে উঠলেও কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজের শিল্পপতি ও বণিকেরা ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত থাকেন। **জাতিগত দিক থেকে এই ধনিকশ্রেণী মারোয়াড়ী, গুজরাটি ও পার্শী নেতৃত্বে পরিচালিত ছিল।** ভৌগোলিক ও জাতিগত দিক থেকে এই শ্রেণী নানারূপ অসম্পূর্ণতা, বৈপরীত্য ও সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন ছিল। ঔপনিবেশিক পটভূমিতে ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর সাথে এই শ্রেণীর স্বার্থসংঘাত আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় বণিক-শিল্পমালিক সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

ভারতীয় শিল্পপতিরা **বিশেষ বিশেষ শিল্পে॰ ভারতীয় মালিকস্বার্থ**

রক্ষার জন্য সংগঠন গড়ে তোলাও প্রয়োজন মনে করেছিলেন। ১৮৭৫ সালে বোম্বে মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েসন, ১৮৮১ সালে ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েসন, ১৮৮৪ সালে জুট মিল্‌স এ্যাসোসিয়েসন এবং ১৮৯১ সালে আমেদাবাদ মিলওনার্স এ্যাসোসিয়েসন স্থাপিত হয়েছিল। আবার, নিয়োগকর্তা হিসাবেও বণিক ও শিল্পপতিরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার জন্য যত্নবান ছিলেন: ১৯২০ সালে এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন অফ সাদার্ণ ইণ্ডিয়া, ১৯২৭ সালে ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি এবং ১৯৩৩ সালে অল ইণ্ডিয়া অর্গানাইজেসন অফ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ার্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনগুলি প্রভূত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার ব্যাপারে এরূপ সংগঠনগুলির ভূমিকা অনুরূপ ইউরোপীয় সংগঠনগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই ভারতীয় অর্থনীতিতে একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব ঘটেছিল; স্বল্প মূলধনের মালিক শিল্পপতিদের হটিয়ে বৃহৎ শিল্পপতিরা বিপুল মূলধন বিনিয়োগ করে এক-একটি শিল্পের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্থনীতিক জীবনে আধিপত্য লাভ করে একচেটিয়া কারবারীরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়েছিলেন। এই কাজে সংবাদপত্র জগতের উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। জি. ডি. বিড়লা বহু পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করে কেন্দ্রীভূত পরিচালনার নীতিতে জনমত গঠনে প্রয়াসী হন; তাঁকে অনুসরণ করে অন্যান্য বৃহৎ শিল্পপতিরাও অনুরূপ কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। **অর্থনীতির উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে জাতীয় রাজনৈতিক জীবন এবং চিন্তা ও মননের অন্তর্প্রদেশে অনুরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপের পথ সুগম করে।**

বুর্জোয়া শ্রেণীর বৃহৎ একটি অংশ বিড়লা, বাজাজ, সারাভাই, লালভাই প্রমুখ বৃহৎ শিল্পপতিদের নেতৃত্বে গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের বহুবিধ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা দান করেছিল। অথচ বৃহৎ শিল্প, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে গান্ধীর বক্তব্য প্রত্যক্ষভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থের অনুকূল ছিল এমন নয়। তাঁর 'সম্পত্তির অছি তত্ত্ব' ঐ শ্রেণীর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠার উপাদানে ভরপুর ছিল না। তবুও বুর্জোয়া শ্রেণী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। তিনি সমগ্র

ভারতে 'দার্শনিক-নৈতিক ও রাজনৈতিক এমন একটি উত্তপ্ত কটাহ' সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন যার অভ্যন্তরে ভারতীয় চিন্তা ও মনন প্রচণ্ড উত্তাপের ঘূর্ণিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল।[42] কোন শ্রেণীর পক্ষেই স্থবির চিন্তায় স্বচ্ছন্দ থাকা সম্ভব ছিল না। এদিক থেকে গান্ধীর ভূমিকা প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল। বহুশ্রেণী-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তাই সকল শ্রেণীর পক্ষে গান্ধী-পরিচালিত আন্দোলনে কোন-না-কোনভাবে সামিল হওয়া সম্ভব ছিল।

মন্দীভূত আর্থনীতিক ক্রিয়াকর্মের পীঠস্থান হিসাবে স্থায়িত্ব দিতে তৎপর ছিল।

14. Karl Marx : *The Future Results of British Rule in India,* July 22, 1853, New York Daily Tribune.
15. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সভ্যতার সঙ্কট'……পৃ: ৪০৮
16. B. R. Nanda : *Gokhale, the Indian Moderates and the British Raj,* p. 485
17. Nirad C. Chaudhuri : *The Intellectual in India,* p. 28
18. Milton Singer : *When a Great Tradition* Modernizes…, ch. 1
19. মি: সুমিত সরকার অবশ্য তাঁদের সনাতনী গোষ্ঠীতেই অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী বলে মনে হয়। Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal,* 1903-1908, (1973), pp. 513-514
20. Amales Tripathi : *The Extremist Challenge,* ch. 1
21. ঐ
22. K. K. Chatterjee : *English Education in India—Issues and Opinions,* 1976, p. 203
23. স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ খান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি বদরুদ্দীন তায়েবজীকে লেখা চিঠিতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণের বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। R. Coupland : *The Indian Problem,* 1944, Part I, p. 156 দ্রষ্টব্য।
24. Bipan Chandra : *Nationalism and Colonialism in Modern India,* p. 145
25. Jawaharlal Nehru : *Indian Wins Freedom* (1962). Article on Mahatma Gandhi, pp. 66-67
26. Keshab Choudhuri : *A Limited-Frame Reference to Gandhian Relevance* in Journal of Gandhian Studies, Vol. 3, Nos. 11-12, April—July, 1976 দ্রষ্টব্য। 'It is a wrong way to say that Gandhi proceeded from Ethics with a capital E to Economics with another capital E.

The question of journey from one E to another E is meaningless if we know that the destination itself is EE. We cannot and should not try to find a qualitative difference between the Gandhian axioms and the axioms of any other system.'

S. P. Aiyar: *Modernization of Traditional Society*, 1973, pp. 68-69 দ্রষ্টব্য ; ঐ নিবন্ধে রাজনীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তিলক ও গান্ধীর পরস্পর বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে : "Tilak had no patience with Gandhi's insistence on Truth and Non-violence. He frankly told Gandhi—'My friend ! Truth has no place in politics.' And further, in a letter to *Young India*, Tilak wrote—'Politics is a game of worldly people, and not of sadhus.' In reply Gandhi wrote—'With deference to the Lokmanya, I venture to say that it betrays mental laziness to think that the world is not for sadhus.'......Gandhi's techniques of political action and his world view formed a unified whole."

27. L. I. Rudolph and S. H. Rudolph: *The Modernity of Tradition*, 1969, দ্রষ্টব্য।

28. A. R. Desai: *The Social Background of Indian Nationalism*, pp. 204-205

29. Geoffrey Ashe: *Gandhi—A Study in Revolution*, 1968, p. 355: Gandhi 'ploughed through *Das Capital*, although put off by its style......' 'Pyarelal got the impression that the course had confirmed him in his own brand of communism, which was close to Marx's forerunners than to Marx, and had not won him over to the idea of class war.'

30. *The Amrita Bazar Patrika*, August 3, 1934

31. Robert Payne : *Life and Death of Mahatma Gandhi*, 1969, p. 423

32. Louis Fischer : *A Week with Gandhi*, 1944, pp. 43 and 73. Also see, D. G. Tendulkar : *Mahatma* : Life of Mohondas Karamchand Gandhi, Vol. VI, p. 122

33. মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিশারকে '৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সম্ভাব্য রূপরেখা বর্ণনা করা প্রসঙ্গে গান্ধী বলেছিলেন, 'কৃষকেরা খাজনা দে'য়া বন্ধ করে দেবে......কিন্তু (খাজনা) দেবার অস্বীকৃতি তাদের এরূপ ভাবতে সাহস যোগাবে যে, তারা স্বাধীন কর্মপন্থা গ্রহণে সক্ষম। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে জমি কেড়ে নেওয়া।'

'With violence ?' enquired Louis Fischer.

'There may be violence', Gandhi said, 'but again landlords may cooperate.'

'You are an optimist,' remarked Louis Fischer.

'They might cooperate by fleeing ,' Gandhi joked.

* * * *

"'Or,' said Louis Fischer, 'they might organize violent resistance' ?

'There might be fifteen days of chaos,' Gandhi speculated, 'but I think we could soon bring that under control.'

'You feel, then, it must be confiscation without compensation ?' Louis Fischer asked.

'Of course', Gandhi agreed. 'It would be financially impossible for any body to compensate the landlords.'

33. S. Wolpert : *A New History of India* (1977), pp. 346-347

34. Gyan Pandey : *Peasant Revolt and Indian Nationalism—The Peasant Movement in Awadh, 1919-1922*, in R.

Guha (ed.): Subaltern Studies I—Writings in South Asian History and Society (1982), pp. 150-151

অধ্যায় ২

1. Harold Isaacs: *Scratches On Our Minds—American Images of China and India*, 1858, দ্রষ্টব্য।
2. G. W. F. Hegel: *The Philosophy of History*. New York, 1956, p. 142.
3. Louis de Camos: *The Lusiads*. Translated into English by Richard Fanshawe, 1963, সপ্তম স্তবক।
4. কবিতাটির বয়ান M. L. Burke রচিত *Swami Vivekananda in America* (Calcutta, 1958) গ্রন্থের ১৩১ নং পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত রূপে পাওয়া যায়:

See that heathen mother stand
Where the sacred current flows;
With her own maternal hand
Mid the waves her babe she throws.
Hark! I hear the piteous scream;
Frightful monsters seize their prey,
Or the dark and bloody stream
Bears the struggling child away.
Fainter now, and fainter still,
Breaks the cry upon the ear;
But the mother's heart is steel
She unmoved that the cry can hear.
Send, O send the Bible there,
Let its precepts reach the heart;
She may then her children spare—
Act the tender mother's part.

5. Milton Singer : *Where a Great Tradition Modernizes*...এর কুড়ি পৃষ্ঠায় 'সহোদর' ধারণাটির ইংরাজী বয়ান দেওয়া হয়েছে : 'the lesser breeds without the law'.

6. Schwab : *La Renaissance Orientale* (note I, Introduction to Part I). See M. Singer : *When A Great Tradition Modernizes*..., p. 24

7. D. S. Somervell : *English Political Thought in the Nineteenth Century*, 1964, pp. 60-61, 67 and 72

8. Garratt সম্পাদিত *Legacy of India*-তে H. G. Rawlinson কর্তৃক উদ্ধৃত, p. 33

9. Benoykumar Sarkar : *The Futurism of Asia and Other Essays on the Relations Between the East and West*, 1921, pp. 166-167

10. Aubrey Menen : *The New Mystics and the True Indian Tradition*, 1974, p. 116

11. A. R. Desai : *Social Background*..., pp. 23-24 দ্রষ্টব্য।

12. M. Singer : *When a Great Tradition Modernizes*...ch. 2-তে 'ক্ষুদ্র ও মহান ঐতিহ্য' সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

13. V. I. Pavlov : *Historical Premises For India's Transition to Capitalism*, p. 123

14. D. Williams and E. D. Potts (eds.) : *Essays in Indian History in Honour of C. C. Davies*, 1973, p. 141

15. ঐ ; সির-হি-আকবর গ্রন্থের মুখবন্ধে দারা শিকোহ্ বলেছেন যে, সত্য কেবল কোরাণের একচেটিয়া নয়। মাফুজুল-উল্-হক সম্পাদিত মাজমা-উল-বাহ্রিন, পৃঃ ৫ ও ১১ দ্রষ্টব্য। উক্তিটির ইংরাজী তর্জমা পাওয়া যায় D. Williams and E. D. Potts সম্পাদিত পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১৪৫ নং পৃষ্ঠায়।

16. V. I. Pavlov : *Historical Premises*..., p. 19

17. Sir J. N. Sarkar : *Mughal Administration* (1969), p. 47

18. Benjamin Heyne quoted, V.I. Pavlov : *Historical Premises...*, pp. 34-35
19. Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India*, 1951, p. 261
20. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, pp. 141-155
21. J. Ovington : *A Voyage to Surat in the year* 1789 ; Oxford, 1929, p. 189
22. See, V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, pp. 156-157
23. The Indian Economic and Social History Review, Vol. XI, Nos. 2-3, June-September, 1974, p. 180
24. N. K. Sinha : *The Economic History of Bengal*, Vol. II, p. 219
25. Romilla Thapar : *Ideologies and Interpretation of Early Indian History*, in K. S. Krishnamurti and *et al.* (eds.)—Essays in Honour of Sachin Chaudhuri (1977), p. 5
26. V. I. Pavlov : *Historical Premises*···, p. 25
27. Karl Marx and Frederic Engels : *On Colonialism* দ্রষ্টব্য।
28. Romilla Thapar : *Ideologies and Interpretation...*, p. 7
29. Max Weber : *General Economic History*, translated by Frank H. Knight (1961), p. 361. Caste Forms and Schisms অধ্যায়ে ওয়েবার বলেছেন : 'It was impossible to shatter traditionalism based on caste ritualism anchored in *karma* doctrine by rationalizing the economy.' P. 123 'The effects of the caste system on the economy...were essentially negative...this order by its nature is completely traditionalistic and anti-rational in its effects'. P. 111 'Hinduism is characterized by a dread of the magical evil of innovation.' P. 122
30. "*The Communist Manifesto* concludes with the phrase 'they (the proletariat) have nothing to lose but their chains, they have a world to win.' The same holds for

the pious Hindu of low castes. He too can 'win the world', even the heavenly world; he can become a Ksatriya, a Brahman, he can gain Heaven and become a god—only not in this life, but in the life of the future after rebirth into the same world pattern." প্রোটেস্টান্ট ও হিন্দু নৈতিকতা এবং ধনতান্ত্রিক উদ্যোগ সম্পর্কে ওয়েবারের মতামত নিম্নোক্ত তিনটি গ্রন্থে লভ্য: *The Religion of India*; *The Sociology of Hinduism and Buddhism*; *The Sociology of Religion.*

31. Milton Singer: *When a Great Tradition Modernizes...*, ch. 8 দ্রষ্টব্য।
32. M. N. Srinivas: *Religion and Society Among the Coorgs of South India* (London, 1952) দ্রষ্টব্য। শ্রীনিবাসের পরবর্তীকালের দু'টি গ্রন্থও এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য: *Caste in Modern India and Other Essays* (Bombay, 1962) এবং *Social Change in Modern India* (Berkeley, 1968)
33. Nemaisadhan Bose: *Indian Awakening and Bengal*, Third edition, 1976, p. 2
34. R. C. Majumdar: *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, p. 18

অধ্যায় ৩

1. Amales Tripathi: '*Land Revenue Policy*,' Ch. XXXVI in R. C. Majumdar and *et al.* (eds.)—*History and Culture of the Indian People, British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. IX, Part I, p. 1122.

'The product of the Cornwallis System never dreamt of applying capitalist methods to agriculture. He (Zamindar) resumed leases not to farm himself but to resettle for a higher profit. No cash crop played here as impor-

tant a role as sheep-farming in England. The Bengal peasant did not evolve from a villein. We should not confuse him with the English customary tenant or copy-holder and certainly not with the tenant-at-will. The 'pattah' has only a superficial similarity with 'Copy' but it was not conferring any rights and privileges not possessed before ; on the contrary, it curtailed them.' Amales Tripathi : *Land Revenue Policy......*, p 1142, footnote. V. Smith : *The Oxford History of India* (Third edition), p. 637 দ্রষ্টব্য।

2. ঐ, পৃ: ১১৪২ ; Eric Stokes : *The English Utilitarians and India...*, 1959, হিতবাদী দর্শনের প্রভাব বর্ণনা করেছে।
3. Hunter's *Statistical Account of Bengal Rent* ; *The Famine Commission Report of 1878*, Appendix, Vol. III, pp. 387 and 394 ; A. Macdonnell's evidence before the Currency Commission, 1878, Part I, pp. 211-212
4. Sahid Amin : *Small Peasant Commodity Production and Rural Indebtedness—the Culture of Sugarcane in Eastern U. P., c. 1880-1920*, in Ranajit Guha (ed.) : Subaltern Studies I..., p. 40
5. A. B. Keith : *A Constitutional History of India*, 1936, Vol. 1, p. 215
6. Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement*...pp. 513-514
7. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, pp. 333-354
8. V. I. Lenin : *The Development of Capitalism in Russia* দ্রষ্টব্য।
9. Karl Marx : *Capital*, Vol. 1, ch. XXXI : Genesis of the Industrial Capitalist.
10. A. R. Desai—*Social Background...*, p. 57. And R. C. Majumdar (ed.) : History and Culture of the Indian People..., ch. on *Land Revenue Policy*, pp. 1132-1133

11. V. K. R. V. Rao : *The National Income of British India*, 1941, p. 190. Also see *Floud Commission Report*, 1941, Vol. 1, p. 86, Vol. II, p. 30

12. A. Ghosh and K. Dutt : *Development of Capitalistic Relations in Agriculture (A Case Study of* W. *Bengal) 1793-1976*

13. K. Marx : *The Future Results of British Rule in India*, Karl Morx & F. Engels—Selected Works (Moscow, 1969), p. 495

14. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, p. 355

15. R. C. Majumdar (ed.) : *History and Culture of the Indian People*...ch. XXXVII, p. 1134. বিচারপতি পীকক্‌ ও জ্যাকসন সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তীকালের খাজনা সংক্রান্ত আইনগুলিকে এমন-ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রজাদের স্বার্থহানি ঘটেছিল। They 'intepretated the Great Rent Act (X of 1860) in such a way as to nullify its object and leave the Zamindars (and the planters with Zamindari rights) the old whip-hand.'

16. R. C. Dutt : *Famines and Land Assessments in India* (1910), Preface.

17. R. P. Dutt : *India Today* এবং W. Digby : *'Prospsrous' British India* (London, 1901), p. 8

18. R. C. Majumdar (ed.) : *History and Culture of the Indian People...*, ch. entitled Land Revenue Policy, pp. 1140-1141

19. ঐ

20. ঐ, p. 1141

21. ঐ, p. 1142 ; See also *Census Reports, 1911 & 1921*

22. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 53

23. ঐ

24. A. Ghosh : *Agricultural Labour in Bengal*, Indian Journal of Economics, 1948

25. Sumit Sarkar : *Modern India* 1885-1947, p. 30

26. Clifford Geertz প্রক্রিয়াটির নামকরণ করেছেন agricultural involution.

27. D. H. Buchanan : *The Development of Capitalist Enterprises in India*, 1934 দ্রষ্টব্য।

28. Karl Marx : *The British Rule in India*, K. Marx and F. Engels—Selected Works, Vol. 1 দ্রষ্টব্য।

29. ঐ

30. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 50

31. K. A. Wittfogel : *Oriental Despotism—A Comparative Study of Total Power* (New York, 1981, Reprint), p. 372

অধ্যায় ৪

1. B. N. Ganguli : *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory.* (1965), pp. 5-7

2. Karl Marx and F. Engels : *On Colonialism* (Moscow, 1965), pp. 38-39

3. রোজা লুক্সেমবার্গ বলেছিলেন যে, এরূপ কার্যক্রম ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গ্রহণ করে 'for the completion of the natural slow erosion of non-capitalist forms in preparation for a transition to commodity economy. Hence the constant military occupation of the colonies, native uprisings and colonial expeditions to put them down as a permanent feature of the colonial regime. Coercion in this case is the direct consequence of the clash between capitalism and subsistence structures which set a limit on capital accumulation.' R. Luxemberg : *Nakopleniye kapitala*, Moscow,

1966, p. 260. For the English translation, see V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, p. 271

4. D. H. Buchanan : *The Development of Capitalist Enterprises in India* ; D. R. Gadgil : *The Industrial Evolution of India in Recent Times* (1933) দ্রষ্টব্য।
5. A. N. Chandra : *The Sannyasi Rebellion* (1977), p. 157. Also see : Lester Hutchinson—*The Empire of the Nabobs*, p. 122
6. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, p. 341
7. A. Tripathi : *Trade and Finance in the Bengal Presidency* 1793-1833 ; Bombay, 1956, pp. 253 and 260
8. D. R. Gadgil : *The Industrial Evolution of India in Recent Times*, pp. 40-41
9. R. C. Majumdar and K. K. Dutta : *The Administrative Organization*, in R. C. Majumdar (ed.)—The History and Culture of the Indian People..., p. 867
10. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, p. 343
11. Karl Marx : *Capital*, Vol. 1, p. 598 দ্রষ্টব্য।
12. A. R. Desai : Social Background..., pp. 98-101
13. V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, p. 275
14. ঐ, পৃঃ ২৭৯
15. See, *Report from the Select Committee on East India Produce*, p. 168
16. তালিকা তিনটি V. I. Pavlov : *Historical Premises...*, pp. 280-281 থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।
17. A. Taylor : *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca in Bengal, 1851*, p. 234
18. See A. Tripathi : *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793–1833* and V. I. Pavlov : *Historical Premises ...*, p. 337. শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠী অভিমত প্রকাশ করেছেন যে,

বঙ্গদেশের বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণের অধোগতির জন্য উদ্ভূত ক্ষতি নীল, রেশম ও আফিঙ উৎপাদন এবং বাণিজ্যের ফলে তিন-চার গুণ (মূল্যের হিসাবে) পুষিয়ে গিয়েছিল। মিঃ পাভলভ এরূপ বক্তব্যকে একপেশে মনে করেছেন। তাঁর মতে শ্রীযুক্ত ত্রিপাঠীর অভিমত আন্তর্জাতিক বাজার-দরের ওঠা-পড়া ও জনকল্যাণের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করতে অপারগ। তা ছাড়া, নীল উৎপাদকের আয় এত কম ধার্য করা হয়েছিল যে, নীলচাষীর পক্ষে তখন ধান চাষ করা লাভজনক ছিল।

19. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 94 and V. I. Pavlov : *Historical Premises*...p. 60

অধ্যায় ৫

1. Amales Tripathi : *Industry*, in R. C. Majumdar *et al.* (eds.)—History and Culture of the Indian People..., ch. XXXV, p. 1095
2. *Report of Indian Industrial Commission*, Parliamentary Paper—Command 51 of 1919, pp. 11, 151
3. D. C. Coleman : *Industrial Growth and Industrial Revolutions*, Economics, New Series, XXIII (1956), pp. 1-22
4. W. W. Rostow : *The Stages of Economic Growth*, 1960 ; W. A. Lewis : *Theory of Economic Growth* ; S. Pollard : *Investment, Consumption and the Industrial Revolution*, The Economic History Review, Second Series, Vol. XI, No. 2 (1958)
5. W. W. Rostow অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রথম উৎক্ষেপের জন্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে শিল্পায়ন, রাজনীতির ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মানুষের সর্বেব প্রাধান্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী ও ভূপ্রকৃতির ক্ষেত্রে নগরীকরণ পূর্বশর্ত হিসাবে ক্রিয়াশীল থাকা প্রয়োজন।
6. তা সত্ত্বেও রানাডে (*Essays*, Third edition) এবং কালে (*Indian Industrial and Economic Problems*, Second edition) ভারতের শিল্পায়নে ব্রিটিশ মূলধনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে-

ছিলেন। তাঁরা অবশ্য শিল্পায়নের অধিকতর বিস্তার কামনা করেছিলেন। জন মেনার্ড কেইন্‌স এরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, শিল্পায়নের বিস্তৃতি কৃষির ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে ঘটতে পারে। কেইন্‌সের অভিমত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯১৩ থেকে ১৯২২ এবং পুনরায় ১৯২৮ সালের পর থেকে কাঁচামালের দাম পড়ে গিয়েছিল।

7. R. C. Majumdar and K K. Dutta : *The Administrative Organization,* in R. C. Majumdar *et al.* (eds.) History and Culture of the Indian people..., p. 865

8. স্বাধীন ভারতে আর্থনীতিক পরিকল্পনা চালু হওয়ার আগেকার কয়েকটি বছরের পরিসংখ্যানগুলি ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকের ভারতের আর্থনীতিক অবস্থা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অসঙ্গত নয়। কেনন। ঐ বছরগুলি থেকেই সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান রচনা ও ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস শুরু হয় বলা যায়। তা ছাড়া, ঐ বছরগুলিতে ভারতের আর্থনীতিক উন্নয়ন অত্যন্ত শ্লথগতিসম্পন্ন ছিল।

9. G. K. Shirokov : *Industrialization of India,* p. 14

10. ঐ

11. রানাডে ও গোখেলের ধারণা ছিল যে, মুক্ত বাণিজ্যের নীতিতে আস্থা ও সংরক্ষণ নীতির অভাব ভারতের চিরাচরিত শিল্পগুলির স্বার্থহানি ও নূতন ভারতীয় শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টির মূলে ক্রিয়াশীল। তাঁদের মতে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা আরও ইতি-বাচক হওয়া উচিত। তাঁরা উৎপাদনক্ষেত্রে সরাসরি সরকারী অংশ-গ্রহণ কাম্য মনে করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত মনে করেছিলেন যে, ভারতের দারিদ্র্য ও আর্থনীতিক পশ্চাৎপদতা দূর করার উপায় দ্রুত বিকাশোন্মুখ আধুনিক শিল্পগুলির মধ্যে নিহিত। স্থানীয় শিল্পগুলির দেউলিয়া অবস্থা এবং ভারতীয় অর্থনীতির কৃষিনির্ভরতা জাতীয় আয়ের শোচনীয় অবস্থা অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

নওরোজী, রানাডে, গোখেল ও রমেশচন্দ্রের শিল্পবিকাশ সংক্রান্ত মতামত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন-চারটি দশক ও বর্তমান শতাব্দীর

প্রথম দু'-তিনটি দশক জুড়ে নানা রূপ ধারণ করে বিভিন্ন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ্‌দের লেখায়, রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাবে এবং ব্যবসায়ী এবং জনপ্রতিষ্ঠানগুলির চিন্তাভাবনায় স্থান লাভ করে। ভারত সম্পর্কে 'শিল্পায়ন' শব্দটি সম্ভবত এম. বিশ্বেশরাইয়া প্রথম ব্যবহার করেন বর্তমান শতাব্দীর বিশের দশকের শেষ দিকে। ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পায়ন সম্পর্কে নানারূপ সমস্যা ১৯৩৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিয়োজিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির দলিলগুলিতে উল্লেখ করা হয়। ঐ কমিটি অভিমত প্রকাশ করে যে, 'শিল্পায়ন ছাড়া কোন দেশ রাজনৈতিক বা আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না।··· শিল্পায়ন ছাড়া জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত ও কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।'

১৯৪৪ সালে টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম, লালভাই প্রমুখ শিল্পপতিদের রচিত বোম্বে পরিকল্পনা ও 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবার' রচিত 'দি পীপ্‌লস প্ল্যান' এবং শ্রীযুক্ত আগরওয়াল রচিত ও গান্ধী অনুমোদিত গান্ধীবাদী পরিকল্পনায় শিল্পায়ন ও ভারী শিল্পের গুরুত্ব কমবেশী স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতীয় আর্থনীতিক চিন্তায় শিল্পায়ন সম্পর্কিত মতামত ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট ভাবধারায় সুস্থির হয়েছিল।

12. যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত): স্বদেশী, শ্রাবণ ১৩১৩ (১৯০৬)—'স্বদেশী আন্দোলনের ফল' দ্রষ্টব্য।
13. Sumit Sarkar : *The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908*, p. 102
14. G. Shirokov : *Industrialization...*, pp. 23-24
15. L. C. Jain : *Indian Economy Durlng the War*, 1944, p. 31
16. G. Shirokov, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, pp. 28-29
17. L.C. Jain, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, 128
18. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 113
19. G. K. Shirokov, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p. 49
20. ঐ
21. Amales Tripathi, পূর্বোক্ত নিবন্ধ, p. 1108
23. ঐ, p. 1109

24. G. K. Shirokov, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, p. 47
25. ঐ, p. 48
26. ঐ, pp. 51-52
27. ঐ
28. Max Weber : *Religion of India—The Sociology of Hinduism and Buddhism*, p. 328.
29. 'None of these entrepreneurs had the haziest notions as to what industry really meant...The root of the trouble lies in the Indian social system—the caste system.' See, Milton Singer : *'When a Great Tradition Modernizes...'*, p. 277
30. Milton Singer : *'Industrial Leadership, The Hindu Ethic and the Spirit of Socialism'* in *'When a Great Tradition Modernizes...,'* p. 280
31. ঐ ; পৃ: ২৮৩-২৯৮
32. Bipan Chandra : *Nationalism and Colonialism in Modern India*, p. 145
33. Satischandra Mukherjee : *The Indian Economic Problem*, The Dawn, March—June, 1900
34. গান্ধীর সম্পত্তির অছিতত্ত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত রচনাগুলি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা যায়—M. L. Dantwala : *Gandhism Reconsidered* (1945) ; Hiren Mukherjee : *Gandhiji—A Study* (1962, Second edition) ; J. J. Anjaria : *An Essay on Gandhian Economics* (1944) ; T. K. N. Unnithan : *Gandhi in Free India* (1956) ; Nirmal Kumar Bose : *Studies in Gandhism* (1962) ; Jawaharlal Nehru : *An Autobiography* (1962) ; Gunnar Myrdal : *Asian Drama—An Inquiry into the Poverty of Nations* (1968), Vol. II ; Amlan Dutt : *For Democracy* ; E. M. S. Namboodiripad *Lenin and Gandhi*, in New Age, Vol. IV, No. 10,

October, 1955; B. Bhattacharyya: *Evolution of the Political Philosophy of Gandhi*, 1969

অধ্যায় ৬

1. G. Almond and J. Coleman : *The Politics of the Developing Areas*, 1960
2. D. D. Kosambi : *The Culture and Civilization of India in Historical Outline* (1972, Reprint), pp. 122 & 125-126
3. See the Government of India publication entitled *Indian Railways: One Hundred Years*, 1853-1953 (Published in 1953)
4. স্যর আর্থার কটন যা বলেছিলেন তা হল এই: 'My great point is this, that what India wants is water-carriage; that the railways have completely failed; they cannot carry at the price required; they cannot carry the quantities and they cost the country three millions a year, and increasing to support them. That steamboat canals would not have cost more than one-eighth that of the railways; would earry any quantities at nominal prices and at any speed; would require no support from the Treasury; and would be combined with irrigation.'
5. '*Indian Railways : One Hundred Years*'...দ্রষ্টব্য।
6. R. C. Majumdar and K. K. Datta: *Administrative System*, in R. C. Majumdar *et al.* (eds.)—*History and Culture of the Indian People...*, p. 860
7. *Report of the Indian Road Development Committee*, 1927-28, para. 17
8. S. R. Srivastava : *Transport Development in India*, p. 253
9. ঐ, পৃ: ২৮০
10. ঐ, পৃ: ২৭১

11. ঐ, পৃঃ ৪৩০-৪৩২
12. See, I. Naqvi : *Air Transport in india*, p. 2
13. Karl Marx : *Future Results of British Rule in India* দ্রষ্টব্য।
14. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 143
15. B. B. Majumdar : *Indian Political Associations and Reform of Legislatures* 1818-1917, p. 2
16. ঐ, পৃঃ ৩
17. Briton Martin : *New India* 1885 দ্রষ্টব্য।
18. B. B. Majumdar : *From Rammohon to Dayanand* দ্রষ্টব্য।
19. K. B. Sayeed : *Pakistan—The Formative Phase* (1857-1948), p. 201

অধ্যায় ৭

1. R. C. Majumdar : *General Economic Condition of the People*, in R. C. Majumdar *et al.* (eds.)—History and Culture of the Indian People..., pp. 1157-1162
2. ঐ, পৃঃ ৮৩৫
3. R. K. Mukherjee : *Local Government in Ancient India*, Oxford (1919), p. 229
4. R. C. Majumdar and K. K. Dutt : *The Administrative Organization*, in R. C. Majumdar *et al.* (eds.)—The History and Culture of the Indian People...Vol. IX, Part I, p. 867
5. ঐ ; পৃঃ ৮৬৯
6. ঐ ; পৃঃ ৮৬৯
7. ঐ ; পৃঃ ৮৬৯
8. ঐ ; পৃঃ ৮৭০
9. ঐ ; পৃঃ ৮৬৯
10. ঐ ; পৃঃ ৮৬৯
11. ঐ ; পৃঃ ৮৬৮

12. Sir Percival Griffiths : *The British Impact on India*, 1952, pp. 227-228
13. Briton Martin : *New India* 1885 দ্রষ্টব্য।
14. R. C. Majumdar and K. K. Dutt : *The Administrative Organization...*, p. 870

জাতিবৈরী মনোভাবের নিদর্শন হিসাবে দু'টি উদ্ধৃতি :

(a) গভর্ণমেণ্ট অফ বেঙ্গল-এর প্রাক্তন সেক্রেটারি মি. সীটন কার্-এর উক্তি : 'The cherished conviction which was shared by every Englishman in India, from the highest to the lowest, by the planter's assistant in his lonely bungalow and the editor in the full light of the Presidency town—from these to the Chief Commissioner in charge of an important province and to the Viceroy on his throne—the conviction in every man that he belongs to a race whom God has destined to govern and subdue.'

(b) লর্ড রবার্টস-এর অভিমত : 'It is this consciousness of the inherent superiority of the European which has won for us India. However well educated and clever a native may be, and however brave he may have proved himself, I belive that no rank which we can bestow upon him would cause him to be considered as an equal by the Britiih officer.'

দু'টি উদ্ধৃতি যথাক্রমে R. C. Majumdar *et al.* (eds.) : *History and Culture of the Indian People...*, p. 871 এবং Sir Percival Griffiths : *The British Impact...*, p. 202 দ্রষ্টব্য।

15. R. P. Dutt : *India Today*, Bombay, 1947, p. 106 ; W. Digby : *'Prosperous' British India* (London), 1901, দ্রষ্টব্য।
16. দু'টি রিপোর্ট ও R. C. Dutt-এর *Famines and Land Assessment in India* (1910) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রিপোর্ট দু'টি

হল : Reports of the Famine Commission, 1878-1880 and 1901

17. R. C. Majumdar and K. K. Dutta : The *Administrative Organization...*, p. 837
18. V. K. R. V. Rao : *The National Income of British India* (1941), p. 10
19. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : 'সাম্য' ও 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধ দু'টি দ্রষ্টব্য। সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ১৩৮৪ বাংলা সন, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ।
20. *Bransonism* রম্যরচনা ; ঐ, পৃঃ ৩৩—৩৭
21. Jawaharlal Nehru : *The Discovery of India* (Second edition), pp. 282-284
22. *Combridge History of India*, Vol. VI, p. 481
23. Sardar K. M. Panikkar : *The Indian States Under the British Crown*, in R. C. Majumdar *et al.* (eds.) : History and Culture of the Indian People.... ch. XXX, Section II, p. 960
24. ঐ
25. Sir W. Lee-Warner : *The Native States of India*, 1910, pp. 1544-155
26. Sardar K. M. Panikkar : *The Indian States...*, p. 964
27. Act I of 1168
28. Sardar K. M. Panikkar : *The Indian States...*, p. 965
29. ঐ ; পৃঃ ৯৬৮
30. ঐ ; পৃঃ ৯৬৫
31. ঐ ; পৃঃ ৯৬৮
35. ঐ ; পৃঃ ৯৬৯
33. B. Martin : *New India* 1885 দ্রষ্টব্য।
34. Raghubir Singh : *Administrative Reforms in Indian States*,

in R. C. Majumdar *et al.* (eds.) : History and Culture of the Indian People..., p. 984

অধ্যায় ৮

1. K. K. Chatterjee : *English Education in India—Issues and Opinions*, Preface, p. XI
2. *Parliamentary Papers* (of Great Britain), 1852 '53, Vol. XXXII, p. 113
3. David Kopf : *The Universal Man and the Yellow Dog—The Orientalist Legacy and the Problem of Brahmo Identity in the Bengal Renaissance*, in Rachel Von Baumer (ed.) : Aspects of Bengali History and Society, 1976, p. 44
4. হেস্টিংসের পরিচিতিপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

   'I hesitate not to pronounce the Gita a performance of great originality, of sublimity of conception, reasoning and diction, almost unequalled ; and a singular exception, among all the known religions of mankind, of a theology accurately corresponding with that of the Christian dispensation, and most powerfully illustrating its fundamental doctrines.'

   ঐ পরিচিতিপত্রে আরও বলা হয়েছিল যে, শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতাকে '...one of the greatest curiosities ever presented to the literary world' হিসাবে গণ্য করা যায়। হেস্টিংসের পরিচিতি-পত্রটির বয়ান *The Early Or Exclusively Oriental Period of Government Education in Bengal*, Calcutta Review, Vol. 3, No. 6 (January-June), 1845, p. 233-তে দ্রষ্টব্য।
5. P. J. Marshall : *The British Discovery of Hinduism in Eighteenth Century*, 1973, p. 17
6. Milton Singer : *When A Great Tradition Modernizes*···, ch. 2

7. David Kopf : *British Orientalism and the Bengal Renaissance*, 1969 দ্রষ্টব্য।
8. P. J. Marshall : *The British Discovery...*, p. 20
9. S. N. Mukherjee : *Sir Willam Jones—A Study in Eighteenth Century British Attitudes to India*, 1968, p. 3
10. ওয়েলেস্‌লী বলেছিলেন : 'It cannot be denied that, during the convulsions, with which the doctrines of the French Revolution have agitated the continent of Europe, erroneous principles of the some dangerous tendency had reached the minds of some individuals in the Civil and Military service of the Company in India ; and the state of political as well as of religious opinions, had in some degree unsettled.' Calcutta Review, 1845, Vol. 3, No. 6, (January—June), p. 242. Sisir Kumar Das : *Sahibs and Munshis—An Account of the College of Fort William*, 1977, গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছিল না।
11. Clapham Sect বা ক্ল্যাপহ্যাম গোষ্ঠী নামকরণ করেন সিডনী স্মিথ। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে আগ্রহী এই গোষ্ঠীর প্রধান নেতা উইলবারফোর্স লণ্ডনের সৌখীন অঞ্চল Clapham Common-এর ধারে সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস করতেন বলে এরূপ নামকরণ ঘটে। D. S. Somervell : *English Thought in the Nineteenth Century*, 1964, p. 22
12. Brian H. Hodgson : *Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects*, pp. 256 257 : 'Anglicization will help to widen the existing lamentable gulf that divides us from the mass of the people, and put into the hands of a few among themselves an exclusive and dangerous power, quite similar in essential character to that power

which for ages past the scribes and priests of the East have wielded.'

13. হুইগ নৈতিকতা, হিতবাদী দর্শন ও খ্রীস্টিয় মানবমুক্তির ভাবাদর্শে প্রভাবিত ছিল। হিতবাদী দর্শন, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের অভিমত এবং বঙ্গদেশের শহরবাসী মানুষের ইংরাজী শিক্ষার অনুকূল মতামত সরকারী শিক্ষানীতি রচনায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। Arthur Mayhew : Education of India, 1926, pp. 12-13 দ্রষ্টব্য।

14. *Parliamentary Papers* (of Great Britain), 1831-'32, Vol. IV, Part I (1832), p. 377
'What we may hope to do by English tuition is to teach the teachers, to raise up a class of persons who, having derived from an intimate acquaintance with European literature, the improved ideas and feelings which are derivable from that source, will make it their occupation to spread those ideas and feelings among their country-men.' Ballhachet-এর উদ্ধৃত মিল্-এর এই বয়ান K. K. Chatterjee : *English Education in India...*, p. 42-তে স্থান পেয়েছে।

15. Sir Alfred C. Lyall : *Asiatic Studies—Religious and Social Reform*, 1882, p. 248

16. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ (সম্পাদিত) রামমোহন রচনাবলী, ১৯৭৩, পৃঃ ৪৩৪

17. Pradyumna Bhattacharyya : *Rammohan Roy and the Process of Modernization*, in V. C. Joshi (ed.) : Rammohan and the Process of Modernization, 1975, p. 213. শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বক্তব্যের বিরুদ্ধ মতামত ব্যক্ত হয়েছে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের রচনাতে ; এস. ডি. কোলেটের বক্তব্যও শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের অভিমতের বিরোধী। রামমোহনের বাংলা রচনা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত মজুমদার বলেছেন যে, তাঁর ভাষা 'worthy to rank by the

side of Bacon and Luther.' R. C. Majumdar : *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, 1960, p. 53.
এস. ডি. কোলেট্ বলেছেন, 'As by Luther in Germany, so also by Rammohan in Bengal, the despised dialect of the common people was made the vehicle of the highest ideas and became permanently elevated.'

18. S. C. Sarkar : *Bengal Renaissance and Other Essays*, 1970 দ্রষ্টব্য।
19. আলেকজাণ্ডার ডাফ্-এর বক্তব্য। *Parliamentary Papers* (of Great Britain) 1852-'53, p. 48
20. *Selections From Educational Records*, Vol. II, pp. 16-17
21. Sir S. P. Hartog : *Some Aspects of Indian Education*, 1939, p. 18
22. ১৮৬৫ সালের ২৪শে জুলাই ট্রেভেলিয়ানকে লেখা চিঠিতে স্যর চার্লস উড্ নিজেও বলেছিলেন, তিনি এরূপ তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না যে, 'education can only go downwards from the higher classes to begin with.'
23. উড্‌স প্রতিবেদনের চার নম্বর অনুচ্ছেদের বয়ান ছিল এরূপ : '...teach the natives of India the marvellous results of the employment of labour and capital, rouse them...in the development of the vast resources of their country... (and) confer upon them all the advantages...of wealth and commerce.'
24. R. J. Moore : *Sir Charles Wood's Indian Policy...*, p. 123
25. K. K. Chatterjee : *English Education...*, pp. 58, 90
26. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 151
27. K. B. Sayeed : *Pakistan—The Formative Phase (1857-1948)*, p. 16
28. W. H. Sleeman : *Rambles of An Indian Offieial*, Vol. II, 1848, p. 283

29. A. H. Al-Beruni : *Makers of Pakistan and Modern Muslim India*, 1950, p. 109
30. Zamil-ud-din Ahmad : *Glimpses of Quaid-i-Azam*, 1960, pp. 20-22
31. Sheila McDoungh : *The Spirit of the Jamia Millia Islamia As Exemplified in the Writings of S. Abid Husain*, in R. D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, 1981, p. 141-142
32. ঐ ; পৃ: ১৪৮-১৪৯
33. B. N. Ganguli : *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory*, p. 112
34. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', ১৯৪৯ সংস্করণ, পৃ: ১৩৫-১৩৬
35. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 153
36. D. E. Wacha : *Shells From the Sands of Bombay*, p. 67, quoted in Govt. of Bombay, *Source Material*, I : 295
37. Nirad C. Chaudhuri : *The Intellectual in India*, p. 33

অধ্যায় ৯

1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভারতপথিক রামমোহন', রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, একাদশ খণ্ড, পৃ: ৩৮৮ ও ৪২৫
2. Jadunath Sarkar : *History of Bengal*, 1948 দ্রষ্টব্য।
3. ডেভিড কফ্ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, খ্রীষ্টধর্ম থেকে জ্ঞান আহরণ করে রামমোহন ধর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের সাথে পরিচিতির আগেই যে রামমোহন মুত্‌হাজলী ও মুহ্‌য়াদ্দিন গোষ্ঠীর যুক্তিবাদে দীক্ষিত হয়েছিলেন তা কফ্-এর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। Rajat K. Ray : *Introduction*, V. C. Joshi (ed.) : Rammohan Ray and the Process of Modernization in India, p. 7 দ্রষ্টব্য।

4. R. C. Majumdar : *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century*, pp. 8-11, and K. K. Dutt : *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the Eighteenth Century, 1961*, pp. 26-27.

5. R. C. Majumdar : *Glimpses...*, pp. 11-14

6. Charles Heimsath : *Hinduism and Hindu Social Reform*

7. Spencer Lavan : *The Brahmo Samaj—India's First Modern Movement For Religious Reform*, R. D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, p. 23.

8. মিঃ জন ডিগ্‌বীকে লেখা রামমোহনের চিঠি, ১৮ই জানুয়ারি, ১৮২৮, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ও অন্যান্য সম্পাদিত : রামমোহন রচনাবলী, ১৯৭০, পৃঃ ৪৬২

9. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভারতপথিক রামমোহন'।

10. মিঃ জন ডিগ্‌বী-কে লেখা পূর্বোক্ত চিঠি।

11. 'The God of Rammohan, in fact, is quite un-Indian in character...,' Ajit Kumar Ray : *The Religious Ideas of Rammohan Roy* শীর্ষক পুস্তকে A. L. Basham-এর Preface দ্রষ্টব্য, p. VI

12. Barun De : *A Biographical Perspective on the Political and Economic Ideas of Rammohan Roy*, V. C. Joshi (ed.) : Rammohan Roy and the Process of Modernization..., p. 145

13. David Kopf : *The Universal Man and the Yellow Dog—The Orientalist Legacy and the Problem of Brahmo Identity in the Bengal Renaissance*, in Rachel Van M. Baumer (ed.) : Aspects of Bengali History and Society

14. Protap Chandra Majumdar : *Life of Keshub Chandra Sen*, 1891, p. 215

15. David Kopf : *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind* দ্রষ্টব্য।

16. K. W. Jones : *The Arya Samaj in British India* 1875-1947, R. D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, p. 27

17. K. W. Jones : *Arya Dharma—Hindu Consciousness in the Nineteenth Century Punjab* দ্রষ্টব্য।

18. K. W. Jones : *The Arya Dharma...*, pp. 215-223

19. K. W. Jones : *The Arya Samaj....* p. 37

20. *Census of India*, General Reports for 1911, 1921, 1931, 1941 and 1951

21. A. Tripathi : *The Extremist Challenge*, ch. 1 এবং George M. Williams : *The Ramakrishna Movement—A Study in Religious Change*, R. D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, p. 58

22. Swami Vivekananda, *Collected Works*, Vol. III, p. 300

23. M. L. Burke : Swami Vivekananda—*His Second Visit to the West*, 1973, p. 203

24. ঐ, পৃঃ ২

25. Romain Rolland : *Prophets of the New India*, P. 501

26. B. B. Majumdar : *Militant Nationalism in India—And Its Socio-religious Background* (1897-1917), p. 56

27. V. P. Varma : *Modern Indian Political Thought* (Fifth edition), 1974, p. 58. See, Annie Besant : *The Great* Plan (1920).

28. A. Besant : *Presidential speech at the Calcutta Session of the All-India Congress*, 1917

29. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 290

30. L. R. Gordon-Polonskaya : *Muslim Trends in the Sacial Thought of India and Pakistan*, p. 45

31. M. T. Stepanyants : *Pakistan—Philosophy and Sociology*, p. 20

32. K. B. Sayeed : *Pakistan—The Formative Phase...*, p. 15
33. Syed Ahmad Khan, quoted in A. Husain Hali : *Hasat-i-Jaisad*, p. 323
34. Cited in R. Coupland : *The Indian Problem*, Part I, p. 156
35. M. T. Stepanyants : *Pakistan*···, pp. 20-21
36. ঐ, পৃ: ৫০ ; M. Iqbal : *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, p. 85
37. ঐ, পৃ: ৫১
38. *Statements and Speeches* of Muhammad Iqbal, p. 15
39. ঐ
40. A. Ahmad : *Islamic Modernization in India and Pakistan*, p. 163
41. Jawaharlal Nehru quoted, *The Statesman*, Sunday, May 10, 1981
42. S. Jafri and K. S. Duggal (eds.) : *Iqbal Commemorative Volume*—Iqbal Centenary Calebrations Committee
43. *The Statesman*, Literary Supplement, Sunday, May 10, 1081
44. ঐ
45. Spencer Lavan : *The Ahmadiyah Movement : Islamic Religious Reform in Modern India*, in R. D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, p. 116
46. ঐ, পৃ: ১৩২-১৩৩
47. ঐ, পৃ: ১৩৬ ; Spencer Lavan : *The Ahmadiyah Movement —A History and Perspective* (1974) ও তাঁরই *Ahmadiyah Movement : Past and Present* (1976) আহ্‌মদি আন্দোলন সংক্রান্ত তথ্যে সমৃদ্ধ।
48. A. R. Desai : *Social Background...*, pp. 304-305

49. Rajat Kr. Ray : *Introduction* and Ashis Nandy : *Sati—A 19th Century Tale of Women, Violence and Protest*, in V. C. Joshi (ed.) : Rammohan Roy..., p. 5 and pp. 168-194
50. ঐ
51. M. L. Burke : *Swami Vivekananda in America*, p. 131
52. P. C. Ray : *Life and Times of C. R. Das* (1937), p. 116
53. সারা ভারত মহিলা শিক্ষা সম্মেলনে বরোদার মহারানীর ভাষণ, O' Malley (ed.) : *Modern India and the West* (1941), p. 450
54. ঐ, পৃ: ৪৭৫
55. L. Dumont : *Homo Hierarchicus*—The Caste System and Its Implications, pp. 86-87
56. A. R. Desai : *Social Background*···, pp. 225 and 272

অধ্যায় ১০

1. A. R. Desai : *Social Background* ..., pp. 385-386
2. Sir John Cumming (ed.) : *Political India 1832-1932* (London, 1932), p. 104
3. F. Rahaman : *Muslim Modernism in the Indo-Pakistan Sub-continent*, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London, 1958, XXI, p. 89
4. Indian Round Table Conference, November 12, 1930—January 19, 1931, *Proceedings 3779*, p. 8
5. W. W. Hunter : *The Indian Mussalmans*, Calcutta, 1945, p. 161
6. G. Parrinder : *Comparative Religion*, 1962, p. 21
7. W. S. Blunt-এর বক্তব্য, K. B. Sayeed : *Pakistan—The Formative Phase* 1857-1948, p. 31 দ্রষ্টব্য ।

8. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 17
9. Jadunath Sarkar : *Sivaji and His Times*. Calcutta, 1952, p. 390
10. K. A. Nizami : '*Shah Waliullah ki Siasi Manjuba*' (Aligarh, 1951), p. 106 ; For the English version, see K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 4
11. K. B. Sayeed : *Pakistan*..., p. 5
12. R. Coupland : *The Indian Problem*, Part I, 1944, p. 156
13. J. V. Morley : *Recollections*, Vol. 2, 1918, p. 172
14. Afzal Iqbal (ed.) : *Select Speeches and Writings of Maulana Mohammed Ali*, 1944, p. 255
15. *The Report of the Inquiry Committee Appointed by the Council of the All India Muslim League to Inquire into Muslim Grievances in Congress Provinces.* রিপোর্টের Part III দ্রষ্টব্য।
16. S. A. Wolpert, : *A New History of India*, 1977, p. 331
17. ঐ ; উদ্ধৃত উক্তি, পৃ: ৩৩০
18. ঐ ; পৃ: ৩৩২
19. ঐ ; পৃ: ৩৩৩
20. ঐ ; পৃ: ৩৪৭
21. ঐ ; পৃ: ৩৪৭
22. K. B Krishna : *The Problem of Minorities*, 1932, p. 85
23. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 414
24. *India's Problem of Her Future Constitution*, p. 103
25. *Presidential Address* of Sir Muhammad Iqbal, Allahabad Session, 1930, Delhi : All-India Muslim League, 1945, p. 12
26. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 105
27. Quoted in M. K. Gandhi, *To The Protagonists of Pakistan*, (A. Hingorani ed., Calcutta), p. 120

28. Jamil-ud-din Ahmad (ed.) : *Speeches and Writings of Mr. Jinnah* (Lahore, 1960), Vol. 1, p. 509

29. K. B. Sayeed : *Pakistan* ..., p. 81

30. Jawaharlal Nehru : *An Autobiography* (London, 1958) p. 68

31. '*The Pioneer*', Lucknow, September 26, 1937

32. Jamil-ud-din (ed.) : *Speeches and Writings*···, p. 87

33. ঐ ; Vol. 3, p. 46

34. ঐ ; pp. 240, 241 and 243

35. H. D. Lasswell : *Power and Personality* (New York, 1962), p. 39

36. Jamil-ud-din Ahmad (ed.) : *Speeches and Writings*···, Vol. 1, p. 30

37. K. B. Sayeed : *Pakistan*···, p. 101

38. V. D. Savarkar : '*Hindu Rashtradarsan*' (A Collection of Presidential Speeches Delivered From the Hindu Mahasabha Platform); Bombay, 1949, p. 10. ভি. ডি. সাভারকরের সমগ্র রচনাবলী বহু খণ্ডবিশিষ্ট রচনাসংগ্রহে স্থান লাভ করেছে। তাঁর ইংরাজী রচনা ও বক্তৃতা পঞ্চম ও ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ দু'টি খণ্ড যথাক্রমে ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

    ভারতের মুসলমান-রাষ্ট্র সম্পর্কে ইকবালের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : 'I, therefore, demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. For India it means security and peace resulting from an internal balance of power, for Islam an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian Imperialism was forced to give it, to mobilise its law, its education, its culture and to bring them into closer contact with its

8. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 17
9. Jadunath Sarkar : *Sivaji and His Times.* Calc
p. 390
10. K. A. Nizami : '*Shah Waliullah ki Sias*
(Aligarh, 1951), p. 106 ; For the English
K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 4
11. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 5
12. R. Coupland : *The Indian Problem*, Part I, 1
13. J. V. Morley : *Recollections*, Vol. 2, 1918, p.
14. Afzal Iqbal (ed.) : *Select Speeches and*
Maulana Mohammed Ali, 1944, p. 255
15. *The Report of the Inquiry Committee Appoin*
Council of the All India Muslim League to
Muslim Grievances in Congress Provinces. রি
III দ্রষ্টব্য।
16. S. A. Wolpert, : *A New History of India*, 19
17. ঐ ; উদ্ধৃত উক্তি, পৃঃ ৩৩০
18. ঐ ; পৃঃ ৩৩২
19. ঐ ; পৃঃ ৩৩৩
20. ঐ ; পৃঃ ৩৪৭
21. ঐ ; পৃঃ ৩৪৭
22. K. B Krishna : *The Problem of Minorities*, 1
23. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 414
24. *India's Problem of Her Future Constitution*, p.
25. *Presidential Address* of Sir Muhammad Iqbal
Session, 1930, Delhi : All-India Muslim Le
p. 12
26. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 105
27. Quoted in M. K. Gandhi, *To The Pro*
Pakistan, (A. Hingorani ed., Calcutta), p. 12

	CL	AB
MITA BASU	1	3
DIPANKAR DAS		
ABDUL GOFFAR GAZI	1	2
MIRATUN NAHAR	1	1

8. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 17
9. Jadunath Sarkar : *Sivaji and His Times.* Calc
p. 390
10. K. A. Nizami : '*Shah Waliullah ki Sias*
(Aligarh, 1951), p. 106 ; For the English
K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 4
11. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 5
12. R. Coupland : *The Indian Problem,* Part I,
13. J. V. Morley : *Recollections,* Vol. 2, 1918, p
14. Afzal Iqbal (ed.) : *Select Speeches and*
Maulana Mohammed Ali, 1944, p. 255
15. *The Report of the Inquiry Committee Appoin*
Council of the All India Muslim League to
Muslim Grievances in Congress Provinces. দ্বি
III দ্রষ্টব্য।
16. S. A. Wolpert, : *A New History of India*, 19
17. ঐ ; উদ্ধৃত উক্তি, পৃ: ৩৩০
18. ঐ ; পৃ: ৩৩২
19. ঐ ; পৃ: ৩৩৩
20. ঐ ; পৃ: ৩৪৭
21. ঐ ; পৃ: ৩৪৭
22. K. B Krishna : *The Problem of Minorities*, 1
23. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 414
24. *India's Problem of Her Future Constitution*, p.
25. *Presidential Address* of Sir Muhammad Iqbal
Session, 1930, Delhi : All-India Muslim Le
p. 12
26. K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 105
27. Quoted in M. K. Gandhi, *To The Pro*
Pakistan, (A. Hingorani ed., Calcutta), p. 12

	CL	AB
MITA BASU	1	3
DIPANKAR DAS		
ABDUL GOFFAR GAZI	1	2
MIRATUN NAHAR	1	1

own original spirit and with the spirit of modern times.'

39. *The Amrita Bazar Patrika*, August 2, 1934
40. Zia-ud-din Suleri : *My Leader*, (Lahore, 1946), P. 52
41. A. R. Desai : *Social Background...*, pp. 392-393
42. ঐ ; পৃঃ ৩৭১
43. Louis Fischer : *A Week with Gandhi*, pp. 36-37
44. S. A. Wolpert : *A New History of India*, pp. 331-332
45. Jawaharlal Nehru : *A Bunch of Old Letters* (Bombay, 1958), pp. 49-50
46. Muhammad Miyan : *Jamiyat al Ulama Kia Hai* (pp. 39-40), quoted in K. B. Sayeed : *Pakistan...*, p. 58
47. অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়, R. J. Moore : *Escape From Empire—The Attle Government and the Indian Problem* বইতে।
48. K. W. Jones : *Politicized Hinduism—The Ideology and Programme of the Hindu Mahasabha*, in Robert D. Baird (ed.) : Religion in Modern India, p. 451
49. V. D. Savarkar : *Hindutva*, 1942 (2nd, ed.), pp. 72-73

অধ্যায় ১১

1. 'England has broken down the entire frmework of Indian Society without any systems of reconstitution yet appearing.' *On Colonialism*, p. 33
2. Modern industry resulting from the railway system will dissolve the hereditary divisions upon which rest the Indian castes.' ঐ, পৃঃ ৮০
3. Louis Dumont : *Homo Hierarchicus*—The Caste System and Its Implications pp. 205-208

4. ঐ ; পৃঃ ২২৪. Also see R. D. Lambert : *The Impact of Urban Society Upon Life*, in Roy Turner (ed.) : India's Urban Future, 1962, pp. 117-140

5. E. H. Pahl : *Readings in Urban Sociology* ; 1968 দ্রষ্টব্য।

6. Asok Sen : *Iswar Chandra Vidyasagar And his Elusive Milestones*, 1977; see ch. on Education and Economy

7. Louis Dumont : *Homo Hierararchicus*···

8. A. R. Desai : *Report on the Caste System And Abolition of Untouchability*

9. 'Caste is Politicized, but Politics is not Casteized.'

10. David Pocock : 'Castes exist...but the caste system is no more.' বর্ণব্যবস্থা না থাকলেও বর্ণগুলি ভিন্নতর পরিবেশে ভিন্নতর স্বরূপে কিভাবে থাকতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর *Difference in East Arica* নিবন্ধে, Southwest Journal of Anthropology, XIII, No. 4, 1957, pp. 280-380

11. M. N. Srinivas : *India's Villages* (1954), Introduction ; *Caste in Modern India* (1957). Also see, B. Kuppuswamy : *Journal of Psychology*, XLII, 1956—'Common observation reveals that caste consciousness has increased rather than decreased with education.'

12. V. Raghavan : *Variety and Integration in the Pattern of Indian Culture.* Far Eastern Quarterly 15, No. 4 (August, 1956), pp. 497-505

13. Milton Singer : *Whed a Great Tradition Modernizes...*, pp. 43-45 and 260-262

14. ঐ ; পৃঃ ৩৮৬

15. V. Raghavan : *The Indian Heritage*, 1956

16. A. B. Keith : *A Constitutional History of India*, Vol. I, (1936), p. 215

17. E. S. Montagu : *An Indian Diary* (1930), pp. 89-80

18. A. R. Desai : *Social Backgronnd...*, p. 185
19. B. B. Mishra : *Indian Middle Classes* দ্রষ্টব্য।
20. A. Ghosh and K. Dutta : *Development of Capitalistic Relations in Agriculture* (1977) দ্রষ্টব্য।
21. A. R. Desai : *Social Backgrouad...*, p. 186
22. Fanon তৃতীয় বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলির কৃষকশ্রেণীকে বৈপ্লবিক গুরুত্বের অধিকারী ভেবেছেন।
23. K. Gough : *Imperialism And Revolution in South Asia* দ্রষ্টব্য।
24. A. R. Desai : *Social Background...*, p. 191. ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় সম্মেলনের সামনে বিহার ও ইউ. পি.-র কিষাণসভা দু'টি যে স্মারকলিপি উপস্থাপিত করেছিল তা'তে জাতীয় স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ইত্যাদির দাবি স্থান লাভ করেছিল।
25. Govt. of India, Home Pol. Deposit No 13, Feb. 1921, extracted from CID Memo No. 1052 dt. Allahabad, 7. 1. 1921, signed P. Biggane, Asst. to D. I. G., C. I. D., UP, SB. জ্ঞান পাণ্ডের নিবন্ধ (*The Peasant Revolt and Indian Nationalism : The Peasant Movement in Awadh* 1919-'22) ও সংযোজিত Appendix দ্রষ্টব্য; Ranajit Guha (ed.) : Subaltern Studies—I..., pp. 192-197
বাংলা তর্জমায় মুদ্রণপ্রমাদে 'এক আনায় এক গজ কাপড় বিক্রি করেন' হয়েছে, হবে : 'তিন আনায় এক গজ... ।'
26. Partha Chatterjee : *Agrarian Relations and Communalism in Bengal 1926-1935*, in Ranajit Guha (ed.) : *Subaltern Studies*—I..., p. 11
27. V. I. Pavlov *et al.* : *Social and Economic Development...*, V. I. Pavlov-এর নিবন্ধে গান্ধী সম্পর্কে জওহরলালের অভিমত ও উক্তিগুলি স্থান লাভ করেছে।
28. ঐ

29. Mao Zedong উদ্ধৃত, A. Ghosh and K. Dutta : পূর্বোক্ত বই।
30. Antonio Gramsci : *Selections From the Prison Notebooks* (New York, 1971), p. 5
31. J. V. Femia : *Gramsci's Political Thought—Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process* (New York, 1981), গ্রাম্‌সি থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ১৩২.
32. ঐ, পৃ: ১৩২ : "While world visions are spun out by 'great' intellectuals they are (if successful) transmitted throughout society by lesser intellectuals (teachers, political activists, journalists, priests etc.) and eventually become embodied in 'common sense'."
33. A Tripathi : *The Extremist Challenge*, ch 1. And James M. Eddie *et al.* (eds.) : *Russian Philosophy*, Vol. 1, p. 160
34. G. K. Shirokov : *Industrialization of India*, p. 22
35. ঐ
36. Charles Wood উদ্ধৃত, V. I. Pavlov : *Historical Premises*...
37. ১৯০৮ সালে তিলকের কারামুক্তির দাবিতে বোম্বের বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম প্রকাশ বলে লেনিন চিহ্নিত করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ববর্তী ভারতে ঐ ধর্মঘটই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক কর্ম ('the only political action') ; ঐ ধর্মঘটের মধ্যেই শোনা গিয়েছিল ঐ শ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার আবির্ভাবলগ্নের ঘোষণা ('birth-cry')।
38. A. R. Desai : *Social Background*..., p. 212
39. S. Sen : *Working Class of India—History of Emergence and Movement*, 1977 শ্রমিকসংক্রান্ত ব্যাপারে আরও বহুতর তথ্য ও পরিসংখ্যানে সমৃদ্ধ।

40. R. C. Majumdar : H*istory of Freedom Movement in India*, vol. II, Introduction and the Section on 'Boycott'
41. Bipan Chandra : *Nationalism and Colonialism in Modern India* পুস্তকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণী সংক্রান্ত নিবন্ধে এরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।
42. V. I. Pavlov and *et al.* (eds.) : *Social aud Economic Development* (*18-20th Centuries*) ; see V. I. Pavlov's write-up.

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

অধ্যায় ১

Argov, D.: *Moderates and Extremists in the Indian Nationalist Thinking.* Bombay, 1967

Bose, N. S.: *Indian Awakening and Bengal.* Third edition. Calcutta, 1976

Brown, D. M.: *Indian Political Thought From Ranade to Bhave.* Berkeley, 1965.

Carr, E. H.: *Nationalism and After.* London, 1968

Chadwick, H. M.: *The Nationalities of Europe and the Growth of National Ideologies.* London, 1966

Chandra, Bipan: *Nationalism and Colonialism in Modern India.* New Delhi, 1979

—: *Rise and Growth of Economic Nationalism in India—Economic Policies of Indian National Leadership 1881-1915.* New Delhi, 1966

Cobban, A.: *National Self-determination.* New edition. London, 1970

Ghosh, S.: *Socialism, Democracy and Nationalism in India.* Calcutta, 1973.

Guha, R. (ed.): *Subaltern Studies I—Writings on Southeast Asian History and Society.* Delhi, 1982

Joshi, P. C. (ed.): *Rebellion 1857—A Symposium.* New Delhi, 1957.

Joshi, V. C. (ed.): *Rammohan and the Process of Moderdization in India. New Delhi,* 1975

Kearney, R. N. (ed.): *Politics and Modernization in South and Southeast Asia.*

Kedourie, E. : *Nationalism.* London, 1960

Kennedy, J. : *Asian Nationalism in the Twentieth Century*, New york, 1868

Kling, B. B. : *The Blue Mutiny—The Indigo Disturbances in Bengal 1859-1962.*

Kohn, H. : *The Idea of Nationalism—A Study of Its Origin and Background.* New York, 1945

Lorenzen, D. : *Imperialism and the Historiography of Ancient India*, in Mukherjee, S. N. (ed.) : *India—History and Thought, Essays in Honour of A. L. Basham.* Calcutta, 1982

Martin, B. : *New India 1885*. Berkeley, 1969

McLane, J. R. : *Indian Nationalism and the Early Congress.* Princeton, 1977

Mukherjee, H. N. : *India Struggles For Freedom*, Bombay, 1946

Namboodiripad, E. M. S. : *Mahatma and the Ism.* New Delhi, 1969

Nanda, B. R. : *Gokhale, the Indian Moderates and the British Raj.* Delhi, 1977

Poddar, A. : *Renaissance in Bengal—Quests and Confrontations.* Simla, 1970

Reusner, I. M. and N. M. Goldberg (eds.) : *Tilak and the Struggle For Indian Freedom.* New Delhi, 1966

Rothermund, D. : *The Phases of Indian Nationalism and Other Essays.* Bombay, 1970

Roy, M. N. : *India in Transition.* New edition. Bombay, 1971

Rudolph, R. and Rudolph, S. H : *The Modernity of Tradition—Political Development in India.* Chicago, 1967

Sarkar, S. : *On the Bengal Renaissance.* Calcutta, 1979

Seton-Watson : *Nations and States—An Enquiry into the Origin of Nations and the Politics of Nationalism*. London, 1977

Seal, A. : *The Emergence of Indian Nationalism*. Cambridge 1971

Sinha, P. B. : *Indian Nationalist Movement and Russia*. New Delhi 1975.

Snyder, L. : *The Dynamics of Nationalism—Readings in Its Meaning and Development*. Princeton, 1964.

Thamankar, D. V. : *Lokmanya Tilak*. London, 1956

Tomlinson B. R. : *Political Economy of the Raj 1914-1917*. London, 1979

— : *The Indian National Congress ond and the Raj 1929-'42* London, 1976

Tripathi, A. : *The Extremist Challenge*. Calcutta, 1967

Wilkinson, P. : *Social Movement*, London, 1971

Wolpert, S. A. : *Tilak and Gokhale*. California, 1962

অধ্যায় ২

Basham, A. L. : *The Wonder That Was India : A Survey of the History of the Indian Subcontinent Before the Coming of the Muslims*. New York, Third edition, 1968.

Bose, N. K. : *Culture and Society in India*. Bombay, 1967

Derrett, J. D. M. : *Religion, Law and the Indian State*. London, 1968

Eisenstaadt, S. N. : *Tradition, Change and Modernity*. New York, 1973

Eisenstaadt, S. N. (ed.) : *The Protestant Ethic and Modernization*, New York, 1968

Husain, S. A. : *The National Culture of India*. New Delhi, 1956

Isaacs, H.: *Scratches on Our Minds: American Images of China and India*. New York, 1958

Marx, Karl: *The British Rule in India* and *The Future Results of British Rule in India*. Selected Works of Karl Marx and Frederic Engels. Vol. I. Moscow, 1969

Malik, S. C. (ed.): *Dissent, Protest and Reform in Indian Civilization*. Simla, 1977.

Majumdar, R. C. (ed.): *History and Culture of the Indian People*, Vol. 1; The Vedic Age. London, 1951

Majumdar, R. C.: *The Classical Accounts of India—The Greek and Roman Accounts of Ancient India*. Calcutta, 1981

O'Malley, L. S. S.: *India's Social Heritage*. London and New York, 1975 (first published, 1934)

Smith, D. E.: *South Asian Politics and Religion*. Princeton, 1969.

Voltaire: *Fragments on India*. Freda Bedi translated, Lahore, 1937

Singer, M.: *When A Great Tradition Modernizes—Anthropological Approach to Indian Civilization*. New York, 1972

Weber, Max: *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York, 1930

—: *The Religion of India—The Sociology of Hinduism and Buddhism*. Glenco, 1958

Williams, D. and Potts, E. D. (eds.): *Essays in Indian History in Honour of C. C. Davies*. 1973.

Wittfogel, K. A.: *Oriental Despotism—A Comparative Study of Total Power*. New York, 1981 (Reprint)

অধ্যায় ৩

Blyn, G. : *Agricultural Trends in India, 1891-1947—Output, Availability aud Productivity*. Philadelphia, 1966

De, B. (ed.) : *Perspectives in Social Sciences*, Volume II. Calcutta, 1982

Desai, A. R. : *Peasant Struggles in India*. Delhi, 1979

Dharma Kumar and Meghnad Desai (eds.) : *The Cambridge Economic History of India, c. 1757-c. 1970* Cambridge, 1983

Dutt, R. C. : *The Peasantry of Bengal*. Edited with an Introduction by N. Kaviraj. Calcutta, 1980 (First Published 1874)

— : *The Economic History of India*. 2 Volumes. Publication Divison, Government of India (Third Reprint, 1976)

Ghosh A. & Dutt K. : *Development of Capitalistic Relations in Agriculture* (A Case Study of West Bengal). New Delhi, 1793-1976

Habib, I. : *The Agrarian System of Mughal India*. London, 1963

Lenin, V. I. : *Capitalism in Agriculture*. Collected Works, Volume 4. Moscow, 1960

Metcalfe, T. R. : *Land, Landlords and the British Raj—North India in the Nineteenth Century*. Delhi, 1979

Metcalfe, T. R. and Frykenburg, R. E. (eds.) : *Land Control and Social Structure in Indian History*. Madison, 1969

Narain, D. : *The Impact of Price Movements in Areas Under Selected Crops in India 1900-1939*. Cambridge, 1963

Rothermund, D. : *Government, Landlord and Peasant in India —Agrarian Relations under British Rule 1865-1935*. 1978

Sen, S : *Agrarian Struggle in Bengal 1946-1947*. New Delhi, 1972

Siddiqi, A. : *Agrarian Change in a North Indian State—Uttar Pradesh 1860-1900*. Oxford, 1973

Siddiqi, M. : *Agrarian Unrest in North India—United Provinces 1918-1922*. New Delhi, 1978

Stokes, Eric : *Peasants and the* Raj. : *Studies in Agrarian Society and Peasant Rebellion in Colonial India*. Cambridge, 1978

Tarachand : *History of Freedom Movement in India*, Vol. 3. New Delhi, 1972

Whitcombe, E. : *Agrarian Conditions in Northern India*, Vol. 1 —*The United Provinces Under British Rule 1860-1900*. California, 1971

অধ্যায় ৪

Buchanan, H. F. : *An Account of the Districts of Bihar and Patna in 1811-1812*. Two Vols. Patna, n. d.

Chicherov, A. I. : *Indian Economic Development in the 16th to 19th Centuries*. Moscow, 1971

Desai, A. R. : *Social Background of Indian Nationalism*. Bombay, 1981. Reprint

Marshall, P. J. : *The East India Fortunates—The British in Bengal in the 18th Century*. Oxford, 1976

Mukherjee, R. K. : The Economie History of India 1600-1800. Allahabad, 1967

Pavlov, V. I. *et al*. (eds.) : India—Social and Economic Development (18-20th Centuries). Moscow, 1975

Raychaudhuri, T. and Habib, I. (eds.) : *The Cambridge Economic History of India*, Vol. 1. Cambridge, 1983

Raychaudhuri, T. (ed.) *Contributions to Indian Economic History*. Volume II. Delhi, 1963

Saul, S. B. *Studies in British Overseas Trade 1870-1914.* Liverpool, 1960

Silver, A. : *Manchester Men and Indian Cotton. Manchester,* 1966

Singh, V. B. (ed.) : *From Naoroji to Nehru—Six Essays in Indian Economic Thought.* New Delhi, 1975

Sinha, N. K. : *The Economic History of Bengal, From Plassey to the Permanent Settlement,* Volumes I (Calcutta, 1956) and II (Calcutta, 1970)

Tripathi, A. *Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833.* Bombay, 1956

অধ্যায় ৫

Bagchi, A. K. : *The Political Economy of Underdevelopment.* Cambridge, 1982

— : *Private Investment in India 1911-1939.* Cambridge, 1972

Buchanan, D. H. : *The Development of Capitalistic Enterprise in India.* New York, 1934

De, B., *et. al* (eds). : *Essays in Honour of S. C. Sarkar.* New Delhi, 1976

Dutt, R. P. : *India Today.* Revised edition. Calcutta, 1972

Gadgil, D. R. : *The Industrial Evolution of India in Recent Times* 1860-1939. Fifth edition. Delhi, 1971

Ganguly, B. N. : *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory.* Bombay, 1965

Indian National Congress : *Resolutions on Economic Policy and Programme 1924-'54.* New Delhi, 1954

Marx, K. and Engels, F. : *On Colonialism.* Moscow, 1963

Pulyarkin, V. A. : *The Developing Countries of South and*

Southeast Asia—The Basic Features and Ways of Transformation of the Structure of the Economic Regions Formed in the Colonial Period, in *The Countries and Peoples of the East*. Moscow, 1974

Ray, R.: *Industrialization in India—Growth and Conflict in the Private Corporate Sector 1914-1947*. Delhi, 1979

Rungta: *The Rise of Business Corporations in India*. Cambridge, 1970

Sen, S. K.: *Studies in Industrial Policy and Development of India 1858-1914*. Calcutta, 1964

Shirokov, G. K.: *Industrialization of India*. Moscow, 1973

Tagore. S. N.: *'Banglar Shilpa-Biplab O Rammohan'* (in Bengali). Calcutta, 1963

অধ্যায় ৬

Almond, G. and Coleman, J. S. (eds.): *The Politics of the Developing Arcas*. Princeton, 1960

Acworth Committee Report 1921

Antia, F. P.: *Inland Transport Costs*. Bombay, 1932

Banerjee, P. C.: *Railways, Transportation*. Agra, 1938

Bernstein, P. H. T.: *Steamboats on the Ganges*. New Delhi, 1960

Chakraborty, S.: *The Bengali Press (1818-1868)—A Study on the Growth of Public Opinion*. Calcutta, 1976

Ghose, S. C.: *Indian Railway Problem*. Gwalior, 1924

Government of India Publication: *Indian Railways—One Hundred Years, 1853-1953*. Published in 1953

Macpherson, W. J.: *Investment in Indian Railways, 1845-1875*, Economic Historical Review (December, 1955)

Narain, P.: *Press and Politics in India* 1885-1905. Delhi, 1970

Prasad, Amba: *Indian Railways—A Study in Public Utility Administration*. Bombay, 1960

Pye, L. W. (ed.): *Communications and Political Development*. First Indian Reprint. New Delhi, 1972

Report of the Indian Road Development Committee, 1927-28

Schramm, W. (ed.): *Mass Communications* Urbana, 1944

—: *The Process and Effects of Mass Communications*. Urbana, 1954

Srivastava, S. K.: *Transport Development in India*. Third edition. Gaziabad, 1960

Tewari, R. D.: *Railways in Modern India*. Bombay, 1941

Thorner, D.: *Investment in Empire*. Philadelphia, 1950

অধ্যায় ৭

Chamber of Princes: *The British Crown and the Indian States*. London, 1928

Handa, R. L.: *History of Freedom Struggle in Princely States*. New Delhi, 1968

Hettne, B.: *Political Economy of Indirect Rule—Mysore 1881-1947*. London, 1977

Jeffrey, R. (ed.): *People, Princes and Paramount Power—Society and Politics in the Indian Princely States*. Delhi, 1978

Lee-Warner, W.: *The Native States of India*. London, 1910

Mador, J.: *Political Change in An Indian State, Mysore 1917-1955*. Delhi, 1977

Majumdar, R. C.: *The History and Culture of the Indian People—British Paramountcy and Indian Renaissance*. Volume IX, Part I. Second edition. Bombay, 1963

Menon, V. P. : *The Story of the Integration of Indian States.* Bombay, 1956

Panikkar, K. M. : *Introduction to the Study of the Relations of the Indian States with the Government of India.* London, 1927

—: *Evolution of British Policy Towards Indian States 1774-1858.* London, 1929

Sastry, K. R. R. : *Indian States and Responsible Government.* Allahabad, 1939

Singh, R. : *Indian States and the New Regime.* Bombay, 1938

Tirtha, R. : *Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle.* Bombay, 1967

Tyson, G. W. : *Bengal Chamber of Commerce and Industries 1853-1953.* A Centenary Survey.

অধ্যায় ৮

Ali, Muhammad : *Scheme of Studies of National Muslim Educational Institutions of India.* Bombay, 1969

Basu, Aparna : *The Growth of Education and Political Development in India 1898-1920.* Delhi, 1974

Bose, B. D. : *Education in India Under East India Company.* Second edition. Calcutta.

Chatterjee, K. K. : *English Education in India—Issues and Opinions.* New Delhi, 1976

Chaudhuri, N. C. : The Intellectual in India. New Delhi, 1967

Datta, K. K. : *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India.* Patna, 1936

Husain, Z. : *Education Reconstruction in India.* New Delhi, 1969

Hussein, M. H.: *Syed Ahmad Khan, Pioneer of Muslim Resurgence*. Lahore, 1970

Mayhew, A.: *Education of India*. London, 1926

McCully, B. T.: *English Education and the Origins of Indian Nationalism*. New York, 1940

Mcore, R. J.: *Sir Charles Wood's Indian Policy 1853-1866*. Manchester, 1966.

Mukherjee, H. and U.: *The Origin of the National Education Movement*. Calcutta, 1957

Parliamentary Papers (British), *1831-32*, IV, Part I, and VIII; 1852-53: XXIX, XXX and XXXII

Sharp, H. (ed.): *Selections From Educational Records*, Part I, Calcutta, 1920

Shils, E.: *The Indian Intellectual Between Tradition and Modernity—The Indian Situation*. New York, 1970

Sinha, D. P.: *The Educational Policy of the East India Company in Bengal (upto 1864)*. Calcutta, 1964

Trevelyan, C. E.: *On the Education of the People of India*. London, 1838

Tripathi, A.: *Vidyasagar—The Traditional Modernizer*. Calcutta, 1975

অধ্যায় ৯

Ahmad, Aziz: *Islamic Modernization in India and Pakistan 1857-1964*. London, 1967

Ahmed, S A. F.: *Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835)*. Leiden, 1965

Baird, R. D.: *Religion in Modern India*. New Delhi, 1981

Besant, A.: *The Religious Problem in India*. Reprint. Delhi, 1976

Bhatnagar, O. P. (ed.) : *Studies in Social History* (Modern India). Allahabad, 1964

Biswas, D. K. : *'Rammohan Samiskkha.'* (in Bengali). Calcutta, 1983

Borthwick, M. : *Keshub Chunder Sen.* 1978

Bose, P. N. : *A History of Hindu Civilization During British Rule.* Vol. 1. First Published, 1894. Reprint, New Delhi, 1975

Burke, Marie L. : *Swami Vivekananda—New Discoveries.* Calcutta, 1958

—: *Swami Vivekananda : His Second Visit to the West, New Discoveries.* Calcutta, 1973

Gupta, A. C. : *Studies in the Bengal Renaissance.* Jadavpur, Calcutta, 1958.

Farquhar, J. N. : *Modern Religious Movements in India.* Calcutta, 1915

Heimsath, Charles : *Hinduism and Hindu Social Reform.* Princeton, 1964

Hinnells, J. R. and Sharpe, E. J. (eds.) : *Hinduism.* New Castle upon Tyne, 1972.

Isherwood, C. : *Ramkrishna and His Disciples.* Second edition. Calcutta, 1969

Jones, K. W. : *Arya Dharma—Hindu Consciousness in the Nineteenth Century Punjab.* California, 1976

Jordans, J. F. : *Dayanand Saraswati—His Life and Times.* 1978

Kopf, David : *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind.* New Jersey, 1979

—: *British Orientalism and the Bengal Renaissance—The Dynamics of Indian Modernization 1773-1834.* Berkeley, 1969

Lavan, S. : *Ahmadiyah Movement—Past and Present.* Amritsar, 1976

—: *The Ahmadiyah Movement—A History and Perspective.* New Delhi, 1974

—: *Unitarians and India—A Study in Encounter and Response.* 1977

Lewy, G. : *Religion and Revolution.* New York, 1974

Majumdar, B. B. : *History of Indian Social and Political Ideas—From Rammohan to Dayanand.* Calcutta, 1967

Majumdar, B. B. : *Militant Nationalism in India and Its Socio-religions Background* 1897-1917. Calcutta, 1966

Majumdar, R. C. : *On Rammohan.* Calcutta, 1972

Marshall, P. J. : *The British Discovery of Hinduism in the Eighteenth-Century.* Cambridge, 1970.

Max Mueller, F. : *Keshub Chunder Sen.* Edited by Nanda Mukherjee Calcutta, 1976

Majumdar, R. C. : *Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century.* Calcutta, 1960

Monier-Williams : Hinduism. Reprint. Delhi, 1971.

Rao, M. S. A. : *Social Movement in India.* Delhi, 1979

Ray, A. K. : *The Religious Ideas of Rammohan Roy.* New Delhi, 1976

Ray, A. S. : '*Banglar Renesnans*' (in Bengali). Calcutta, 1371 B. S.

Rolland, R. : *The Life of Vivekananda and the Universal Gospel.* Almora, 1931

Roy, B. K. : *Socio-politico Views of Vivekananda.* Second edition. New Delhi 1979

Roy, N. R. (ed.) : *Rammohan Roy—A Bicentenary Tribute.* New Delhi, 1979

Sen, Asoke : *Vidyasagar and His Elusive Milestones*. Calcutta, 1977

Stepanyants, M. T. : *Pakistan—Philosophy and Sociology*. Moscow, 1971

Tagore, Rabindranath : '*Bharat Pathik Rammohan*'. 'Janma Satabarshik Samskaran', Volume 11

অধ্যায় ১০

Aziz, K. K. : *Britain and Muslim India. London*, 1963

Barrier, N. G. (ed.) : *Roots of Communal Politics*. Delhi, 1976

Bolitho, H. : *Jinnah—Creator of Pakistan*. London, 1954

Hardy, P. : *The Muslims of British India*. Cambridge, 1972

Ikram, S. M. : *Modern Muslim India and the Birth of Pakistan*. Lahore, 1965

Keer, D. : *Dr. Ambedkar—Life and Mission*. Bombay, 1954

De, A. : *Roots of Separatism in Nineteenth Century Bengal*, Calcutta, 1974

Mathur, Y. B. : *Growth of Muslim Politics in India*. Pragati Prakashan, 1979

Merriam, A. H. : *Gandhi Versus Jinnah : The Debate over the Partition of India*. 1982

Minault, G. : *The Khilafat Movement : Religious Symbolism and Political Mobilization in India*. Delhi, 1982

Omar, B. : '*Sampradayikata.*' (in Bengali). Calcutta, 1966

Pirzada, S. S. (ed.) : *Foundations of Pakistan—All India Muslim League Documents 1906-1947*. Two Volumes. Indian edition. New Delhi, 1982

Rahaman, H. : *Hindu-Muslim Relations in Bengal, 1905-1947—Study in Cultural Confrontation*. Bombay, 1974

Rahaman, M.: *From Consultation to Confrontation : A Study of the Muslim League in British Indian Politics 1906-1912.* London, 1978

Savarkar, V. D.: *Hindu Rashtra Darshan* (A Collection of the Presidential Speeches Delivered from the Hindu Mahasabha Platform). Bombay, 1949

Shakir, M.: *Politics of Minorities : Some Perspectives.* Delhi, 1980

Thursby, G. R.: *Hindu-Muslim Relations in British India—A Study of Controversy, Conflict and Communal Movements in Northern India* 1923-1928. Leiden, 1975

Sayeed, K. B.: *Pakistan—The Formative Phase* 1857-1948 Second edition. London, 1968

অধ্যায় ১১

Adhikari, G.: *Pakistan and National Unity.* Bombay, 1942

Ahmad, I. (ed.): *Caste and Social Stratification Among Muslims in India.* New Delhi, 1973

Beteille, A.: *Caste, Class and Power—Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village.* Berkeley, 1965

Crouch, H.: *Indian Working Class.* Bombay, 1979

Dumont, L.—*Homo Hierarchicus—The Caste System and Its Implications.* Chicago, 1970

Gadgil, D. R.: *Origins of the Modern Indian Business Class.* New York, 1959

Hutton, J. H.: *Caste in India.* London, 1961

Ibbetson, D.: *Punjab Castes.* Delhi, 1974. Reprint (First published, 1916)

Ishchik, E. F.: *Politics and Social Conflict in South India—*

The Non-Brahman Movement and Tamil Separatism 1916-1929. California, 1959

Karnik, V. B.: *Indian Trade Unions.* Bombay, 1966 (Second edition)

Kochanek, S. A.: *Business and Politics in India.* London, 1974

Kothari, R. (ed.): *Caste in Indian Politics.* New Delhi, 1970

Mishra, B. B.: *The Indian Middle Classes—Their Growth in Modern Times.* London, 1961

Morris, M. D.: *Emergence of an Industrial Labour Force in India.* California, 1965

Omvedt, G.: *Cultural Revolt in Colonial Society—The Non-Brahman Movement in Western India. 1873-1930.* Bombay, 1976

Owen, C: *Social Stratification.* London, 1971, (Reprint)

Pavlov, V. I.: *The Indian Capitalist Class: A Historical Study.* Bombay, 1964

Sen, S.: *Working Class of India—History of Emergence and Movement* 1830-1930, Calcutta, 1977

Sharma, G. K.: *Labour Movement in India: Its Past and Present.* New Delhi, 1971

Sinha, J. N.: *The Indian Working Force* (Its *Growth and Changing Composition*), Census of India 1961, Vol. 1, Monograph No. 11. New Delhi, 1972

Srinivas, M. N.: *Caste in Modern India and Other Essays.* Bombay, 1962

—: *Social Change in Modern India.* Berkeley, 1966

Timberg, T. A.: *The Marwaris.* Delhi, 1978.

নির্দেশিকা

ই

ও

ঔ

ল

হ